একক
দশক
শতক

বিমল মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—আঠারো টাকা—

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭০
দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৩৭০
তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৭১
চতুর্থ মুদ্রণ, মাঘ ১৩৭১
পঞ্চম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৭২
ষষ্ঠ মুদ্রণ, কার্তিক ১৩৭৪
সপ্তম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৮০

EKAK-DASHAK-SATAK

(Last part of the trilogy : Saheb Bibi Gulam, Kari Diye Kinlam, Ekak Dashak Satak)

A novel by Bimal Mitra

Price Rs. 18/-

এই গ্রন্থের রচনাকাল :
নভেম্বর ১৯৬২—আগস্ট ১৯৬৩

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—শ্রীঅজিত গুপ্ত
মুদ্রণ—ন্যাশনাল হাফটোন কোং

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

মণ্টু

সংসার-যাত্রা-নির্বাহের সমস্ত দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে তুমি চিরদিন আমার সহযোগিতা করেছ বলেই 'সাহেব-বিবি-গোলাম, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' আর 'একক দশক শতক' রচনা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাই আমার ইচ্ছে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে তোমার নাম যুক্ত থাকুক।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে সম্প্রতি অসংখ্য উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক-মহলে আমার জনপ্রিয়তার ফলেই এই দুর্ঘটনা সম্ভব হয়েছে। ও-নামে কোনও দ্বিতীয় লেখক নেই। পাঠক-পাঠিকা-বর্গের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে সেগুলি সম্পূর্ণ জাল বই। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

The time will come when the sun will shine only upon a world of free men who recognise no master except reason, when tyrants and slaves, priests and their stupid or hypocritical tools will no longer exist except in history or on the stage.

—Marquis de condorcet.

1743—1794

বিমল মিত্রের এ-যাবৎ লেখা বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা ॥

এর নাম সংসার
শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন
চার চোখের খেলা
সাহেব বিবি গোলাম
সাহেব বিবি গোলাম (নাটক)
নফর সংকীর্তন
একক দশক শতক (নাটক)
কড়ি দিয়ে কিনলাম
বেগম মেরী বিশ্বাস
শ্রেষ্ঠ গল্প
সখী সমাচার
সাহিত্য বিচিত্রা
মিথুন লগ্ন
ফুল ফুটুক
ও হেনরির গল্প (অনুবাদ)
ইয়ার্লিং (অনুবাদ)
মন কেমন করে
অন্যরূপ
নিশিপালন
কন্যাপক্ষ
সরস্বতীয়া
বরনারী (জাবালি)
চলো কলকাতা
বেনারসী
কুমারী ব্রত
আমি
পতি পরম গুরু
রাগ ভৈরব

স্ত্রী
লজ্জাহরণ

কলকাতা থেকে বলছি
আসামী হাজির
গল্পসম্ভার
গুলমোহর
রাণী সাহেবা
কথা চরিত মানস
কাহিনী সপ্তক
এক রাজা ছয় রানী
প্রথম পুরুষ
মৃত্যুহীন প্রাণ
টক ঝাল মিষ্টি
পুতুল দিদি
মনে রইলো
হাতে রইল তিন
দিনের পর দিন
শনি রাজা রাহু মন্ত্রী
তোমরা দু'জন মিলে
তিন ছয় নয়
নিবেদন ইতি
রং বদলায়
সুয়োরানী
নবাবী আমল
নটনী
বিনিদ্র
কেউ নায়ক কেউ নায়িকা
যে যেমন
চাঁদের দাম এক পয়সা
দু চোখের বালাই

নিবেদনমিদং

১৯৩৮ সালের আগস্ট মাস। সবে ইউনিভার্সিটির বেড়া ডিঙিয়েছি। আমার কর্মজীবনের সেই শুভ সূত্রপাতের সঙ্গে-সঙ্গে অতি সংগোপনে একটি কঠিন ব্রত আমি গ্রহণ করে বসলাম। ব্রতটি ছিল এই যে—যে-দেশে আমি জন্মেছি, একটি বিশেষ যুগ থেকে শুরু করে জীবনের একটি বিশেষ তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় খণ্ডে খণ্ডে সেই দেশের একটি উপন্যাস লিখে যাবো। সেদিন কলম ছিল অপটু, কিন্তু যৌবনের আতিশয্যে সাহস ছিল দুর্জয়। সেই সাহসের ওপর ভর করেই একদিন 'সাহেব বিবি গোলাম' লিখতে শুরু করি। আমার গোপন পরিকল্পনার সেটি প্রথম খণ্ড। সে-উপন্যাস শেষ হয় ১৯৫৩ সালে। দেশের জনসাধারণ সে-উপন্যাস পড়ে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-সূত্রে আবদ্ধ করলেন, কিন্তু সাহিত্য-সমাজ আমার শিরে অভিসম্পাত বর্ষণ করলেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার ফাইলে সে-অভিসম্পাতের কিছু নজীর এখনও বিদ্যমান। গবেষকরা তার সন্ধান নিশ্চয়ই রাখেন।

কিন্তু তার ফলে আমি হৃতস্বাস্থ্য হলেও হৃতোদ্যম যে হই নি তার প্রমাণ 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'—ভারতীয় ভাষায় সর্ববৃহৎই শুধু নয়, সর্বজনসমাদৃত উপন্যাস। সৌভাগ্যক্রমে সে-উপন্যাস পড়ে পাঠক-সাধারণ আমাকে আগের মতই আশাতীত সমাদরে অভিনন্দন জানালেন এবং সাহিত্য-সমাজ যথারীতি আমার ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করে তাঁদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন। সে-নজীরও ভবিষ্যৎ গবেষকদের অগোচর থাকবার কথা নয়।

কিন্তু ততদিনে আমি সাহিত্য-সমাজের এই দুর্জ্ঞেয় মনোবৃত্তির পুর্ণ পরিচয় পেয়ে গিয়েছি, তাই অবিচলিত নিষ্ঠায় আবার শুরু করলাম আমার পরিকল্পিত উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড। সে-উপন্যাস আজ এতদিনে শেষ হলো—এই 'একক দশক শতক'। আমি অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি এ-গ্রন্থের ললাটেও সেই একই লিপি ক্ষোদিত আছে। তাই আমার জীবদ্দশাতেই যে আমি আমার ব্রত সমাপ্ত করতে পেরেছি, আমার কাছে এ আনন্দের মূল্য অসীম।

১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর পটভূমিকা। অর্থাৎ, কলকাতার পত্তন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর-কাল পর্যন্ত।

এর পর ১৯১২ সালে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর নায়কের জন্ম। সেই ১৯১২

সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর পটভূমিকা। অর্থাৎ, দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল।

এবার 'একক দশক শতক'। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে শুরু করে ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবরে চীনা আক্রমণ পর্যন্ত এর পরিধি।

এই প্রায় পৌনে তিনশো বছর কালকে আমার উপন্যাসে বিধৃত করে রাখতে আমার জীবনের পঁচিশটি বছর যে কোথা দিয়ে অতিবাহিত হলো সে বিষয়ে সচেতন হবার অবসর পাই নি এতদিন। আমার প্রয়াস সার্থক হয়েছে কি হয়নি তার বিচারক আমি নই। হয়ত বর্তমান কালও তার বিচারক নয়, সে বিচার ভবিষ্যৎকালের। আমি শুধু কারক, কর্তা অবাঙ্‌মনসোগোচর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন—"অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ল আমার ভাগ্যে, অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা, আমার মত আর কোন সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি। এও আমার খ্যাতি-পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি।" বলাই বাহুল্য আমি রবীন্দ্রনাথ তো নই-ই, এমন কি আজ বাংলা সাহিত্যে যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় তাঁদের কারোর সমকক্ষও নই। তবু সাহিত্য-সমাজের ধিক্কার কুৎসা ও বিদূষণ থেকে আমি মুক্ত থাকতে পারবো এ দুরাশাই বা কেমন করে করি?

আর একটা কথা। আলেকজান্দ্রিয়ার কবি CaHimachus বলেছেন: 'A big book is a big evil.'—সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক, আমার উপন্যাস দীর্ঘই হয়েছে। সুতরাং আমিও সেই একই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু সেই বৃহৎ পুস্তক লিখেও যে আমি পাঠকের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করি নি তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। আমি আমার পাঠক-সাধারণের কাছে সে-জন্যে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হয়ে আছি।

এর পরে এই উপন্যাস-ত্রয়ীর একটি ভূমিকা (preface) লেখবার বাসনা আছে। সে-বইটির নাম দেব 'বেগম মেরী বিশ্বাস।' অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজদের আগমনের পর ইসলাম, খৃষ্টান এবং হিন্দুসংস্কৃতির সমন্বয়-সাধনের সংগ্রামই হবে এর বিষয়-বস্তু।

আজ আমার আরব্ধ ব্রত-সমাপ্তি উপলক্ষে এই কয়টি কথা নিবেদন করেই এই ভূমিকায় পূর্ণচ্ছেদ টানলাম। ইতি—

বিনীত

বিমল মিত্র

মুখপত্র

রাজ্য-পরিক্রমার পর রাজধানীতে ফিরছেন রাজা রোহিত সামনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পথ আটকে দাঁড়ালেন।

—কে?

—আমি রাজা রোহিত।

ব্রাহ্মণ বললেন—ঘরে ফিরছো কেন?

রাজা রোহিত বললেন—আমি এবার ক্লান্ত—

ব্রাহ্মণ বললেন—চলতে চলতে যে ক্লান্ত সে-ই তো অন্ত-শ্রী! যিনি সত্য-কাম তিনিও যদি নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন, তাঁরও পতন অনিবার্য। সুতরাং, তুমি চলো চলো, এগিয়ে চলো, চরৈবেতি—চরৈবেতি—

রাজার আর গৃহে ফেরা হলো না। তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন পরি-ক্রমায়। কিন্তু একদিন আবার ফিরে এলেন রাজধানীতে। আবার সেই ব্রাহ্মণ পথ আটকে দাঁড়ালেন।

—ঘরে ফিরছো কেন?

রাজা রোহিত আবার বললেন—এ-রকম ক্রমাগত চলে চলে লাভ কী?

ব্রাহ্মণ বললেন—সে কী? যে চলতে পারে সে-ই তো সুস্থ। সুস্থ মানুষই তো সুস্থ মনের অধিকারী। আত্মার বিকাশ হয় তার। এ কি চরম লাভ নয়? তুমি চলো চলো, এগিয়ে চলো—চরৈবেতি—চরৈবেতি—

এবারও ঘরে ফেরা হলো না রাজার। আবার বেরিয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু আবার একদিন ফিরলেন রোহিত। আবার ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন—

—আবার কেন ফিরলে?

—আমি আর পারছি না যে—

ব্রাহ্মণ বললেন—সে কি? যে বিশ্রাম করে তার ভাগ্যও যে বিশ্রাম করে। যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও যে উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও যে ধরাশায়ী হয়, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও যে এগিয়ে চলে—তুমি এগিয়ে চলো, থেমো না—চরৈবেতি—চরৈবেতি—

কাজেই আবার ফিরতে হলো রাজা রোহিতকে। ঘুরে ঘুরে আবার যখন ঘরে ফিরছেন, পথে আবার সেই ব্রাহ্মণ।

—আর আমি ঘুরতে পারছি না ব্রাহ্মণ। আমি আপনার উপদেশ শুনতে পারবো না। আমায় আপনি ক্ষমা করুন। সত্যযুগে এ উপদেশ হয়তো চলতো, এ যুগে এ অচল—

ব্রাহ্মণ হাসলেন। বললেন—না, শুয়ে থাকাই হলো কলিযুগ, জেগে ওঠাই দ্বাপর, উঠে দাঁড়ানোই ত্রেতা, আর চলাই হলো সত্যযুগ। সুতরাং তুমি এগিয়ে চলো রাজা রোহিত, আরো এগিয়ে চলো, চরৈবেতি—চরৈবেতি—থেমো না—

আর ফেরা হলো না। আবার চলতে আরম্ভ করলেন রাজা রোহিত। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, সিন্ধু থেকে পূর্ব-সীমান্ত। কাশী কোশল অযোধ্যা মিথিলা কলিঙ্গ দ্রাবিড় ভারতবর্ষের সমস্ত ভূ-খণ্ডে আবার শুরু হলো তাঁর পরিক্রমা। তারপর শুরু হলো বহির্ভারত আর তারপর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড।

এমনি করে কালপ্রবাহ এগিয়ে চললো। অবশেষে যুগযুগান্তর পরে এল ১৯৪৭ সাল। সে রাজা রোহিতও নেই, সেই ব্রাহ্মণও নেই। আদেশ করবার লোকও নেই, উপদেশ শোনবারও কেউ নেই। উপদেশ উপদেষ্টা সব তখন একাকার হয়ে গেছে।

এ উপন্যাস সেখান থেকেই শুরু করলাম।

উপাখ্যান

প্রথমে যখন এ-পাড়ায় বাড়িটা তৈরি হচ্ছিল তখনও কেউ জানতো না। জমি কেনা কবে হলো, কবে দলিল রেজিস্ট্রী করা হলো, তার খবরও কেউ রাখতো না। এ-পাড়ার লোক সাধারণত এসব খবর নিয়ে মাথা ঘামায় না। যে যার বাড়িতে নিজের নিজের কোটরে থাকে। এই জমিতেই একদিন রাজমিস্ত্রী মজুর দিনের পর দিন খেটে এ-বাড়ি তুলেছিল। তখন মাঝে মাঝে একটা বিরাট গাড়ি এসে দাঁড়াতো। সঙ্গে থাকতেন একজন মহিলা। যাঁর বাড়ি তিনি এসে দেখে যেতেন বাড়ি কতদূর উঠলো। তাঁর স্ত্রীও দেখতেন। সেই তখন থেকেই লোকে জানতে পারলো এ-বাড়ি শিবপ্রসাদ গুপ্তের। কলকাতার নামজাদা লোক, প্রখ্যাত দেশভক্ত। এককালের পোলিটিক্যাল সাফারার শিবপ্রসাদ গুপ্তের নাম শুনলে কারো চিনতে বাকি থাকার কথা নয়।

বড়লোকদের নাম হয়ে গেলে সুবিধেও যেমন থাকে, আবার অসুবিধেও তেমনি অনেক।

শিবপ্রসাদ গুপ্ত যখন প্রথম এ-বাড়িতে এসেছিলেন তখন পাড়ার লোকেরা অনেকেই অযাচিতভাবে এসে দেখা করে গিয়েছিলেন। সেই যে তাঁদের আনা-গোনা আরম্ভ হয়েছিল, তার পর থেকে তা আর থেমে যায় নি।

লোকে বলত—বড়লোক হলে কী হবে, মেজাজটা শিবের মত—

শিবের মেজাজ আসলে কী রকম কে জানে। কিন্তু শিবকে ঠাণ্ডা মেজাজের দেবতা মনে করে নিলে উপমাটা লাগসই করার পক্ষে সুবিধে হতো। আর তা ছাড়া শিবের চেহারার সঙ্গেও মিল ছিল শিবপ্রসাদবাবুর।

শিবপ্রসাদবাবু বলতেন—না না, কী যে বলেন আপনারা, দিনকাল যে-রকম পড়েছে আজকাল তাতে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে।

আরো বলতেন—মেজাজ গরম করলে কি আর পাবলিকের সঙ্গে কারবার করা চলে বঙ্কুবাবু—

একা বঙ্কুবাবুই শুধু নয়, পাড়ার কয়েকজন রিটায়ার্ড বৃদ্ধ সন্ধ্যেবেলা মাথা-গলা-কান ঢাকা দিয়ে এসে বসতেন। খবরের কাগজ নিয়ে আলোচনা হতো,

কংগ্রেস, কমিউনিস্ট নিয়ে আলোচনা হতো, প্রত্যেকের একটা করে বলবার মত বিষয় ছিল, সেটা তাদের অতীত জীবন। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার চেয়ে অতীতটা নিয়েই বেশি মাথা ঘামাতেন সবাই। সেই অতীত জীবনের কথাই সকলের মনে পড়তো। কী-সব দিন-কাল ছিল মশাই! কোথায় গেল সেই সোনার দেশ! তখন লেখাপড়ার কদর ছিল, দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল। আর এখন সব উল্টে গেছে। মেয়েরা অফিসে ঢুকেছে চাকরি নিয়ে। রাস্তায় পার্কে একা-একাই সব বেড়াচ্ছে। পুরুষ মানুষকে ভ্রূক্ষেপই নেই।

প্রত্যেক দিনই এই আলোচনা হয়। কিন্তু মীমাংসায় পৌঁছোবার আগেই বদ্যিনাথ এসে ঘরে ঢোকে।

বদ্যিনাথ এসে বলে—পুজোর জায়গা হয়েছে আপনার—

বদ্যিনাথ ওই সময়ে ঘরে ঢোকা মানেই শিবপ্রসাদবাবুর পুজোর জায়গা হওয়া। এটা সবারই জানা হয়ে গিয়েছে। প্রথমে একটু অবাক লেগেছিল। মানে একেবারে প্রথম-প্রথম।

শিবপ্রসাদবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন—ওই ভণ্ডামিটুকু আর ছাড়তে পারছি না কিনা—

বঙ্কুবাবু বলেছিলেন—তা ভণ্ডামি বলছেন কেন? পুজো করা কি ভণ্ডামি মশাই? এখনও যে ইণ্ডিয়া পৃথিবীর মধ্যে এত এগিয়ে আছে এ কিসের জন্যে বলুন? ওই সব আছে বলেই তো এখনও দুনিয়াটা চলছে। চন্দ্র সূর্য নড়ছে। নইলে দেখতেন কবে ইণ্ডিয়া কমিউনিস্ট ব্লকে জয়েন করে ফেলতো—

শিবপ্রসাদবাবু হো হো করে উচ্চ হাসি হাসতেন। একেবারে প্রাণখোলা হাসি।

বলতেন—অতশত জানি না মশাই, পুজো করে মনে তৃপ্তি পাই তাই করি। ছোটবেলার অভ্যেসটা আর ছাড়তে পারি নি—

কথাটা শুনে চমকে যাবার মতই। সবাই জিজ্ঞেস করে—আপনি কি ছোট-বেলা থেকেই পুজো করে আসছেন নাকি?

শিবপ্রসাদবাবু বলেন—তা দশ-বারো বছর বয়েস থেকেই করে আসছি তো, মা বলেছিলেন করতে, তাই করি। এখনও মার কথাগুলো সবই মেনে চলতে চেষ্টা করি—ওই দেখুন না আমার মায়ের ছবি…

বলে মায়ের উদ্দেশে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করলেন।

একটা সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো মায়ের ছবিটা টাঙানো ছিল দেয়ালের

গায়ে। বিরাট অয়েলপেন্টিং। সারা দেয়ালখানা জুড়ে ওই একখানা ছবিই ঝুলছে। সবাই সেই দিক চেয়ে দেখলে।

শিবপ্রসাদবাবু বলতে লাগলেন—মায়ের মনের কোনো সাধই পূর্ণ করতে পারি নি তাই এখন দুঃখ হয়। আমি মায়ের অযোগ্য ছেলে মশাই, আমার মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি জীবনে—

বলতে বলতে গলাটা যেন বুজে আসে শিবপ্রসাদবাবুর।

প্রতিবেশীরা তখন আর দাঁড়ান না। বলেন—না না, আপনি আসুন, আপনার দেরি করে দেবো না আর—

রাত ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত শিবপ্রসাদবাবুর পুজো করবার সময়। সে-সময় কারো গোলমাল করার নিয়ম নেই। শুধু তাই নয়, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এ-বাড়ির ভেতরে কোথায় যেন একটা প্রশান্তির প্রলেপ মাখানো সজীবতা লেগে থাকে। এখানে সবাই প্রসন্ন। এ-যুগে এ এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। কোথাও কোনও অভিযোগ লুকিয়ে থাকে তো তা কারো কানে যায় না। আনন্দ যেন উপ্‌চে পড়ছে প্রত্যেকটি মানুষের মনে। সবাই ঘুম থেকে উঠে বলে—বাঃ! আবার রাত্রে শুতে যাবার আগেও যেন সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে বলে—বাঃ! এ যে এ-যুগে কেমন করে সম্ভব হলো সেইটেই এ-পাড়ার লোকের কাছে একটা সমস্যা। কেউ কেউ ভাবে হয়ত টাকাই এর প্রধান কারণ। অপর্যাপ্ত টাকা থাকলে হয়ত এমনি শান্তির সংসার গড়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু টাকা কি কেবল কলকাতা শহরে শুধু শিবপ্রসাদবাবুর একলারই আছে? আর কারো নেই? বঙ্কুবাবুরই কি টাকা নেই? অবিনাশবাবুরই কি টাকার অভাব? অনাথবাবুর তিনটি ছেলেই দিক্‌পাল—তিনজনই গেজেটেড্ অফিসার, কত টাকার ছড়াছড়ি চারিদিকে। এ-পাড়ার বড়-বড় বাড়ির মালিক সবাই। বাইরে থেকে ফ্লোরেসেন্ট লাইট, রেফ্রিজারেটার, রেডিওগ্রাম, সবই তো নজরে পড়ে। নজরে যাতে পড়ে তার সব রকম ব্যবস্থাই তো মজুত। কিন্তু সবাই এখানে, এই শিবপ্রসাদবাবুর বাড়িতে এসে যেন খানিকটা মুক্ত-বায়ু সেবন করে যায়। এখানে এসে শিবপ্রসাদবাবুর সঙ্গে কথা বললেও যেন পরমায়ু বৃদ্ধি হয় সকলের। কিন্তু কেন এমন হয় কেউ বুঝতে পারে না।

সকালবেলা অফিসে যাবার সময় মন্দা এসে দাঁড়ায়। শিবপ্রসাদবাবুর হাতের জিনিস গুছিয়ে দেবার জন্যে নয়। সে কাজের আলাদা লোক আছে। বিষ্টিনাথের কাজই ওই। বিষ্টিনাথের চাকরিটাই ওই জন্যে।

শিবপ্রসাদবাবু মন্দার দিকে চেয়ে বলেন—জানো, বিষ্টিনাথ আজকাল গানের চর্চা করছে, কালোয়াত হবে—

বিষ্টিনাথ আশ্চর্য হয়ে একটু জড়োসড়ো হয়ে পড়লো।

—কী রে, কালোয়াত হবি বুঝি? ওস্তাদ রেখেছিস? কত মাইনে নেয়?

মন্দাও অবাক হয়ে গেছে। বললে—বলছো কী তুমি? ও আবার গান গাইবে, তবেই হয়েছে—

—আরে না, তুমি জানো না, ভোরবেলা আমি যে শুনলুম নিজের কানে। শীতে কন্‌কন্‌ করছে, আর শুনি খুব গান হচ্ছে। প্রথমে বুঝতে পারি নি, আমি ভাবলুম বুঝি সদাব্রত গান গাইছে, শেষে বুঝতে পারলুম, এমন গলা তো বিষ্টিনাথের না হয়ে যায় না—

মন্দা বললে—থাক থাক, তোমার অফিসের আবার দেরি হয়ে যাবে ওই সব বাজে কথা নিয়ে—

—আরে বাজে কথা নয়, ওকেই জিজ্ঞেস করো না, কোন্ গানটা গাইছিলি রে? বল্ না? 'ভালবেসে কেন সে কাঁদায়'—তার পর কী রে?

মন্দা আর থাকতে পারলে না। বললে—তোমার দেখছি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, তোমার দেখছি মুখে কিছু বাধে না···

—বাঃ, ওর ভালবাসতে বাধলো না আর আমার মুখ ফুটে বলতেই বাধবে?

মন্দা বললে—তুই যা তো বিষ্টিনাথ, যা যা, এ ঘর থেকে যা—

বিষ্টিনাথ বোধ হয় ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো।

কিন্তু শিবপ্রসাদবাবু হাসতে লাগলেন।

বললেন—অনেক দিন তো দেশে যায় নি, বউয়ের জন্যে মন কেমন করছে আর কি। ওকে ছুটি দেওয়া যাক, কী বলো—?

—বাঃ রে, ওকে ছুটি দিলে তোমার কী করে চলবে? ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে তুমি? বিষ্টিনাথ ছাড়া তো তোমার একদণ্ড চলে না—

—কেন, তুমি করতে পারবে না ওর কাজগুলো?

—আমার বয়ে গেছে করতে!

বলে মন্দা একটু মুখ ভার করার ভান করলে।

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—কিন্তু আগে তো তুমি আমার সব কাজই করতে!

—আগে করতুম করতুম, এখন তুমিই কি আগের মতন আছো?

—কেন, আমি আবার কবে বদলে গেলুম!

—বদলে যাও নি? আগে তোমার এত ঘোরাঘুরি ছিল, না এতবড় বাড়ি ছিল? না এত টাকাই ছিল?

—তা এত টাকা কি আমি ইচ্ছে করে করেছি? তুমি তো জানো টাকার লোভ আমার কোন দিন ছিল না, টাকা বাড়ি গাড়ি রেফ্রিজারেটার রেডিওগ্রাম কিছুই আমি চাই নি, সমস্ত আপনিই এসে গেছে—বলতে গেলে এ তোমার ভাগ্যেই এসেছে—

মন্দা একটু রাগ দেখালো। বললে—যাও যাও, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—

শিবপ্রসাদবাবু হাসতে লাগলেন। পাঞ্জাবি পরা হয়ে গিয়েছিল। জিনিস-পত্রও সব গুছিয়ে দিয়েছে বদ্যিনাথ। শিবপ্রসাদ ঘর থেকে বেরোবার আগে জিজ্ঞেস করলেন—কুঞ্জ গাড়ি বার করেছে নাকি?

বদ্যিনাথ বাইরেই দাঁড়িয়েছিল হুকুমের অপেক্ষায়। সেখান থেকেই বললে—হ্যাঁ, বার করেছে—

গাড়ির কথাতেই বোধ হয় মন্দার মনে পড়লো কথাটা। পেছন থেকে বললে—তুমি নাকি খোকাকে গাড়ি কিনে দেবে বলেছ?

শিবপ্রসাদবাবু ফিরলেন। বললেন—হ্যাঁ, বলেছিলুম তো, খোকা বলছিল নাকি?

—ওর গাড়িটা পুরোনো হয়ে গেছে তাই বলছিল, আমার ভয় করে, কবে না অ্যাক্সিডেন্ট করে বসে আবার—

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—তা বলছে যখন, দাও না। আর আমি নিজে তো ওর বয়েসে গাড়ি চড়তে পাই নি—

—তা বলে এখন থেকেই শৌখিন হয়ে যাওয়া কি ভালো?

—গাড়ি থাকা কি শৌখিন হওয়া? নইলে কলেজে বাসে ট্রামে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হবার তো আরো বেশি চান্স, সেদিন আমার অফিসেরই একটা ক্লার্ক তো বাসের চাকার তলায় চাপা পড়ে মারা গেল—

কথাটায় বাধা পড়লো। হঠাৎ টেলিফোন এসে গিয়েছিল। আওয়াজ

শুনেই বজিনাথ গিয়ে ধরলো। টেলিফোনটা শিবপ্রসাদবাবু নিজে ধরেন না কখনও।

মন্দা ততক্ষণ নিজের কাজগুলো গোছাতে ব্যস্ত। দিনের মধ্যে যতক্ষণ সকালবেলা বাড়ি থাকেন শিবপ্রসাদবাবু ততক্ষণই টেলিফোন। হাজার-হাজার প্রতিষ্ঠান আর হাজারটা মানুষের সঙ্গে সারাদিন সম্পর্ক রাখতে হয়। এই যে এখন অফিসে যাচ্ছেন, তারপর ফিরবেন সেই সন্ধ্যে সাতটা আটটায়। যেদিন কোথাও মীটিং থাকে সেদিন আরো রাত হয়। আর মিটিংও কি একটা নাকি! সেই মীটিং থেকে ফিরতেই এক-একদিন রাত দশটা-এগারোটা বেজে যায়। পাড়ার বঙ্কুবাবু অনাথবাবুরা এসে কর্তাকে না পেয়ে ফিরে যান। অত রাত্রে ফিরে এসেও তখন পুজো করতে বসেন শিবপ্রসাদ। পুজোটা নিয়মিত করা চাই, তার পর খাওয়া—

শিবপ্রসাদবাবু ফোনটা রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন।

মন্দা জিজ্ঞেস করলে—আজকেও আবার মীটিং নাকি তোমার?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—আরে না, মহা মুশকিলে ফেলেছে আমাকে ওরা—

—কারা?

—আবার কারা? ওই পি-এস-পি'র দল। আমাকে নিয়ে টানাটানি। বলছে আমাদের ক্যাণ্ডিডেট হয়ে আপনি ইলেকশানে দাঁড়ান—আমি যত বলছি, বাবা, আমি কোনও দলেই নই, ছোটবেলা থেকে নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের কাজ করেছি, এখনও করছি, যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন করবো। তা দেশের উপকার করতে তো রাজী আছি, কিন্তু তোমাদের দল-টলের মধ্যে আমি নেই—তা কিছুতেই শুনবে না, কেবল আমাকে দলে টানতে চাইছে—হয় ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষের দলে জয়েন করতে হবে, নয় তো অতুল্য ঘোষের, মাঝা-মাঝি থাকা চলবে না—

মন্দা অত কথা বুঝতে পারে না। বললে—তা তুমি মীটিং-এ যাচ্ছো নাকি? কী বললে তুমি?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—আমি যা সকলকে বলি তাই-ই বললুম। বললুম যে মাকে জিজ্ঞেস না করে তো আমি কিছুছু করি না—মাকে জিজ্ঞেস করবো—দেখি মা কী বলেন—

বলে আর দাঁড়ালেন না। বারান্দা দিয়ে নীচে একতলার দিকে চলতে লাগলেন। বজিনাথও পেছন-পেছন চলতে লাগলো কাগজপত্রের পোঁটলা

হাতে নিয়ে। ওটা শিবপ্রসাদবাবুর সঙ্গে গাড়িতে রোজ যায়, আবার রোজ ফিরে আসে। বঙ্কিনাথও সঙ্গে সঙ্গে যায়। আবার বাবুর সঙ্গেই সে ফিরে আসে রাত্রে। নেতাজী সুভাষ রোডের দোতলার একটা ফ্ল্যাটে শিবপ্রসাদ-বাবুর অফিস। 'ল্যাণ্ড ডেভেলপ্‌মেণ্ট সিণ্ডিকেট'। শিবপ্রসাদবাবুর ক্লার্ক আছে, টাইপিস্ট আছে, ড্র্যাফট্‌স্‌ম্যান আছে। ঘর-ভর্তি লোক। কলকাতা যখন ডোবা-পুকুর ছিল তখনকার কথা আলাদা। একে একে বাড়ির সংখ্যা বেড়েছে। লোকসংখ্যা বেড়েছে। পার্টিশানের পর মানুষ গিজ-গিজ করছে শহরে। সেই সময় থেকেই মাথায় বুদ্ধিটা খেলেছিল শিবপ্রসাদবাবুর। তখনই এই অফিসটা করেন। তিনি বুঝতে পারেন এ-কলকাতা আগামী পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে আর এ-রকম থাকবে না। আরো বড় হবে। ডালপালা ছড়িয়ে পশ্চিমে চন্দননগর চুঁচড়ো ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত গিয়ে ঠেকবে। দক্ষিণে যাদবপুর গড়িয়া ছাড়িয়ে ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে ছোঁবে। আর উত্তরে বরানগর দমদম ছাড়িয়ে কোথায় গিয়ে পৌছোবে তার ঠিক নেই। তার পর ডি-ভি-সি হয়েছে, দুর্গাপুর হয়েছে, কল্যাণী হয়েছে। যাদবপুর, গড়িয়া, নরেন্দ্রপুর সবই তাঁর প্ল্যানমতই হয়েছে। শিবপ্রসাদবাবু নিজের দূরদৃষ্টির জন্যে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। যেন এ তাঁরই কলকাতা। এই গ্রেটার ক্যালকাটা যেন তাঁর নিজের হাতেরই গড়া। টাকা যা এসেছে তা এসেছে। তার সঙ্গে আর একটা দামী জিনিস যা এসেছে তা হলো তাঁর আত্মতৃপ্তি। এই আত্মতৃপ্তিই গুপ্ত পরিবারের সব চেয়ে বড় প্রফিট। এই প্রফিটের ওপর নির্ভর করেই হিন্দুস্থান পার্কে বাড়ি করেছেন শিবপ্রসাদ গুপ্ত।

অফিসে ঢুকেই দেখলেন একজন অচেনা ভদ্রলোক বসে আছেন। অবাঙালী।

শিবপ্রসাদবাবু যেতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার করলেন। বললেন —নমস্তে—

—কে আপনি? আমি তো ঠিক চিনতে পারছি না?

—আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। আমি একটা অন্য কাজে এসেছি, জমি বেচা-কেনার কাজ নয় ঠিক—

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—কিন্তু আমার তো জমি কেনা-বেচাই কাজ—

—তা জানি, কিন্তু সে-কাজের জন্যে আমি আসি নি। আমি আসছি জয়পুর থেকে—

—জয়পুর ?

—হ্যাঁ, সুন্দরিয়া বাঈয়ের কাছ থেকে একটা খত্ এনেছি—

বলে একটা চিঠি বার করে শিবপ্রসাদবাবুর হাতে দিলে।

শিবপ্রসাদবাবু চিঠিটা হাতে নিয়ে বক্তিনাথকে ডাকলেন। বক্তিনাথ বাইরে ছিল। আসতেই বললেন—ছাখ, এখন আধ ঘণ্টা কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবো না, যদি কেউ আসে তো বসিয়ে রাখবি, ভেতরে আসতে দিবি না—

তারপর বক্তিনাথকে আবার ডেকে বললেন—আর অপারেটারকে বলবি এখন যেন আমাকে রিং না করে, আমি ব্যস্ত আছি—

একই কলকাতার বিভিন্ন পাড়ার আবার বিভিন্ন রূপ। হিন্দুস্থান পার্কের আকাশে যখন নীলের সমারোহ, তখন বৌবাজারের মধু গুপ্ত লেনে কয়লার ধোঁয়ার ঠাট্টা। অথচ এই পাড়াতেই আগে শিবপ্রসাদবাবুর কেটেছে। এই পাড়ারই সরু অন্ধকার গলির মধ্যে মন্দাকিনী ছেলে মানুষ করেছে। এই পাড়াতেই সদাব্রত বড় হয়েছে। বাড়ির জানালা দিয়ে এই পাড়ার পিচের রাস্তার ওপরেই ছেলেদের ক্রিকেট খেলা দেখেছে সদাব্রত। তারপর একটু একটু করে বড় হবার পর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মেশবার অনুমতি পেয়েছে। তাও দূর থেকে। বেশি মিশতে গেলেই মায়ের শাসন সহ্য করতে হয়েছে। একটু বেশি দেরি করে আড্ডা দিলেই মা বকেছে। ছেলেকে চোখে-চোখে রাখতো মা। এই বুঝি খারাপ হয়ে যায় ছেলে।

মা বলতো—পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অত আড্ডা দেওয়া ভাল নয়—

সদাব্রত বলতো—কিন্তু ওরা তো খারাপ ছেলে নয় মা—

—সে-সব তোমার তো দেখবার দরকার নেই, আমি বলছি ওরা খারাপ, ওদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা উচিত নয়—

আর শিবপ্রসাদবাবুর তখন উঠতির সময়। কোথা দিয়ে তাঁর সময় কাটতো, কোথায় কখন থাকতেন, কী করতেন কিছুই ঠিক ছিল না। সারাটা দিন প্রতিষ্ঠা লাভের প্রাণপণ চেষ্টায় ভূতের মতন পরিশ্রম করতেন। ভোর-বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন, আর ফিরতেন যখন তখন মধু গুপ্ত লেন নিঝুম হয়ে এসেছে। এসেই ক্লান্তিতে শুয়ে পড়তেন। মন্দাও তখন

নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো। তখন খোকা আসে নি। প্রথম যৌবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের দিন সে-সব। সে-সব দিনের কথা সদাব্রত জানে না। শুধু এইটুকু জানে বাবা তাঁর নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। আর শুধু জানে তার মা পাখির মত দিনের পর দিন তাকে আগ্‌লে নিয়ে মানুষ করেছে। আরো জানে তার জন্যে মা'র ভাবনার অন্ত নেই। আরো জানে পৃথিবীর পাড়ায়-পাড়ায় যত ছেলে আছে মা'র চোখে তারা সবাই খারাপ।

সদাব্রত মনে মনেই একটু হাসলো।

তার পর নম্বর খুঁজে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো।

আশ্চর্য, ছোটবেলায় এই শম্ভুদের বাড়িতে মা আসতেই দিত না। শম্ভুরা গরীব। শম্ভুর বাবা কোন্ একটা অফিসে কেরানীগিরি করতো। হাতে টিফিনের কৌটো নিয়ে সকাল সাড়ে আটটার সময় দৌড়তে দৌড়তে বাস-রাস্তার দিকে যেত। তখন থেকে মা'র যেন কেমন ঘেন্না ছিল এদের ওপর। অথচ এখন সদাব্রত বড় হয়েছে। এখন নিঃসংকোচেই এদের বাড়ি এসেছে। এসে শম্ভুর সঙ্গে গল্প করতে পারে, আড্ডা দিতে পারে। কেউ জানতে পারবে না। এ-পাড়ার লোক নয় তারা। তাই কেউ আপত্তিও করবে না।

—কে?

ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কথাটা বলে একজন দরজা খুলে দিলে। ছোট মেয়ে। ফ্রক পরা।

—শম্ভু আছে?

—দাদা তো ক্লাবে গেছে। বাড়িতে নেই—

—ক্লাব! কোন্ ক্লাব? শম্ভুদের আবার ক্লাব হয়েছে নাকি!

মেয়েটি বললে—ওই যে সামনে গলির মোড়, ওই মোড়ের মাথায় দেখবেন একটা মুড়কি-বাতাসার দোকান আছে, তারই পেছনে দাদাদের ক্লাব—গেলেই দেখতে পাবেন—

প্রথমে সদাব্রত ভেবেছিল দরকার নেই গিয়ে। বাড়িতে দেখা হয়ে গেলে না-হয় খানিকক্ষণ গল্প করা যেত অনেক দিন পরে। আর তা ছাড়া এমন তো কিছু কাজও নেই। কলেজ স্ট্রীটে বই কিনতে এসেছিল। বই কেনার পর হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল পুরোনো পাড়াটার কথা। তার পর হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছে।

ফিরে আসতে গিয়েও আবার এগিয়ে চললো। হাতের ঘড়িতে সময়টা দেখলে একবার। অনেক সময় আছে। সেই চেনা গলি। কিন্তু এতদিনেও কিছু বদলায় নি। লম্বা লম্বা দোতলা-তিনতলা-চারতলা বাড়ি সব। একেবারে ঠাসবুনুনি। গায়ে-গায়ে লাগানো বাড়িগুলো। সেই ডাইং-ক্লিনিংটা এখনও রয়েছে। আগে বাড়িতে গ্যারেজ ছিল না, বাবাকে গাড়ি রেখে আসতে হতো বড় রাস্তার মোড়ের একটা বাড়ির গ্যারাজে। অফিস থেকে লোকেরা ফিরছে। সরু গলি হলে কী হবে, খুব ভিড়। এইটুকু গলির মধ্যেই একটা গাড়ি গেলে লোকের বাড়ির দরজায় চৌকাঠে উঠে দাঁড়াতে হয়।

গলির মোড়ে এসে দাঁড়াল সদাব্রত।

একটা খোলার চালের ঘর। দেখলেই বোঝা যায় মুড়কি-বাতাসার দোকান।

সদাব্রত দোকানের পেছন দিকটা দেখবার চেষ্টা করলে। পেছন দিকেই শম্ভুদের ক্লাব। একবার ভেবেছিল দোকানদারকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু দোকানদার তখন খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। দোকানটার ঠিক পাশ দিয়েই একটা সরু সিমেন্ট-বাঁধানো গলি। সেখান থেকে ভেতরের ঘরের আলো জ্বলা দেখা যাচ্ছে। দু-একজন ভদ্রলোক ঢুকছে ভেতরে।

সদাব্রত ভেতরে ঢুকবে কিনা ভাবছিল। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক ভেতরে ঢোকবার উপক্রম করতেই সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—দেখুন, এটা কি একটা ক্লাব?

ভদ্রলোক মুখ ফেরাতেই মনে হলো যেন চেনা-চেনা। সদাব্রতর চেয়েও বয়েসে বড়।

ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ—

সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—ভেতরে শম্ভু আছে? শম্ভু দত্ত?

তখনও ভেতর থেকে তুমুল আড্ডার আওয়াজ আসছে। খুব হাসি-তর্ক-বাদ-বিতণ্ডার গোলমাল।

ভদ্রলোক সদাব্রতর মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। বললে—আচ্ছা দাঁড়ান, দেখছি—

সদাব্রত সেখানে সেই বাইরের রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রলোক ভেতরে গিয়েই ডাকলে—শম্ভু, তোকে ডাকছে রে—

বাইরে থেকে স্পষ্ট শোনা গেল—কথাটার সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল সব থেমে গেছে।

—কে ডাকছে ?

—সেই আমাদের পাড়ার শিবপ্রসাদবাবুর পোষ্যপুত্তুরটা—

—কে ? তবু যেন বুঝতে পারলে না শম্ভু।

—আরে মনে নেই, আমাদের পাড়ায় আগে ছিল, সেই শিবপ্রসাদবাবু, এখন বালিগঞ্জে বাড়ি করে উঠে গেছে—

কে যেন জিজ্ঞেস করলে—কার পোষ্যপুত্তুর ? পোষ্যপুত্তুর বলছো কেন ?

—তা পোষ্যপুত্তুরকে পোষ্যপুত্তুর বলবো না তো জামাই বলবো ? বুড়ো বয়েস পর্যন্ত ছেলেপিলে হলো না বলে তো ওকে পোষ্যপুত্তুর নিয়েছিল···

—সদাব্রত ? আমাদের সদাব্রতর কথা বলছো ? সে এসেছে ? কোথায় ?

—ওই তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তোকে ডাকছে।

শম্ভু পড়ি-মরি করে গলি দিয়ে বাইরে এসেই একেবারে জড়িয়ে ধরেছে।

—আরে তুই ? সদাব্রত ? কী ব্যাপার ? তুই হঠাৎ ? এ-পাড়াতে ? তোর গাড়ি কই ? হেঁটে এসেছিস ?

সেই অল্প-অন্ধকার গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে সদাব্রতর মনে হলো সে হিমপাথর হয়ে গেছে। তার যেন আর চৈতন্যই নেই। সে যেন মৃত। সে যেন ফসিল। মধু গুপ্ত লেনের কলকাতার সঙ্গে সে যেন মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়ে ফসিলে পরিণত হয়েছে। যুগ-যুগ আলো-বাতাসহীন অন্ধকারের মধ্যে থেকে থেকে তার যেন অন্তিম সমাধি হয়েছে। সে নেই। সে শেষ হয়ে গেছে। একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে সংসার থেকে।

—কী রে ? চিনতে পারছিস না ? আমিই তো শম্ভু। হেঁটে এসেছিস কেন ? তোর গাড়ি কোথায় গেল ?

সদাব্রত কোনও উত্তরই দিতে পারছে না। সে তা হলে ও-বাড়ির কেউ নয় ? তার মা বাবা, যাদের সে নিজের ভেবেছিল তারা কেউই তার আপনার নয় ? এতদিন তা হলে সে ভেজাল হয়ে জীবন কাটিয়েছে ! এতদিনে অতীতের সব ঘটনাগুলো একে-একে মনে পড়তে লাগলো। এতদিন বুঝতে পারে নি। এতদিন বুঝতে দেওয়া হয় নি তাকে। সত্যি কথাটা বললে কী এমন লোকসান হতো তার ! কী এমন লাভই বা হতো তার ! কিন্তু কেউ বলে নি কেন তাকে !

—কী রে, শরীর খারাপ নাকি তোর ? মাথা ধরেছে ?

সদাব্রতর যেন এতক্ষণে মুখ দিয়ে কথা বেরোলো।

বললে—আমি আজকে আসি ভাই, অন্য একদিন বরং আসবো, আজকে মোটে ভাল লাগছে না—

—এতদূর এসে ফিরে যাবি? আয় না, আমাদের ক্লাবের ভেতরে এসে বোস না, এক কাপ চা খেয়ে চলে যাবি, আর না—

সদাব্রত বললে—আজ থাক ভাই, অন্য একদিন বরং আসবো—

—তা হলে কবে আসবি বল্?

—এখন থেকে বলতে পারছি না, সময় পেলেই একদিন আসবো—

বলতে বলতে আর সেখানে দাঁড়ালো না। দাঁড়াতে পারলো না সদাব্রত। তাকে বলে নি কেন কেউ? বললে কী লোকসান হতো? তাকে বিশ্বাস করে নি কেন কেউ? সে কি বিশ্বাসের যোগ্য নয় তা হলে? মধু গুপ্ত লেনের সরু রাস্তা দিয়ে হন্‌হন্ করে চলতে লাগলো সদাব্রত। এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে যেন কেউ তাকে চিনে ফেলবে। হাঁপাতে হাঁপাতে সদাব্রত সোজা বাস-রাস্তায় গিয়ে পড়লো একেবারে।

বঙ্কুবাবু বললেন—কী মশাই! অনেকদিন আপনার দেখাই নেই, কারবার নিয়ে বুঝি খুব মেতে গেছেন?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—কারবারের কথা রাখুন, ও কারবার-টারবার সব এবার গুটিয়ে নেবো ভাবছি—

—কেন?

—আর কি সে-যুগ আছে! এখন তো গভর্মেণ্টই জমির ব্যবসা খুলছে। আমি তো সেদিন ডাক্তার রায়কে সেই কথাই বললুম। বললুম—সব ন্যাশন্যালাইজ করে নিলেই হয়। বাস-ট্রাম-ইলেকট্রিসিটি সবই তো নিচ্ছেন, এর পর যদি জমিজমার ব্যবসাও করেন তো আমরা যাই কোথায়? আমরা কী খেয়ে বেঁচে থাকি?

—তা ডাক্তার রায় কী বললেন?

—শুনে হাসতে লাগলেন। ডাক্তার রায় আমার পুরোনো বন্ধু তো!

অনাথবাবু অবাক হয়ে গেলেন—ডাক্তার রায় আপনার পুরোনো বন্ধু নাকি?

—বাঃ, তা জানেন না! আজ না-হয় চীফ্ মিনিস্টার হয়েছেন, আমরা তো একসঙ্গে এক সভায় লেক্চার দিয়েছি। যেবার সেই রায়ট্ হলো কলকাতায়, তখন তো শ্যামাপ্রসাদবাবু আর আমি দু'জনে ঘুরে ঘুরে সব কাজ করেছি। তখন মধু গুপ্ত লেনের বাড়িতে থাকতুম, আমার বাড়িতে দু' বেলা মীটিং হয়েছে—কংগ্রেসের কর্তারা সব তখন কী করবে বুঝতেই পারছে না—

তা এ শুধু কথার কথা নয়। যারা জানবার তারা জানে সে-সব কথা।

এক-একদিন কথার মধ্যেই হঠাৎ টেলিফোন আসে, শিবপ্রসাদবাবু টেলিফোনটা ধরেন। ধরে অনেকক্ষণ কথা বলেন। শেষে বিরক্ত হয়ে টেলিফোনটা রেখে দেন। বলেন—জ্বালিয়ে খাবে দেখছি আমাকে—

সবাই জিজ্ঞেস করে—কেন, কী হলো আবার? কে টেলিফোন করছিল?

—আবার কে? আপনাদের মেয়র—

মেয়রের নাম শুনেই সবাই একটু অবাক হয়ে যায়। সমস্ত কলকাতাই যেন শিবপ্রসাদবাবুর মতামতের জন্যে অস্থির উদ্গ্রীব হয়ে আছে। শিবপ্রসাদ-বাবুর মত না পেলে যেন মিনিস্ট্রি ভেঙে যাবে, কলকাতা শহর লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। এক-একটা টেলিফোন এমন অসময়ে আসে যে সকলকে বিপদে ফেলে দেয়।

মন্দা জিজ্ঞেস করে—আবার কোথায় বেরোচ্ছ?

শিবপ্রসাদবাবু বলেন—যাই, হঠাৎ ডাকছেন। যাই, না গেলে খারাপ দেখাবে, ভাববে আমি বুঝি কাউকে মানতেই চাইছি না—

তারপর বদ্যিনাথকে ডেকে বলেন—বদ্যিনাথ, কুঞ্জকে গাড়ি বার করতে বল্—

বহুদিন আগে যখন প্রথম জীবনে মন্দা এ-বাড়ির বউ হয়ে এসেছিল তখন মুখ বুজে সংসারের সব কাজ করেছে। শিবপ্রসাদবাবুর তখন অফুরন্ত পরিশ্রমের জীবন। তিন দিন দেখাই নেই মানুষটার। খবরও দিতে পারেন নি বাড়িতে। সকালবেলা খেয়েদেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, সন্ধ্যেবেলাই ফিরে আসার কথা। সেদিন গেল, তার পরের দিনটা গেল। তার পরের দিনটাও গেল। তবু একটা খবর নেই, তখন এত চাকর-ঝিও ছিল না বাড়িতে। কোথায় কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হলো না কি? কেউ একটা খবর নেবার পর্যন্ত লোক নেই। কাকেই বা জিজ্ঞেস করেন? কোথায় যে কর্তা যান তা কখনও বলতেন না মন্দাকে। সেই সব বছরগুলো বড় একলা-একলা কেটেছে মন্দার।

খোকাও তখন ছিল না। মধু গুপ্ত লেনের বাড়ির জানালাটা ফাঁক করে মন্দা বাইরের রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকেছে তিন দিন। তবু দেখা নেই। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় একলা বাড়ির মধ্যে থর-থর করে কেঁপেছে। মানুষটার জন্যে প্রাণটা হাঁক-পাঁক করতো। কতদিন মন্দা বলেছে—নাই বা বেরোলে, এই সময়ে মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে, তোমার না বেরোলে কী হয়?

তার পর সে-সব দিনও কেটে গেছে। সেই দাঙ্গা, সেই দুর্ভিক্ষ, সেই দিন-নেই রাত-নেই এক ফোঁটা ফ্যানের জন্যে দরজার সামনে ধরনা দেওয়া। তখন মন্দার মনে হতো যেন দিন আর কাটবে না, রাত আর পোয়াবে না। কিন্তু দুঃখের হোক আর সুখেরই হোক, দিন কেটে যায়ই। শিবপ্রসাদবাবুরও সে-সব দিন কেটেছে। সেই তখন কোথায়-কোথায় মীটিং করেছেন, সারা দিন সারা রাত পরিশ্রম করে হয়ত ভোরবেলা বাড়ি ফিরে এসেছেন। তার পর এতটুকু বিশ্রাম নেই, আবার কারা ডাকতে এসেছে, তখনি দুটো নাকে-মুখে গুঁজে দিয়ে আবার বেরিয়ে গেছেন।

মন্দা বলতো—তুমি ও-সবের মধ্যে না-ই বা থাকলে?

শিবপ্রসাদবাবু বলতেন—তা আমি না থাকলে চলবে কী করে? সবাই যদি বাড়িতে দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকি তো দেশের এতগুলো লোকের গতি কী হবে?

মন্দা বলতো—তা সে দেখবার জন্যে তো দেশের লাটসায়েব আছে, পুলিস আছে, তারাই দেখবে—

শিবপ্রসাদবাবু রেগে যেতেন। বলতেন—যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না, মেয়েমানুষের বুদ্ধি নিয়ে চললে আর দেশের কাজ করা যায় না—

এমনি করেই কেটেছে সে-সব দিন। তার পর নাকি সব গোলমাল মিটে গেল। তখন থেকে শিবপ্রসাদবাবু একটু বিশ্রাম পেলেন। কিন্তু তখনও বৈঠকখানায় বসে আড্ডা হয়। কাপের পর কাপ চা পাঠাতে হয়, পান পাঠাতে হয়। অনেক দিন কান পেতে শুনেছেন সে-সব কথা। কিছুই বুঝতে পারেন নি। দলাদলি, দল ভাঙানো। তুমুল তর্কের ঝড় বয়ে গেছে। তারই মাঝে একবার ভেতরে এসে পুজো করে গেছেন। তারপর আবার সেই এক

আলোচনা। রামবাবু মিনিস্টার হবে না শ্যামবাবু মিনিস্টার হবে। কে মেয়র হবে, কে ডেপুটি মেয়র হবে তারই ফয়সালা করবার জন্যে ওঁদের ঘুম ছিল না।

তখন কোথায়-কোথায় না ঘুরেছেন। এই জলপাইগুড়িতে গেছেন, আবার তার পরদিনই বারাসতে মীটিং। সেখান থেকে ফিরে এসেই আবার আসানসোল। এক-একবার ভয়ও হতো মন্দার। এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে কবে হয়ত নিজের ব্যবসাটাও নষ্ট করবেন!

মন্দা জিজ্ঞেস করতো—তা তুমি যে এ ক'দিন অফিসে যাচ্ছো না, তোমার অফিস কে দেখছে?

শিবপ্রসাদবাবুর কিন্তু সেই একই উত্তর।

—ব্যবসা আগে না দেশ আগে?

—দেশ দেখবার তো অনেক লোক আছে! তুমি না দেখলে দেশ গোল্লায় যাবে?

শিবপ্রসাদবাবু বলতেন—আমি দেখি কি সাধে? না দেখতে পারলে তো বেঁচে যাই। কিন্তু এই দেশের জন্যেই বহু লোক প্রাণ দিয়েছে, তা জানো? হাজার হাজার লোক জেল খেটেছে, টি-বি হয়ে মরেছে! ক্ষুদিরাম গোপীনাথ সাহা ফাঁসি গিয়েছে, যতীন দাস উপোস করে মরেছে, তা আমরা যদি আজ না দেখি তো তাদের প্রাণ দেওয়া যে মিথ্যে হয়ে যাবে! চোখের সামনে সাত ভূতে লুটে-পুটে খাবে, এটা যে চোখ মেলে দেখতে পারি না, তাই তো এত কষ্ট করে মরি! নইলে আমার আর কী? আমি তো আমার নিজের ব্যবসা নিয়ে থাকলেই পারি, আরাম করে খেয়ে-দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেই পারি—

তা এ-সব কথা মন্দা কান দিয়ে শুনেছে কিন্তু প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাও ছিল না তার তখন। আর প্রতিবাদ করলে শোনবার মত মানুষও নন শিবপ্রসাদবাবু। শিবপ্রসাদবাবু নিজের খেয়াল-খুশি মতই চিরকাল চলেছেন, এখনও চলছেন। এখনও কোথায় যে মাঝে মাঝে চলে যান, কী করেন বলেন না। বলবার মত সময়ই পান না।

বাইরের ঘর থেকে হঠাৎ স্বামীকে ভেতরে আসতে দেখে মন্দা অবাক হয়ে গেল।

মন্দা জিজ্ঞেস করলো—কী হলো?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—বঙ্কিনাথ কোথায় গেল ?

—সে তো তোমার পুজোর যোগাড় করছে—

শিবপ্রসাদবাবু ওপরে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। বললেন—কুঞ্জকে গাড়ি বার করতে বলতে হবে—

—কেন, তুমি আবার এত রাত্রে কোথাও বেরোচ্ছ নাকি ?

—হ্যাঁ, একবার বেরোতেই হবে—

—কেন, আবার মীটিং নাকি ?

মন্দা পেছন-পেছন চলতে লাগলো। বঙ্কিনাথও খবর পেয়ে বাবুর কাছে এসেছে। বললে—কুঞ্জ গাড়ি বার করছে হুজুর—

তাড়াতাড়ি জামাটা বদলে নিয়ে শিবপ্রসাদবাবু আবার নীচে নেমে গেলেন। তাঁর যেন কথা বলবারও সময় নেই।

বঙ্কিনাথও যাচ্ছিল। মন্দা জিজ্ঞেস করলে—বাবু কোথায় যাচ্ছেন, তুই কিছু জানিস ?

বঙ্কিনাথ বললে—আজ্ঞে না মা—

—কোনও টেলিফোন এসেছিল ?

—তা তো জানি না, বাবু তো বাইরের ঘরে বন্ধুবাবুদের সঙ্গে কথা বলছিলেন দেখে এসেছি…

—তা হঠাৎ এমন বাইরেই বা যাওয়ার কি কাজ হলো ?

তখন বাইরে গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ হয়েছে। বঙ্কিনাথ তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে পৌছোবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। কুঞ্জকে এ-সব দিনে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় না। বাবু কোথায় যায়-না-যায় তার কাছ থেকে কোনও কথা আদায় করা শক্ত। বড় চাপা মানুষ। দিন-রাত বোবার মত কাজ করে যায়। যখন যেখানে যাক, ফিরে এসে তা নিয়ে কোনও আলোচনাই করে না। গ্যারেজের মাথার ঘরখানাতে বিছানাটা খুলে শুয়ে পড়ে, আর ঠাকুর খেতে ডাকলে খেয়ে নিয়ে চলে যায়। মানুষ নয় কুঞ্জ, যেন যন্ত্র। যন্ত্রের মত আজ এত বছর শিবপ্রসাদবাবুর কাছে কাজ করে চলেছে।

শিবপ্রসাদবাবু প্রথমে গেলেন শ্যামবাজারের একটা গলিতে। বাবুকে নামিয়ে দিয়ে কুঞ্জ গাড়িটা ঝাড়তে-মুছতে লাগলো। তার পর গাড়ির ভেতরে এসে বসলো। কত জায়গায় বাবুকে আসতে হয়। বাড়ির সামনে সার-সার আরো কতকগুলো প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে

এখানে তার ঠিক নেই। দেখতে দেখতে আরো কতকগুলো গাড়ি এসে জুটতে লাগলো। আর খানিক পরেই শিবপ্রসাদবাবু বেরিয়ে এলেন, এসে গাড়িতে বসলেন। বললেন—চলো—

কুঞ্জ অ্যাক্সিলারেটারে পা দিয়ে এঞ্জিন চালিয়ে দিলে। তার পর সব চুপ। কুঞ্জ চুপ করেই গাড়ি চালায়। ড্রাইভারের অকারণ কথা বলা শিবপ্রসাদবাবু পছন্দ করেন না।

কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের কাছে আসতেই শিবপ্রসাদবাবু শিরদাঁড়া সোজা করলেন। বললেন—একটা ট্যাক্সি ডেকে দে তো কুঞ্জ—

কুঞ্জ রাস্তার একপাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বাইরে গেল। ট্যাক্সি বললেই ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। একটু দেরি হয়। একটু অপেক্ষা করতে হয়।

শিবপ্রসাদবাবুর বোধ হয় জরুরী কাজ ছিল। ট্যাক্সিটা নিয়ে আসতেই বাবু উঠে পড়লেন। তার পর কুঞ্জর দিকে ফিরে বললেন—তুই এখানে থাক্, আমি এখুনি আসবো—

কুঞ্জ কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের কোণে গাড়িটা রেখে চুপ করে বসে রইল। রাত তখন ন'টা।

বলতে গেলে এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই। কলকাতা শহরের মানুষ বুঝতে পেরেছিল আর একটা নতুন যুগ আসছে। স্বাধীনতা যার জন্যেই হোক আর যে-জন্যেই হোক আসতে বাধ্য। কিন্তু কাদের স্বাধীনতা? গরীবদের না বড়লোকদের? আসলে একটা জিনিস বুঝতে পারা যায় নি। সেটা বোঝা যায়ও না। যখন বান আসে তখন জলের তোড়ে সব ভেসে গেলেও শেষকালে কোথাও বালি জমে, কোথাও পলি পড়ে। কোথাও মরুভূমি হয়ে যায়, কোথাও আবার সোনার ফসল ফলে। কুঞ্জ এ-সব ভাবে না। তার এ-সব ভাবনা মাথায় আসে না। মন্দাও ভাবে না। বদ্যিনাথেরও ও-সব বালাই নেই। অনাথবাবু, বঙ্কুবাবু, অবিনাশবাবুরাও এ-সব কথা ভাবে না। তারা সবাই পেন্সনের অঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত। এমন কি মধু গুপ্ত লেনের ক্লাবের ছেলেরাও ভাবে না, ভাবতো শুধু একজন। কেন এমন হলো? এমন তো হবার কথা নয়।

সদাব্রত তাঁর কাছেই প্রথম শুনেছিল কথাগুলো।

কম বয়েস তখন সদাব্রতর। মধু গুপ্ত লেনের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা পড়াতে আসতেন তিনি রোজ। সারাদিন স্কুলের পর বিকেলবেলা কোথাও বেরোবার অনুমতি ছিল না। কোনও রকমে বিকেলটা কেটে গেলেই সমস্ত মনটা আকুল হয়ে উঠতো সন্ধ্যেবেলার জন্যে। সন্ধ্যে হলেই মাস্টার মশাই আসতেন। মাস্টার মশাইয়ের কাছে থাকতে, মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সমস্ত ভুলে যেতো সদাব্রত।

আজ এতদিন পরে হঠাৎ আবার সেই মাস্টার মশাইয়ের কথা মনে পড়লো।

মন্দা জিজ্ঞেস করলে—ঠাকুর, খোকাবাবুকে এখনও খেতে ডাকলে না?

—খোকাবাবু তো নেই মা!

মন্দাও অবাক হয়ে গেল। এই তো এখুনি ঘরে ছিল দেখে এসেছে। বললে—এই তো একটু আগেও ঘরে ছিল, এখন আবার কোথায় গেল? গাড়ি নিয়ে গেছে?

মন্দা নিজেও একবার খোকার ঘরে গেল। দোতলার এক কোণে সদাব্রতর ঘর। সেখানে সে নিজের সংসার গুছিয়ে নিয়েছিল। কত রাজ্যের বই যোগাড় করেছে। বই কিনেছে। বই সাজিয়ে রেখেছে। আজকাল কখন যে সে ঘরে থাকে আর কখন যে বেরিয়ে যায় টেরই পায় না মন্দা। ছেলে বড় হলে যেন মায়ের পর হয়ে যায়। মন্দা কেমন অবাক হয়ে গেল ঘর খালি দেখে। আগে তবু দিনের মধ্যে এক-আধবার দেখা হতো। এখন কখন বাড়িতে আছে কখন নেই বোঝাই যায় না। সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে আসতেই যথারীতি মা গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, খাবি নে তুই?

সদাব্রত বললে—না—

—কেন, খাবি না কেন, কী হলো? শরীর খারাপ?

সদাব্রত বিছানায় শুয়ে মুখ লুকিয়ে ছিল। মা'র কথাতেও মাথা তুললো না। বললে—না, শরীর খারাপ নয়, এমনি খাবো না—

—তা খাবি না কেন, বলবি তো? কোথাও নেমন্তন্ন ছিল?

—না।

মন্দা হঠাৎ ছেলের কপালে হাত ঠেকিয়ে দেখতে গেল জ্বর হয়েছে কিনা। সদাব্রত মা'র হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলে।

—তা বলবি তো কী হয়েছে, কেন খাবি না—

—না, তুমি যাও এখান থেকে, আমার কিছু হয় নি—

মন্দা তবু কিছু বুঝতে পারে নি। বললে—কী হয়েছে বল্ তা হলে?

সদাব্রত বললে—সব কথা তুমি বুঝবে না, তোমাকে বলা বৃথা!

—কিন্তু কালকেও খেলি না, আজকেও খাচ্ছিস না, কী হলো তোর বল্ তো?

—তা তোমরাই কি আমাকে সব কথা বলো!

—তোকে সব কথা বলি না? তুই বলছিস কী?

—তোমার পায়ে পড়ি তুমি যাও এখান থেকে! আমাকে একটু একলা থাকতে দাও—

মন্দা আর কিছু বলে নি তার পর। ছেলে বড় হয়ে গেছে, এখন তারও স্বাধীন মতামত আছে। সদাব্রতও যেন সেই দিনের পর থেকে কেমন হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত জীবনটা একেবারে শুরু থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে সে। কবে সে কী চেয়েছিল আর কী পেয়েছিল আর কী সে পায় নি। তার জন্যে কেউই তো কোনও দিন কিছু ভাবে নি। তার ভাল মন্দ নিয়ে তো সত্যিই কেউ কোনও দিন মাথা ঘামায় নি। বাবা! বাবাকে কতটুকুই বা দেখতে পায় সে বাড়িতে! বাবা ব্যবসা আর নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত সারাদিন, আর মা'র সংসার!

মাস্টার মশাইয়ের বাড়ির কাছে যেতেই দেখলে গলির ভেতর অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা তারই বাবার গাড়ি। গাড়ির ভেতর কুঞ্জ বসে আছে চুপ করে। সদাব্রত আবার ঘুরে অন্য পথ দিয়ে ঢুকলো গলিটাতে। এদিকটা ফাঁকা। মাস্টার মশাইয়ের বাড়ির সামনের দরজায় গিয়ে ঘা দিলে সদাব্রত।

—মাস্টার মশাই!

—কে?

কেদারবাবু ভেতর থেকে ডাকলেন—দরজা খোলাই আছে, ভেতরে এসো হে—

তার পর সদাব্রতকে দেখেই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—ও, তুমি এসেছ? এই একটু আগেই তোমার কথা ভাবছিলুম—

—আমার কথা ভাবছিলেন?

কেদারবাবু বললেন—এই ভাবছিলুম, তোমাদের বাড়িতে তো আগে রোজ যেতুম, তখন তোমার বাবার অবস্থা ভাল ছিল না ততো, কিন্তু দেখ এখন তো তোমাদের অবস্থা খুব ভাল হয়েছে,—খুবই ভাল হয়েছে, হয় নি ?

সদাব্রত হঠাৎ এই কথার উত্তর দিতে পারলে না। শুধু বললে—হ্যাঁ হয়েছে স্যার—

—অথচ দেখ, তোমাদের মতন দু'চার জনের অবস্থা শুধু ভাল হয়েছে, কিন্তু দেশের অবস্থা তো ভাল হয় নি, দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা আগে যা ছিল তার চেয়েও খারাপ হয়েছে, সত্যি কি না বলো ?

হঠাৎ কেদারবাবু কেন এ-সব কথা বলতে আরম্ভ করেছেন বুঝতে পারলে না সদাব্রত। ছোট একটা তক্তপোশের ওপর মাদুর পাতা। ময়লা চিট্ একটা তাকিয়া। সেই মাদুরের ওপরই উবু হয়ে বসে কী যেন লিখছিলেন। ঘরের চারদিকে নোংরা, বই-খাতা-পত্র পাহাড় করে ছড়ানো।

—সত্যি কিনা বলো ?

সদাব্রত বললে—সত্যি—

—আমিও তো তাই ভাবছিলুম। মন্মথ তো কথাটা ভালো তুলেছে।

—কোন্ মন্মথ ?

—আমার ছাত্র ! আমি তাকে হিস্ট্রি পড়াই। অ্যান্সিয়্যাণ্ট্ হিস্ট্রি পড়াই, পড়াতে পড়াতে মন্মথ আজ চট্ করে এই একটা মডার্ন হিস্ট্রির কোশ্চেন্ জিজ্ঞেস করে বসলো। আমিও ভেবে দেখলুম কথাটা তো মন্মথ মন্দ বলে নি ! এ-কথাটা তো আমি আগে ভাবি নি মোটে ! তখনি তোমাদের কথা মনে পড়লো। তার পর ভাবতে লাগলুম খুব। ভেবে ভেবে বার করলুম অ্যান্সারটা।

কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন কেদারবাবু। বললেন—বুঝলে সদাব্রত, অ্যান্সারটা বার করে ফেললাম। রুশোর বইতে দেখলুম স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে—Man is born free but everywhere he is in chains, আমি মন্মথকে বললুম দেশে ফ্রিডম্ এলেই যে মানুষ ফ্রি হবে এমন কোনও কথা নেই—

সদাব্রত কেদারবাবুর কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না।

—তুমি বুঝতে পারছো কিছু, না বুঝতে পারছো না ?

সদাব্রত বললে—আমি আপনাকে অন্য একটা কথা বলতে এসেছিলুম স্যার—

—কিন্তু তুমি আমার কথাটার উত্তর দাও আগে, এই ধরো তোমার বাবার কথাই ধরো, এখন তো অনেক বড়লোক হয়েছো তোমরা, তোমার বাবার মনে কি দুঃখ নেই ? কোনও কষ্ট ? কোনও যন্ত্রণা ?

সদাব্রত বললে—তা আমি জানি না—

—কিন্তু জানি না বললে তো চলবে না। তোমার চললেও আমার তো চলবে না। আমাকে ছাত্র পড়াতে হয়, আমাকে তো অ্যান্‌সার বার করতেই হবে—। আমি তাই তখন থেকেই ভাবছিলুম এটা তো সদাব্রতকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মানে, দেশের ফ্রিডম্ এলে মানুষের ফ্রিডম্ আসে কি না। আর যদি আসে তো আমাদের ইণ্ডিয়াতে কাদের এসেছে ? ক'জনের এসেছে ? অভাব থেকে মুক্তি পাওয়া তো একটা ফ্রিডম্—সত্যি কিনা বলো ?

সদাব্রত বাধা দিয়ে বললে—আমি স্যার পরে এ নিয়ে আলোচনা করবো, আর একদিন—

—আমাকে বলতে পারো তোমার বাবার এখন ইনকাম্ কতো। তোমার বাবা তো জমি কেনা-বেচার বিজ্‌নেস্ করেন, হঠাৎ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের পর ওঁর ব্যবসাতে এত উন্নতি হলো কেন ? কংগ্রেসের লোকের সঙ্গে মেলামেশা ছিল বলে ?

—না, বাবা তো কোনও পার্টির মেম্বার নন ! বাবা বিজ্‌নেস্ করে পয়সা রোজগার করেন !

—কিন্তু কতো ইন্‌কাম করেন ?

সদাব্রত বললে—আমাকে মাফ করবেন স্যার, আমি কিছুই জানি না আমাকে আমার বাবা-মা কিছুই বলেন না—আমি ও-বাড়ির কেউই নই, আসলে, আমি ওঁদের ছেলেই নই—আমি এই কথাটাই আপনাকে বলতে এসেছিলাম—

কেদারবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—ছেলে নও মানে ?

—মাস্টার মশাই, ক'দিন ধরে আমি ভাল করে ঘুমোতে পারছি না, খেতে পারছি না,—কার কাছে যাবো বুঝতে পারছি না, কার কাছে গিয়ে কথাটা বলবো তাও বুঝতে পারছি না, তাই আপনার কাছে এসেছিলাম—আমি এখন চলি, হয়ত আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা—

—আরে শোনো শোনো, উঠছো কেন ?

কিন্তু ততক্ষণে সদাব্রত রাস্তায় নেমে পড়েছে। কেন যে এত জায়গা থাকতে মাস্টার মশাইয়ের কাছে এসেছিল তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি।

কেন সে এখানে এলো? এই আত্মভোলা মানুষটিকে নিজের মনের কথাগুলো বলে সে কি সান্ত্বনা চেয়েছিল? যে-মানুষ নিজের ভালোই বোঝে না, তাকে পরের ভালো-মন্দর ভার দিয়ে সদাব্রত কি মুক্তি পাবে ভেবেছিল? রাস্তায় বেরিয়ে যেন মাথার বোঝাটা আরো ভারী হয়ে উঠলো। আশে-পাশে কত লোক চলেছে। গরীব, বড়লোক—গাড়ি, রিক্সা, ট্রাম। সদাব্রতর মনে হলো সে যেন নিরাশ্রয় এই সংসারে। সংসারের ছোটখাটো খুঁটিনাটিগুলো যেন এতদিন পরে কেউ তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলো। তাঁর ঘরের বিছানার চাদরটা কেন সময়মত বদলানো হয় না, কেন তাকে খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় না সে আরো ভাত নেবে কি না। অত্যন্ত তুচ্ছ সব খুঁটিনাটি। যা নিয়ে আগে মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। কিন্তু আজ যেন সেইগুলোই বড় হয়ে দেখা দিলে তার চোখের সামনে। কার্ল মার্কস কাউকে সরাসরি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর বায়োগ্রাফিতে লেখা আছে। এতদিন পরে যেন সব মানে বোঝা গেল জীবনের। অথচ বাবা-মাকে বিশ্বাস করে কতদিন কত আব্দার করেছে। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। সেই অন্ধ বিশ্বাসের লজ্জা আজ যেন বোঝা হয়ে দাঁড়ালো সদাব্রতর জীবনে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত সাধুপুরুষও যাচাই না করে কাউকে বিশ্বাস করতেন না। অথচ এতদিন সকলের কাছে উপদেশ শুনে এসেছে সদাব্রত যে অবিশ্বাস করে লাভবান হওয়ার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল!

কেদারবাবু আবার নিজের লেখাপড়ার দিকে মন দিচ্ছিলেন। হঠাৎ পেছনের দিকের দরজাটা খুলে গেল।

—কাকা? কে এসেছিল এতক্ষণ?

—ও কেউ না, তুই যা এখান থেকে, এখন খাবো না—

—খেতে ডাকছি না, আমি সব শুনেছি ভেতর থেকে। তুমি কী কাকা? কিছু বোঝ না? ওকে অমন করে ছেড়ে দিলে কেন?

—কেন? আমি কি ছেড়ে দিয়েছি? ও তো চলেই গেল! সদাব্রতর কথা বলছিস?

—চলে গেল বলে তুমি অম্নি যেতে দেবে? ওর মুখ-চোখের চেহারাটা দেখতে পাও নি? যদি এখন রাস্তাতেই গাড়ি চাপা পড়ে? যদি আত্মহত্যা করে? আমি আড়াল থেকে যে সব দেখছিলুম—

—আত্মহত্যা করবে মানে? কী হয়েছে ওর?

—আচ্ছা কাকা, তুমি কী বলো তো? শুনলে না ও কী বললে?

এতক্ষণে যেন হুঁশ হলো। বুঝতে পারলেন যেন কথার গুরুত্বটা। বললেন—তা হলে কী করি বল্ তো মা শৈল? সত্যিই তো আমার বোঝা উচিত ছিল। আমার তো ওই অবস্থায় ওকে ছেড়ে দেওয়া অন্যায় হয়ে গেছে—

—তা তুমি যাও, এই তো এখনি গেল। এখনও হয়ত বাস-রাস্তায় যায় নি—

—তাই যাই, ওকে ধরে নিয়ে আসি।

বলে কেদারবাবু আর দাঁড়ালেন না। সেই অবস্থাতেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। শৈল সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলো। অন্ধকার গলি। স্পষ্ট করে দেখা যায় না দূরের লোকচলাচল। তবু চেয়ে রইলো সামনের দিকে। দেখলে কেদারবাবু বাস-রাস্তার দিকেই হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছেন।

সমস্ত কলকাতা যেন বিস্বাদ ঠেকছিল সদাব্রতর কাছে। শুধু তার নিজের অনিশ্চয়তার জন্যে নয়। এই গোটা শহরটাই যখন অনিশ্চয়তার মধ্যে দোল খাচ্ছে, তখন সদাব্রতর মনে হতো তার নিজের জীবনের মতন এই শহরটার ইতিহাসও যেন ভেজাল। এই রাস্তা-বাস-ট্রাম কিছুই যেন খাঁটি নয়। মাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে কথাটা বলবে বলেই গিয়েছিল সে, কিন্তু মনে হলো বলেও কোনও ফল হবে না। একদিন ছিল যখন মাস্টার মশাই আসতেন বাড়িতে। পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে নিতেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ কী হলো, বললেন—আচ্ছা, তোমার বাবা বাড়িতে আছেন কি না দেখে এসো তো—

তখন ছোট সদাব্রত। বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখে এসে সদাব্রত বলেছিল—না, বাবা তো নেই—

কেদারবাবু বলেছিলেন—কখন থাকেন তিনি তাও তো বুঝতে পারছি না—বড় মুশকিল হলো তো দেখছি—

তার পর কী ভেবে নিয়ে বললেন—কখন এলে দেখা হয়?

—ভোরবেলা।

—তা হলে ভোরবেলাই আসবো !

বলে মাস্টার মশাই চলে গেলেন। পরদিন ভোরবেলাই এসে হাজির মাস্টার মশাই। বাবা তখন বৈঠকখানায় বসে। মাস্টার মশাইকে চিনতে পারেন নি শিবপ্রসাদবাবু। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে হয় নি কেদারবাবুর।

—কে আপনি ?

—আমি খোকার মাস্টার। সদাব্রতর মাস্টার কেদারনাথ রায়, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই—

—কী কথা বলুন। মাইনে বাড়াতে হবে ?

—আজ্ঞে……

শিবপ্রসাদবাবু কাজের লোক, কথার লোক নন। সবটা না-শুনেই বললেন—দেখুন, আমি ছা-পোষা মানুষ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা রোজগার করি। আমার যথাসাধ্য আমি দিচ্ছি, তা আপনি কত পান ?

—পঞ্চাশ।

—পঞ্চাশের একটা পয়সা বেশি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি থাকতো তো আমি দিতাম। আপনি হয়ত ভাবছেন আমি ব্যবসা করি, জমি কেনা-বেচার দালালি করি, কিন্তু আসলে তো ব্যবসার দিকটা দেখবার সময়ই পাই না আমি, এই দেখুন না কাল আমার অফিস থেকে চলে গিয়েছিলুম মেদিনীপুরে—

—মেদিনীপুরে ? কেন ? মেদিনীপুরেও বুঝি আজকাল জমি কেনা-বেচা…

—না না, বন্যার জন্যে ! বন্যায় সেখানকার সব ভেসে গেছে। তা সে-সব কথা থাক, আমার সামর্থ্য নেই এর বেশি দেবার—

কেদারবাবু বললেন—আমি সেই কথা বলতেই তো এসেছিলাম, আপনি আমার মাইনেটা একটু কমিয়ে দিন।

কমিয়ে ! শিবপ্রসাদবাবু যেন থমকে গেলেন। এতক্ষণে ভালো করে চেয়ে দেখলেন কেদারবাবুকে। সাদাসিধে জামা-কাপড়। মাথায় একরাশ চুল। পায়ে একজোড়া চটি। চোখে মোটা চশমা। ডবল্ এম. এ. শুনে ছেলের মাস্টার রেখেছিলেন। লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি !

—কমিয়ে দিন মানে ?

কেদারবাবু বললেন—বাজার যে-রকম খারাপ পড়েছে তাতে পঞ্চাশ টাকা নেওয়া বেশি হয়ে যাচ্ছে আমার—আপনি একটু কমিয়ে দিন মাইনেটা,

চারদিকে বন্যা-টন্যা হচ্ছে, এ-অবস্থায় অনেকের সংসার চালানো দায় হয়ে উঠেছে, লোকের আজকাল খুব কষ্ট…

শিবপ্রসাদবাবু আরো উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বললেন—আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

এমন অদ্ভুত লোক শিবপ্রসাদবাবু জীবনে দেখেন নি। এ কি এই শতাব্দীর মানুষ ? কেদারবাবু কিন্তু বসলেন না। বললেন—এখন আমার বসবার সময় নেই, আরো দু'জায়গায় টিউশ্যানি করতে হবে, দু'জনেই বি. এ. পড়ে কি না—

—আপনি ছাত্র পড়ানো ছাড়া আর কী করেন ?

কেদারবাবু বললেন—সময় তো পাই না, আর কী করবো ? টিউশ্যানি কি আমার একটা ? দিনে ছ'টা ছাত্র পড়াতে হয়—

—তা হলে তো আপনি অনেক টাকা উপায় করেন !

—তা করি।

—সবসুদ্ধ কত টাকা হয় ?

—আপনি দেন পঞ্চাশ, আর তিনজন দেয় তিরিশ টাকা করে, এতেই চলে যায়।

শিবপ্রসাদবাবু হিসেব করে বললেন—এই তো একশো চল্লিশ টাকা হলো, আর বাকি দু'জন ?

—তাদের কথা ছেড়ে দিন, তারা বড় গরীব ! কিছুই দিতে পারে না—

—তা হলে আপনি একশো চল্লিশ টাকায় চালান কী করে ?

—সেই কথাই তো বলছিলাম, বড় কষ্টে চালাচ্ছি,—হিস্ট্রিতে এক-একটা সময় আসে যখন এই রকম কষ্ট করে চালাতে হয়, ইণ্ডিয়ায় এই রকম সিচুয়েশ্যান একবার হয়েছিল সেভেন্‌টিন সেভেন্টিতে—এখন তো তবু রেশন-শপ্ হয়েছে, ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের সময় তাও ছিল না,…আচ্ছা আমি আসি, আমার অনেক কাজ…

বলে চলেই যাচ্ছিলেন কেদারবাবু, শিবপ্রসাদবাবু ডাকলেন।

বললেন—আপনি একটা চাকরি নেবেন ?

কেদারবাবু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন কথাটা শুনে।

—আমার অফিসে চাকরি নেবেন আপনি ? আমি আপনাকে দু'শো টাকা মাইনে দেবো মাসে—

কেদারবাবু সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলতে পারেন নি। একটু পরে বলেছিলেন—

কিন্তু আমার সময় কই, আমি তো ছ'টা টিউশ্যানি করি, কখন চাকরি করবো?

—টিউশ্যানি ছেড়ে দিন, টিউশ্যানি করে যা পান তার চেয়ে বেশি পাবেন, আপনার মত অনেস্ট লোকই আমার দরকার।

—কিন্তু ছাত্রদের কী হবে?

—সে তারা আর কোনও মাস্টার জুটিয়ে নেবে!

কেদারবাবু হাসলেন, বললেন—তা হলেই হয়েছে, ভাল ভাল স্টুডেণ্ট সব খারাপ মাস্টারের হাতে পড়লেই তাদের কেরিয়ারের দফা-রফা হয়ে যাবে, অন্য সবাই যে ফাঁকি দেয়! আর তা ছাড়া আপনি তো বুঝতে পারছেন দেশের অবস্থা খারাপ, অনেকের আবার বই কেনবার পয়সাই নেই—

বলতে বলতে কেদারবাবুর মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে গিয়েছিল। কেদারবাবু আর সেখানে দাঁড়ান নি সেদিন। সদাব্রতর মনে আছে, বাবা তার পর দিন থেকে যেন অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন মাস্টার মশাইকে। পড়ানোর ব্যাপারে আর কোনও দিন কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। কেদারবাবুর হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেই ছোটবেলা থেকে শুরু করে বছরের পর বছর পড়িয়ে গেছেন। একদিনের জন্যে মাইনে বাড়াবার প্রশ্নও তোলেন নি। একদিন কামাইও করেন নি। বৃষ্টির মধ্যে ভাঙা ছাতার তলায় ভিজতে-ভিজতে এসে একমনে পড়িয়ে গেছেন। জীবনে পড়া ছাড়া আর কিছু জানতোই না সদাব্রত। আজ এতদিন পরে হঠাৎ যেন পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হলো তার। প্রথম অন্তরঙ্গতা। সেই প্রথম অন্তরঙ্গতার মুখেই এক প্রচণ্ড আঘাত পেলো।...

সকালবেলাই মা ঘরে এসেছে। সদাব্রত মুখ তুলে একবার তাকিয়েই আবার মুখ নামিয়ে নিল।

—হ্যাঁ রে খোকা, কাল কখন এলি?

সদাব্রত হঠাৎ কথার উত্তর দিতে পারলে না।

—কী রে? কী হয়েছে তোর? কাল তো গাড়ি নিয়ে যাস্ নি? ব্যাপার কী! উনি তো বলছিলেন তোর গাড়ি পুরোনো হয়ে গেছে, নতুন গাড়ি একটা কিনতে হবে—। গাড়ির জন্যেই যদি এত রাগ তো গাড়ি বললেই তো আর গাড়ি কেনা যায় না আজকাল, এক বছর আগে থেকে নাম রেজিস্ট্রী করে রাখতে হয়—

তবু সদাব্রত কিছু কথা বললে না ?

হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই শিবপ্রসাদবাবু ঘরে ঢুকলেন।

—এই যে, কী হলো ? কোথায় ছিলে কাল অত রাত পর্যন্ত ? বন্ধু-বান্ধব জুটেছে নাকি তোমার ?

সদাব্রত বাবার সামনে কোনও কালেই সহজভাবে কথা বলতে পারে না। একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকে! বাবার সঙ্গে কতটুকুই বা তার সম্পর্ক। দিনের মধ্যে কতটুকুই বা বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে সারা জীবনে। ছোটবেলা থেকেই বাড়ির মধ্যে একলা-একলা বই নিয়ে কেটেছে তার, বন্ধু-বান্ধব নেই, ভাই-বোন নেই। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশাও বন্ধ। হঠাৎ শিবপ্রসাদবাবুর সামনে সে কী বলবে বুঝতে পারলে না।

—আজকে আমার সঙ্গে অফিসে যাবে। এখন থেকে তোমাকে সব বুঝে নিতে হবে।

মন্দাকিনীও অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—তুমি ওকে অফিসে বসিয়ে দেবে নাকি ?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—তুমি চুপ করো, সব কথায় তুমি কেন কথা বলো। ও অফিসে বসবে কি লেখাপড়া করবে তা আমি ঠিক করবো। আমি যা বলি তাই ও করবে—

বলে হয়ত চলেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু কী যেন কথা আবার মনে পড়ে গেল। ফিরলেন। বললেন—আমি আজ দশটার সময় বেরোব, তৈরী থেকো—

মন্দা বললে—ওর গাড়ি কী হলো ? তুমি যে বলেছিলে গাড়িটা বদল করে দেবে—গাড়ির জন্যেই ও রাগ করে আছে—

সদাব্রত এতক্ষণে মাথা তুললো। মা'র দিকে চেয়ে বললে—আমি গাড়ির কথা বলি নি তোমাকে, গাড়ি আমার চাই না—আমি পাগল নই—

শিবপ্রসাদবাবু ছেলের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। এমন করে কথা তো কখনও বলতো না খোকা। তাঁরই চোখের আড়ালে এত পরিবর্তন হয়ে গেছে ছেলের! সমস্ত চেহারাখানা দেখেও যেন বিশ্বাস হলো না তাঁর। এই ছেলেকেই তিনি এতটুকু জন্মাতে দেখেছেন, এখন এত শিগগির সে সাবালক হয়ে উঠলো! সদাব্রতর মুখে গোঁফ-দাড়ি উঠেছে। এত লম্বা হয়ে উঠেছে। শিবপ্রসাদবাবুরই মাথার প্রায় সমান-সমান। তিনি যেন ছেলেকে আজ নতুন

চোখ দিয়ে দেখতে লাগলেন। পৃথিবী এত তাড়াতাড়ি বদলায়! এত তাড়াতাড়ি তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন!

সারাদিন যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। অফিসে গিয়ে বেশিক্ষণ কাজ করলেন না সেদিন। করতে পারলেন না। সদাব্রতও সঙ্গে গিয়েছিল। দুটো তিনটে টেলিফোন এলো। হেড্-ক্লার্ক হিমাংশুবাবু এলেন কাজ-কর্ম নিয়ে। শিবপ্রসাদবাবু বললেন—আবার কী?

—কালকে বলেছিলেন আপনি এই প্ল্যানগুলো দেখবেন!

—কিসের প্ল্যান?

—চন্দননগর আর দুর্গাপুরের জমির—পার্টিরা বড় তাড়াহুড়ো করছে—

—পার্টিরা তাড়াহুড়ো করুক, ওই রকম তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কল্যাণীতে অনেক টাকা লোকসান দিয়েছি, এবারও লোকসান দেবো নাকি? দুর্গাপুরের জমিরও তো দর উঠেছিল আগে, এখন কী হলো? স্পেকুলেশান অত সোজা! তখন ওরা ভেবেছিল হুড়-হুড় করে জমির দর উঠবে, কই উঠলো?

অনেক বকুনি দিলেন শিবপ্রসাদবাবু। ছোট অফিস। ভেতরে কথা বললে সারা অফিসের লোকই শুনতে পায়। সবাই চুপ করে শুনছে। নিস্তব্ধ অফিসের ভেতরে টাইপিস্টের চাবি-টেপার খটখট শব্দ যেন সকলের কানে বড় কর্কশ হয়ে বাজতে লাগলো।

নন্দীবাবু টাইপিস্টবাবুর দিকে ইশারা করলে—ও মশাই, অত শব্দ করছেন কেন? দেখছেন না ভেতরে হৈ-চৈ হচ্ছে—

—তা হৈ-চৈ হচ্ছে আমি কী করবো?

—আহা আস্তে করুন না, শুনতে পাচ্ছি না যে—

তা শোনবার মত বিষয়ও নয় এমন কিছু। নিতান্ত বৈষয়িক ব্যাপার। কলকাতার পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর মাইলের মধ্যে যত পোড়ো জমি সস্তায় কিনে বেশি দামে বেচা হয় এখানে! দু'শো টাকা বিঘে দরে কিনে দু'হাজার টাকায় বেচা। আজ না হোক একদিন তো কলকাতা বড় হবে। আরো আরো বড়। ১৯৪৭ সালের পার্টিশানের পরে কলকাতা যে এমন করে বাড়বে তা কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল? কেউই পারে নি। কিন্তু পেরেছিলেন শিবপ্রসাদবাবু।

শিবপ্রসাদবাবুর এই ফার্ম লক্ষ-লক্ষ বিঘে জমি কিনে পুকুর ভরাট করে, রাস্তা বাঁধিয়ে শহর করে দিয়েছে। সে-সব জায়গা এখন এক হাজার দেড় হাজার করে কাঠা। সেখান থেকেই এখন ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়ে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতার অফিসের বাবুরা। কিন্তু তারা কেউ জানে না, এ কলকাতার ভবিষ্যতে আরো কী পরিণতি আছে। লোকে যখন উত্তরপাড়া, বালি, ডায়মণ্ড-হারবার থেকে পান চিবোতে চিবোতে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় আসে, যখন ক্রুশ্চেভ, আইসেনহাওয়ার আর চার্চিল নিয়ে তর্ক করে, যখন নেহরু, বিধান রায়, গোয়া নিয়ে মাথা ফাটায়, তখন জানতেও পারে না যে তাদের পৃথিবী ছোট হয়ে যাচ্ছে আর শহরের মানুষ বাড়ছে। জানতে পারে না এই কলকাতা বাড়তে বাড়তে একদিন দুর্গাপুর পর্যন্ত গিয়ে ঠেকবে। মধু গুপ্ত লেনের মুড়কি-বাতাসার দোকানের পেছনে যখন 'বউবাজার সংস্কৃতি সংঘে'র শম্ভুরা থিয়েটারের নতুন প্লে নিয়ে মীটিং করে, তারাও জানতে পারে না। বঙ্কুবাবু, অবিনাশবাবু, অখিলবাবু—হিন্দুস্থান পার্কের পেন্‌সন-হোল্ডাররাও জানতে পারে না তলে তলে কোথায় কী ষড়যন্ত্র, কী পরামর্শ, কী কারসাজি চলছে। ফড়েপুকুর লেনের কেদারবাবুও জানতে পারেন না অ্যান্‌সিয়্যাণ্ট হিস্ট্রির পাতার মধ্যে কখন মহারাজ অশোককে খুন করে যায় নাথুরাম গড্‌সে, ভগবান বুদ্ধকে হত্যা করে যায় মাও-সে-তুং। রাতারাতি কলকাতা বদলে যায়, পৃথিবী বদলে যায়। সদাব্রতও বদলে যায়।

সারা পৃথিবী নিয়ে যখন শিবপ্রসাদবাবু মাথা ঘামাচ্ছেন, তখন হঠাৎ ঘরের কাছে নজর দিতেই দেখলেন তাঁর নিজের ম্যাপটাও রাতারাতি বদলে গেছে। সদাব্রত বড় হয়েছে।

সদাব্রত সব শুনছিল। শুনছিল আর দেখছিল। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছে বাবার কারবারের কথা। চোখে দেখলে এই প্রথম। এই সার-সার ক্লার্ক বসে আছে। চোখে ভয়, হাতে কলম। তাদেরই ভবিষ্যৎ মনিব সে। একদিন এখানেই এদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসবে নাকি সে? এই অফিসের ভেতরে জমির দরের ওঠা-নামার ব্যারোমিটারের দিকে চোখ রেখে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে? এই লস্ আর প্রফিট? এই পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের লেজার বুক?

—চলো!

হঠাৎ যেন সদাব্রতর চমক ভাঙলো। শিবপ্রসাদবাবু দাঁড়িয়ে উঠেছেন।

—দিস ইজ্ মাই লাইফ। মাই ক্রিয়েশন। এসব তোমাকে এখনি দেখতে বলছি না। বলছি না যে এখন থেকেই তোমাকে এখানে এসে বসতে হবে। কিন্তু তোমার জানা ভালো। তুমি জীবনে কোন্ প্রোফেশন্ নেবে সেটা তুমি নিজেই ডিসাইড করবে, আমি তোমার ওপর কিছু ফোর্স করতে চাই না—

সদাব্রত চুপ করে সব শুনছিল।

—এতদিন এ-সব কথা তোমাকে আমি কিছুই বলি নি। কিন্তু ওয়ার্লড্ ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। আমাদের হিষ্ট্রি, বায়োগ্রাফি, মহাভারত, গীতা, রামায়ণ সব নতুন করে লেখবার সময় এসেছে। আজ ইণ্ডিয়া ফ্রি হয়েছে বটে কিন্তু এতদিনে ভাববার সময় এসেছে আমরা এই স্বাধীনতার যোগ্য কিনা। আর যোগ্য হতে গেলে কী কী কাজ আমাদের করতে হবে। এই যে-শহরে আমি জন্মেছি, তুমি সে-শহরে জন্মাও নি। আমি যে-বাংলাদেশ দেখি নি তুমি সেই বাংলাদেশ আজ দেখছো। এ আরো বদলাবে, তোমরা বেশি ভোগ করছো তাই আমাদের চেয়ে তোমাদের দায়িত্ব আরো বেশি, তোমরাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এতদিন স্কুলে কলেজে যে লেখাপড়া করেছ সেটা তুচ্ছ, এখন থেকে আসল এডুকেশন তোমার আরম্ভ হলো। অন্য যে-কোনও ফাদার হলে এখনি তোমাকে বিজ্নেসে বা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিত, কিন্তু আমি তোমার কেরিয়ার স্পয়েল করতে চাই না—তুমি ভাবো। বেশ ভালো করে ভাবো কোন্ কেরিয়ার তুমি নেবে। তুমি যা চাইবে তাই-ই আমি দিতে চেষ্টা করবো। টাকার জন্যে ভেবো না, ইচ্ছে হলে আমেরিকা যেতে পারো, ইউ. কে. যেতে পারো, টোকিও ওয়েস্ট-জার্মানী যেতে পারো—আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আজকাল ডলারের বড় কড়াকড়ি, এক্সচেঞ্জ-ট্রাব্ল্ আছে বটে কিন্তু তুমি জানো বোধ হয় মিনিষ্ট্রি মহলে আমার ইনফ্লুয়েন্স আছে, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো, সেদিক থেকে কোনও ভাবনা নেই তোমার—

তার পর হঠাৎ যেন কী মনে পড়লো। বললেন—তোমার প্রোফেসারদের সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করতে পারো, দেখ না, তাঁরা কী বলেন।

শিবপ্রসাদবাবু হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন।

—আচ্ছা তোমার সেই যে টিউটর ছিলেন, কী যেন তাঁর নাম?

—কেদারনাথ রায়, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল রিসেণ্টলি—

শিবপ্রসাদবাবুর যেন পছন্দ হলো না কথাটা।

—কেন? তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলে কেন? না, লোকটা অবশ্য ভেরি

অনেস্ট সন্দেহ নেই। অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি, তাও আমি স্বীকার করি। আমার মনে আছে ঘটনাটা এখনও—ভদ্রলোক একদিন আমাকে এসে বলেছিলেন দশ টাকা মাইনে কমাতে! কী সিলি ব্যাপার ভাবো! আমার শুনে খুব হাসি পেয়েছিল সেদিন। অবশ্য আমি হাসি নি, কিন্তু সেইদিনই বুঝলুম লোকটার দ্বারা তো জীবনে কিছ্ছু হবে না। তখনই জানতুম লোকটা একটা ফেলিওর—ওর দ্বারা কিছুই হবে না—

তার পর আবার থামলেন শিবপ্রসাদবাবু, বললেন—অবশ্য তোমাকে এসব কথা বলা বৃথা, তুমি কোয়াইট কোয়ালিফায়েড, কোয়াইট এডুকেটেড, এসব কথা তুমি আমার চেয়ে ভালো করেই বোঝ, ওসব অনেস্টি আজকালকার যুগে অচল। এটা সার্ভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট-এর যুগ। এও একরকম যুদ্ধ। এই পৃথিবীটাই যুদ্ধক্ষেত্র! এই যে আমরা মাছ-মাংস খাই—কেন খাই? না, আমাদের বাঁচতে হলে তাদের মারতেই হবে। হিংসা অহিংসার প্রশ্ন নয়। তেমনি আমাদের মেরে যদি কেউ বেঁচে থাকতে চায় তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না। দোষ দেওয়া যায় কী? তুমিই বলো না। সুতরাং আমাদের আত্মরক্ষা করে চলতে হবে সব সময়। আর সেই আত্মরক্ষা করতে গেলে মাঝে মাঝে ডিজ-অনেস্ট হতে হবে। এও এক রকমের ধর্ম! আর ধর্মযুদ্ধের কথা তো আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রেও আছে—তাই বলছিলুম লোকটা ফেলিওর, ওর প্রিন্সিপ্‌ল্‌ যেন আবার তুমি ফলো করে বসো না, ওই···কী যেন লোকটার নাম······

—কেদারনাথ রায়।

—হ্যাঁ, যাক গে এসব কথা। তোমাকে এই সব কথা বলার জন্যেই আজ নিয়ে এসেছি এখানে। আজকে আবার গোয়ার ব্যাপারে একটা মীটিং আছে, আমি এখানে নামবো, এই হাজরা পার্কে—তুমি এখন সোজা বাড়ি যাবে তো? কুঞ্জ তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার আমাকে নিয়ে যাবে এখান থেকে—

বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। বললেন—কুঞ্জ, এই ফুটপাতে গাড়িটা রাখবি এনে—

হাজরা পার্কের ভেতর তখন বহু লোকের ভিড়। বড় বড় পোস্টার ঝুলছে। 'পর্তুগীজ সালাজার, গোয়া ছাড়ো', 'গোয়া বন্দীদের মুক্তি চাই'। শিবপ্রসাদ-বাবু মীটিং-এর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কুঞ্জ গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। সদাব্রত বললে—কুঞ্জ, এখন বাড়ি যাবো না আমি, আমাকে বৌবাজারে একবার ছেড়ে দিয়ে এসো—

—বৌবাজারে?

—হ্যাঁ, ওই মেডিক্যাল কলেজের সামনে, মধু গুপ্ত লেনে।

কুঞ্জ পুতুলের মত গাড়ির স্টীয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে দিলে।

মধু গুপ্ত লেনের গলির মোড়ের মুড়কি-বাতাসার দোকানের পেছনে তখন তুমুল তর্ক বেধেছে। এটা ক্লাব বসবার আগে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। যখন সব মেম্বাররা এসে জড়ো হয়, সব আর্টিস্টরা এসে পৌঁছোয় তখন আরম্ভ হয় রিহার্সাল। অবশ্য এবার নতুন বই ধরা হয়েছে। কালীপদ সাহিত্যিক মানুষ। বামার-লরীর অফিসে কাজ করে। তারই উৎসাহটা বেশি। সে-ই বরাবর বলতো—কালচার কালচার করছো যে তোমরা, কালচারের কী বোঝো? ইবসেন পড়েছো? বার্নার্ড শ' পড়েছো? টেনেসি উইলিয়াম্স্ পড়েছো? আর্থার মিলার পড়েছো?

মধু গুপ্ত লেনের ক্লাবের কোনও মেম্বারই অবশ্য তা পড়ে নি। তারা চাকরি করে অফিসে, সিনেমা-থিয়েটার দেখে আর বড়জোর শিশির ভাদুড়ী, অহীন চৌধুরী পর্যন্ত দৌড়। আর শুনেছে ডি-এল-রায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম। ওসব নিয়ে কখনও মাথাই ঘামায় নি। লেখাপড়া বলতে বাংলা খবরের কাগজ।

তা সেই কালীপদই একটা লেটেস্ট টেকনিকের নাটক লিখে ফেলেছিল। 'মরা-মাটি'। অর্থাৎ, পাকিস্তান থেকে চলে-আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে। হিরোইন-প্রধান নাটক। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত হিরোইনই সব। অন্য সব রোল সেকেণ্ডারী। সবাই পার্ট নিয়েছে। নাটকটা যেদিন প্রথম পড়া হয়েছিল, সেদিন কালীপদর অ্যান্টি-পার্টির ছেলেরা পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিল—না তোর পার্টস্ আছে মাইরি, আমরা পাড়ার লোক বলে অ্যাদ্দিন গ্রাহ্যি করিনি—

সেই দিন থেকেই 'মরা-মাটি' রিহার্সালে পড়েছে। চাঁদা উঠেছে, আরো উঠছে। আসল সমস্যা ছিল হিরোইনের। তাও জুটে গেছে।

অনেকগুলো মেয়ে যোগাড় করে এনেছিল কালীপদ। এমনিতে দেখতে শুনতে চলনসই সকলেই। দামী ব্রেসিয়ার আর ফল্‌স্ খোঁপা পরলে কারো বয়েস ধরবার উপায় নেই। দু-একদিন রিহার্সাল দেবার পরই খুঁত ধরা পড়ে। অনেকে 'হিংস্র' উচ্চারণ করতে পারে না ঠিকমত। অনেকে চন্দ্রবিন্দু দেয় না। 'ফাঁসি' বলতে গিয়ে 'ফাসি' বলে।

কালীপদ শেষকালে হাল ছেড়ে দিলে। বললে—একটা সুটেব্‌ল হিরোইনের অভাবে দেখছি 'প্লে'টাই মাঠে মারা যাবে—আমার ড্রামার থিমটাই নষ্ট করে দেবে—

সব মেম্বাররাই লেগে-পড়ে হিরোইন খুঁজতে লাগলো। স্টার, রঙমহল, বিশ্বরূপায় যত অ্যামেচার থিয়েটার হয়, সব দল বেঁধে দেখতে যায় হিরোইনের খোঁজে।

শম্ভু একজনকে দেখিয়ে বলে—এটা কেমন দেখছিস?

কালীপদ বলে—দূর, ওরকম হাঁটা চলবে না—পেছনের লোয়ার পার্টটা বড় স্টীফ্—অচল—

এমনি একটা না একটা খুঁত বেরোয়ই। কারো লোয়ার পার্ট স্টীফ, কারো ফ্রুন্ট্ ভিউ ফ্ল্যাট, কারো স্টেপিং ব্যাড। কেউ পছন্দমত হয় না। শম্ভু যাকে আনে ক্লাবে, তাকেই কালীপদ নট্ করে দেয়। শেষকালে 'মরা-মাটি' যখন স্টেজ করা প্রায় ক্যানসেল্‌ড্ হবার যোগাড়, সেই সময় কুন্তি মেয়েটা এসে হাজির।

শম্ভু দত্ত কালীপদর মুখের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কেমন দেখছিস?

কালীপদ তখন একমনে চেয়ে দেখছে কুন্তির দিকে। ব্যাক থেকে, ফ্রুন্ট থেকে, সাইড থেকে নানাভাবে তখন দেখে নিয়ে কালীপদ এক কাপ চা নিয়ে চুমুক দিচ্ছে আর ভাবছে। মেয়েটিকেও এক কাপ চা দেওয়া হয়েছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কুন্তি বললে—অত কী দেখছেন?

কালীপদ যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেল। প্রসঙ্গটা বদলে বললে—আপনি কোন্ কোন্ বইতে প্লে করেছেন?

কুন্তি বললে—আমি বেলেঘাটা ক্লাবের 'স্বর্ণলতা' বইতে কনকের পার্ট করেছি, তরুণ-সমিতির 'যার-যা-খুশি' বইতে অন্নদার পার্ট করেছি, তার পর টার্নার মরিসন অফিসের ক্লাবের 'মুক্তিস্নান' বইতে……

কালীপদ বললে—ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বলতে পারবেন ?

কুন্তি বোবার মত চেয়ে রইল—ব্ল্যাঙ্ক ভার্স মানে ?

—গিরিশ ঘোষের নাটক পড়েন নি ?

—গিরিশ ঘোষ কে ?

কালীপদ চায়ের কাপে চুমুক দিলে। গিরিশ ঘোষের নাম শোনে নি, এদের নিয়ে প্লে করাই তো বিড়ম্বনা। কী বলবে বুঝতে পারলে না।

শম্ভু পাশ থেকে চুপি চুপি বললে—একেই মাইরি নিয়ে নে কালীপদ, এরকম ফিগার আর পাবি না—অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি।

—শম্ভু !

হঠাৎ নিজের নাম শুনে পেছন ফিরলো শম্ভু। প্রথমে চিনতে পারে নি ঠিক। প্যাণ্ট্-কোট-টাই পরা। শুধু মুখখানা দেখে বোঝা যায়।

—আরে আরে সদাব্রত, কী খবর ?

শম্ভু উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো সদাব্রতকে।

সদাব্রত এখানে মেয়েদের দেখতে পাবে আশা করে নি, একটু সংকোচ হলো। ক্লাবের অন্য সব মেম্বাররাও তার দিকে চেয়ে আছে।

সদাব্রত বললে—তোর সঙ্গে একটা দরকার ছিল আমার, একটু বাইরে আসবি ? আমার বিশেষ দরকার—

শম্ভু বললে—বাইরে কেন, ভেতরে বোস্ না, এখানে এসে সেদিন তুই চলে গেলি, আজকে বোস্,—বলে জোর করে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে।

সদাব্রতর ইচ্ছা ছিল না বসতে। কিন্তু না-বসেও পারলে না। এমন অদ্ভুত আবহাওয়ার মধ্যে আগে কখনও আসে নি সদাব্রত। টিনের চাল। দেওয়ালে অনেক ছবি টাঙানো। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি। গিরিশ ঘোষের ছবি। আরো অনেকগুলো ফ্রেমে আঁটা ছবি ঝুলছে। সিগারেটের ধোঁয়া, চায়ের কাপের ছড়াছড়ি। সবাই সদব্রতর দিকে চেয়ে দেখছিল। হয়ত এদের কোনও জরুরী কাজে বাধা পড়লো।

সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—তোদের কাজে বাধা পড়লো নাকি ?

শম্ভু বললে—না না, তুই বোস্ না, কালীপদ তুই কাজ চালিয়ে যা—

কালীপদ জিজ্ঞেস করতে লাগলো আবার—আচ্ছা আপনি গান গাইতে পারেন ?

কুন্তি বললে—আমি তো আগেই শম্ভুবাবুকে বলে দিয়েছি আমি গান

জান না, আর গান জানলে তো আমি স্টারে চান্স্ পেয়ে যেতাম, আপনাদের এখানে আসতে হতো না—

কালীপদ বললে—না, গান অবিশ্যি আমার দরকার নেই, কথাটা এমনি জিজ্ঞেস করলাম, যদি গান জানতেন তা হলে 'মরা-মাটি'তে গান ঢুকিয়ে দিতুম আর কি—তা থাক্‌গে, নাচ জানেন ?

সদাব্রত ক্লাবের মধ্যে বসে বসে অস্থির হয়ে উঠেছিল। এও তো এক জগৎ। মাস্টার মশাইয়ের কাছে শেখা জগৎটা যেন এখানে এসে একেবারে মিথ্যে হয়ে গেছে। একদিকে হিস্ট্রি আর একদিকে রিয়ালিজম্। এই রিয়ালিজম্‌ই আবার একদিন হিস্ট্রি হয়ে উঠবে। তখন তাই নিয়েই আবার কেদারবাবুরা রিসার্চ করবেন। প্রোফেসাররা মোটা-মোটা থিসিস্ লিখবেন, ডক্টরেট্ পাবেন। সদাব্রত মেয়েটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে। একগাদা পুরুষের মধ্যে এই একটিমাত্র মেয়ে। কোথাও কোনও আড়ষ্টতা নেই। চা খেয়ে একটা পান মুখে পুরে দিলে। দশ বছর আগেও এই ঘটনা কল্পনা করতে পারা যেত না। অথচ আজকের দিনে এও সত্যি, জলের মত সহজ আর সত্যি। মেয়েটার কথাগুলো আর কানে যাচ্ছে না। মেয়েটার চোখ-মুখ চেহারা কিছুই নজরে পড়ছে না। কিন্তু আজকের সমস্ত ঘটনা তাকে যেন বিমূঢ় করে দিয়েছে। সকালবেলা দেখা তাদের জমি-কেনা-বেচার অফিস, বিকেলবেলা হাজরা পার্কের 'গোয়া-অভিযান'-এর মীটিং, আর তারই পাশাপাশি মধু গুপ্ত লেনের ভেতরে বউবাজার সংস্কৃতি-সংঘের এই আবহাওয়া, সমস্ত যেন বড় বেখাপ্পা লাগলো। সদাব্রতর মনে হলো সব যেন ছন্নছাড়া। কোথাও যেন সংগতি নেই।

হঠাৎ শম্ভুর দিকে ফিরে সদাব্রত বললে—তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল শম্ভু, একটু বাইরে চল্—

শম্ভুও উঠলো, বললে—চল্—

ক্লাবের বাইরে এসে দাঁড়ালো সদাব্রত, শম্ভুও এলো। বললে—কী বলছিলি বল্ ?

সদাব্রত কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেললে নিজেই বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—ও মেয়েটা কে রে ? কী করতে এসেছে ?

শম্ভু বললে—ওকে ট্রায়াল্ দিচ্ছি, পারবে কিনা জানি না—

সদাব্রত বললে—অনেকদিন থেকে তোর কাছে আসবো-আসবো, ভাবছিলাম···আমি বোধ হয় আর বেশি দিন কলকাতায় থাকবো না। কী করবো কিছু ঠিক করতে পারছি না।

—বিলেত-টিলেত চলে যা না!

সদাব্রত বললে—এখন যাবো কী করে!

—কেন? এই তো কাগজে দেখছি কত লোক জার্মানী চায়না রাশিয়াতে সব বেড়াতে যাচ্ছে, গায়করা সাহিত্যিকরাও তো সবাই যাচ্ছে, আজকাল তো সবাই বিলেত-ফেরত—

—কিন্তু আমাকে কে নিয়ে যাবে? এখন তো ডলার-এক্সচেঞ্জ পাওয়া যায় না, খুব কড়াকড়ি করে দিয়েছে—

শম্ভু বললে—তাতে তোর কী? তোর বাবা তো রয়েছে, তোর বাবার সঙ্গে তো মিনিস্টারদের আলাপ-পরিচয় আছে—

সদাব্রত বললে—ওসব কথা থাক, আসলে আমার অন্য প্ল্যান রয়েছে, আমি তোর কাছে একটা অন্য কাজে এসেছি, সেই ভদ্রলোক কোথায়? সেই সেদিনকার ভদ্রলোক একজন, যে বলেছিল···

শম্ভু বললে—কোন্ ভদ্রলোক? কী বলেছিল? তোর সম্বন্ধে?

সদাব্রত বললে—অবশ্য তার জন্যে আমি কিছু মনে করি নি, আমি সে-জন্যে একটুও ওরিড্ নই, কিন্তু কথাটা যখন উঠেছে তখন কোথাও নিশ্চয় একটা ট্রুথ্ আছে—

—কোন্ কথাটা? কিছুই বুঝতে পারছিল না শম্ভু, হাঁ করে সে চেয়ে রইল।

সদাব্রত বললে—আচ্ছা তোর কী মনে হয়? অনেকদিন থেকেই তো তুই আমাকে দেখছিস্, আমার বাবাকেও দেখেছিস···

—কিন্তু আসল কথাটা কী?

সদাব্রত বললে—আমি আজ বাবার অফিসে গিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম কথাটা তুলবো। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবো তাই-ই ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু এক-একবার ভাবছি মানুষের জন্ম মানুষের বার্থ দিয়েই কি মানুষের বিচার হবে? মানুষের বার্থ, তার হেরিডিটিটা কি এতই ইমপর্ট্যাণ্ট ফ্যাক্টর? আবার ভাবছি···

শম্ভু বললে—কিন্তু আমি তো তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না—

—কিন্তু সেই ভদ্রলোক কোথায়? যার মুখ থেকে প্রথম শুনি যে, আমি আমার বাবার অ্যাডপ্‌টেড্‌ সান্‌! আমি পালিত ছেলে। কিন্তু পোষ্যপুত্রই যদি হই তো আমার নিশ্চয় জানবার অধিকার আছে আমি কোন্‌ ফ্যামিলির ছেলে, কে আমার আসল বাবা-মা? কোথায় তাদের বাড়ি? তারা বেঁচে আছে কি না।

শম্ভু এতক্ষণে সদাব্রতর মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। আশ্চর্য! সদাব্রতকে পাড়ার ছেলেরা সবাই হিংসে করতো এককালে। এখন এতদিন পরে প্রথম শম্ভুর মনে হলো যেন সদাব্রত আসলে হেরে গেছে।

—তোর গাড়ি কী হলো?

সদাব্রত বললে—আজ ক'দিন থেকে গাড়ি নিয়ে বেরোই না ভাই, মনে হচ্ছে আমার কিছুতেই যেন রাইট্‌ নেই, আমি লাইফের পৃথিবীতে যেন একজন ট্রেস্‌পাসার—

—ওসব কথা ভাবিস্‌ নে। তুই কত বড়লোক ভাব্‌ তো? অ্যাভারেজ ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করে দেখ্‌ না নিজেকে। অনেক ছেলে নিজে একটা ঘরে একলা শুতে পর্যন্ত পায় না, খাওয়া-পরার কথা ছেড়েই দে না-হয়। আর তুই না জানিস্‌, আমি তো জানি, যারা বাসে-ট্রামে-ট্যাক্সিতে ফরসা টেরিলিনের বুশ্‌ শার্ট গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার পরে বেড়ায়, আসলে তাদের মুরোদ কত? আরে এই দেখ্‌ না, এই যে অফিস থেকে খেটে-খুটে ক্লাবে এসে বসি, এ কেন? বাড়িতে জায়গা নেই আমাদের, তা জানিস? ভাই-বোনেরা সব লেখাপড়া করে, তাই এখানে পাখার তলায় বসে বসে খানিকটা সময় কাটিয়ে যাই—তোর অবস্থার সঙ্গে আমাদের তুলনা? তোর যদি রাইট্‌ না থাকে তো রাইট্‌ আছে আমাদের? আমরাই তো এ ওয়ার্লডে রিয়্যাল ট্রেস্‌পাসার—

বলে হো হো করে হাসলো শম্ভু। হেসে হয়ত আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাধা পড়লো। সেই মেয়েটা হঠাৎ ক্লাবের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। শম্ভু অবাক হয়ে গেছে। মেয়েটা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে গলি পেরিয়ে মধু গুপ্ত লেনের রাস্তায় নামছিল। শম্ভু এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে—এ কি, আপনি চলে যাচ্ছেন যে!

সদাব্রত চেয়ে দেখলে সেই মেয়েটা। সেই কুন্তি!

কুন্তি বললে—দেখুন, আপনাদের এখনও মতির ঠিক নেই, আপনারা আগে মতি স্থির করুন, তখন আমায় ডাকবেন—

বলে চলেই যাচ্ছিল। শম্ভুর কথায় আবার দাঁড়ালো। বললে—দেখুন, আপনি বলেছিলেন বলেই আমি আপনাদের ক্লাবে এসেছি। নইলে আমার অন্য কাজ আছে—

—কিন্তু কালীপদ? কালীপদই তো 'মরা-মাটি' লিখেছে, কালীপদ আপনাকে কী বললে?

কুন্তি বললে—দেখুন, আমি ব্ল্যাঙ্ক ভার্স জানি কি না, আমি গিরিশ ঘোষের নাম শুনেছি কি না, এসব পরীক্ষা দিতে আপনাদের কাছে আমি আসি নি, আমাকে যারা পার্ট দেয়, তারা আমাকে দেখেই দেয়, আমাকে পরীক্ষা করে পার্ট দেয় না তারা—

—কিন্তু আর একটু দাঁড়ান না, আমি কালীপদকে বলছি—

কুন্তি কিন্তু দাঁড়াল না। রাস্তা দিয়ে সোজা চলতে লাগলো। যাবার সময় বলে গেল—এর পর যদি আমাকে দিয়ে কাজ করাতে হয় তো আগাম পঁচাত্তরটা টাকা আমার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসবেন, তবে কাজ করতে আসবো, এবার থেকে নগদ টাকা হাতে না নিয়ে আর কোথাও যাবো না—

কিন্তু তখন আর অনুরোধ-উপরোধ করে ফিরিয়ে আনবার সময় নেই। মেয়েটা চলেই গেল।

শম্ভু চুপ করে ছিল। সদাব্রত বললে—কোথায় থাকে ও? কী করে ও?

শম্ভু সেই রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়েই বললে—কী আর করবে, থিয়েটার করে বেড়ায় পাড়ায়-পাড়ায়। দেখ্‌লি তো তুই, কী অহংকার ওদের হয়েছে আজকাল! আর কালীপদটাও হয়েছে তেমনি, করবি তো অ্যামেচার থিয়েটার, তার আবার অত বাছাবাছি কী? আর পঁচাত্তর টাকার বেশি যখন দিতে পারবো না, তখন অত খুঁতখুঁতে হলে চলে?

—কিন্তু দেখতে তো ভালোই, পার্ট করতে পারে না বুঝি?

শম্ভু বললে—আরে তা নয়, ও একেবারে বার্নার্ড শ' হয়েছে, ওই আমাদের কালীপদ! আমরা তো আর নাট্য-সাহিত্যের উন্নতির জন্যে প্লে করছি না, করছি একরাত একটু চপ্‌-কাটলেট্‌ থাবো, ফুর্তি-টুর্তি করবো, এই আর কী। আর দুটো নাইট্‌ প্লে করতে পারলে গভর্মেণ্টের কাছ

থেকে হাজার কয়েক টাকা আদায় করতে পারবো। তা তার জন্যেই এত খোশামোদ!

—টাকা দিতে হবে তো ওদের?

শম্ভু বললে—শুধু টাকা? টাকাও দিতে হবে আবার খোশামোদও করতে হবে, আবার গাড়ি করে কাউকে-কাউকে বাড়ি পৌঁছেও দিতে হবে—আজকাল খুব ডিম্যাণ্ড কিনা ওদের। আগেকার দিনে খুব ভাই সুবিধে ছিল, ছেলেরা গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সেজে নেমে পড়তো···কিন্তু থাক্ গে, ওদের কথা ছেড়ে দে, ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামাস্ নি তুই—

সদাব্রত বললে—মাথা আমি ঘামাচ্ছি না, কিন্তু সেই ভদ্রলোককে আমি একবার জিজ্ঞেস করতাম খবরটা কোথা থেকে তিনি শুনলেন।

—কিন্তু দুলাল-দা তো আজকে আসে নি, আমি জিজ্ঞেস করে রাখবো'খন—

—কিন্তু আমার নাম করিস নি যেন, আমি জিজ্ঞেস করেছি এটা যেন বলিস নি—আমি পরে আর একদিন আসবো, যদি ঘটনাটা সত্যি হয় তো আমাকে সমস্ত নতুন করে ভাবতে হবে, এতদিন যেভাবে জীবনটাকে দেখে এসেছি সেভাবে আর দেখা চলবে না—

শম্ভু পিঠ চাপড়ে সাহস যুগিয়ে দিয়ে বললে—তোরা লেখাপড়া শিখেছিস. এ নিয়ে এত ভাবছিস কেন? তুই তো আমাদের মত মুখ্যু নোস্, আমার যদ্দূর মনে হয় দুলাল-দা রসিকতা করেছে—

—রসিকতা!

শম্ভুর তখন বোধ হয় ক্লাবের ভেতরে কাজ ছিল, বললে—ঠিক আছে, পরে আসিস একদিন, আমি জিজ্ঞেস করে রাখবো, এখন ভেতরে গিয়ে দেখি, কী ব্যাপার হলো, মেয়েটা রাগ-মাগ করে চলে গেল কেন—যাই—

বলে ভেতরে যেতেই দেখলে কালীপদ চুপ করে বসে। সবাই মেজাজ গরম করে আছে। শম্ভু বললে—কী রে, কালীপদ, কী হলো? রাগ করে চলে গেল কেন কুন্তি?

কালীপদ একটা সিগারেট ধরালে। বললে—দূর, ওকে দিয়ে হবে না। আমার সাবজেক্ট উদ্বাস্তু নিয়ে, ওর গলায় এখনও সেই মেলোডি লেগে রয়েছে। আরে বাবা, এ তো ডি-এল-রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নয়, কিংবা 'মেবার-পতন'ও নয়, সেই গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে অ্যাক্টিং করার যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে, ও খবরই রাখে না তার। ইব্‌সেন আসার পর থেকে ড্রামার ওয়ার্লডে কত বড় রিভোলিউশান্

হয়ে গেছে তারও খবর রাখে না—আর টেনেসি উইলিয়ামস্ আসার পর থেকে অ্যামেরিকার থিয়েটার হোলসেল্ চেঞ্জ হয়ে গেল, বাংলাদেশে কেউ তা জানেই না—

ওপাশে শক্তিপদ বসে ছিল। সে বললে—কিন্তু আমরা তো ড্রামা ফেস্টি-ভ্যালে নাম লেখাচ্ছি না, আমরা তো ফুর্তি করবার জন্যে থিয়েটার করছি—

কালীপদ রেগে গেল। বললে—তা হলে তাই-ই করো, ফুর্তি করেই যদি দেশের উন্নতি করতে চাও তো করো, আমাকে আর এর মধ্যে জড়িও না ভাই তোমরা, ওতেই বাঙালীদের যদি মুখোজ্জ্বল হয় তো ওই করো, কেউ বারণ করছে না। কিন্তু আমি এও বলে রাখছি একদিন এই বাংলাদেশ থেকেই আবার ইব্সেন, টেনেসি উইলিয়ামস্, আর আর্থার মিলার জন্মাবে, একদিন এই আমার 'মরা-মাটি'ই বাঙালী কাল্চারের পিভট্ হয়ে থাকবে—

তার পর শম্ভুর দিকে হাত বাড়িয়েদিয়ে বললে—দে, সিগ্রেট দে একটা, টানতে টানতে বাড়ি যাই—

কুন্তিকে ছেড়ে দিয়েছিল এখানে পৌঁছেই। হাঁটতে হাঁটতে সদাব্রত মধু গুপ্ত লেন পার হয়ে ট্রাম-রাস্তায় এসে পড়লো। এ-দিকটা ফুটপাথের ওপর হাঁটা যায় না। পথের ওপরেই বাজার বসে গেছে। একবার বাসে ওঠবার চেষ্টা করলে। ঝুলতে-ঝুলতে চলেছে সবাই। বিরাট দোতলা বাসগুলো। ট্রাম এসপ্ল্যানেডে বদ্লাতে হবে। কী করবে বুঝতে পারলে না সদাব্রত। অনেকক্ষণ ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে লাগলো। একেবারে সোজা দক্ষিণমুখো। হঠাৎ একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে তাতেই উঠতে যাচ্ছিল সদাব্রত।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবেন ?

—বালিগঞ্জ !

কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে যেতেই বাধা পড়লো।

—দেখুন, ওই লোকগুলো আমার পেছন পেছন আসছে—

সদাব্রত পেছন ফিরে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। সেই মেয়েটা। কুন্তি। কুন্তিও যেন অবাক হয়ে গেছে। এই লোকটাকেই দেখেছে সে শম্ভুবাবুদের ক্লাবের ভেতরে।

—কে? কারা পেছনে-পেছনে আসছে?

কুন্তি পেছনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। তবু সদাব্রত সেই দিকেই এগিয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে নির্দেশিত মানুষদের দেখা গেল না। কয়েক জনকে যেন শুধু সন্দেহজনক চরিত্রের বলে মনে হলো।

সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—কারা? কোথায় তারা?

বোধ হয় কুন্তিও খুঁজছিল। বললে—ওই যে—

কিন্তু ভিড়ের মধ্যে মেয়েটা কাদের দেখিয়ে দিলে তা ঠিক বোঝা গেল না। সবাই নিরীহ নাগরিক। গোবেচারা মানুষ সব। যে-যার নিজের নিজের কাজে রাস্তায় বেরিয়েছে, কাউকেই অপরাধী বলে চেনা গেল না। অন্ততঃ কারোর মুখের চেহারা দেখে তা বোঝা গেল না। আর দাঁড়িয়ে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। কুন্তিও সঙ্গে ছিল। সদাব্রত ফিরে এসে আবার ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিল। বললে—তুমি কোন্ দিকে যাবে?

কুন্তি বললে—আপনি যদি আমাকে একটু পৌঁছে দেন—

—কোথায় থাকো তুমি?

—আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

ট্যাক্সিটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। সদাব্রত বললে—তুমি ওঠো, আমি বালিগঞ্জে যাবো, তোমার যেখানে দরকার আমি নামিয়ে দেব'খন—

গাড়ি ছেড়ে দিলে। সোজা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে গিয়ে মোড় ঘুরলো। চুপ করে বসেই ছিল কুন্তি। সদাব্রত হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—ওদের ক্লাবে ওরা কি নিলে না তোমায়?

কুন্তি এবার সদাব্রতর দিকে চাইল। বললে—আপনিও তো ওই ক্লাবের মেম্বার?

সদাব্রত বললে—মেম্বার নই, ওখানে আমি কাউকে চিনি না—শুধু শম্ভুর সঙ্গে দরকার ছিল বলে গিয়েছিলুম—

কুন্তি বললে—তা হলে বলি, আপনি হয়ত জানেন না, ওদের ওখানে আর যাবেন না আপনি—

—কেন?

কুন্তি বললে—ওরা সবাই কমিউনিস্ট্—

সদাব্রত বোধ হয় এর আগে এত চমকায় নি কখনও! কমিউনিস্ট্! আরো

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখলে একবার মেয়েটার দিকে। কেমন সন্দেহ হতে লাগলো যেন। এমন তো চেহারা দেখে মনে হয় নি। এতক্ষণে যেন বুঝতে পারা গেল কেন পেছনে পেছনে লোকেরা অনুসরণ করছিল।

কিন্তু কুন্তিই নিজের জবাবদিহি করলে। বললে—আপনি হয়ত ভাববেন আমি মিছিমিছি ওদের নামে বদনাম দিচ্ছি, আপনি হয়ত ভাববেন আমার কোনও বদ্ মতলব আছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কোনও দলের নই। আমি কংগ্রেসের দলের সঙ্গেও মিশি না, কমিউনিস্টদের সঙ্গেও মিশি না, শুধু অভাবের জন্যে, শুধু পেট চালাবার জন্যে আমাকে এই পেশা নিতে হয়েছে। আমার শাড়ি আমার লিপ্‌স্টিক্ মাখা ঠোঁট এইসব দেখে হয়ত আপনার মনে হতে পারে আমাদের অবস্থা ভালো, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমার এই ব্যাগের মধ্যে মাত্র তিনটে টাকা আছে। ভেবেছিলুম এদের কাছে আজ কিছু অ্যাড্‌ভান্স্ পাবো, কিন্তু কিছুই দিলে না এরা, তার ওপর আমার বিদ্যে-বুদ্ধি নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করতে লাগলো, তাই সব দেখে শুনে আমার রাগ হয়ে গেল, আমি চলে এলুম—

সদাব্রত চুপ করে রইল। সত্যিই মেয়েটা সিল্কের শাড়ি পরেছে, সেটা এতক্ষণে নজরে পড়লো। সত্যিই লিপ্‌স্টিক্ বুলিয়েছে ঠোঁটে। সেটাও যেন স্পষ্ট নজরে পড়লো। গায়ে হয়ত সেণ্ট মেখেছে, কিংবা রুমালে, নাকে গন্ধ এসে লাগলো।

আর একটা মোড় আসতেই সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—কোন্ দিকে যাবে তুমি?

মেয়েটা কোনও উত্তর দিলে না। সদাব্রত হঠাৎ আবিষ্কার করলে—মেয়েটার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। রাস্তার আলো এসে মাঝে মাঝে পড়ছে মুখের ওপর আর চকচক্ করছে। কিন্তু কী বলা উচিত তাও বুঝতে পারলে না। মেয়েটার উদ্দেশ্য কী, তাও বোঝা গেল না।

হঠাৎ মেয়েটা উঠে সোজা হয়ে বসলো।

বললে—আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন, এখানেই—

—এখানেই? কেন? কী হলো হঠাৎ?

কুন্তি বললে—হঠাৎ নয়, আপনাকে আমি চিনি না জানি না, এভাবে আপনার কাছে সব কথা বলতে চাই না, আপনিই বা আমাকে গাড়িতে তুললেন কেন? আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না? আমি তো চোর,

ডাকাত, বদমাইশ, খারাপ মেয়েও হতে পারি? আপনি তো আমাকে চেনেন না, আমি তো আপনাকে ব্ল্যাকমেল্ও করতে পারি?

ব্ল্যাকমেল্ কথাটা শুনে সদাব্রত আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—ব্ল্যাকমেল্ কথার মানে জানো?

—ঠিক মানে জানি না, কিন্তু অনেকের মুখে শুনেছি তো! বহু মেয়ে রাস্তায়-ঘাটে ছেলেদের ব্ল্যাকমেল্ করে বলে শুনেছি, আমি তো সেই রকমও হতে পারি? আপনি আমায় কেন গাড়িতে তুললেন বিশ্বাস করে?

সদাব্রত বললে—তুমিই তো আমাকে গাড়িতে ওঠাতে বললে!

—কিন্তু আমি তো আপনার অচেনা, এই রকম অচেনা মেয়েদের গাড়িতে তুললে বিপদ হতে পারে তা আপনি জানেন না?

সদাব্রত হাসলো।

বললে—আমার বিপদের কথা আমি বুঝবো, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। তুমি কোথায় যাবে তাই আমাকে বলে দাও, আমি পৌঁছে দিচ্ছি—

কুন্তি তখন যেন একটু শান্ত হয়েছে। বললে—আমি ওদের কমিউনিস্ট্ বলেছি বলে আপনি রাগ করলেন নাকি?

—রাগ! কিন্তু কমিউনিস্ট্ মানে কী, তুমি জানো?

কুন্তি সদাব্রতর মুখের দিকে চাইলে। বললে—আপনিও কি কমিউনিস্ট্?

সদাব্রত বললে—তোমার দেখছি কমিউনিস্ট্দের ওপর খুব রাগ! তুমি এত কমিউনিস্ট্দের সঙ্গে মিশলে কী করে?

কুন্তি বললে—আমরা মিশিনি তো কে মিশেছে? জানেন আমরা নিজের দেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছি এক কাপড়ে, সমস্ত কিছু ফেলে! আমরা এখানে জানোয়ারের মত, গরু-ছাগলের মত বাস করছি। যেখানে এসেছি সেটা কি আমাদের দেশ? এই চারপাশে এত বাড়ি, এত আলো, জাঁকজমক, এই মোটর-গাড়ি, এসব কি আমাদের?

—তোমাদের নয় তো কাদের? এ তো তোমাদেরই দেশ? এ দেশ কাদের?

—বড়লোকদের! তারা কি আমাদের কথা ভাবে? আমরা কী খাই, কী করে বেঁচে থাকি সেকথা কেউ খোঁজ নিয়েছে? খোঁজ নিতে তাদের বয়ে গেছে। আমরা বেঁচে থাকলেই বা কী, আর মরে গেলেই বা কী!

কথাগুলো শুনে কেমন যেন হাসি পেতে লাগলো সদাব্রতর। মজাও লাগলো।

সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—এসব কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে? কমিউনিস্ট্‌রা?

কুন্তি বললে—শেখাবে কেন? আমাদের নিজেদের চোখ নেই? আমরা খবরের কাগজ পড়ি না? আমরা গরীব বলে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা কিছুই থাকতে নেই? আজ সাত বছর কলকাতায় এসেছি, যখন এসেছিলুম তখন ফ্রক পরতাম, এখন শাড়ি পরছি। অনেক দেখলুম, অনেক ভুগলুম, এখনও কি বলতে চান পরের মুখে ঝাল খেয়ে বেড়াচ্ছি?

ট্যাক্সি-ড্রাইভার পাঞ্জাবী। হঠাৎ একটা রাস্তার মোড়ে এসে দ্বিধা করতে লাগলো।

—কিধার জানা হ্যায় সাব?

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে সদাব্রত বললে—তুমি কোথায় থাকো?

কুন্তি বললে—বালিগঞ্জে থাকবার ক্ষমতা আমাদের নেই—

—তা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু জায়গাটার একটা নাম তো আছে?

—ধরে নিন ফুটপাথে।

—কিন্তু আমরা বড়লোক এ কথাটাই বা ধরে নিলে কী করে? আমার চেহারা দেখে, জামা কাপড় দেখে?

কুন্তি বললে—তা জানি না। আর আপনি বড়লোক কি গরীবলোক তা জানবারও আমার দরকার নেই, ওদের ক্লাব থেকে বেরিয়ে মনটা খুব খারাপ ছিল তাই অনেক কথা বলে ফেলেছিলুম রাগের ঝোঁকে, আপনি যেন কিছু মনে করবেন না—

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইল। তার পর সদাব্রতই প্রথম কথা বললে।

বললে—তোমার বয়েস কম, কিন্তু একটা কথা মনে করে রেখো যে মানুষের বাইরের রূপটাই তার সব নয়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এসব বড়লোক-গরীবলোক বিচার করে না। আমি জীবনে বড়লোকদের সঙ্গেও মিশেছি, অনেক গরীব লোককেও জানি, দেখেছি তফাৎটা শুধু বাইরের, ভেতরে সবাই এক—

কুন্তি বললে—আপনি আমার অবস্থাটা জানলে আর এ-কথা বলতেন না—

তার পর হঠাৎ সদাব্রতর মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—কাকে খেতে না-পাওয়া বলে তা জানেন? জানেন কাকে বলে উপোস করা? কাকে বলে খালি পেটে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে ভরা পেটের ভান করা?

তার পরেই হঠাৎ বললে—আচ্ছা নমস্কার, হাজরা পার্ক এসে গেছি, এখানে ট্যাক্সি থামাতে বলুন—

কিন্তু হঠাৎ দু'জনেই একটা শব্দে চমকে উঠলো। পার্ক থেকে লাউড-স্পীকারে বক্তৃতা ভেসে আসছিল। সামনে পেছনে অনেক ভিড়। ভেতরে উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে বক্তা তখন বলে চলেছেন—আর হাজার হাজার লোক মুগ্ধ হয়ে বক্তৃতা শুনছে—

বক্তা বলছেন—ফিলজফার কান্ট রোজ ভোরবেলা ঘড়ির কাঁটায় পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। কিন্তু সেদিন হঠাৎ খবর এলো ফ্রান্সের জনসাধারণের হাতে সেখানকার রাজা সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে বন্দী হয়েছে। খবর এলো ব্যাস্টিলের পতন হয়েছে। ফ্রান্সের রাজশক্তির এই পতন সমস্ত পৃথিবীর মনকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। জীবনে এই একটি দিন মাত্র তাঁর বেড়াতে বেরোতে দেরি হলো। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, হেজ্‌লিট্‌ এই বিপ্লবকে অভিনন্দন জানালেন। সকলে মেনে নিলেন রক্তপাতের ভেতর দিয়ে অতীতের সঙ্গে এই যে বিচ্ছেদ এলো তা বিশ্বের মঙ্গলের কারণ। আমাদের ইণ্ডিয়াতে আজকের এই ধনতন্ত্রের এই শোষণ-সম্বল সমাজ-ব্যবস্থা আমরা চাই না। একমাত্র শোষণ-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই আমাদের কাম্য। যে ধর্ম ছারপোকাকে রক্ত খাওয়ায় কিন্তু মানুষের রক্ত চোষে তাকে আমরা অহিংসা বলি না।

চারদিকে চটাপট্‌ চটাপট্‌ হাততালি পড়তে লাগলো।

বক্তা আবার বলতে লাগলেন—দেশ আজ স্বাধীন, আমাদের স্বাধীনতার মধ্যে কোথাও কলোনিয়ালিজমের গন্ধ নেই। কিন্তু আমাদেরই এই দেশের একটি অংশে আজো পর্তুগীজ কলোনীর বিষফোড়া রয়ে গেছে। আজ হয়ত এ ছোট, অত্যন্ত নিরীহ মূর্তি নিয়ে বিরাজ করছে, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যে এই বিষফোড়াই একদিন কার্বাঙ্কল হয়ে সর্বাঙ্গে পচন ধরাবে। আজ আমরা গোয়ার কথা বলছি। ভারত সরকার যদি এই গোয়াকে মুক্ত করবার ভার নিজের হাতে না নেন তো সে ভার আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। বিপ্লব আমরা চাই এবং বিপ্লবের কী মূল্য দিতে হয় তাও আমরা জানি, আমরা সেই বিপ্লবের যোদ্ধাদের…

গাড়িটা তখনও ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে চলছিল।

কুন্তি হঠাৎ মুখ খুললো। বললে—দেখছেন, ওরাও কমিউনিস্ট্—

—কে বললে কমিউনিস্ট্?

কুন্তি বললে—আমি জানি, আমি সকলকে জানি—

—তুমি কী করে ওঁকে জানলে?

কুন্তি আবার হাসলো।

বললে—আমি যে সব ক্লাবে যাই! আমার তো থিয়েটার করাই পেশা। ভাবছেন অন্য মেয়েদের মত আমি রান্নাঘরে বসে ভাত-ডাল রাঁধি আর খবরের কাগজ পড়ি? আপনিও যা জানেন না তা আমি জানি, আপনার চেয়ে অনেক বেশি জানি। সেই জন্যেই তো তখন ওই কথা বলছিলাম—

সদাব্রত আর থাকতে পারলে না।

বললে—জানো উনি কে? ওই যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন? উনি আমার বাবা। আমি শিবপ্রসাদ গুপ্তের ছেলে—

সামনে সাপ দেখেও বোধ হয় লোকে এত ভয় পায় না। অন্ধকারে সদাব্রত ঠিক দেখতে পেলে না, কিন্তু নামটা শুনেই কুন্তি ভয়ে কুঁকড়ে পেছিয়ে বসলো।

হাজরা পার্কের ভেতরে শিবপ্রসাদবাবু তখনও বলে চলেছেন—গোয়া আমাদের দেশ, গোয়া আমাদের মাতৃভুমির অভিন্ন এক অংশ। এই অভিন্ন অংশ আজ পরকরতলগত। একে উদ্ধার করবার জন্যে আজকে সশস্ত্র বিপ্লবও প্রয়োজন হলে করতে হবে। জ্ঞান ও কর্ম, ত্যাগ ও নিষ্ঠা যদি আমাদের জীবনে স্বীকার না করতে পারি, চরিত্রবলের দৃঢ় বনেদ যদি না গড়ে তুলতে পারি তো একদিন গোয়াই আবার ক্ষুদ্র ব্রিটিশ-শক্তির মত আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে পারে, আজকে আমি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে রাখলাম।

সংসারে অনেক জিনিস ঘটে যা সব সময় চোখে পড়ে না। বা চোখে পড়লেও তার কোনও গুরুত্ব বোঝা যায় না। ১৯৪৭ সালের পর থেকে শহর এমনি করেই চলছিল। এক-একজন মানুষ হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই বড়লোক হয়ে উঠছিল, আর একজন বিদ্যে-জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে

নিচেয় নেমে যাচ্ছিল। আবার আর একদল কোন অবলম্বন না পেয়ে আড্ডার আফিমের নেশায় মশগুল হয়ে থাকছিল। আর একদিকে খবরের কাগজের পাতায় বড়-বড় ঘটনা খানিক ক্ষণের জন্যে শহরের মানুষকে চমকে দিচ্ছিল। কোনওটা বা রাশিয়ায় স্টালিনের মৃত্যু, কোনওটা বা স্পুটনিকের আকাশে ওড়া। সকালবেলা যারা বাসে-ট্রামে-ট্রেনে ঝুলতে-ঝুলতে অফিসে যেতো তারা খবরের কাগজখানা গুটিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতো। সময় পেলে সেখানা কখনও পড়তো আবার কখনও বা পড়তো না। কখনও এক-একবার একটা চটকদার সিনেমার ছবি এলে আবার তারই সামনে গিয়ে লাইন দিত। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে আর ভাবনা কী? কণ্ট্রোল উঠে গেছে ভালোই হয়েছে। সিমেন্ট চিনি কাপড় সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। তা বাড়ুক, তাই নিয়ে যাদের মিছিল করার কাজ তারা মিছিল করুক। এ আজাদী ঝুটা হ্যায় বলে চেঁচানো যাদের কাজ, তারা চেঁচাক। মনুমেণ্টের তলায় গিয়ে লাউড্‌স্পীকার-মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে গরম-গরম বক্তৃতা দিক। আমাদের ওসব পোষায়ও না, আমাদের ওসব মানায়ও না। আমরা বরাবর খাই-দাই-কাঁসি বাজাই, এখনও বাজাবো। সেই বক্তিয়ার খিলিজীর আমল থেকে এই সেদিনকার ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত তাই-ই করে এসেছি, এখনও তাই করবো। আমরা যে-যার নিজের নিজের কাজ করেই হয়রান মশাই! আমাদের অত কিছু ভাববার সময় কোথায়?

কেদারবাবু সেদিন সেই কথাই ভাবছিলেন। তাঁকে ছেলেদের হিস্ট্রি পড়াতে হয়। এ-সব ঘটনাও তো হিস্ট্রি। মন্মথ কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছে।

সেই সব ভাবতে ভাবতেই বাড়ি আসছিলেন তিনি। রাস্তায় অনেক ভিড়। হাতে একগাদা বই নিয়ে আপন মনেই ভাবতে ভাবতে আসছিলেন। ওয়ারের পর একটা নতুন বই বেরিয়েছে, 'এ সার্ভে অফ্ ওয়ার্লড্ সিভিলাইজেশান'—সেখানা পড়ে দেখতে হবে। কত ভাবনা মানুষের। কেদারবাবু চলতে-চলতেই একবার দাঁড়ালেন। নেপোলিয়ান বেটাই বোধ হয় যত দোষ করেছিল। নইলে ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের মত অমন একটা ঘটনাকে একেবারে উল্টে দিয়ে গেল বেটা!

কখন যে বাড়ির সামনে এসে গিয়েছিলেন খেয়াল ছিল না। দরজার কড়া নাড়তে-নাড়তে ডাকলেন—শৈল, ও শৈল—

ভেতর থেকে কে একজন দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো। কাকে চাই?

হতবাক হয়ে গেলেন কেদারবাবু। কাকে চাই মানে? নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকবেন তাতেও আপত্তি!

কেদারবাবু বললেন—আপনি কে?

ভদ্রলোকও বললেন—আপনি কে?

—আরে আমি আমার বাড়িতে ঢুকবো, তাও ঢুকতে দেবেন না?

হঠাৎ বোধ হয় ভেতরে নজর পড়লো। ভেতরে অন্যরকম চেহারা। কেমন যেন অস্বস্তি লাগলো ভাবতে। বাড়ি ভুল করেছেন নাকি? কুড়ি বছর এই বাড়িতে বাস করছেন আর এই ভুলটা করে ফেললেন! চারদিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—দাঁড়ান, আমি বোধ হয় ভুল করেছি—

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। বললেন—আপনি নতুন বুঝি এ-পাড়ায়?

কেদারবাবু বললেন—নতুন হবো কেন? আমি কুড়ি বছর আছি এই ফড়েপুকুর স্ট্রীটে—

ভদ্রলোক বললেন—এটা তো ফড়েপুকুর স্ট্রীট নয়, এটা তো মোহনবাগান রো—

কী আশ্চর্য! কেদারবাবু বললেন—কিছু মনে করবেন না মশাই, একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম—

বলে রাস্তায় এসে পড়লেন। তার পর আর ভুল করার কথা নয়। নিজের ঠিক বাড়িটার সামনে আসতেই হরিচরণবাবু বললেন—এই যে মাস্টার মশাই—

কেদারবাবু বললেন—কি আশ্চর্য! দেখুন মশাই, আমি আজকে ভুল করে মোহনবাগান 'রো'তে চলে গিয়েছিলুম, অথচ আজ কুড়ি বছর এখানে···

হরিচরণবাবু থামিয়ে দিলেন। বললেন—একটা কথা আপনাকে বলবার জন্যে ক'দিন থেকে ঘুরছি, আপনার দেখাই পাই না মশাই, আপনাকে আমি অনেক দিন আগেই বলেছিলাম মনে আছে বোধ হয়—

কেদারবাবু বললেন—হ্যাঁ, মনে আছে বৈ কি—

—আপনি বলেছিলেন বাড়িটা ছেড়ে দেবেন—

কেদারবাবু স্বীকার করলেন—হ্যাঁ, তা বলেছিলুম—

—আরো বলেছিলেন দু'একমাসের মধ্যেই ছেড়ে দেবেন। সে আজ এক বছর হতে চললো, কিন্তু আমি তো আর পারছি না—আমিও তো ছা-পোষা

মানুষ, আমার দিকটাও তো আপনি দেখবেন! কী কষ্ট করে যে সংসার চালাচ্ছি তা আমিই জানি—

কেদারবাবু বললেন—খুব সত্যি কথা বলেছেন, দিনকাল যা পড়েছে তাতে চলা খুব কষ্টসাধ্য! আমি একটি ছাত্রকে পড়াই, তার নাম বসন্ত, ছেলেটি খুব ভালো, ব্রিলিয়াণ্ট্ বয়, জানেন, তার বাবা আজ বলছিল দিনকাল বড় খারাপ, আমাকে দু'মাস মাইনে দিতে পারে নি—

হরিচরণবাবু বললেন—সে-সব কথা শুনে তো আমার কোনও লাভ নেই, আপনি বাড়ি খালি করে দেবেন কবে সেইটে বলুন—একটা ডেফিনিট্ ডেট্ বলে দিন এবার, আমার আর দেরি সইছে না—

—ডেফিনিট্ ডেট্?

কেদারবাবু ভাবতে লাগলেন। তার পর বললেন—নিশ্চয়, ডেফিনিট্ ডেট্ তো একটা দেওয়া উচিত, আপনার খুবই অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে পারছি; কিন্তু আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম চাটুজ্জে মশাই, একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। ক'দিন ধরে একটা অন্য জিনিস ভাবছিলুম, হিস্ট্রিতে এক-একটা সময় আসে যখন এই রকম স্কেয়ারসিটি, এই রকম দুরবস্থা আসে—একবার এসেছিল সেভেনটিন্ ফিফ্‌টিসেভেনে। আবার ধরুন এই যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেল, আপনি কি ভেবেছেন শান্তি এসেছে? বাজে কথা—দেখুন না জার্মানী ভাগ হয়ে গেল, ইণ্ডিয়া ভাগ হয়ে গেল, কোরিয়া ভাগ হয়ে গেল—

হরিচরণবাবু বাধা দিলেন—ওসব কথা আমি আগে অনেকবার শুনেছি আপনার কাছে, এবার আপনি দয়া করে আমার বাড়িটা ছেড়ে দিন।

কেদারবাবু বললেন—নিশ্চয় ছেড়ে দেবো, আমি কি বলছি আমি ছাড়বো না।

—কিন্তু কবে ছাড়বেন তা তো বলবেন? আমার এই মাসের মধ্যেই বাড়ি চাই—

কেদারবাবু বললেন—তা ছাড়বো। আমি তো বলছি এই মাসের মধ্যেই···

—কাকা!

ভেতর থেকে সদর দরজার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ শৈলর গলা শোনা গেল। কেদারবাবু একবার সেদিকে চাইলেন। বললেন—দেখছেন আমার ভাইঝি ঠিক আমার গলা শুনতে পেয়েছে···যাচ্ছি রে, এই চাটুজ্জে মশাইয়ের সঙ্গে একটু কথা বলছি—

—কাকা, তুমি একবার ভেতরে এসো—দরকার আছে—

কেদারবাবু ভেতরে ঢুকলেন—কী রে? কী হলো?

—আচ্ছা, তুমি কী বলো তো? তুমি কি বলে কথা দিচ্ছ যে এ-মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেবে? বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবে শুনি? কোথায় বাড়ি পাবে? কলকাতায় বাড়ি পাওয়া কি অত সোজা?

—কিন্তু ওঁর যে বড় কষ্ট হচ্ছে। ওঁকে যে আমি কথা দিয়ে দিয়েছি—

—কেন তুমি কথা দিলে? ওই জন্যেই তো তোমাকে ডাকলুম। যাও ওঁকে গিয়ে বলো যখন আমরা বাড়ি পাবো তখন যাবো—

কেদারবাবু বললেন—তা তো আর হয় না, আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছি—

শৈল বললে—কিন্তু কথা দেওয়াটাই কি সব? বাড়ি ছেড়ে দিলে আমরা যাবো কোথায়?

—সে-একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে'খন, জানিস্, আজকে ভবানীপুর দিয়ে আসছিলুম, শুনলুম খুব মীটিং-টিটিং হচ্ছে—

—কিসের মীটিং?

—আবার কিসের, গোয়ার! বেটাদের আক্কেল দেখ্ একবার, ইণ্ডিয়ার মধ্যে ওরা জেঁকে বসে আছে এখনও! সবাই চলে গেল, ব্রিটিশ গেল, ফ্রেঞ্চ গেল, পোর্টুগীজরা এখনও এখানে জেঁকে বসে থাকতে চায়—এটা তো ভাল কথা নয়। আমাদের যে অসুবিধে হচ্ছে সেটা বুঝবে না—এই আমাদের জন্যে চাটুজ্জে মশাইয়ের যেমন অসুবিধে হচ্ছে। আমরা একেবারে জেঁকে বসে আছি—

শৈল আর পারলে না। বললে—তুমি থামো তো! গোয়া নিয়ে কী হচ্ছে তা ভেবে কী হবে আমার? তুমি চাটুজ্জে মশাইকে গিয়ে বলে এসো যে যখন আমরা বাড়ি পাবো তখন যাবো—

—কিন্তু আমি যে কথা দিয়ে দিয়েছি রে!

—ও-কথার কোনও দাম নেই, যাও শিগ্গির বলে এসো—

কেদারবাবু বললেন—যাবো?

—নিশ্চয় যাবে, তুমি তো সারাদিন বাইরে বাইরে থাকো, আর আমি যে কী কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি তা তো তুমি বুঝতে পারবে না—এর পর যদি বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হয় তখন কী করবে বলো তো? এক মাসের মধ্যে কোথায় বাড়ি পাবে তুমি? যাও—

কেদারবাবু বাইরে এলেন। হরিচরণবাবু তখন আর নেই সেখানে। ততক্ষণে চলে গেছেন।

শৈল বললে—একটু এগিয়ে গিয়ে দেখো না, এখনও বোধ হয় বেশি দূর যান নি। তুমি বলে এসো যে যখন আমরা বাড়ি পাবো তখন যাবো, তার আগে যাওয়া সম্ভব নয়—আর আমরা তো বিনা ভাড়ায় থাকছি না। মাসে-মাসে ভাড়া তো দিচ্ছি ঠিক—

কেদারবাবু সেই অবস্থাতেই আবার রাস্তায় বেরোলেন। ফড়েপুকুর স্ট্রীটেও লোকজন অসংখ্য। কেদারবাবু ভাবতে লাগলেন—সত্যিই অনেক দিন আগেই বাড়ি ছাড়তে বলেছিলেন চাটুজ্জে মশাই। তাঁর বাড়ির দরকার। সুতরাং অন্যায় কিছু বলেন নি তিনি। তবু এক মাসের মধ্যে যদি বাড়ি পাওয়া না যায়!

—চাটুজ্জে মশাই, চাটুজ্জে মশাই—

সামনেই হরিচরণবাবু যাচ্ছিলেন। তিনি পেছন ফিরলেন।

কেদারবাবু বললেন—দেখুন চাটুজ্জে মশাই···একটা কথা···

বলতে গিয়েই থেমে গেলেন। ভুল লোক! অচেনা ভদ্রলোকও অবাক হয়ে গেছেন। কেদারবাবু বললেন—আমি ঠিক চিনতে পারি নি, আমি ভেবেছিলাম হরিচরণবাবু—কিছু মনে করবেন না আপনি······

ট্রাম-রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে কেদারবাবু ফিরেই আসছিলেন। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক মাসের দোসরা তারিখেই বরাবর ভাড়া নিতে আসেন। বহুদিনের ভাড়াটে কেদারবাবু। কুড়ি টাকা ভাড়া দেন মাসে-মাসে। তিনখানা ঘর। বহু পুরনো বাড়ি। শৈল কতদিন বলেছে একটু মেরামত করিয়ে দেবার জন্যে। চুন বালি ধরানো হয় না, মেরামতের কথা বললেই বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেন। কী যে করা যায়! অথচ ওঁর কষ্ট হচ্ছে। এই তো পর্তুগীজদেরও গোয়া ছাড়তে বলছি আমরা।

ফিরেই আসছিলেন। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে একটা গোলমাল কানে এলো। কেদারবাবু চশমা ঠিক করে নিলেন। বিরাট এক প্রোসেশান্ আসছে। আবার কিসের প্রোসেশান্? গলির আশে-পাশে যারা এদিকে ওদিকে যাচ্ছিল তারা থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—কী হয়েছে মশাই? কিসের প্রোসেশান? কেদারবাবু ফিরে চাইলেন পাশের লোকটার দিকে। কারা আসছে মশাই?

দূর থেকে সকলে একসঙ্গে চিৎকার করছে :

—আমাদের দাবি মানতে হবে।

নইলে গদি ছাড়তে হবে।

—কারা মশাই এরা ? কী বলছে ?

—অত্যাচারীর শাস্তি চাই—

শাস্তি চাই।

কেউ বুঝতে পারছিল না কারা এরা। দেখতে দেখতে মিছিলটা আরো এগিয়ে এলো। কেদারবাবু দেখতে লাগলেন—মিছিলের সামনে লাল শালুর ওপর মোটা-মোটা সাদা অক্ষরে কী সব লেখা রয়েছে।

—বাঙালীদের এখনও চৈতন্য হলো না মশাই, হায় রে বাঙালী জাত !

—কী হয়েছে মশাই ? কিসের প্রোসেশান্ ?

ভদ্রলোক বললে—শোনেন নি ডালহৌসী স্কোয়ারে গুলি চলেছে ? দেড়শো নিরীহ লোক পুলিসের গুলিতে মরে গেছে। অথচ····.

—কী করেছিল তারা ?

—কী আবার করবে, শুধু প্রোসেশান্ করে বিধান রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, নিজেদের দাবি জানাতে চেয়েছিল—এই তাদের অপরাধ। দেখে আসুন গিয়ে রাস্তা একেবারে রক্তে ভেসে গিয়েছে—

যারা শুনছিল সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কেন ? কেন ? নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর অত্যাচার করলে কেন ?

—একেই বলে মশাই কংগ্রেসের রাজত্ব ! এরই জন্যে ক্ষুদিরাম গোপীনাথ সাহা ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে ? এর চেয়ে তো মশাই ব্রিটিশের রাজত্ব ঢের ভাল ছিল। সে মশাই তবু জানতুম বিদেশী গভর্মেণ্ট ! এখন এরা সব ছদ্মবেশী ডাকাত, আমরা ব্রিটিশের গুলি খেয়ে স্বাধীনতা আনলুম আর ওরা মশাই মজাসে মন্ত্রিত্ব করবে, মোটা-মোটা মাইনে নেবে !

মিছিলটা তখন সামনে দিয়ে চলেছে। একদল গ্রামের চাষী-পরিবারের মেয়েমানুষ। তারাই লাল ফ্ল্যাগ নিয়ে সামনে-সামনে চলেছে, আর পেছনে সার-সার পুরুষ-মানুষ। খালি পা, ছেঁড়া জামা, বসা মুখ-চোখ। নিরীহ ক্ষুধার্ত মানুষ। সকলের চেহারায় উদ্বেগ। মিছিলের দু'পাশে মাঝে মাঝে লীডার-শ্রেণীর লোক তাদের চালনা করছে। তারাই চেঁচিয়ে বলছে :

—অত্যাচারীর শাস্তি চাই—

আর সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাচ্ছে :

—শান্তি চাই।

আবার সুর পালটে কখনও বলছে :

—আমাদের দাবি মানতে হবে।

সবাই জোর গলায় একসঙ্গে বলছে :

—আমাদের দাবি মানতে হবে।

সেই সুরে লীডার চিৎকার করে উঠছে :

—নইলে গদি ছাড়তে হবে।

সমবেত কণ্ঠে চিৎকার উঠছে :

—নইলে গদি ছাড়তে হবে।

আশপাশের লোকের মধ্যেও গুঞ্জন গুন্-গুন্ ফিস্-ফিস্ আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেল। এই অত্যাচারী গভর্মেণ্ট, এর পতন এবার অনিবার্য। বিধান রায় কি এর পরও চুপ করে গদি আঁকড়ে বসে থাকবে? আর আমরাও শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব মুখ বুজে সহ্য করবো? ধিক বাঙালী জাতের সহ্যক্ষমতা!

কথা শুনতে শুনতে আশপাশের সমস্ত মানুষের ভেতো-রক্ত যেন খানিক ক্ষণের জন্য গরম হয়ে উঠলো।

একজন বললে—আপনারাই তো মশাই ওদের ভোট দিয়ে গদিতে বসিয়েছেন—

পাশের ভদ্রলোক বললেন—না মশাই, আমি কমিউনিস্টদের ভোট দিয়েছিলুম—

কেদারবাবু হতবাক হয়ে দেখছিলেন আর শুনছিলেন। হরিচরণবাবুকে খুঁজতেই তিনি যে বেরিয়েছিলেন, এখন এই মুহূর্তে আর সে-কথা মনে রইল না। তাঁর আরো মনে পড়লো না যে তিনি বাড়িওয়ালাকে কথা দিয়েছেন, এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেবেন। তাঁর শুধু মনে হতে লাগলো দেশের লোক সত্যিই কষ্টে পড়েছে, দেশের লোকের ওপর গভর্মেণ্টেরও অত্যাচারের শেষ নেই। তা হলে কী হবে? ছাত্ররা তা হলে লেখাপড়া করবে কী করে? বসন্তর বাবা অভাবে পড়ে দু'মাসের জন্যে তার মাইনে বাকি ফেলে রেখে দিয়েছেন। মন্মথ তো সত্যি কথাই বলেছিল। সংসারে অনেক জিনিস ঘটে যা চোখে পড়ে না। এরই মধ্যেই এক-একজন

মানুষ তো বড়লোক হয়ে উঠছে। সদাব্রতর বাবা তো বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। তিনি হঠাৎ এত অভাবের মধ্যে বড়লোক হয়ে উঠলেন কী করে?

ভাবতে ভাবতে মাথা গোলমাল হয়ে গেল কেদারবাবুর। তিনি আস্তে আস্তে আবার বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলেন।

পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার একমনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল।

সদাব্রত বললে—গাড়ি ঘুরিয়ে নাও—ঘুমাও গাড়ি—

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সদাব্রত। কেদারবাবুর কথাটাই আবার হঠাৎ মনে পড়লো। সত্যি, কেদারবাবুই একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোমার বাবার ইনকাম কত? সদাব্রত তো নিজেও জানে না তার বাবার ইনকাম কত!

মেয়েটাকে একটু আগেই নামিয়ে দিয়েছিল রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড়ে।

সদাব্রত জিজ্ঞেস করেছিল—এখান থেকে কোথায় যাবে তুমি?

কুন্তি বলেছিল—এই কাছেই, কালীঘাট ক্লাবে—কিছু টাকা পাওনা আছে আমার—

—তা তোমার বাড়িটা আসলে কোথায়?

—জোড়াসাঁকোতে—

বোধ হয় অচেনা পুরুষ-মানুষের কাছে ঠিকানাটা প্রকাশ করতে চায় নি। নিজের অবস্থার আসল পরিচয়টা কে-ই বা দিতে চায়? খেটে খেতে হয় কুন্তিকে। তার কথা শুনে মনে হয়েছিল খুব রাগ আছে কমিউনিস্টদের ওপর। শুধু কমিউনিস্টদের ওপরে নয়, বড়লোকদের ওপরেও রাগ আছে। কুন্তিকে নামিয়ে দিয়ে তার কথা ভাবতে-ভাবতেই আর কোনও দিকে খেয়াল ছিল না। কোন্ দিকে ট্যাক্সি চলছে তারও খেয়াল ছিল না। এতদিন কলেজে পড়েছে। তাদের কলেজেও অনেক মেয়ে পড়তো। তাদের কারো সঙ্গেই পরিচয় হয় নি কোনও সূত্রে। হয়ত সদাব্রত সবাইকে এড়িয়ে চলতো বলেই পরিচয় হয় নি। শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেদের সঙ্গেও পরিচয় হয় নি বিশেষ। গাড়িতে করে ঠিক

ক্লাস বসবার আগে গিয়ে হাজির হতো, আর ক্লাস শেষ হলেই চলে আসতো। এ বোধ হয় ছোটবেলাকার অভ্যেস।

তখন কেউ কেউ তাকে দেখিয়ে বলতো—দাম্ভিক—

কারো সঙ্গে সদাব্রতর উদারভাবে মিশতে না পারাটাকেও যেন দাম্ভিকতা বলে ধরে নিয়েছিল সবাই। দু'একজন আলাপ করবার ইচ্ছে নিয়ে অবশ্য এগিয়ে এসেছে। সিগারেট এগিয়ে দিয়েছে। হয়ত তার গাড়িতেও উঠতে চেয়েছে। তার গাড়িতে উঠে তারই পয়সায় সিনেমা দেখতে চেয়েছে। যেমন হয় সব কলেজেই। কিন্তু তেমন আমল পায় নি বলেই হয়ত আর বন্ধুত্ব হয় নি। আর মেয়েরা? মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার যে ইচ্ছে হয় নি সদাব্রতর তা নয়। অনেক বার ক্লাস করতে করতে একজনের সঙ্গে চোখোচোখিও হয়েছিল বোধ হয় একবার। সেই প্রথম আর বোধ হয় সেই-ই শেষ। কি রকম একটা আড়ষ্টতা এসে তার চোখ-নাক-মুখ চাপা দিয়ে দিয়েছিল। আর সে-পথ মাড়ায় নি সদাব্রত।

আরো আগের কথা। তখন সবে ফার্স্ট ইয়ারে পড়তো সদাব্রত। সেদিন বোধ হয় স্টুডেন্টস্ স্ট্রাইক হয়েছিল। কথা ছিল কলেজ থেকে সবাই দল বেঁধে মার্চ করতে করতে ময়দানে মনুমেন্টের তলায় জড়ো হবে। অন্য কলেজ থেকেও ছেলেরা গিয়ে জড়ো হবে সেখানে। মেয়েরাও থাকবে সে-দলে। ছেলেদের মধ্যে উৎসাহটা বোধ হয় সেই জন্যেই অত বেশি ছিল। যখন সবাই কলেজ-কম্পাউণ্ডের মধ্যে জমায়েত হচ্ছিল তখনই কুঞ্জ গাড়ি নিয়ে এসেছিল সেখানে।

একজন মেয়ে, তার নাম আজ মনে নেই, জিজ্ঞেস করেছিল—কি হলো, আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না?

লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল সদাব্রত। অথচ কতদিন তার সঙ্গেই কথা বলতে চেয়েছিল সে মনে মনে। কিন্তু কী যে হলো, সব যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কিছুই উত্তর দিতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। শুধু বোধ হয় কোনও রকমে 'না' বলেই গাড়িতে উঠে বাড়ি চলে গিয়েছিল। ছোটবেলায় সত্যিই খুব লাজুক ছিল সদাব্রত। এখনও লাজুক সে। কিন্তু সেই আগেকার মতন নয়। এখন তবু কুন্তির সঙ্গে ট্যাক্সিতে বসে চলতে চলতে অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছে সে। সোজাসুজি অনেক প্রশ্ন করে ফেলেছে, অনেক কৌতূহল প্রকাশ করেছে।

ছেলেরা আবার কেউ-কেউ আড়ালে বলতো—আদুরে দুলাল—

হয়ত আদুরেই ছিল সে এতকাল। জন্ম থেকে কোনও অভাব তার হয় নি। এখন মনে হয় অন্য ছেলেদের মত অভাব থাকলেই বোধ হয় ভালো হতো। অন্য ছেলেদের মত আড্ডা দিয়ে বেড়ালেই তার পক্ষে ভালো হতো। তা হলে আর আজ তাকে এই নতুন পৃথিবীর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে সংকোচে দ্বিধায় অস্থির হতে হতো না। তা হলে সে আজ খোলাখুলি ভাবে মধু গুপ্ত লেনের ভেতর শম্ভুদের ক্লাবে গিয়ে মিশতে পারতো। তা হলে আজ এই কুন্তিকে এই রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো না। কেদারবাবুর বদলে অন্য কোনও টিউটরের কাছে পড়লে হয়ত সে এ-রকম হতো না।

—কিধার যানা সাব?

হঠাৎ সদাব্রতর যেন ঘুম ভাঙলো। এতক্ষণ নিজের অতীত দিনগুলোর ভাবনায় এত মশগুল ছিল যে তার খেয়ালই হয় নি কোথায় কোন্ দিকে চলেছে। বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে সদাব্রত। এদিকে এর আগে কখনও আসে নি। এই-ই বোধ হয় টালিগঞ্জ। দু'পাশে ছোট ছোট টিনের চালের, খাপ্‌রার চালের ঝুপড়ি ঘর। এখানে যারা থাকে তারাই বোধ হয় উদ্বাস্তু! রাস্তায় ঘাটে এদের দেখেছে সে। পাকিস্তান হবার পর থেকে এরা আসছে আর শহরের ভিড় বাড়ছে। এরাই মিছিল করছে, নোংরা করছে রাস্তা-ঘাট, গোলমাল করছে। এদের কথাই খবরের কাগজে পড়েছে সে।

সদাব্রত বললে—চলো, হিন্দুস্থান পার্ক—

ট্যাক্সিটা আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে চলতে লাগলো। ট্যাক্সি ড্রাইভারটাও বোধ হয় একটু অবাক হয়ে গেছে। বৌবাজার থেকে বাবু উঠেছে একটা মেয়েকে নিয়ে। তার পর এক জায়গায় নামিয়েও দিয়েছে তাকে। কেনই বা তুলেছিল আর কেনই বা নামিয়ে দিলে কিছুই সে হয়ত বুঝতে পারছে না। আর তার পর কেনই বা এতক্ষণ টালিগঞ্জের দিকে চলছিল তারও ঠিক নেই। আবার এতক্ষণ পরে সেই কালীঘাট—যে পথ দিয়ে এসেছিল।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড়ের ওপর একটা চেনা চেহারা দেখে সদাব্রত অবাক হয়ে গেছে। সেই কুন্তি এখনও দাঁড়িয়ে আছে! আশেপাশে আরো অনেক লোকের ভিড়। তারা জটলা পাকাচ্ছে কী নিয়ে যেন!

গাড়িটা ফুটপাথের পাশে গিয়ে দাঁড় করাতেই কুন্তি দেখতে পেয়েছে।

বাইরে মুখ বাড়িয়ে সদাব্রত বললে—তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে ?

এমনভাবে ধরা পড়ে যাবে—কুন্তি যেন আশা করতে পারে নি।

সদাব্রত আবার জিজ্ঞেস করলে—এখনও বাড়ি যাও নি তুমি ?

কুন্তি মাথা নাড়লো। বললে—না—

—কালীঘাট ক্লাবে যাবে বলেছিলে যে ? টাকা পেয়েছ ?

—না—

—তা হলে ? এমন করে একলা দাঁড়িয়ে আছো কেন ? বাড়ি যাবে না ?

কুন্তি বললে—আমি বাড়ি যাবো'খন, আপনি যান—

সদাব্রত একটু দ্বিধা করতে লাগলো। তবু মরীয়া হয়ে বললে—জোড়াসাঁকো তো অনেক দূর, যেতেও তো অনেক সময় লাগবে—

এতক্ষণে কুন্তি বললে—কিন্তু যাবো কী করে ? বাস-ট্রাম যে সব বন্ধ !

সদাব্রত রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে একটা বাস কি ট্রাম কিছুই নেই। জিজ্ঞেস করলে—কেন ? বাস-ট্রাম বন্ধ কেন ?

কুন্তি বললে—ধর্মতলায় গুলি চলেছে যে ! টিয়ার-গ্যাস্ ছুঁড়েছে—প্রায় দেড়শো লোক মারা গেছে—

সদাব্রত বললে—কিন্তু আমি তো একটু আগে ওইখান দিয়েই এসেছিলুম তোমার সঙ্গে, তখন তো কিছুই ছিল না—

—তখন ছিল না, তার পরে হয়েছে।

—তা হলে তুমি বাড়ি যাবে কী করে ?

কুন্তি কিছু কথা বললে না।

সদাব্রত তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিলে। বললে—তুমি উঠে পড়ো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ হবে, বরং অন্য কোথাও পৌঁছে দিই তোমাকে, যেখানে তোমার ইচ্ছে—

কুন্তি আর দ্বিধা করলে না। উঠে বসলো ভেতরে।

সদাব্রত বললে—চলো, শেয়ালদার দিক দিয়ে ঘুরে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি—

—না, মিছিমিছি আমার জন্যে অত টাকা খরচ করবেন কেন ?

সদাব্রত বললে—তুমি বিপদে পড়েছ বলে !

কুন্তি বললে—বিপদে কি আমি একলা পড়েছি, আমার মত আরো দু' তিনশো লোক বিপদে পড়েছে—

—কিন্তু তাদের তো আমি চিনি না, তোমাকে চিনি বলে তোমাকেই গাড়িতে তুলে নিলুম—

—কিন্তু আমাকে আপনি কতটুকু চেনেন? কী চেনেন আমার? আমার নামটুকু ছাড়া আর কী জানেন আমার সম্বন্ধে?

সদাব্রত হাসলো। বললে—এইটুকুও তো জানি যে তুমি অ্যামেচার ক্লাবে থিয়েটার করে বেড়াও, আর আরও একটা কথা জানি—

—কী?

—তুমি কমিউনিস্টদের ঘেন্না করো আর বড়লোকদের ভয় করো।

কুন্তি কিন্তু এ-কথায় হাসতে পারলে না। তেমনি গম্ভীর হয়েই রইলো। শুধু বললে—সে কথা থাক্, আপনাকে আর কষ্ট করে অত দূরে পৌঁছে দিতে হবে না। আপনি আমায় ওই দেশপ্রিয় পার্কের কাছে নামিয়ে দিলেই চলবে—

—ওখানে তোমার কে আছে?

—আমার এক আত্মীয় থাকে।

—আগে তো তা বলো নি?

—আগে বলবার দরকার হয় নি।

সদাব্রত তবু বললে—তার চেয়ে নিজের বাড়ি যেতে তোমার আপত্তি কী? আমার কিন্তু কিচ্ছু কষ্ট হবে না—

—না, তবু থাক।

—পাছে আমি তোমার ঠিকানাটা জেনে ফেলি, এই জন্যে, না?

কুন্তি বললে—না, তা কেন? আপনি আমার ঠিকানা জানলে ক্ষতি কি?

—না, তোমাকে মাঝে-মাঝে বিরক্ত করতে পারি তো?

—সে আমাকে বিরক্ত করবার লোকের অভাব নেই সেখানে। অনেক লোক আসে। আমি তো পর্দানশীন নই।

—তোমার ভয় নেই, আমি কোনও ক্লাবের মেম্বার নই, আমি থিয়েটার দেখিও না, অভিনয়ও করতে জানি না। আজকে নিয়ে মাত্র দু'দিন শম্ভুদের ক্লাবে গিয়েছিলুম, তাও নিজের একটা জরুরী কাজে—

হঠাৎ কুন্তি বললে—এখানে আমাকে নামিয়ে দিন, এই দেশপ্রিয় পার্ক এসে গেছে—

ট্যাক্সিটা থামলো। কুন্তি নিজেই দরজা খুলে নেমে গেল। বললে—আচ্ছা আসি নমস্কার—

সদাব্রত বললে—কিন্তু তুমি তো তোমার বাড়ির ঠিকানাটা বললে না?

কুন্তি কথাটা শুনে কী ভাবলে একবার। তার পর বললে—সে যাবার মত বাড়ি নয় আমাদের—

—তবু শুনে রাখি, যদি কখনও কোনও উপকার করতে পারি—

কুন্তি বললে—অতই যদি আগ্রহ তা হলে শুনুন, বত্রিশের বি আহিরীটোলা সেকেণ্ড বাই লেন—

সদাব্রত বললে—ঠিক আছে, মনে থাকবে, অনেক ধন্যবাদ—

তার পর আর দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় না। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলে। সদাব্রত পেছন ফিরে দেখলে কুন্তি একটা বাড়ির সামনে পোর্টিকোর ভেতর ঢুকে পড়লো। তার পর আর তাকে দেখা গেল না। ট্যাক্সিটা এবার জোরে চালিয়ে দিলে সর্দারজী।

পোর্টিকোর তলায় সিমেণ্ট বাঁধানো। কুন্তি তারই ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজেকে মোটা থামের উল্টো পিঠে আড়াল করে নিলে। রাস্তার লোক এখন আর তাকে দেখতে পাচ্ছে না। একটা গরু মেঝের ওপর বসে আরাম করে চোখ বুজে জাবর কাটছে। বার্নিশ করা দরজার ওপর পেতলের প্লেটে বাড়ির মালিকের নাম লেখা রয়েছে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। কুন্তি অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। এতক্ষণে নিশ্চয় ভদ্রলোক চলে গেছে। তার পর আস্তে আস্তে উঁকি মেরে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। ট্যাক্সিটা নেই। চলে গেছে।

তার পর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো কুন্তি পোর্টিকো থেকে।

না, কোথাও নেই ট্যাক্সিটা।

এবার ফুটপাথ পেরিয়ে আবার রাস্তায় পড়লো। রাস্তাটা পার হয়ে বাস-স্টপে এসে দাঁড়ালো। সেখানে আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছে কয়েকজন। তা দেখুক। এতক্ষণে বোধ হয় আবার

খাস চলতে আরম্ভ করেছে। দূরে যেন একটা দোতলা বাস দেখা গেল ঝাপ্‌সা মতন।

কুন্তি শাড়িটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সামনের দিকে জায়গা করে নিলে।

হাজরা পার্কের মীটিং অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। যারা কাছাকাছি পাড়ায় থাকে, তারা বেড়াতে আসে এ-পার্কে। বিকেলবেলা অফিসের ফেরত সন্ধ্যেবেলা একটু হাওয়া খাওয়াও হয়, আবার বিনা-পয়সায় মজা দেখাও যায়। আগের থেকে কিছু খবর পাওয়া যায় না। খবর পাবার জন্যে কারও আগ্রহও নেই। সিনেমা-বায়োস্কোপ-থিয়েটার দেখতে তবু টিকিট কিনতে হয়। এখানে একেবারে ফ্রি। কোনও দিন থাকে কংগ্রেসের মীটিং, কোনও দিন জনসংঘের, কোনও দিন পি. এস. পি'র, কোনও দিন আর. এস. পি'র, ফরওয়ার্ড ব্লকের। অসংখ্য পার্টি, অসংখ্য তাদের মত। সবাই মিনিস্ট্রি ক্যাপচার করতে চায়। বাইরে সবাই দেশ-সেবা করতে চায়, গরীবদের ভালো করতে চায়। সবাই-ই গরীব লোকের শুভাকাঙ্ক্ষী!

কুঞ্জ গাড়ি নিয়ে এসে ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল।

শিবপ্রসাদবাবু ভালো বক্তৃতা দিতে পারেন। সমস্ত পার্কের জনতা তাঁর বক্তৃতায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল তখন। তাঁর এক-একটা কথায় ভিড়ের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠছিল। তিনি বলছিলেন—জীবনের সঙ্গে আপস-রফা করা চলে কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে আপস করা চলে না, রফা করা চলে না। মৃত্যুর মৃত্যু নেই, মৃত্যু অবিনশ্বর···

তিনি যখন ডায়াস্‌ থেকে নেমে এলেন তখন সমস্ত লোকের মনে হলো যেন সুভায বোস বেঁচে থাকলেও এমন করে আগুন ছড়াতে পারতেন না।

গাড়ির কাছে আসতেই কুঞ্জ গাড়ির দরজা খুলে দিলে। শিবপ্রসাদবাবু গাড়িতে উঠে খদ্দরের চাদরটা পাশে রেখে দিলেন। বললেন—চল্‌—

তার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—কুঞ্জ—

-তুই আমার বক্তৃতাটা শুনেছিস্‌?

—হ্যাঁ—

—কতটা শুনেছিস্? গোড়া থেকে?

—হ্যাঁ—

কুঞ্জর এ-সব প্রশ্ন শোনা অভ্যেস আছে। প্রত্যেক মিটিং-এর পরেই কুঞ্জকে এ-প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। প্রত্যেক বারই বাবুর বক্তৃতা তার ভাল লাগে।

—কেমন লাগলো তোর?

—খুব ভালো।

শিবপ্রসাদবাবু এতেও সন্তুষ্ট নন, জিজ্ঞেস করলেন—আমারটা ভালো, না ত্রিদিব চৌধুরীরটা ভালো?

—বাবু আপনারটাই বেশি ভালো।

—সবাই মন দিয়ে শুনছিল? কেউ গোলমাল করে নি?

এই রকম নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হয় কুঞ্জকে। এটাই নিয়ম। প্রত্যেকটাই ভালো বলতে হয়। শিবপ্রসাদবাবুর গাড়ির ড্রাইভারের চাকরি বজায় রাখতে গেলে এটা করতে হবে। কুঞ্জ এটা শিখে নিয়েছে। চাকরি মানেই দাসত্ব। কুঞ্জ মাথা খাড়া রেখে সোজা গাড়ি চালাতে লাগল।

সদাব্রত যখন বাড়ির সামনে পৌঁছুল তখন বেশ রাত। পকেট থেকে নোট বইটা বার করে সদাব্রত ঠিকানাটা তাতে লিখে রাখলো। বত্রিশের বি আহিরীটোলা সেকেণ্ড বাই লেন। এও সেই ও-পাড়ায়। চিৎপুর ছাড়িয়ে আরো উত্তরে যেতে হবে। বাই লেন যখন তখন নিশ্চয় খুব সরু গলি হবে। মেয়েটা বলেছিল—আমাদের বাড়ি যাবার মত নয়। কলকাতায় ক'টা বাড়িই বা যাবার মত!

ট্যাক্সিটা থামতেই সদাব্রত ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সদর দরজার দিকে চাইতেই কেমন অবাক হয়ে গেল। গ্যারেজে গাড়ি নেই। এখনও বাবা ফেরেন নি নাকি? মীটিং থেকে অন্য কোথাও গেছেন?

মাও বোধ হয় সামনেই ছিল। মুখ-চোখ দেখে মনে হলো যেন খুব বিব্রত। সদাব্রতকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—এত দেরি হলো যে আজ? কোথায় যাস্ আজকাল? ওদিকে কলকাতায় গুলি চলছে, এত রাত পর্যন্ত না-ফিরলে ভাবনা হয় না আমার?

যথারীতি নিজের ঘরের দিকেই চলে যাচ্ছিল সদাব্রত।

মা আবার বললে—তুইও বাড়ি থাকবি না, উনিও বেরিয়ে যাবেন, তা হলে আমি কার জন্যে সংসার আগলে রাখি?

সদাব্রত বললে—বাবা মীটিং থেকে আসেন নি?

—এলে কী হবে! আবার বেরিয়েছেন—

—কোথায় বেরিয়েছেন!

মা বললে—আবার কোথায়? দেশের কাজে! কারবারের কাজে যান, তাও না-হয় মানে বুঝতে পারি, কিন্তু এ কোথায় বন্যা হলো মেদিনীপুরে, সেখানে ছুটলেন। কোথায় গোয়াতে কী ছাই-পাঁশ হচ্ছে তিনি ছুটলেন, কোথায় আবার গুলি-বন্দুক চললো, সেখানেও তিনি চললেন। একটি ছেলে বাড়িতে, তিনিও তাই! তা হলে আমি কার জন্যে বাড়ি আগ্‌লে রাখবো?

—কিন্তু বাবাকে কেউ ডেকেছেন?

মা বললে—তা খবর দেবার লোকের তো আর অভাব নেই! পুজো করে সবে উঠেছেন, আমি খেতে দিচ্ছি এমন সময় টেলিফোন এলো—কোথায় বিধান রায় না অতুল্য ঘোষ না প্রফুল্ল সেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন—

সদাব্রত আর কথা বললে না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

এবার চিৎপুর। এই শহরের একটা অত্যন্ত দরকারী জায়গা। হিন্দুস্থান পার্ক, মধু গুপ্ত লেন, ডালহৌসী স্কোয়ার আর ফড়েপুকুর স্ট্রীটের মতন একেও অস্বীকার করা চলে না। চিৎপুর রোডটা যেখানে বিডন স্কোয়ার ছাড়িয়ে সোজা আরো উত্তরে চলে গেছে, তারই আশেপাশের এলাকার কথা বলছি। দিনের বেলা এখানে এলে কিছু বোঝবার উপায় নেই, আর পাঁচটা বাজারের মত এরও পাশে জোড়াবাজার। রাস্তার দু'ধারে বাসনপত্র হুঁকো-নল-তামাক, কিংবা হারমোনিয়াম-তবলা-ডুগির দোকান। ট্রাম-বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখা যাবে দু'পাশে সার-সার ঘেঁষাঘেঁষি হাবিজাবির দোকান। এমন কিছু মজা নেই তাতে। হয় সোনা-রুপোর গয়না, নয় তো হুঁকো-গড়-গড়া, নয় ঝাল-চানা-চালভাজা, নয় তো ডুগি-তব্‌লা বিক্রি হচ্ছে! নেহাৎই

শুকনো মাল। কিন্তু রাত্রে এ-জায়গা রসালো হয়ে ওঠে। তখন এই জায়গাটারই আবার ভোল বদলে যায়। রাস্তার দু'পাশে সরু ফুটপাথ। তারই ওপর অসংখ্য মানুষ-জনের ভিড়।

একতলায় মানুষের ভিড়। কিন্তু বাড়িগুলোর দোতলায় ?

চং-চং শব্দ করে ট্রামগুলো চলতে গিয়ে হঠাৎ হৈ-হৈ গোলমাল ওঠে। গেল —গেল—গেল—

হঠাৎ চারদিক থেকে সব লোক এসে জড়ো হয় এদিকে।

—কী মশাই, আর একটু হলেই যে চাপা পড়তেন! অমন ওপর দিকে চেয়ে চলতে আছে ? একটু দেখে শুনে চলতে হয় তো!

ওপাশের সুড়ঙ্গ থেকে কিল্‌বিল্‌ করে ওঠে মেয়েরা। বলে—মরণদশা আর কি—

সুড়ঙ্গই বটে! ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে একেবারে সোজা নাকবরাবর নরক পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়। যারা যায় তারাও বিচক্ষণ ব্যক্তি। কিন্তু রাত্তিরবেলা ঠিক সেই অবস্থায় তাদের বিচক্ষণতা বোধ হয় লোপ পেয়ে যায়। এক-একজন লোক চাপা পড়তে-পড়তে বেঁচে যায় বটে, কিন্তু এক-একজন চাপাও পড়ে সত্যি-সত্যি। আর তখন ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি মোষের গাড়ির গাদি লেগে যায় রাস্তায়। তখন ওপরের রেলিং থেকে ঝুঁকে দেখে সবাই। ওপরের লোকেরা নিচের দিকে চেয়ে দেখে, আর নিচের লোকেরা ওপরের দিকে চেয়ে দেখে। ওপরের দিকে দেখতে দেখতেই এক-একজন মাথা নিচু করে সুড়ঙ্গের মধ্যে সোঁ করে ঢুকে পড়ে।

কিন্তু পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের নিয়মকানুন আলাদা।

পদ্মরাণী সেকালের লোক। বলে—আমার এই তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকলো, আমিই এখনো গোঁফ দেখলে লোক চিনতে পারি নে বাছা, আর তোরা চিনবি লোক ?

দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখেই পদ্মরাণীর ঘর। সেখান থেকে পর্দা তুললেই একেবারে সদরের দরজা পর্যন্ত নজরে পড়ে। ইচ্ছে করলে সব দেখা যায়। ভোরবেলা দরজা খোলা থেকে শুরু করে রাত একটা-দু'টো পর্যন্ত—মাঝে মাঝে রাত তিনটে পর্যন্তও সদর দরজা খোলা থাকে। হয়ত কোনও কোনও দিন বন্ধই হয় না। কিন্তু কুলপী-বরফওয়ালাই হোক, আর বেলফুলওয়ালাই হোক, আর গুণ্ডা-বদমাইশ-গাঁটকাটাই হোক, সকলেই নজরে পড়ে। মুখখানা

একবার দেখলেই চিনতে পারে পদ্মরাণী। মেয়েদের শেখায়। বলে—কাঠের বেড়ালই হোক আর মাটির বেড়ালই হোক বাছা, তাচ্ছিল্য করিস্ নে, ইঁদুর ধরলেই হলো—

অর্থাৎ টাকা দিলেই হলো। পদ্মরাণী নিজে টাকাটা বোঝে ভালো। এ পাড়াতে আরো অনেক বাড়ি আছে। বাড়িরও অভাব নেই, মেয়েরও কমতি নেই। একবার জাল ফেলতে পারলে কোঁচড় ভর্তি হয়ে ওঠার মত। কিন্তু এখানে যারা থাকে তারা ওদেরই মধ্যে একটু আলাদা। যারা এখানে আসে তারাও জানে এখানে পয়সার খাতির। পয়সা দিলে ভর-পেট খাতির খেয়ে রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে বাড়ি চলে যাও। তবে এমন খাতির করবো যে ঘুরে ফিরে সেই এখানেই আসতে হবে। একবার পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে যে এসেছে সে আর ভুল করেও অন্য ফ্ল্যাটে যাবে না।

পদ্মরাণী তাই সকলকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে—ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর গা ?

যা সব জায়গায় হয়, এখানে সেটি চলে না। সবাই জানে খাঁটি মদ বলতে এ-পাড়ায় এই এক পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটেই পাওয়া যায়। পদ্মরাণী পয়সাটা বোঝে বটে, কিন্তু নেমকহারামি করে না। বলে—আমি পয়সা নেবো, খাঁটি মাল দেবো, তার পর তোমার ধম্ম তোমার, আমার ধম্ম আমার। আমি যদি তোমাকে আজ ঠকাই, কাল তুমি ঠকাবে আমাকে। তখন আমার ইহকালও গেল, পরকালও যাবে—

পাশেই সুফলের দোকান। সুফল কাঁকড়ার দাঁড়া ভাজা, আর চিংড়ি মাছের কালিয়াটা করে ভাল। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে খদ্দের আসে কিনতে। কাচের বাক্সর মধ্যে খাবারগুলো সাজিয়ে রাখে। দেখে লোকের জিভ দিয়ে নাল পড়ে। অথচ দামে সস্তা। রাত্রের দিকেই তার খদ্দের বেশি। তবু কাজ-কর্মের মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই পদ্মরাণীর ঘরের বাইরে এসে ডাকে—মা—

পদ্মরাণী বলে—কে ? সুফল ? কী বলছিস্ বাবা ?

—টগরদির ঘরে তালা লাগানো যে ? টগরদি নেই বুঝি ?

—কেন ? দাম বাকি আছে নাকি তোর ?

সুফল বলে—হ্যাঁ মা, তিন টাকা ছ' আনা পাওনা ছিল—

—তা পয়সা বাকি ফেললি কেন বল্ তো ? পয়সা কখনও বাকি ফেলতে

আছে বাবা! তোরা রাঙা মুখ দেখলেই একেবারে ভুলে যাস্, এ লাইনে বাকিতে কেউ কারবার করে? আমি তো তোকে আগেই বলে দিয়েছিলুম বাবা—

সুফল তবু দাঁড়িয়ে থাকে। বলে—কেন, টগরদি কোথায় গেল? আসবে না আর?

পদ্মরাণী বলে—আসবে না তো যাবে কোথায় বাছা? এই যে বাসন্তী ছিল সতেরো নম্বর ঘরে, এখন বারো নম্বরে এসে উঠেছে আবার, চিনিস তো? তা ওই বাসন্তীই তো একদিন গেরস্ত-লাইনে যাবে বলে চলে গিয়েছিল দেমাক করে। বলে—বিয়ে করে ঘর-সংসার করবো। আমি বললুম—তা যাও না বাছা, গেরস্ত-লাইনে কত জ্বালা একবার গেরস্তালি করে দেখে এসো না। তা তাই-ই গেল। আমি সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিলুম, আশীর্ব্বাদ করলুম দু'জনকে, পটলডাঙায় ঘর-ভাড়া করে রইলও দু'বছর, তার পর একদিন কাঁকালে একটা বাচ্ছা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির আবার—বুঝলুম পীরিত ঘুচে গেছে—

এসব পুরনো গল্প। এ-গল্প সুফল না জানতে পারে, কিন্তু জানে অন্য ভাড়াটে মেয়েরা।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—তার পর?

তখন পদ্মরাণী বলে—তারপর আর কী! তার পর এই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটই ভরসা—আড়াই শো টাকার ঘরখানা লোকসান দিয়ে দেড় শো টাকায় নামিয়ে দিই, তবে পেট চলে! তাই তো বাসন্তীকে এখন বলি—গু কি আমরা খেতে জানি নে মা? জানি। খাইনে কেন? না গন্ধ বলে···

পদ্মরাণীর কথাগুলো কিন্তু যাহোক শোনবার মত। সারা দিন নিজের ঘরের ভেতর খাটে বসে বসে ফ্ল্যাট চালায়। মাথার কাছে একটা গড্‌রেজের স্টীলের আলমারী আছে, তাতে টাকা রেখে আঁচলে চাবি বাঁধে। আর দরকারে-অদরকারে বিন্দুকে ডাকে। বলে—বিন্দু—অ বিন্দু—

পদ্মরাণীর বিন্দুই ভরসা। বিন্দুই পদ্মরাণীর রান্না-বান্না করে আবার এতবড় সংসার দেখাশোনা করে। একটা দরোয়ান আছে, সে নামমাত্র। সে কখন কোথায় থাকে তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। বলতে গেলে একলা বিন্দুই সকলের খবরদারি করে আর হুকুম তামিল করে পদ্মরাণীর। পদ্মরাণীর ঘরে টেলিফোন আছে। এমনিতে কাজে লাগে না বড় একটা। কর্তা যদি

কখনও সময় পেলেন তো টেলিফোন করলেন, নইলে নয়। তাঁরও অনেক কাজ। আর মাঝে মাঝে দারোগা-পুলিস-পেয়াদার টেলিফোন আসে। যেদিন তারা আসবে তার আগে থেকেই সাবধান করে দেয় পদ্মরাণীকে। বলে—বোতল-টোতলগুলো একটু সরিয়ে রাখবেন, আমরা আসছি—

এই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের সামনেই একদিন এসে হাজির হলো জর্জ টম্‌সন্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড্ অফিসের রিক্রিয়েশান্ ক্লাবের ড্রামাটিক সেক্রেটারি দুলাল সান্যাল। সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারী অমল ঘোষ, আর তার সহকর্মী সঞ্জয়। সঞ্জয় সরকার। সঞ্জয়ের বড় বড় বাবরি চুল। সাজাহানের পার্ট করেছে, আলমগীরে আওরংজেব। মাইথোলজিক্যাল, হিস্টোরিক্যাল, সোশ্যাল—কোনও বইতেই তার নামতে বাকি নেই।

দুলাল সান্যাল একটু দ্বিধা করেছিল। কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনজনেই দল বেঁধে এসেছে। ট্রাম থেকে নেমে ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে আসল পাড়ায় এসে পড়েছে। একটু ভয়-ভয়ও করছে। আবার সংকোচও হচ্ছে। কিন্তু ফিমেল্ রোল্-এ ফিমেল না নিলে যখন চলবে না, তখন অত ভেবে কি লাভ!

অমল বললে—দূর মাইরি, এ কোথায় নিয়ে এলি তুই? এ যে বেশ্যা পাড়া রে—

সঞ্জয় বললে—তাতে কি হয়েছে? আমরা তো সে-জন্যে আসি নি—আমরা আর্টিস্ট্ খুঁজতে এসেছি—

দুলাল সান্যাল গম্ভীর রাশভারি মানুষ। হাতে একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ আছে তার, ভেতরে প্যাড্, কন্‌ট্র্যাক্ট্ ফর্ম নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। কিছু ক্যাশ্ টাকাও এনেছে। যদি অ্যাড্‌ভান্স্ দিতে হয়—

দুলাল সান্যাল বললে—কোন্ বাড়িটা?

সুফল তার দোকানে বসে পাঁটার ঘুগ্‌নি রাঁধছিল। ঝাল, মশলা আর পেঁয়াজ দিয়ে আজ এমন ঘুগ্‌নি বানিয়েছে যে সারা চৌহদ্দি গুলজার হয়ে গেছে সেই গন্ধে। ঘুগ্‌নি নামিয়েই পরোটা ভাজতে শুরু করবে। এ-পাড়ায় যারা রাত্তিরটায় রাঁধে না, তারা সুফলের পরোটা আর চাটা খেয়েই কাটিয়ে দেয়। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের বেশির ভাগ ভাড়াটে রাত্তিরবেলা রাঁধবার সময় পায় না। বাবুদের পয়সায় খাবারটা আদায় করে নেয়।

সুফল রাঁধতে রাঁধতেই বললে—গৌরে, যা তো, ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস

করে আয় তো ডিমের কারি ক'টা লাগবে? আর টগরের ঘরের চাবি খোলা দেখলে আমাকে এসে বলবি—

—হ্যাঁ দাদা, এখানে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট্ কোন্‌দিকে বলতে পারেন?

সুফল ঘাড় ফিরিয়ে দেখাল। কথা বলবার ফুরসুৎও নেই তার। মেঘলা মেঘলা দিন, ভিজে-ভিজে হাওয়া, এই সব দিনেই এ-পাড়ায় বাবুদের ভিড়টা বাড়ে।

—পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট্?

সুফল চেয়ে দেখলে। চেহারা দেখেই বুঝতে পারলে অফিসের বাবুর দল। চাঁদা করে মাইফেল করতে এসেছে।

—এই যে, এই পাশের সদর-দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যান—

তাতেও খুশী হলো না দুলাল সান্যাল। বললে—একটা কথা বলতে পারো ভাই, তুমি তো এখানেই আছো, আমরা একটা দরকারে এসেছি—

—কী দরকার বলুন না?

—এখানে কুন্তি গুহ বলে কোনও অ্যাক্‌ট্রেস্ থাকে? মানে, প্লে-টে করে থিয়েটারে—

কুন্তি গুহ! সুফল সব মেয়েকেই চেনে। বললে—প্লে করে? না মশাই, প্লে তো কেউ করে না, প্লে-করা মেয়ে নেই এখানে, এ তো খারাপ মেয়েমানুষের বাড়ি—

অমল বললে—তা হোক, খারাপ মেয়েমানুষ হলে দোষ কী? আমরা টাকা ফেলবো, পার্ট করে চলে আসবে। ও-নামে কোনও মেয়ে আছে কি না বলুন না—

সুফল বললে—আমি অত জানি না স্যার, আপনারা বরং মাকে জিজ্ঞেস করে আসুন—

—মা?

সুফল বললে—হ্যাঁ, সোজা সদর গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে যান, তার পর উঠোনে গিয়েই দেখবেন দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই পর্দা-ঝোলানো ঘর, সেখানে জিজ্ঞেস করবেন—

সঞ্জয় বললে—দুলালদা, তোমরা না যাও, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি একলা যাচ্ছি—

কিন্তু পায়ে-পায়ে তিনজনেই ঢুকলো। ভেতরে বেশ চক্-মিলানো বাড়ি।

ইট-বাঁধানো উঠোন। মধ্যখানে একটা খাড়াই খুঁটির ওপর ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ ঝুলছে। উঠোনের কোণের দিক থেকে ধোঁয়া আসছে। বোধ হয় রান্নাঘর ওদিকে। কল-পায়খানা-চৌবাচ্চা। একটা বেড়াল পা মুড়ে সেখানে চুপ করে বসে আছে। দোতলাতেও চারিদিকে সার-সার ঘর। কয়েকটা ঘরের দরজা বন্ধ। কোন ঘর থেকে ঘুঙুরের আর হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে। "চাঁদ বলে ও চকোরী বাঁকা চোখে চেয়ো না।" একটা মেয়ে সিঁড়ির ওপরে রেলিং ধরে নিচের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। চোখে চোখ পড়তেই ঝুঁকে পড়লো। বললে—আসুন না—

দুলাল সান্যাল সাবধান করে দিলে—খবরদার অমল, যাস নি—

—কে গা?

রান্নাঘরের দিক থেকে কে একজন বুঝি ঝি-মতন হাতে বাটিতে করে কী নিয়ে এদিকে আসছিল।

—একেই জিজ্ঞেস কর্ অমল—

অমল এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো, কুন্তি গুহ তোমাদের এখানে থাকে?

বিন্দুর লজ্জা-শরমও আছে বলতে হবে। বাঁ হাতে গায়ের কাপড়টা টেনে দিলে। মুখটা আড়াল করে বললে—মাকে জিজ্ঞেস করুন আপনারা—

—বিন্দু, কে লা?

ওপরে থেকে বুঝি শুনতে পেয়েছে পদ্মরাণী। পর্দার ফাঁক দিয়ে সবই দেখা যায় ভেতর থেকে।

বিন্দু ওপরের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললে—এই ভালোমানুষের ছেলেরা এসেছে মা, কাকে খুঁজতে লেগেছে—

তার পর দুলালদের দিকে চেয়ে বললে—আসুন আপনারা, ওপরে আসুন—

নতুন লোকের গলা শুনে ওপরের রেলিঙের ধারে আরো কয়েকটা মেয়ে এসে জুটলো। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। সঞ্জয় একদৃষ্টে সেই দিকে চাইতে চাইতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। বললে—আহা,—অত হেসো না গো, দাঁতে মাছি বসবে—

আর সঙ্গে-সঙ্গে খিল্‌খিল্‌ করে হাসি। একজন বুঝি একটু ওরই মধ্যে দজ্জাল স্বভাবের। বললে—এদিকে আসুন না, মাছি-মারার কল আছে আমাদের কাছে—

দুলাল সান্যালও পেছন পেছন উঠছিল। ধমক দিয়ে উঠলো—এই সঞ্জয়, খবরদার, ইয়ার্কি চলবে না—

ততক্ষণে পদ্মরাণীর ঘর এসে গিয়েছে। বিন্দু ভেতরে ঢুকে পর্দাটা তুলে বললে—এই যে এনারা এয়েচেন মা—

—কী বাবা? কী-রকম চাই তোমাদের? বলতে বলতে খাটের ওপর বসেই গায়ের কাপড়টা টেনে দিলে পদ্মরাণী। বললে—বোস বাবা তোমরা, বিন্দু চেয়ারগুলো টেনে দে বাছা—

দুলাল সান্যাল বসছিল না। অমল কিছু ঠিক করতে পারে নি। সেও দাঁড়িয়ে ছিল। সঞ্জয় কিন্তু বসে পড়েছে। বেশ গোছানো ঘরখানা। খাটের নিচেয় একখানা কাঁসার পিক্‌দানি। ঘরের মধ্যে ধুনোর গন্ধ ভুরভুর করছে। কাচের আলমারি ভর্তি পুতুল। দুধের বাটিটা হাতে নিয়ে পদ্মরাণী জিজ্ঞেস করলে—কাকে চাও বাবা তোমরা? তিনজনেই এক ঘরে বসবে?

সঞ্জয় বললে—আমরা কুন্তি গুহকে চাই। সে প্লে করে—আমরা থিয়েটার করছি কি না—

—থিয়েটার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা আসছি জর্জ-টমসন্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের অফিস থেকে, আমাদের রিক্রিয়েশন ক্লাব থেকে 'যারা একদিন মানুষ ছিল' বইটা প্লে হবে, আমরা হিরোইন্ খুঁজতে এসেছি, কুন্তি গুহ নামে আপনার এখানে একটা মেয়ে আছে শুনেছি, তাকে খুঁজতেই এসেছি—

পদ্মরাণী বললে—কুন্তি নামে কেউ নেই তো বাবা, টগর আছে, বাসন্তী আছে, যূথিকা আছে—মেয়ে আমার অনেক আছে, দেখতে-শুনতেও ভালো, স্বভাব-চরিত্রও ভালো—

সঞ্জয় বললে—কিন্তু তারা কি কখনও প্লে করেছে? তারা কি প্লে করতে পারবে?

—দেখ না তোমরা, তোমাদের দেখতে দোষ কী? ওলো বিন্দু, যা তো বাছা, ওদের সব্বাইকে একবার ডেকে আন্ তো, বল্ যে আপিস থেকে ভালোমানুষ বাবুরা এসেছে—

আর বলতে হলো না। চার-পাঁচটা মেয়ে কিল্‌বিল্ করতে করতে এসে হাজির।

পদ্মরাণী বললে—হ্যাঁ লো, টগর কোথায় গেল? টগর নেই বুঝি ঘরে?

তা টগর না থাকলো না-থাক। বাসন্তী এসেছে, যূথিকা এসেছে, গোলাপী এসেছে, সিন্ধু এসেছে। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের নামকরা রূপসীরা এসে সভা আলো করে দাঁড়ালো। পদ্মরাণীর সামনে কেউ ফষ্টি-নষ্টি করতে পারে না। সবাই জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রইলো। সে এক অস্বস্তিকর আবহাওয়া। দম আটকে আসতে লাগলো দুলাল সান্যালের। পদ্মরাণীর কিন্তু লোক চিনতে ভুল হয় না। পদ্মরাণী বললে—তোমরা কথা বল না বাবা, মেয়েদের সঙ্গে আড়ালে গিয়ে কথা বল না। বড় ভালো মেয়ে আমার সব—আমি বাবা নিজেও সোজা-কথার মানুষ, আমার মেয়েরাও তাই—তাই তো বলি ওদের, বলি আমি গুণ পেলেই কাঁদি, আর নুন পেলেই রাঁধি, আমার মেয়েদের গুণের ঘাট পাবে না বাবা তোমরা—

তার পর একটু থেমে বললে—বল্ না গোলাপী, কথা বল্ না বাছা, ভালোমানুষের ছেলেরা এসেছে আপিস থেকে, প্লে করতে পারবি? ছেলেরা টাকা দেবে, সোনার মেডেল দেবে—কথা বল্ না—

শেষকালে দুলাল সান্যালের দিকে চেয়ে পদ্মরাণী বললে—দেখছো তো বাবা, মেয়েদের দেখছো তো, এমন মেয়ে তোমরা এই সোনাগাছির এ-তল্লাটে খুঁজে পাবে না···তা তার চেয়ে একটা কাজ করো, তুমি বাবা একলাই ওই গোলাপীর ঘরে গিয়ে আড়ালে কথা বলো, দর-দস্তুর করো, বড় লাজুক মেয়ে আমার, আমার সামনে কথা বলতে ওর লজ্জা হচ্ছে—যা না গোলাপী, ছেলেকে তোর ঘরে নিয়ে যা না—যা—

দুলাল সান্যাল বললে—কিন্তু আমরা তো কুন্তি গুহকে খুঁজতে এসেছি—শুনেছি সে প্লে করে ভালো—

বাসন্তী মেয়েটা বললে—তা আমাদের পছন্দ হচ্ছে না আপনাদের?

বলে চোখ ঘুরিয়ে কী-রকম একটা বেঁকা কটাক্ষ করলে।

সঞ্জয় দেখেছিল। সে দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—ঠিক আছে দুলালদা, আমি একটু টেস্ট্ করে দেখি···আপনি প্লে করেছেন কখনও আগে?

বাসন্তী কিছু বলবার আগেই দুলাল সান্যাল বাধা দিলে। বললে—না থাক, দরকার নেই, কুন্তি গুহকে পেলে কাজ হতো আমাদের—

—মা!

এমন সময় বাইরে থেকে গলা পেয়েই পদ্মরাণী বলে উঠলো—ওই তো টগর এসেছে—আয় মা টগর, ভেতরে আয়—

কুন্তি এতগুলো অচেনা লোককে এ-ঘরে দেখবে আশা করে নি। সকলকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো। পদ্মরাণী বললে—এই তো আমার টগর মেয়ে এসেছে, একে তোমাদের পছন্দ হয় বাবা? শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে এও তোমাদের প্লে করতে পারবে—কী রে টগর, বাবুরা থিয়েটারের জন্তে মেয়ে খুঁজছে—পারবি তুই?

কুন্তি ত্বলাল সান্যালের মুখের দিকে চাইলে। এরা তাকে চেনে নাকি? তার পর পদ্মরাণীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমি তো থিয়েটার করতে জানি না মা, আমি থিয়েটার করতে পারি কে বললে?

পদ্মরাণী বললে—বলবে আবার কে বাছা, ওরা কুন্তি বলে কোন্ মেয়েকে খুঁজতে এসেছে, তা আমি বললুম কুন্তি বলে তো কেউ নেই এখেনে, এদের মধ্যে যদি কাউকে পছন্দ হয় তো খুঁজে নাও—

ত্বলাল সান্যাল, অমল ঘোষ—ততক্ষণ ব্যস্ত হয়ে উঠছিল। বললে—আমরা আসলে কুন্তিকে খুঁজতেই এসেছিলুম, কুন্তি গুহ, শুনেছিলুম এখানে থাকে সে, এই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে—

কুন্তির কেমন সন্দেহ হলো। বললে—কে বললে আপনাদের?

—আমাদেরই জানা-শোনা একজন লোক।

কুন্তি আবার জিজ্ঞেস করলে—তাকে আপনারা দেখেছেন?

—তার প্লে দেখেছি, কখনও প্লে করি নি তার সঙ্গে—

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। পদ্মরাণী খাটের পাশ থেকে টেলিফোন তুলে বললে—হ্যালো—

কুন্তি ত্বলাল সান্যালের দিকে ফিরে বললে—না, আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন, কুন্তি বলে এ-ফ্ল্যাটে তো কেউ নেই, এই আমি আছি, আমার নাম টগর, ওর নাম বাসন্তী, ওর নাম যূথিকা, আর ওর নাম গোলাপী—আর যারা আছে তাদের ঘরে লোক আছে—প্লে মশাই আমরা কেউই করতে পারি না, এখানে যারা ফুর্তি করতে আসে, আমরা তাদের নিজের ঘরে বসাই। এখনও বুঝতে পারেন নি, এটা বেশ্যাবাড়ি—

ত্বলাল সান্যাল আর দেরি করলে না। অমলকে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে বাইরে চলে গেল। সঞ্জয় বুঝি তখনও ভেতরে থাকতে চাইছিল। বললে—তা আপনিই করুন না, আপনাকে হলেই আমাদের কাজ চলে যাবে—

বাইরে থেকে দুলাল আবার ডাকলে—এই সঞ্জয়, চলে আয়—

সঞ্জয় আর দাঁড়ালো না। বাইরে থেকেও তখন নিচের উঠোনে অনেক লোকের আওয়াজ কানে এলো। হয়ত বাবুরা আসতে শুরু করেছে। এইবার পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট গুলজার হবার টাইম হলো। এর পর সুফলের দোকান থেকে কাঁকড়ার দাঁড়া ভাজা, পাঁটার ঘুগ্‌নি, আর মোগ্‌লাই পরোটা আসতে আরম্ভ করবে। আর তার পর বৈজুর দোকান থেকে আসতে শুরু করবে বোতল। তার পর রাত আটটা বেজে যাবার পর বোতল আসবে পদ্মরাণীর নিজের ভাঁড়ার থেকে। সে অন্য বোতল। সে বোতলে মালের সঙ্গে অ্যাণ্টি মেশানো থাকবে। সে তুমি যত চাও তত পাবে। রাত-ভর সাপ্লাই করে যেতে পারে পদ্মরাণী। তখন আসবে মালাই-কুলপী, আলু-কাব্‌লী-ফুচকাওয়ালা, তখন আসবে 'চাই বেলফুলের গোড়ে মালা', আর তখন হারমোনিয়াম-তব্‌লার সঙ্গে শুরু হবে 'চাঁদ বলে ও চকোরী বাঁকা চোখে চেয়ো না'।

পদ্মরাণী টেলিফোনটা রেখে দিয়ে মুখ ফেরালো। বাসন্তীরা সবাই চলে গেছে। কুন্তি তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

পদ্মরাণী বললে—কী রে মেয়ে, দু'দিন থেকে তোর খবর নেই, বাবুরা এসে ফিরে যায়, ব্যাপার কি লা? সুফলের তিন টাকা সাড়ে ছ'আনা বাকি ফেলেছিস? কী হলো তোর? বলি ব্যবসা উঠিয়ে দিলি নাকি?

কুন্তি সেই সব কথা বলবার জন্যেই এসেছিল বোধ হয়। বললে—সুফলের দেনা আমি এই এখুনি শোধ করে দিয়ে এলুম—

—আর আমার যে জুলাই মাস থেকে ভাড়া বাকি পড়েছে···

—তাও এনেছি—বলে ব্যাগ থেকে দশটা দশ টাকার নোট পদ্মরাণীর হাতে দিয়ে বললে—এই একশোটা টাকা আজ অনেক কষ্টে এনেছি, এইটে এখন নাও মা, পরে আমি যোগাড় করছি, বাবার খুব অসুখ···

পদ্মরাণী টাকা ক'টা স্টীলের আলমারির ভেতর রাখতে রাখতে বললে—তা ব্যবসার দিকে মন না দিলে কোত্থেকে টাকা আসবে বাছা? টাকা কি গাছের ফল? আর আমার দিকটাও তো দেখতে হয় মা টগর, আমি গরীব মানুষ, আমার দুধটা ঘিটা কোত্থেকে আসে? তার পর আছে বাড়ির ট্যাক্সো! তোরা যদি ভাড়া ফেলে রাখিস তো আমি কোত্থেকে চালাই মা?

আমার কি আর সেই বয়েস আছে যে ঘরে লোক বসাবো এই বুড়ো বয়েসে? তোর ঘরটা এখুনি ছেড়ে দিলে আমি আড়াই শো টাকা ভাড়া পাই। তা আমার যেমন লোকসানের কপাল! তা তোরা তো সেটা দেখলি না। তখন ভাবলুম টগরের বয়েস কম, এখন একটু জমিয়ে বসুক তার পর যখন ক্ষমতা হবে, তখন না-হয় দেবে—তা মা তুমি তো বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার, মায়ের দুঃখুটা তো একবারও বুঝলে না—

কুন্তি অপরাধীর মত নিচু গলায় বললে—বাবার অসুখ বলেই তো…

—তা অসুখ তো আজ হয়েছে, এর আগে কি হয়েছিল? এর আগে মাসের মধ্যে ক'টা দিন ধুনো-গঙ্গাজল দিয়ে দোকান খুলেছ, গুনে বলো তো? ব্যবসা হলো লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মী যদি চঞ্চলা হয় তো কারবার টেঁকে? ভালো ভালো ঘরের ছেলেরা সব আসে এখানে, বলে—টগর কোথায়, টগর কোথায়? আহা, ফুর্তি করতে আসে ছেলেরা, শুকনো মুখে ফিরে যায়। দেখে মায়া হয় মা, ঘরের লক্ষ্মীকে এমন করে পায়ে ঠেলতে নেই, এতে তোমার ভালো হবে না, এই তোমায় আমি বলে রাখলুম। তার চেয়ে তুমি মা আমার ঘরটা ছেড়ে দাও, আমি আড়াই শো টাকায় নতুন মেয়ে বসাই, তোমার নিজের লোকসানও কোর না, আমি গরীব মানুষ, আমারও লোকসান কোর না—

কুন্তি বললে—আমি এবার থেকে আসবো মা ঠিক—

পদ্মরাণী বললে—আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলচি মা, তোমার মা-ও বেঁচে থাকলে তোমাকে এই কথাই বলতো! এই তো গোলাপী! গোলাপীরও নিজের সংসার আছে, নিজের সোয়ামী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, সে কী করে আসে? সে তো কই কামাই করে না? সে তো ঠিক বাড়ির রান্না-বান্না সেরে, ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে এখানে এসে দোকান খোলে, তার পর রাত্তির এগারোটা হোক, বারোটা হোক ঠিক বাড়ি চলে যায়! আমি তো কিছ্ছু বলি না। মাসে-মাসে তোমার মত আমার ভাড়াও ফেলে রাখে না, খদ্দেরও ফেরায় না—

কুন্তি চুপ করে রইল, কিছু বললে না।

পদ্মরাণী দুধের বাটিটাতে চুমুক দিয়ে বলতে লাগলো—আমি কি তোমাকে বলছি যে তোমার বোনকে দেখো না, বুড়ো বাপকেও দেখো না—কেবল এখানে এসে দিনরাত ফুর্তি করো? তা তো বলছি না মা! তুমি হলে গেরস্থ মেয়ে, অভাবে পড়ে এখানে এসেছো, আবার অবস্থা ভাল হলে বিয়ে-থা করে

সংসার করবে! আমি তোমাকে তেমন পরামর্শ দেবো কেন মা? আমি কি পিশেচ? না মা, তেমন বাপ-মায়ের জন্মিত্ নই আমি—

কুন্তি এবার বললে—ক'দিন থেকে বড় ঝঞ্ঝাট চলছে, কী যে করি বুঝতে পারছি না—

পদ্মরাণী কথার মাঝখানেই বলে উঠলো—ঝঞ্ঝাট কার নেই মা? কার ঝঞ্ঝাট নেই? এই ঝঞ্ঝাটের জন্যেই তো মা ভালোমানুষের ছেলেরা এখানে ছুটে আসে, এসে বোতল মুখে ঢেলে দিয়ে দু'দণ্ড শান্তি খোঁজে!

কুন্তি বললে—না, এ অন্য ঝঞ্ঝাট,—আমাদের বাড়ি বোধ হয় ছাড়তে হবে মা এবার—

—কেন, ছাড়তে হবে কেন? ভাড়া দিচ্ছিস না?

কুন্তি বললে—সেই জন্যেই তো যত জ্বালা! বস্তি-বাড়ি তো! দশ টাকা ভাড়া দিচ্ছিলাম, এখন এই ক'বছরে বেড়ে বেড়ে চোদ্দ টাকা করেছে, এখন বলছে বস্তি ভাঙবে নাকি! অথচ ওই ঘরের পেছনে আমি দেড়শো টাকা খরচ করেছি, জানলা ছিল না, জানলা বসিয়েছি, কাল দরোয়ান এসেছিল, বললে —উঠে যেতে হবে। ছ' মাস সময় দিয়েছিল, তার মধ্যেও কেউ উঠে যায় নি, এখন শুনছি গুণ্ডা এনে বস্তি ভেঙে দেবে—

—কে ভাঙবে?

—জমিদার, জমির মালিক। বড়-বড় ফ্ল্যাট-বাড়ি করবে, তাতে অনেক টাকা ভাড়া আসবে—আমি সেই সেখান থেকেই এখন আসছি—

পদ্মরাণী বললে—তা তোর বাবা কী বলে? বাবার চাকরি আছে, না গেছে?

হঠাৎ সুফল ঘরে ঢুকলো। বললে—আজকে ডিমের ঝাল্-কারি করেছিলুম, আনবো নাকি মা এক প্লেট্—

পদ্মরাণী মুখ বেঁকাল।

—তুই একটা আস্ত আহাম্মক, আজ না পূর্ণিমে? পূর্ণিমের দিন আমাকে মাছ-মাংস-ডিম-কাঁকড়া কিছু ছুঁতে দেখেছিস? এই দ্যাখ্ না, দেখছিস্ না গরম দুধ খাচ্ছি—

তার পর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল।

—অ-বিন্দু, বিন্দু কোথায় গেলি বাছা, আমার বাতের তেলটা গরম করে আন্—

তার পর কুন্তির দিকে ফিরে বললে—ক'দিন ধরে মা কী-যে হয়েছে, কোমরে এমন সুলুনি আরম্ভ হয়েছে যে দাঁড়াতে পারছি নে ঠ্যাং-এর ওপর—আর গতর গেল, এবার গতর ধসতে শুরু করলো—

সুফল তখন অন্য ঘরে চলে গেছে। তার সময় নেই। কুন্তিও হয়ত অন্য কথা বলবে বলে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু হঠাৎ আবার টেলিফোনের রিং শুরু হলো। কুন্তি বললে—তা হলে আজ আসি মা—

—তা কাল আসছিস তো?

—হ্যাঁ মা, কাল ঠিক আসবো,—না এলে তো চলবে না—

বলে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পদ্মরাণী টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বললে—হ্যালো—

লম্বা একটা ব্লু-প্রিন্ট্ প্ল্যান্ টেবিলের ওপর ছড়িয়ে বোঝাচ্ছিলেন শিবপ্রসাদবাবু। বললেন—এই দেখ, এদিকটা হলো গিয়ে ক্যালকাটার নর্থওয়েস্ট সাইড, এই জোড়াসাঁকো চিৎপুর এই সব অঞ্চল। এদিকে সিটি আর নড়বে না। যদি কোনও দিন ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট্ হাত দেয় তো সে পরের কথা। আমি এদিকটার কথা ভাবছি না। ইস্ট্-এ এখনও অনেক স্কোপ আছে, এই সি-আই-টি রোড ধরে আশে-পাশে দেখো। এই হলো রেলওয়ে লাইন, এর ওপাশে এই দেখো এ সব জলা-জমি—মার্শি-ল্যাণ্ড্। দেখবে এখানেও একদিন বসতি হবে, একেবারে এই বিদ্যাধরী পর্যন্ত—এই হোল্ এরিয়াটা এতদিন বলতে গেলে ফ্যালো পড়ে ছিল। আমারই প্রথম এদিকে নজরে পড়ে—

সদাব্রত চুপ করে সব শুনছিল।

—যখন পাকিস্তান হলো, সকলেরই তো মাথায় হাত, বুঝলে! রেফিউজীরা এসে জড়ো হচ্ছে শেয়ালদার প্ল্যাটফরমে। তুমি তখন ছোট। শ্যামাপ্রসাদবাবু আর আমি এই সব এরিয়াটায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। পার্টিশান না হলে আমারও ঠিক গ্রেটার ক্যালকাটা সিটিটা ভালো করে দেখা হতো না। ওদিকে বড়বাজারের মারোয়াড়ী কমিউনিটি প্রচুর টাকা দিলে আর গভর্মেণ্ট্ও গাদা-গাদা টাকা ঢালতে লাগলো, এখানকার যত মসজিদ ছিল তাদের মধ্যে অনেকগুলোতে রেফিউজীরা এসে ঘর-সংসার করছে

লাগলো। তাতেও জায়গা হয় না। শেয়ালদার দিকে যত দোকান ছিল মুসলমানদের, সেগুলোতে সব হিন্দুরা এসে ঢুকে পড়লো—

তার পর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—এ-সব তোমার জানা দরকার বলেই বলছি। তুমিও এখন একজন ইণ্ডিয়ান সিটিজেন্, তোমারও ভোট হয়েছে এখন—ইউ শুড্ নো। কিন্তু আজ তোমরা দেখছো কাশ্মীর-ট্রাবল্, বর্ডার-ট্রাবল, কত কী হচ্ছে, এর রুট্‌টা তোমাদের জানা দরকার। পাকিস্তান না হলে এ-সব তো কিছুই হতো না—আর পাকিস্তান না হলে আমার এই ল্যাণ্ড্-স্পেকুলেশন্‌ও ফ্লারিশ্ করতো না—

তার পর শিবপ্রসাদবাবু আরো ঘনিষ্ঠ হলেন। বললেন—ভাবছো, বিজ্‌নেস সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে পলিটিক্স্ নিয়ে এতো ডিস্‌কাসন্ করছি কেন? কিন্তু তুমি তো ইক্‌নমিক্স্ পড়েছো, তুমি জানো রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতি কী ভাবে জড়িয়ে আছে! প্রাইম্ মিনিস্টারের একটা লেক্‌চারেই ক্যালকাটার শেয়ার-মার্কেটের দর কী-রকম ওঠে নামে? আমার এই ল্যাণ্ড্-স্পেকুলেশন্‌ও তাই। পাকিস্তান না হলে আমার এই বিজ্‌নেসও ফ্লারিশ্ করতো না। কিন্তু পাকিস্তানই বা হলো কেন বলো তো?

ছোটবেলা থেকে সদাব্রত বাবার কাছে উপদেশ শুনে এসেছে। আজও যেন সে ছোটই আছে। ছেলেমানুষের মত চুপ করে রইলো সদাব্রত।

—কে পাকিস্তান তৈরি করলো, জানো তুমি?

সদাব্রত কিছু উত্তর দিলে না।

—খবরের কাগজে তুমি অনেক কথা পড়বে। হিস্ট্রির বইতেও অনেক কিছু লেখা থাকবে। সে-কথা বলছি না। আসলে আমি ভেতরের মহলে ছিলুম বলেই সিক্রেটটা জানি। কে পাকিস্তান সৃষ্টি করলো বলো তো? ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট?

সদাব্রত তবু কোনও উত্তর দিলে না।

—না, ব্রিটিশ গভর্মেণ্টও নয়। তা হলে কে? কারা? মহাত্মা গান্ধী? জওহরলাল নেহরু? সর্দার প্যাটেল? মহম্মদ আলি জিন্না? লিয়াকত আলী খাঁ? সুরাবর্দী? না, নাজিমুদ্দীন সাহেব, কে?

শিবপ্রসাদবাবু যেন মীটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছেন।

বলতে লাগলেন—আসলে দায়ী কেউই নয়, দায়ী হিন্দুরাও নয়, মুসলমানরাও নয়—দায়ী হলো…

বলে আরও সামনে ঝুঁকে পড়লেন। গলাটা যেন একটু নিচু করলেন। বললেন—আমি তখন হাই-কম্যাণ্ডের ইনার সার্কেলের মধ্যে ছিলাম, আসল সিক্রেটটা আমি তোমাকে বলি···তোমার জানা দরকার···আসল সিক্রেটটা হলো···

কী সিক্রেট কে জানে। হয়ত কোনও সিক্রেট ছিল, তা আর বলা হলো না, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই বাধা পড়লো। শিবপ্রসাদবাবু রিসিভারটা তুলে বললেন—হ্যালো—

তার পর বলতে লাগলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ডীড্‌স্-টাইড্‌স্ দলিল-পত্র তো সব আমার অফিসেই রয়েছে, লোক্যাল পুলিসকে আমি খবর দিয়ে রাখবো, সে ভার আমি নিলুম, তবে আমার মনে হচ্ছে রেফুজীরা গণ্ডগোল করবে। কিন্তু যখন ডিগ্রী হয়ে গেছে, ইজেক্ট্‌মেণ্ট্ অর্ডার বেরিয়ে গেছে, তখন পজেশান্ পেতে হলে মারপিট ছাড়া উপায় কী? জবর-দখল যখন প্রমাণ হয়ে গেছে···বুঝেছি, আমি পেপার্স নিয়ে আপনার কাছে আমার ছেলেকে পাঠাচ্ছি—হ্যাঁ, আমার ছেলে, তাকে সব কাজ-কর্ম দেখিয়ে রাখছি আর কি! আচ্ছা নমস্কার—

বলে রিসিভারটা রেখে দিয়ে ডাকলেন—বদ্যিনাথ, বড়বাবুকে ডেকে দে—

হিমাংশুবাবু তড়ি-ঘড়ি চলে এলেন ভেতরে। শিবপ্রসাদবাবু বললেন—হিমাংশুবাবু, যাদবপুরের সেই জবর-দখল বস্তিটার সম্বন্ধে যে-সব পেপার্স অফিসে আছে, সেই ফাইলটা দিন তো, সদাব্রত ওগুলো নিয়ে একবার গোলকবাবুর কাছে যাবে—

হিমাংশুবাবু চলে গেলেন। শিবপ্রসাদবাবু বললেন—তোমার হাত দিয়েই পাঠাচ্ছি কারণ তোমারও কিছু জানা দরকার, আমাদের ফার্মের অ্যাড্‌ভোকেট গোলকবাবু, গোলকবিহারী সরকার। তাঁর সঙ্গে দেখাও হবে, আলাপ-পরিচয় হবে—আর যাদবপুরের বস্তিটাও একদিন তোমায় দেখিয়ে নিয়ে আসবো। সব রেফুজীরা সে-জমির ওপর ঘর বানিয়ে মৌরসীপাট্টা করে ফেলেছে,—ধরো এখন যদি বেচেও দিই ও-প্লট তো অনেক দাম পাবো! কিছু না, শুধু সস্তা-ভাড়ার ফ্ল্যাট্-বাড়িও যদি তৈরী করে দিই তাতেও আমার মাসে ফেলে ছড়িয়ে ফিফ্‌টি থেকে সিক্স্‌টি পার্সেণ্ট্ প্রফিট্ আসে—তাই তো তোমাকে একটু আগেই বলছিলাম পাকিস্তান হয়ে আমার তো কোনও লোকসানই হয় নি। তুমিই বলো না, পাকিস্তান না হলে কি রেফুজীরা আসতো? আর

রেফুজীরা এখানে না এলে কি ল্যাণ্ডের এই দর উঠতো? তুমিই বলো না—এ তো এক পক্ষে ভালোই হয়েছে—

হিমাংশুবাবু আবার ঘরে ঢুকে পেপারগুলো দিয়ে গেলেন। শিবপ্রসাদবাবু সেগুলো নিয়ে দেখে সদাব্রতকে দিলেন। বললেন—এই নাও, আর গোলকবাবুর বাড়ি আহিরীটোলা লেনে। আহিরীটোলা লেন, চেনো তো? আর না চিনলেও কুঞ্জ চেনে। কুঞ্জই তোমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবে—যাও—কিছু বলতে হবে না, শুধু কাগজগুলো দিলেই তিনি সব বুঝতে পারবেন—

আহিরীটোলা! কথাটা কানে যেতেই হঠাৎ কেমন চমকে উঠলো সদাব্রত!

সামলে নিয়ে উঠলো চেয়ার ছেড়ে। বললে—আচ্ছা—

কুঞ্জ ঠিক জায়গাতেই নিয়ে গিয়েছিল। অনেকবার সে বাবুকে নিয়ে এসেছে উকীলবাবুর কাছে। তার চেনা বাড়ি। বিকেলবেলা চিৎপুর রোডে ট্রাফিকের ভিড়টা বেশি। রাস্তাটা সরু। তারই মধ্যে আবার ট্রাম। এক-একবার অনেকক্ষণ গাড়ি আটকে থাকে। তবু কুঞ্জ পাকা ড্রাইভার। মেজাজও কখনও গরম করে না। সামনের গাড়িকে পাশ-কাটিয়ে এগিয়ে যাবারও চেষ্টা করে না। বেশ মাথা ঠাণ্ডা রেখে গাড়ি চালাচ্ছিল সে।

—আচ্ছা কুঞ্জ···

সদাব্রত পেছনের সীটেই বসে ছিল। কিন্তু আর যেন থাকতে পারলে না। কুঞ্জ গাড়ি চালাতে-চালাতেই একবার এক মুহূর্তের জন্যে পেছন ফিরলো। সদাব্রত জিজ্ঞেস করে ফেললে—আহিরীটোলা সেকেণ্ড-বাই লেনটা চেনো?

কুঞ্জ সব চেনে। ড্রাইভ্ করে করে ঘুণ হয়ে গেছে সে। বললে—চিনি দাদাবাবু—

—আগে উকীলবাবুর বাড়িটা পড়বে, না সেকেণ্ড-বাই লেনটা পড়বে?

কুঞ্জ বললে—সেকেণ্ড-বাই লেনটা পাশে পড়বে, কিন্তু সেখানে গলির ভেতরে তো গাড়ি ঢুকবে না—

সদাব্রত বললে—আগে তুমি সেখানেই চলো, আমার এক মিনিটের বেশি

লাগবে না, তুমি গলির বাইরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখো, আমি হেঁটেই ভেতরে একবার গিয়ে কাজটা সেরে আসবো—

সত্যিই বেশিক্ষণ সময় লাগবার কী-ই বা আছে! এমন তো কিছু কাজও নেই তার সঙ্গে। আর তা ছাড়া থিয়েটার করা মেয়ে যখন, তখন বাইরের লোকের যাতায়াতও আছে নিশ্চয়ই। তবু মেয়েটা বলেছিল—যাবার মত বাড়ি সেটা নয়। হয়ত ভাঙা বাড়ির একতলায় দু'খানা কি একখানা ঘর নিয়ে থাকে। তাতে আর লজ্জার কী আছে। অথচ আত্মীয়দের মধ্যে কিছু কিছু বড়লোকও তো আছে। সেদিন রাত্রে ট্যাক্সি থেকে নেমে যে-বাড়িটার পোর্টিকোর মধ্যে ঢুকলো সেটা তো বড়লোকের বাড়ি বলেই মনে হলো। তাদের নিজের বাড়ি না-হলেও, সে-বাড়ির ভাড়াটেও যদি হয়, তা-ও কম নয়। আড়াই শো টাকা অন্তত ভাড়া দিতে হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু নিজেরাই বা কেন গরীব এত? সেদিন অনেক কথা শুনিয়েছিল মেয়েটা। কমিউনিস্টদের ওপর রাগ, বড়লোকদের ওপরেও রাগ। আশ্চর্য! কলকাতায় কত রকম অদ্ভুত চরিত্রের মানুষই আছে!

—এই সেকেণ্ড-বাই লেন দাদাবাবু, এর ভেতরে গাড়ি ঢুকবে না।

সদাব্রত বাইরে নেমে চেয়ে দেখলে গলিটার দিকে। সরু ঘিঞ্জি ড্যাম্প্ আবহাওয়া। এই বিকেলবেলাতেই যেন সন্ধ্যে নেমেছে এখানে। দু'পাশে বালি-খসা নোনা-ইট বার করা বাড়ির দেয়াল। একটা ঘেয়ো কুকুর। ডাস্ট্‌বিন। নর্দমা দিয়ে ছড়ছড় করে পাশের বাড়ির পায়খানার জল পড়ছে। পেছনেই একটা চামড়ার স্যুটকেসের কারখানা। স্যাকরার দোকান।

সদাব্রত পকেট থেকে নোট-বইটা বার করলে। মুখস্থই আছে ঠিকানাটা। তবু একবার মিলিয়ে নেওয়া ভালো। বত্রিশের-বি আহিরীটোলা সেকেণ্ড্ বাই লেন।

দেয়ালের গায়ে আঁটা বাড়ির নম্বরগুলো লক্ষ্য করতে করতে সদাব্রত গলির ভেতরে এগিয়ে চললো।

বত্রিশের-বি, আহিরিটোলা সেকেণ্ড বাই লেন। এতদিন পরে হঠাৎ সদাব্রতকে দেখে মেয়েটা হয়ত অবাক হয়ে যাবে। তা হোক, তবু দেখতে হবে কী রকম অবস্থায় থাকে ওরা। দেখতে হবে কী-রকম অবস্থায় থাকলে ওই রকম মনোবৃত্তি হয় মানুষের। দেখাই যাক্ না। দেখতে তো কিছু দোষ নেই।

এক-এক করে বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে শেষকালে পাওয়া গেল। নোনা ইঁটের বালি-খসা একটা দোতলা পুরনো বাড়ি।

সদাব্রত সামনে একজন লোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, এ-বাড়িতে কুন্তি বলে একজন মহিলা থাকেন ?

—কুন্তি ? এই বাড়িতে ? এটা তো মেস। মেস-বাড়ি।

—মেস-বাড়ি ?

খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেল সদাব্রত। কুন্তি তবে মেসে থাকে নাকি ?

আবার জিজ্ঞেস করলে—এটা কি তাহলে মেয়েদের মেস ?

লোকটা বললে—না মশাই, এটা বেটাছেলেদের মেস, এখানে মেয়েমানুষ-টানুষ কেউ থাকে না—

বলেই লোকটা একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগলো।

সদাব্রত আর দাঁড়ালো না সেখানে। দাঁড়িয়ে থাকতেও ঘেন্না হলো তার। যে-রাস্তা দিয়ে সে এসেছিল সেই রাস্তা দিয়েই আবার বড় রাস্তার দিকে হন্-হন্ করে ফিরে চললো।

হিমাংশুবাবু ষোল বছর ধরে এই 'ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট্ সিণ্ডিকেট'-এ কাজ করছেন। একবার নকশা দেখলেই আঁচ করতে পারেন জমির ঢাল কেমন, জমিতে জল জমে কি না। নাবাল জমি না ভিটে। এটা হিমাংশুবাবুকে কেউ শিখিয়ে দেয় নি। করতেন আগে উকিলের মুহুরীগিরি। অফিস শুরু করবার সময় শিবপ্রসাদবাবু সেখান থেকেই তুলে নিয়ে এসেছিলেন এই অফিসে। তখন অফিস ছোট ছিল। এত ক্লার্ক আসে নি। ওই হিমাংশুবাবুই সবে-ধন নীলমণি। শিবপ্রসাদবাবু আর কতটুকুই-বা অফিসে থাকবার সময় পেতেন। তখন তো ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্ট সবে চলে যাচ্ছে, চারদিকে অব্যবস্থা। শ্যামাপ্রসাদবাবু মিনিস্টার হয়ে গেলেন সেণ্টারে। বন্ধু-বান্ধব সবাই মিনিস্টার, নয় তো পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি। তখন সবাই ভেবেছিল শিবপ্রসাদবাবুও একজন মিনিস্টার হয়ে যাবেন বোধ হয়। হয় মিনিস্টার, নয় তো স্টেট-মিনিস্টার, নয় তো ডেপুটি। ঘন-ঘন দিল্লীতে যাচ্ছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হন নি। হয়ত ভেবেছিলেন মিনিস্টার হয়ে কী-ই বা হবে! সঙ্গে পাগড়ি-পড়া চাপরাসী ঘুরে বেড়াবে, গাড়ি পাবেন, মোটা মাইনেও হয়ত পাবেন। বাড়ির গেটের সামনে হয়ত দিনরাত লালপাগ্‌ড়ি পুলিসও পাহারা দেবে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এমনিতে তো হাতে মিনিস্টাররা রইলই। কংগ্রেস পার্টিও হাতে রইলো। সুবিধে যা করে নেবার তা ভেতর থেকে হবেই। তা হলে আর গায়ে ছাপ মেরে দরকার কী! তাই ভাবলেন কিং হওয়ার চেয়ে কিং-মেকার হওয়া ভাল। তিনি তাই-ই হলেন। এদিকে অফিস দেখতে লাগলেন হিমাংশুবাবু।

তা লোকটি ভাল বেছেছিলেন শিবপ্রসাদবাবু।

অনেস্ট্‌, কর্মঠ হিসেবী। তিনটে গুণই ছিল হিমাংশুবাবুর। শিবপ্রসাদবাবু দিল্লী গিয়েছিলেন। হিমাংশুবাবুই কাজগুলো বুঝিয়ে দিতেন সদাব্রতকে।

হিমাংশুবাবু বলতেন—এই পুরোনো ফাইলগুলো পড়ে দেখুন আপনি—

একগাদা ফাইল দিয়ে গিয়েছিলেন টেবিলের ওপর। বাবা নেই। পরদিন থেকেই সদাব্রত ঠিক সময়ে এসে হাজির হতো অফিসে। কর্তাব্যক্তি বলতে একা সদাব্রত। প্রথম-প্রথম বাবার চেয়ারে বসতে কেমন আশ্চর্য লাগতো সদাব্রতর। নেতাজী সুভাষ রোডের বিরাট একটা বাড়ির তিনতলার একটা ফ্ল্যাট। জানালা দিয়ে ঝুঁকে দেখলে দেখা যায় নিচে সার-সার গাড়ি আর পিঁপড়ের মতো সার-সার মানুষ চলেছে। ঠিক দেয়ালের গায়ে যেমন কালো-কালো পিঁপড়েরা সার বেঁধে মরা পোকা খেতে যায়। আর মাথার ওপরে এই মরা-ফাইলের স্তূপ আর গোল করে পাকানো ব্লু-প্রিন্ট! চারদিক ঘষা-কাচ দিয়ে ঘেরা ঘর। দেয়ালের গায়ে বহু বাঁধানো ফটো। গান্ধীজী পা মুড়ে বসে আছেন, জওহরলাল নেহরু মাইক্রোফোনের সামনে হাত মুঠো করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। শিবপ্রসাদবাবুর পাশে ডাক্তার বিধান রায়, কোনওটাতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে।

চারদিকের ফটোগুলো দেখতে দেখতে সদাব্রত কেমন যেন হয়ে যেত। যেন ভেতরে ভেতরে একটা প্রচ্ছন্ন গৌরব বা গর্ববোধ জেগে ওঠে মনে। সেও তো এই সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী। হয়ত সে এ-বংশের ছেলে নয়। কিন্তু উত্তরাধিকারী তো সে-ই। এর গৌরবটুকুরও উত্তরাধিকারী, আবার এর ঐশ্বর্যটুকুরও ভাগীদার। সে যেন কাঠের পুতুল। কেউ যেন সেই পুতুলকে এখানে বসিয়ে গেছে কাজ চালাবার অজুহাতে।

একটা ফাইল নিয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যায় সদাব্রত। জমি কেনা থেকে শুরু করে বেচা পর্যন্ত। কিছুই সে বুঝতে পারে না। আর একটা ফাইল টেনে নেয়, সেটাও বোঝা যায় না। করেসপণ্ডেন্সের ক্রস-ওয়ার্ড-পাজল্। এই জটিল করেসপণ্ডেন্স্ আর ব্লু-প্রিণ্ট্ মন্থন করেই তাদের জীবনের অমৃত উঠে আসে। সে-অমৃত ব্যাঙ্কে গিয়ে মধুচক্র সৃষ্টি করে।

সেদিন আর থাকতে পারলে না সদাব্রত। জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা হিমাংশু-বাবু, আমাদের ইয়ার্লি ইনকাম কত?

—কিসের ইনকাম?

—এই ফার্মের? মানে, এই ফার্ম থেকে বাবা মাসে-মাসে কত ড্র করেন।

হিমাংশুবাবু ঠিক এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন আশা করতে পারেন নি। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমাদের তো ব্যালেন্স-শীট আছে, আমাদের ব্যালেন্স-শীট সাব্‌মিট করতে হয় জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রারের কাছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, নিয়ে আসছি—

সদাব্রত বললে—না না, আপনাকে নিয়ে আসতে হবে না—আমি শুধু এমনি জানতে চাইছি, বাবার ইনকাম এই বিজ্‌নেস থেকে অ্যাপ্রক্সিমেট্‌লি কত? আপনি তো সবই জানেন।

হিমাংশুবাবু যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন—শিবপ্রসাদবাবুই তো ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এই কোম্পানীর, উনি ডিভিডেণ্ড পান ওঁর শেয়ারের আর একটা অ্যালাউয়েন্স আছে, মাসে সাড়ে চার শো টাকার মতন।

—সাড়ে চার শো টাকা!

সদাব্রত মুখে কিছু প্রকাশ করলে না। মাত্র সাড়ে চার শো টাকা! এত কম টাকা বাবার ইনকাম? ওই তাদের বাড়ি, এই গাড়ি, এই ড্রাইভার, চাকর-বাকর, ঝি-ঠাকুর, সব সাড়ে চার শো টাকার ওপরে নির্ভরশীল। কিন্তু কুঞ্জই মাইনে পায় তো আশি টাকা। তার ওপর আছে আরো কত খরচ। তার নিজের কলেজের মাইনে ছিল এতদিন, টিউটরের মাইনে। তার পর তার নিজের বই কেনার খরচ। সদাব্রত নিজেই তো কত টাকার বই কিনেছে তার ঠিক নেই। যখন যা সে চেয়েছে তাই-ই পেয়েছে। তার নিজের গাড়িটা পুরনো হলেও তারও তো খরচ আছে একটা?

হিমাংশুবাবু বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন সদাব্রতর মনের কথাগুলো। বললেন—আমাদের ফার্ম তো ততো রিচ্ নয়, তেমন প্রফিট্ আজকাল হচ্ছে

কোথায় আর? এখন তো অনেকগুলো ল্যাণ্ড-স্পেকুলেশন অফিস হয়েছে, এখন অনেক রাইভ্যাল কোম্পানি হয়েছে, সেই আগেকার মত প্রফিট এখন আর নেই—

সদাব্রত উত্তরে শুধু বললে—ও—

—সেই জন্যেই তো আমাদের স্টাফের মাইনেও বাড়াতে পারছি না।

—ক্লার্কদের কত করে দেওয়া হয়?

হিমাংশুবাবু বললেন—যা দেওয়া উচিত তা তো দিতে পারছি না। ওই যে নন্দী ছেলেটা কাজ করছে, আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল, ওকে এখনও সত্তর টাকার বেশি দিতে পারছি না—

—কিন্তু সত্তর টাকায় ওঁর চলে? আমাদের ড্রাইভার কুঞ্জও তো পায় আশি টাকা!

হিমাংশুবাবু বললেন—শিবপ্রসাদবাবু তো তাই প্রায়ই দুঃখ করেন। বলেন, পেট ভরে এদের খেতে দেবো এমন অবস্থাও আমার নেই। উনি ভারি কষ্ট পান মনে-মনে, তাই আর কেউ কিছু বলে না! শিবপ্রসাদবাবু মনে-মনে যে কত কষ্ট পান তা আমিই একলা বুঝতে পারি।

—আপনি নিজে কত পান?

—আমার কথা ছেড়ে দিন। আমার বিপদের সময়ে উনি যে সাহায্য করেছিলেন তা জীবনে ভুলবো না। মাইনে না-পেলেও আমি এ-অফিস ছেড়ে যেতে পারবো না। আমি দেড় শো টাকা নিই বটে, কিন্তু তাও নিতে আমার হাত কর-কর করে—

—আর ডিভিডেণ্ড্?

সদাব্রত বাবার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যেন নিষিদ্ধ এলাকায় অন্যায় প্রবেশাধিকার চাইছে। বললে—এত কথা জিজ্ঞেস করছি বলে আপনি কিছু মনে করবেন না হিমাংশুবাবু! আমার বাবা আমাকে ক'দিন থেকে সব কিছু জেনে নিতে বলছিলেন।

হিমাংশুবাবু বললেন—না না, সে কি কথা? আপনি সব কিছু জানবেন বৈ কি! আমাকেও তো বলে গেছেন আপনি যা কিছু জানতে চাইবেন সব জানাতে। আসলে আপনাকে বলি, কোম্পানি খুব ভাল চলছে না। অর্থাৎ, যতো ভাল চলা উচিত ছিল ততো ভাল চলছে না।

সদাব্রত হঠাৎ কথার মাঝখানে বললে—আচ্ছা দেখুন, সেদিন জয়পুর থেকে

একজন টেলিফোনে ট্রাঙ্ককল্ করছিল, সুন্দরিয়া বাঈ, না কী তার নাম—সে কে? সুন্দরিয়া বাঈ কে জানেন আপনি?

—সুন্দরিয়া বাঈ?

হিমাংশুবাবু ভাবলেন খানিকক্ষণ। তার পর বললেন—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। কেন? কী বলছিলেন তিনি?

—না, কিছু বলেন নি। বাবাকে খুঁজছিলেন, আমি বললাম তিনি দিল্লী গেছেন—

হিমাংশুবাবু বললেন—ও, বুঝেছি, তা হলে বোধ হয় পার্ক-স্ট্রীটের একটা প্রপার্টি আছে, সেই নিয়ে কথা বলতে চায়, আমি ঠিক জানি না। অনেক ইংরেজ চলে গেছে তো, এখন মারোয়াড়ীরা কিনে নিচ্ছে সমস্ত—

সদাব্রত বললে—আচ্ছা আপনি যান, আমি ফাইলগুলো পড়ে দেখছি—

বলেই হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বললে—আর একটা কথা হিমাংশুবাবু, সেই বস্তিটার ব্যাপার কী হলো? সেই যে আমি সেদিন সব পেপার্স নিয়ে গোলকবাবুর কাছে গিয়েছিলুম? শেষ পর্যন্ত তার কী হলো?

হিমাংশুবাবু বললেন—সে তো সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—

—কী বন্দোবস্ত?

—উকীলের কাজ উকীলে করেছে। তিনি পেপার্স-টেপার্স সব দেখে দিয়েছেন। আমাদের দিক থেকে কোনও ফ্ল নেই, এখন বাকি শুধু দখল করা—

—দখল করা মানে?

হিমাংশুবাবু বললেন—এই সব উদ্বাস্তুরা এখানে এসে উঠেছে তো। কার জমি তার ঠিক নেই, জমিতে এসে উঠে একেবারে ঘর-বাড়ি তৈরি করে ফেলেছে। অথচ দেখুন, তারাই গভর্ণমেণ্ট থেকে হাজার-হাজার টাকা লোন্ পেয়েছে, জামা-কাপড়ের দোকান করেছে, বেশ মজা করে খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে! পাকিস্তান থেকে যারা এসেছে তাদের জ্বালায় বাসে-ট্রামে তো আর জায়গা পাবার উপায় নেই, আপনি তো দেখেছেন! যেন এটা এদেরই দেশ একেবারে! আমাদের একেবারে মানুষ বলেই মনে করে না—

—তা না করুক, এখন কি মামলা করে এদের ওঠাবেন?

হিমাংশুবাবু এবার হাসলেন, বললেন—না না, মামলা করলে কি আর ওঠে! যেখানে বসেছে সেখান থেকে ওঠানো ওদের শক্ত! আর গভর্ণমেণ্ট তো কিছু বলতে সাহস করবে না ওদের!

—কেন ? গভর্ণমেণ্ট ভয় করে নাকি ওদের !

—তা করে না ? ওদেরও তো ভোট আছে, সামনে ভোট আসছে তো তাই ওদের চটাতে সাহস করবে না। কমিউনিস্ট পার্টিরা তো ওদের ব্যাকিং নিয়েই ভোটে দাঁড়াতে চাইছে কিনা। গভর্ণমেণ্ট-আদালত করলে কিছুই হবে না—

—তা হলে কী করে ওদের সরাবেন ?

—মেরে! রাতারাতি কাজ সেরে ফেলতে হবে, নইলে ওদের পেছনে তো কমিউনিস্ট্ পার্টি আছে! যদি একটা রায়ট বেধে যায় তো ক্রিমিন্যাল কেস-এ ফেঁসে যাবো যে আমরা! তাই ও-সব ঝামেলার মধ্যে যাবো না। আমাদের সব অ্যারেঞ্জ্মেণ্ট করা আছে, একদিন মিড-নাইটে গিয়ে সব ঝুপড়ি-ঘর ভেঙে দিয়ে দখল করে নেবো।

সদাব্রত বললে—কিন্তু ওরা যাবে কোথায় ?

—সে ওরা বুঝবে। এরকম করে আমরা রিজেণ্ট পার্কে দশ বিঘে জমি রিক্লেম করে নিয়েছি। আর আমাদের এ-পাড়ার একজন বিজ্নেসম্যান, তাঁরও ওইরকম কয়েক কাঠা জমি উদ্বাস্তুরা দখল করে রেখেছিল, তিনি ভালোমানুষি করে মামলা করতে গিয়েছিলেন, আজ সাত বছর হলো সেই মামলাও চলছে গাঁটের টাকাও খরচ হচ্ছে, অথচ এখনও কোনও ফয়সালা হলো না। আমি শিবপ্রসাদবাবুকে তাই বলেছি ওদের মেরে না তাড়ালে ওরা যাবে না, দু'চারটের মাথা না ফাটালে ওদের উচিত শিক্ষা হবে না—

সেদিন সেই রাত্রে ট্যাক্সি নিয়ে টালিগঞ্জের দিকে গিয়ে উদ্বাস্তুদের ঘরগুলো দেখেছিল সদাব্রত। সেই কথাগুলোও মনে পড়লো। বড় রাস্তার ধারে ধারে ভাল-ভাল জমিতে সব ছেঁড়া চট, ভাঙা বাঁশ, রাণীগঞ্জের টালি দিয়ে ঘর তৈরি করেছে। সদাব্রত সেই অফিসের চেয়ারে বসেই যেন বস্তিটার চেহারা কল্পনা করে নিতে পারলে। হিমাংশুবাবুর মত বড়বাবু আছে বলেই হয়ত ল্যাণ্ড্ ডেভেলপমেণ্ট সিণ্ডিকেট চলছে। সব অফিসেই বোধ হয় এক একজন হিমাংশুবাবু থাকে। তাদের কাছে অফিসটাই জীবন। অফিসের ছোটখাটো খুঁটিনাটি থেকে বড় বড় বাজেট ব্যালেন্স-শীট পর্যন্ত সব যাদের মুখস্থ। ক'দিনের মধ্যেই সদাব্রত আবিষ্কার করে ফেলেছিল যে হিমাংশুবাবু নিজেই যেন একটা ফাইল। অসংখ্য ধুলো-জমা কাগজের মধ্যে আর একটা মৃত কাগজ।

হিমাংশুবাবু অফিসে এসেই নিজের চেয়ার-টেবিল ডাস্টার দিয়ে পরিষ্কার

সদাব্রত বললে—তা আপনার নিজেরই বা কী করে চলে ওই মাইনেতে?

হিমাংশুবাবু বললেন—ওটা অভ্যেসের ব্যাপার, খরচ বাড়ালেই বাড়ে। তখন মনে হয় গাড়ি না-হলে চলবে না, রেফ্রিজারেটার না হলে চলবে না, এয়ার-কন্ডিশান্ ঘর না-হলে চলবে না। এই শিবপ্রসাদবাবুই কি বাড়ি করতে চেয়েছিলেন, না গাড়ি করতে চেয়েছিলেন? আমিই তো বলে বলে করালাম। বললাম—আমরা গরীব হয়ে জন্মেছি, আমরা গরীব হয়েই মরবো, কিন্তু আপনাকে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে হয়, মিনিস্টারদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়, আপনি গাড়ি কিনুন। আমিই তো বলে-বলে মত করালুম। উনি আবার গীতা পড়েন তো, আসলে আমি তো জানি, বাইরে থেকে মানুষটিকে যেমন দেখি ভেতরে তা নন উনি! ওই গীতার কথাগুলোই পালন করতে চান কেবল নিজের জীবনে। জীবনে টাকার ওপরে তো কোনও লোভ নেই ওঁর। লোভ থাকলে আজ আমাদের কোম্পানির এই দশা! এ কোম্পানি আমি, এই আমি নিজে, সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে পারতুম।—তার ওপরে আগে যা-কিছু উনি উপায় করেছেন সবই তো দান করে দিয়েছেন—

সদাব্রত আরো অবাক হয়ে গেল।

—আপনি আবার যেন ওঁকে এ-সব কথা বলবেন না। কেউ জানে না সে-সব। উনি আবার নিজের দানের কথা ঢাক পেটাতে চান না অন্য লোকদের মত। এই যে উদ্বাস্তুরা দেখছেন। এদের জন্যে উনি কম করেছেন! উনি তো দান করেই ফতুর।

হঠাৎ একটা ট্রাঙ্ক কল্ আসতেই বাধা পড়লো। হিমাংশুবাবু টেলিফোনটা নিয়ে বললেন—হ্যালো……না—তিনি নেই—বলে ফোন্টা ছেড়ে দিলেন।

সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—কে ফোন্ করছিল? কোত্থেকে?

হিমাংশুবাবুর বললেন—ও জয়পুর থেকে, আমি বলে দিলুম তিনি নেই—

সদাব্রত অবাক হয়ে গেল।

—জয়পুর থেকে? সেই সেবার একজন করেছিল—সুন্দরিয়া বাঈ না কি?

হিমাংশুবাবু বললেন—তা জানি না এ কে। নাম বললে না—

সেদিন টেলিফোন তুললেই ওধার থেকে কে বললে—সদাব্রত গুপ্ত আছে অফিসে ?

—আমি সদাব্রত কথা বলছি।

—আমি শম্ভু। অফিস থেকে বলছি। আমি সেই খবরটা যোগাড় করেছি রে, দুলালদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—কী বললে ?

শম্ভু বললে—টেলিফোনে সব বলা যাবে না। আমাদের অফিসে টেলিফোন করার নিয়ম নেই, আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে করছি, আজকে আমার বাড়িতে দেখা করিস, আমি ছেড়ে দিলুম—

বলে তাড়াতাড়ি লাইনটা কেটে দিলে শম্ভু। আর কিছু শোনা গেল না। হাতের ফাইলটা রেখে দিলে সদাব্রত। আর যেন কিছুই ভাল লাগলো না। হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেল সব। প্রত্যেক দিন অফিসে আসা আর অফিস থেকে যাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল। প্রত্যেক দিন সেই কুঞ্জ এসে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর সদাব্রত উঠে চলে আসতো এখানে। সেই এক বাঁধা রাস্তা আর সেই এক মুখ। অনেক দিন কোথাও বেরোতে পারে নি। মা কোথাও যেতে দেয় না। মা বলে দিয়েছিল অফিস থেকে সোজা বাড়ি আসতে। তিনি নেই, খোকা যেন বাড়ি ফিরতে দেরি না করে। অথচ বাবা কোথায়-কোথায় চলে যান, তাঁর কোনও ব্যাপারে ঠিক নেই কিছু। তাঁকে মা বাঁধতে পারে নি, সদাব্রতকে তাই হয়ত গোড়া থেকেই কাছছাড়া করে নি। মাঝে-মাঝে অফিসেও টেলিফোন করে মা।

মা বলে—হ্যাঁ রে টিফিন্ খেয়েছিস্ ?

সদাব্রত বলে—হ্যাঁ খেয়েছি মা।

—খেতে ভালো লেগেছে ? জয়নগরের মোয়া দিয়েছিলুম দু'টো, ফেলে দিস নি তো ?

সদাব্রতর রাগ হয়ে যায়। ছোট ছেলে নাকি সে যে মোয়া খাবে। বলে—আমি তো বলেছিলুম খাবো, তবে আবার টেলিফোন করলে কেন ?

—তোকে মনে করিয়ে দিচ্ছি শুধু, তুই যা ভুলো ছেলে!

—না, আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না, আর তা ছাড়া তুমি এত খাবার পাঠাও, আমার লজ্জা করে খেতে!

—কেন লজ্জা করবে কেন? খাটা-খাটুনি হচ্ছে, না খেলে শরীর টিঁকবে কেন?

সদাব্রত বলে—তুমি কিছু বোঝ না, আমার কিছু্ কাজ নেই, আমি শুধু চুপ করে বসে থাকি, আর তা ছাড়া অফিসের কোনও ক্লার্ক খায় না, আর বিদ্যিনাথ প্লেটগুলো ধুতে নিয়ে গেলে সেখানে সবাই দেখতে পায় আমি কী খাচ্ছি-না-খাচ্ছি—

মা-ও বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারে না। বলে—তা তারা গরীব লোক কী আবার খাবে? তাদের সঙ্গে তুই?

সদাব্রত আর কথা বাড়ায় না। মার সঙ্গে কথা বলে মিছিমিছি মুখ নষ্ট করা। তাড়াতাড়ি দু-একটা কথা বলেই রিসিভারটা রেখে দেয়। এমনি প্রায় রোজ। বাড়িতে গিয়েও মাকে কতদিন বুঝিয়ে বলেছে। আর সকলে যখন খেতে পাচ্ছে না, তখন তার খাওয়াটা যে খারাপ দেখায় সেটা মাকে বুঝিয়ে ওঠাতে পারে না। অথচ সেদিনও ফুড্-মিছিলের ওপর গুলি চললো, কত লোক ধরা পড়লো, কত লোক মারা গেল, আবার কত লোক হাসপাতালে রয়েছে এখনও।

—শম্ভু!

অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে না গিয়ে একেবারে বৌবাজারে গিয়ে হাজির হয়েছিল সদাব্রত। মধু গুপ্ত লেনের চেনা বাড়ি।

অনেকদিন পর এখানে আসতেই আবার যেন বড় ভালো লাগতে লাগলো। শম্ভুদের বাইরের ঘরে হয়ত ছোট ভাই-বোনেদের মাস্টার পড়াচ্ছে। পড়ানোর শব্দ আসছে ভেতর থেকে।

কিন্তু শম্ভু বোধ হয় তৈরীই ছিল। একেবারে জামা-কাপড় পরে এসে হাজির। বললে—এসেছিস? চল্—

তার পর বাইরে গাড়ি দেখে বললে—গাড়ি এনেছিস্ আজ?

সদাব্রত বললে—অফিস থেকেই সোজা আসছি তো! বাবা নেই কলকাতায়···তার পর কী খবর বল্?

শম্ভু বললে—আরে সে-সব বাজে কথা!

—বাজে কথা ?

—হ্যাঁ, দুলালদা নিজে আমাকে বলেছে। বলেছে ঠাট্টা করে বলেছিল ও-কথা। আমি বললাম ঠাট্টা করে ও-কথা বলতে গেলেই বা কেন তুমি ? দুলালদা তো ওই রকমই লোক। সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করে। আমি তখনই তোকে বলেছিলুম রসিকতা করেছে। তুই মিছিমিছি এই ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস—চল্ ক্লাবে চল্, বাড়িতে মাস্টার এসেছে, বসবার জায়গা নেই—চল্—আজ দুলালদাকেও আসতে বলেছি, মুখোমুখি তার কাছ থেকে শুনবি—

সদাব্রত বললে—না থাক্, এ রকম সীরিয়াস ব্যাপার নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে ?

—আমিও তো তাই বললাম। বললাম—ঠাট্টা করবার তো একটা সীমা আছে—

সদাব্রতকে টানতে টানতে একেবারে গলির মোড়ে ক্লাবের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল শম্ভু। ভেতরে ঢুকতে গিয়েও সদাব্রত একটু পিছিয়ে এলো। বললে—না ভাই, আমি আর ভেতরে যাবো না ! আবার তোদের প্লে কি হচ্ছে নাকি ?

—সে তো সেই পর্যন্তই হয়ে আছে। হিরোইন্ পাচ্ছি না। আমি বলেছি হিরোইন্ আমি আর খুঁজবো না। খুঁজতে হয় কালীপদ খুঁজবে, আমরা ওর মধ্যে নেই আর—তাতে প্লে হোক আর না-ই হোক—

সদাব্রত হঠাৎ বললে—সেই মেয়েটা আর আসে নি ?

—কোন্ মেয়েটা ?

—সেই যে, কুন্তি না কী যেন তার নাম ?

শম্ভু বললে—না, কালীপদ ডিরেক্টর, কালীপদই তাকে ক্যান্সেল করেছে, এখন কালীপদ যদি তাকে ডেকে আনে তবেই প্লে হবে নইলে হবে না। তার পরে তো আরো অনেক মেয়েকে ট্রাই দিয়ে দেখা গেল, কেউ স্যুট্ করছে না—

—আচ্ছা সে মেয়েটার বাড়ি কোথায় রে ?

শম্ভু বলল—সে তো যাদবপুরে কোথায় কোন্ বস্তিতে থাকে—

—যাদবপুরে ?

সদাব্রত অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু আমাকে যে সেদিন বললে—আহিরীটোলায় ?

—তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হলো তার ?

—সেই দিনই রাস্তায় আমি ট্যাক্সিতে উঠছি, এমন সময় আমাকে এসে ধরলে, আমি বালিগঞ্জে নামিয়ে দিলুম! যাবার সময় বললে আহিরীটোলায় থাকে। কিন্তু সেখানে তো ও-নামে কেউ থাকে না।

শম্ভুও একটু অবাক হলো—তুই গিয়েছিলি নাকি খুঁজতে ?

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ, আমাদের উকীলের বাড়ি তো ওইদিকে, ভাবলুম একবার গিয়ে দেখা করে আসি। তা যে ঠিকানা দিয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখি সেটা একটা ছেলেদের মেস্। আমি একটু অপদস্থ হয়ে গেলুম শুনে—

শম্ভু বললে—ওরা ওই রকম। ওদের কথা কখনও বিশ্বাস করিস নি—চল্ চল্—দেখি দুলালদা যদি এসে থাকে—

কুঞ্জকে একটু অপেক্ষা করতে বলে সদাব্রত ভেতরে ঢুকলো। তখন বেশ ভিড়। ঢুকতেই কুন্তিকে দেখে যেন এক পা পেছিয়ে এলো সদাব্রত। আবার ঠিক এখানে দেখা হয়ে যাবে আশা করতে পারে নি। কুন্তির হাতে চায়ের কাপ। তখন কাপে চুমুক দিচ্ছিল নিচু হয়ে। অতটা দেখতে পায় নি প্রথমে। কিন্তু জুতোর আওয়াজে মুখ তুলতেই সামনে সদাব্রতকে দেখতে পেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে কাপ চল্‌কে চা পড়ে গেল শাড়িতে।

আসলে শম্ভুও জানতো না যে সেই কুন্তিই সেদিন আবার ক্লাবে আসবে। কেউই জানতো না। কালীপদরই আসল বাহাদুরি। সেদিন বামার-লরীর অফিস থেকে কালীপদ সকাল-সকাল ছুটি করে নিয়ে বেরিয়েছিল। শম্ভুর কাছে আগে থেকে আন্দাজে একটা ঠিকানা জেনে নিয়েছিল। সেইটুকু ভরসা করেই যাওয়া।

বাস থেকে নেমে যেখানে যাদবপুর টি-বি হাসপাতাল, তার পশ্চিমমুখো রাস্তাটা ধরে সোজা যেতে হবে। এইটুকুই শুধু জানতো। তার পরই আরম্ভ হলো রেফুজি-কলোনী। ছোট ছোট টিনে-ছাওয়া মাটির ঘর। এক সার। তারই মধ্যে একটাতে থাকে মেয়েটা। কপাল ঠুকে হয় এস্পার নয় ওস্পার ভেবে কালীপদ ঝুঁকি নিয়েছিল।

সেদিনও যথারীতি কুন্তী সেজে-গুজে বেরোচ্ছে। পাশের জীবনবাবুর বউ ডেকেছিল—ও ভাই তুমি বেরোচ্ছ নাকি ? আমার একটা কাজ করতে পারবে ?

কুন্তী এ-সব কাজে কখনও 'না' বলে না। বললে—বলুন না বৌদি, কী আনতে হবে ?

—একটা সাবান আনতে পারবে ? গায়ে মাথার সাবান।

তা এ-পাড়ায় যারা বাইরে বেরোয় না, তাদের জন্যে অনেক জিনিসই কিনে এনে দেয় কুন্তী। সেই যখন প্রথম এসেছিল এখানে তখন ফ্রক্ পরে বেড়াতো পাড়ার মধ্যে। তখন থেকেই ঘোরা বাতিক আছে মেয়েটার। তখন এমন টিনের চাল ছিল না। ঝুপ্ড়ি ঘর তৈরী করেছিলেন যে-যার ক্ষমতামত। কার জমি, কে জমিদার কিছুই জানতো না কেউ। ফরিদপুর থেকে এসেছিল ঈশ্বর কয়াল। সে কর্মঠ লোক। শেয়ালদা স্টেশনে এক দিন থেকেই ঘুরতে বেরোলো। তা কলকাতা শহর তো আর ছোট শহর নয়। একদিনে দেখা সম্ভবও নয়। ঘুরতে-ঘুরতে দেখা হয়ে গেল অনেক চেনা লোকের সঙ্গে। গুপ্তপাড়ার হরিপদকাকা, উত্তরপাড়ার সাধু সামন্ত, বিষ্টু সান্যাল। সাধু সামন্তর সঙ্গে বিষ্টু সান্যালের বরাবর রেষারেষি ছিল। কেউ কাউকে দাবার আসরে সহ্য করতে পারতো না। তার পর অঢেল চেনা লোক বেরিয়ে গেল। এখন সবাই বেশ মিল-মিল করে আছে—

হরিপদকাকা জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কোথায় উঠেছ ঈশ্বর ?

—আজ্ঞে শেয়ালদার প্লাটফরমে আছি, আর লঙ্গরখানায় খাচ্ছি—

—বলো কি ? বউ-টউ, ছেলে-মেয়ে ? তারা কোথায় ?

ঈশ্বর বললে—সবাই গুঁতোগুঁতি করে আছি। মারোয়াড়ীরা চাল আর দুধ দিচ্ছে তাই খাচ্ছি—মেয়েটার আমাশা হয়েছে, বাহ্যে করছে দেখে এসেছি, কী যে করি কাকা, একটা পথ বলে দ্যান্—

হরিপদকাকা দেখিয়ে দিলেন পথ। নিজেরাই কেমন করে এখানে এসে চালা-ঘর তুলে নিয়েছেন বললেন। চাঁদা করে বাড়ি-ঘর-উঠোন করেছেন। হাঁস পুষেছেন, লাউ-কুমড়োর চারা লাগিয়েছেন।

—জমি কার ?

হরিপদকাকা বললেন—কে জানে কার ? অত-শত দ্যাখবার সময় কোথায় তখন। দেখলাম খালি পড়ে আছে জমি, তাই এসে উঠেছি। এখন তুলুক দেখি

কার গায়ে কত ক্ষেমতা আছে!

—যদি পুলিস-দারোগা এসে লাঠি মেরে উৎখাত করে, তখন?

হরিপদকাকা বললেন—আরে এমনিতে তো মরেই আছি, না-হয় ওমনিতেও মরবো। তবে এবার আর পালিয়ে যাবো না ঈশ্বর, মরবার আগে দু'চারটেকে মেরে ফেলে তবে মরবো।

হরিপদকাকার সাহস দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল ঈশ্বর কয়াল। হরিপদকাকা জোয়ান বয়েসে লাঠিবাজি করতে পারতো। এখন বয়েস হয়েছে। কিন্তু সাহসটা চলে যায় নি।

হরিপদকাকা বললেন—তোমরাও চলে এসো এখানে, কোনও ভয় নেই—আমরা আ ছি, পেছনে আরো দল আছে আমাদের। তারা বলছে তারাও লড়বে আমাদের সঙ্গে, জোয়ান-জোয়ান ছোক্‌রার দল—

—তারা কারা?

—সে তোমরা এসো না, তখন দেখবে।

—কংগ্রেসের দল নাকি?

হরিপদকাকা বললেন—সে তুমি পরে দেখো। এ কাস্তে-কুড়ুলের দল। তে-রঙা নিশেন নয়, এদেরও নিশেন আছে। লাল রং-এর নিশেন এদের, তার ওপরে কাস্তে আর কুড়ুল আঁকা—

তা সেই হলো সূত্রপাত। ঈশ্বর কয়ালই শেয়ালদা স্টেশন থেকে গাঁয়ের সব ক'জনকে এখানে এনে তুলেছিল। আরো অনেকের সঙ্গে মধু সিকদার, মনোমোহন গুহ, নিরঞ্জন হালদার এসে উঠেছিল এই পাড়ায়। তার পর সেই পাড়াতেই ঘর-সংসার করে পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে সবাই। চাঁদা করে টিউব-ওয়েল বসিয়ে নিয়েছে। পুকুর কাটিয়েছে। চাঁদা করে ইস্কুল-লাইব্রেরী সমস্ত করিয়েছে। তবু ভয় যায় নি কারো। কাস্তে-কুড়ুল মার্কা ছেলেরা প্রথমে এসে অভয় দিয়ে গিয়েছিল। তারাই এসে ফর্ম-টর্ম ভর্তি করে নিয়ে সরকারী টাকা আদায় করে এনে দিয়েছিল। সেই টাকাতেই উদ্বাস্তুরা শহরের আনাচে-কানাচে দোকান করেছে। কাপড়ের দোকান, মনিহারী দোকান। আরো কত রকমের দোকান সব। তার পরে সাত বছর কেটে গেছে। কত লোক কত ভাবে টাকা কামাচ্ছে। কিন্তু ফরিদপুরের মনোমোহন গুহ মশাই কিছুই করতে পারে নি। শরীর ভেঙে গেছে, মন ভেঙে গেছে। কুন্তী প্রথম যখন এসেছিল তখন ফ্রক পরতো। তার পর একদিন শাড়ি ধরেছে। কিন্তু শাড়ি পরবার পর থেকেই

পেছনে লোক লেগে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে কোথায় কোথায় ঘুরতো, কোথায় কোথায় খেতো—আবার কোত্থেকে টাকা এনে দিতো বাপের হাতে।

মনোমোহনবাবু অবাক হয়ে যেতো। শুনে দেখ্ তো একটা দু'টো নয়—একেবারে দশ-দশটা টাকা।

জিজ্ঞেস করতো—টাকা কোত্থেকে পেলি রে? কে দিলে?

কুন্তি বলতো—ওরা—

—ওরা মানে কারা? তাদের নাম নেই?

—ওরা, যারা নিয়ে গিয়েছিল—

—কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?

—ওদের দলে থিয়েটার করতে—

তখন থেকে বাপ জানতো মেয়ে থিয়েটারই করে। বাড়িতে যখন ফিরে আসে তখন এক-এক দিন অনেক রাত হয়। পাড়ার লোকেরাও জানে মনোমোহনবাবুর বড় মেয়ে থিয়েটার করে বেড়ায়। থিয়েটার ক্লাবের বাবুরা অনেক টাকা দেয়। সেই টাকা দিয়ে মনোমোহনবাবু বাড়ির খড়ের চাল খুলে ফেলে দেড়শো টাকা খরচ করে টিনের চাল করে নিলে। সেই একফোঁটা কুন্তির গায়ে গয়না উঠলো, বাপের গায়ে জামা উঠলো। ছোট বোনের গায়ে নতুন ফ্রক্ উঠলো। বাড়িতে দু'বেলা উনুন জ্বললো। বাড়ির রান্নাঘর থেকে ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ আসতে লাগলো। এক কথায় বলতে গেলে মনোমোহনবাবুর বরাত ফিরে গেল। তখন আর মেয়েকে কিছু বলা যায় না। মেয়ে ছিল বলেই বুড়ো বয়েসে খেতে পারছে পরতে পারছে মনোমোহনবাবু। অসুখ হলে ডাক্তার আসছে, পথ্য আসছে। ছোট মেয়েটাকেও ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। কুন্তি না থাকলে কী হতো?

কালীপদ খুঁজে খুঁজে এখানে এই পাড়াতেই এসে হাজির হলো।

মনোমোহনবাবু মাটির দাওয়ার ওপর বসে কাশছিল। হাঁফ কাশি। সামনে ছোকরা মানুষ দেখেই বললে—কে?

কালীপদ বললে—আজ্ঞে আমি কুন্তি গুহকে খুঁজছি, আমাদের ক্লাবের থিয়েটারের জন্যে—

মনোমোহনবাবু বললে—থিয়েটারের বাবু? কিন্তু তোমরা অত রাত করে ছাড়ো কেন বলো দিকিনি আমার মেয়েকে? একটু সকাল-সকাল ছাড়তে পারো না? ওই দুধের বাছা অত সয় কী করে বলো তো?

অকর্মণ্য বুড়ো বাবা একমনে হুঁকো টেনে যাচ্ছেন। এর সঙ্গে অন্য সিনিক এফেক্ট্ দেবো আমি। উইংস্-এর এপাশ থেকে ওপাশে নানা চরিত্রের লোক হেঁটে আনাগোনা করছে। কেউ কেউ তোমার দিকে ভালো করে নজরও দিচ্ছে। তুমি যে সুন্দরী, তুমি যে যুবতী, সেটা তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে। চারদিকে সবই প্রায় ঝাপ্‌সা, স্টেজের ফ্লাইট্‌গুলো নেবানো। মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্-এর শব্দ। তোমার কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্ থেকে একটা ফেণ্ট স্যাড্ টিউন ভেসে আসছে ভায়োলিনের—আর উইংস-এর ওপর থেকে একটা ফোকাস এসে পড়েছে তোমার মুখের ওপর……

এ কথাগুলো কালীপদর। কালীপদই জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আশে-পাশে যারা বসে ছিল তাদের মুখেও কথা নেই। এক মনে শুনছে সবাই। শম্ভু বসে ছিল আর তার পাশেই সদাব্রত। সদাব্রতও শুনছিল।

—ইতিমধ্যে একজন লোক এসে তোমার দিকে দেখতে দেখতে ওপাশে চলে গেল। মনে হলো যেন আরো একজন আছে তার সঙ্গে। তারা দুজনে ওপাশ থেকে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো তোমাকে। তার পর মুখের ভাব বদলে তোমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনার মার কি অসুখ? তুমি মুখ তুলে একবার চাইলে, তার পর আবার মুখ নামালে। কিছু কথা বললে না—

লোকটা আবার জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তারকে খবর দিয়েছেন?

তোমার বাবা এতক্ষণে মুখ তুলে চাইলেন। বললেন—কোথায় পাবো বাবা ডাক্তার? পয়সা কোথায়? কে-ই বা ডাক্তার ডাকবে? আমাদের ভগবানই ভরসা মশাই—

অন্য লোকটা বললে—আপনার যদি টাকার দরকার থাকে তো আমরা টাকা দিতে পারি—

বলে লোকটা পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বার করে তোমার বাবাকে দিতে গেল। তুমি দেখছিলে, এতক্ষণে কথা বললে। এই-ই তোমার ফার্স্ট ডায়ালগ্। তুমি শান্ত গলায় মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—আপনারা কারা? মনে রেখো কিন্তু তুমি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত মেয়ে। শহরের বদমাইশ লোকের হাল-চাল তোমার অজানা। তুমি এর আগে কখনও শহর দেখো নি। গুণ্ডাদের তুমি ভাল মানুষ মনে করেই বিশ্বাস করেছ। তোমার মুখে যেন সন্দেহ না ফুটে ওঠে। তা হলেই সব স্পয়েল হয়ে যাবে। একজন ভার্জিন মেয়েকে সবাই খারাপ

করতে চাইছে, এটা তুমি তাদের চেহারা দেখেও বুঝতে পারছো না। তোমার মনটা খুব সরল আর কি। আর তা ছাড়া তোমার মা তখন......

সদাব্রত শম্ভুর কানের কাছে মুখ এনে বললে—কই রে শম্ভু, তোর সেই দুলালদা তো আসে নি—

শম্ভু চুপি-চুপি বললে—আর একটু বোস না, আসবে এখুনি—

কালীপদ কুন্তির দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—এইবার দেখি তোমার ডেলিভারিটা কেমন হয়, এইবার ডায়ালগ্‌টা বলো তো, তুমি মনে করে নাও তোমার বয়স ষোল বছর। তোমার ছেঁড়া শাড়ি, গায়ে একটা ছেঁড়া সেমিজ, চরম দুর্দশা চলছে তোমার...এবার বলো। ধরো আমি এসেছি তোমার সামনে। তোমার বাবাকে লক্ষ্য করে বললুম—আপনাদের যদি টাকার দরকার থাকে তো আমরা টাকা দিতে পারি—এইবার তুমি মুখটা তোল। তুলে আমার দিকে সোজা ভাবে চাও। চেয়ে জিজ্ঞেস করো—আপনারা কারা। বলো? আস্তে আস্তে বলো—আপনারা কারা?

কুন্তি মনে মনে বোধ হয় চেষ্টা করছিল। মুখটা সরল স্নিগ্ধ করে আনছিল। পারছিল না।

কালীপদ উৎসাহ দিয়ে বললে—বলো বলো—এক্সপ্রেশনটা ঠিক হয়েছে, এইবার বলো—

তার পর হঠাৎ শম্ভুর দিকে ফিরে বললে—শম্ভু চুপ কর্ না তুই, ডিসটার্ব করছিস কেন? আর যদি চুপ করে না থাকতে পারিস তো বাইরে চলে যা—

আসলে সদাব্রতই কথা বলছিল। কথাটা সদাব্রতর গায়ে গিয়ে লাগলো। উঠে দাঁড়িয়ে শম্ভুকে বললে—আমি চললুম রে—

বলে বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই শম্ভুও উঠছিল। কিন্তু কুন্তির কথায় বাধা পড়লো হঠাৎ।

কুন্তি বললে—বাইরের বাজে লোকদের কেন আসতে দেন আপনারা?

সদাব্রত পেছন ফিরে দাঁড়াল। বললে—আমার কথা বলছো?

সদাব্রতর কথায় সমস্ত ক্লাব-ঘর তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

কুন্তিও কম নয়। সঙ্গে সঙ্গে বললে—হ্যাঁ, আপনার কথাই তো বলছি, আপনি তো মেম্বার নন এ ক্লাবের, আপনি কেন আসেন এখানে কাজের ক্ষতি করতে?

অকর্মণ্য বুড়ো বাবা একমনে হুঁকো টেনে যাচ্ছেন। এর সঙ্গে অন্য সিনিক এফেক্ট্ দেবো আমি। উইংস্-এর এপাশ থেকে ওপাশে নানা চরিত্রের লোক হেঁটে আনাগোনা করছে। কেউ কেউ তোমার দিকে ভালো করে নজরও দিচ্ছে। তুমি যে সুন্দরী, তুমি যে যুবতী, সেটা তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে। চারদিকে সবই প্রায় ঝাপ্সা, স্টেজের ফুললাইট্গুলো নেবানো। মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের হুইস্ল্-এর শব্দ। তোমার কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্যাক্গ্রাউণ্ড্ থেকে একটা ফেন্ট স্যাড্ টিউন ভেসে আসছে ভায়োলিনের—আর উইংস-এর ওপর থেকে একটা ফোকাস এসে পড়েছে তোমার মুখের ওপর……

এ কথাগুলো কালীপদর। কালীপদই জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আশে-পাশে যারা বসে ছিল তাদের মুখেও কথা নেই। এক মনে শুনছে সবাই। শম্ভু বসে ছিল আর তার পাশেই সদাব্রত। সদাব্রতও শুনছিল।

—ইতিমধ্যে একজন লোক এসে তোমার দিকে দেখতে দেখতে ওপাশে চলে গেল। মনে হলো যেন আরো একজন আছে তার সঙ্গে। তারা দুজনে ওপাশ থেকে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো তোমাকে। তার পর মুখের ভাব বদলে তোমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনার মার কি অসুখ? তুমি মুখ তুলে একবার চাইলে, তার পর আবার মুখ নামালে। কিছু কথা বললে না—

লোকটা আবার জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তারকে খবর দিয়েছেন?

তোমার বাবা এতক্ষণে মুখ তুলে চাইলেন। বললেন—কোথায় পাবো বাবা ডাক্তার? পয়সা কোথায়? কে-ই বা ডাক্তার ডাকবে? আমাদের ভগবানই ভরসা মশাই—

অন্য লোকটা বললে—আপনার যদি টাকার দরকার থাকে তো আমরা টাকা দিতে পারি—

বলে লোকটা পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বার করে তোমার বাবাকে দিতে গেল। তুমি দেখছিলে, এতক্ষণে কথা বললে। এই-ই তোমার ফার্স্ট ডায়ালগ্। তুমি শান্ত গলায় মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—আপনারা কারা? মনে রেখো কিন্তু তুমি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত মেয়ে। শহরের বদমাইশ লোকের হাল-চাল তোমার অজানা। তুমি এর আগে কখনও শহর দেখো নি। গুণ্ডাদের তুমি ভাল মানুষ মনে করেই বিশ্বাস করেছ। তোমার মুখে যেন সন্দেহ না ফুটে ওঠে। তা হলেই সব স্পয়েল হয়ে যাবে। একজন ভার্জিন মেয়েকে সবাই খারাপ

করতে চাইছে, এটা তুমি তাদের চেহারা দেখেও বুঝতে পারছো না। তোমার মনটা খুব সরল আর কি। আর তা ছাড়া তোমার মা তখন……

সদাব্রত শম্ভুর কানের কাছে মুখ এনে বললে—কই রে শম্ভু, তোর সেই দুলালদা তো আসে নি—

শম্ভু চুপি-চুপি বললে—আর একটু বোস না, আসবে এখুনি—

কালীপদ কুন্তির দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—এইবার দেখি তোমার ডেলিভারিটা কেমন হয়, এইবার ডায়ালগ্‌টা বলো তো, তুমি মনে করে নাও তোমার বয়স ষোল বছর। তোমার ছেঁড়া শাড়ি, গায়ে একটা ছেঁড়া সেমিজ, চরম দুর্দশা চলছে তোমার…এবার বলো। ধরো আমি এসেছি তোমার সামনে। তোমার বাবাকে লক্ষ্য করে বললুম—আপনাদের যদি টাকার দরকার থাকে তো আমরা টাকা দিতে পারি—এইবার তুমি মুখটা তোল। তুলে আমার দিকে সোজা ভাবে চাও। চেয়ে জিজ্ঞেস করো—আপনারা কারা। বলো ? আস্তে আস্তে বলো—আপনারা কারা ?

কুন্তি মনে মনে বোধ হয় চেষ্টা করছিল। মুখটা সরল স্নিগ্ধ করে আনছিল। পারছিল না।

কালীপদ উৎসাহ দিয়ে বললে—বলো বলো—এক্সপ্রেশনটা ঠিক হয়েছে, এইবার বলো—

তার পর হঠাৎ শম্ভুর দিকে ফিরে বললে—শম্ভু চুপ কর্ না তুই, ডিসটার্ব করছিস কেন ? আর যদি চুপ করে না থাকতে পারিস তো বাইরে চলে যা—

আসলে সদাব্রতই কথা বলছিল। কথাটা সদাব্রতর গায়ে গিয়ে লাগলো। উঠে দাঁড়িয়ে শম্ভুকে বললে—আমি চললুম রে—

বলে বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই শম্ভুও উঠছিল। কিন্তু কুন্তির কথায় বাধা পড়লো হঠাৎ।

কুন্তি বললে—বাইরের বাজে লোকদের কেন আসতে দেন আপনারা ?

সদাব্রত পেছন ফিরে দাঁড়াল। বললে—আমার কথা বলছো ?

সদাব্রতর কথায় সমস্ত ক্লাব-ঘর তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

কুন্তিও কম নয়। সঙ্গে সঙ্গে বললে—হ্যাঁ, আপনার কথাই তো বলছি, আপনি তো মেম্বার নন এ ক্লাবের, আপনি কেন আসেন এখানে কাজের ক্ষতি করতে ?

শম্ভুই এ-কথায় সব চেয়ে লজ্জায় পড়লো। বললে—কী বলছো কুন্তি তুমি? কাকে কী বলছো? সদাব্রত যে আমার ফ্রেণ্ড, আমিই ওকে এখানে ডেকে এনেছি—

কুন্তি বললে—আপনার বন্ধু তা আমি জানি, কিন্তু বন্ধু বলেই যে মানুষ আক্কেল হারিয়ে ফেলবে, এটা ভাল কথা নয়—

সদাব্রত রুখে উঠলো—তার মানে?

কুন্তি বললে—যদি আপনার আক্কেল থাকতো তো আমার কথার মানে জিজ্ঞেস করতেন না—

সদাব্রত হঠাৎ বললে—কিন্তু সেদিন তুমিই না আমায় এই ক্লাবে আসতে বারণ করেছিলে এরা কমিউনিস্ট বলে? তুমিই না বলেছিলে তোমার বাড়ি বত্রিশের বি আহিরীটোলা সেকেণ্ড বাই লেন?

কুন্তিও দমবার পাত্রী নয়। বললে—কিন্তু আপনিই বলুন তো, সেদিন আপনার ট্যাক্সি থেকে আপনি আমায় নামতে দিতেন, যদি ওই ধাপ্পা না দিতুম?

—বলছো কী তুমি?

—হ্যাঁ, নইলে হয়ত কোনও বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলতেন আমায়! আপনি মনে করেছেন আমরা বুঝতে পারি না কিছু? এতদিন কলকাতা শহরে আছি, এই সহজ কথাটুকু আর বুঝতে পারি না ভেবেছেন?

সদাব্রত সেইখানে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্তের জন্যে। তার পর শান্ত গলায় বললে—আজ এতগুলো লোকের সামনে তুমি আমায় লম্পট বলেই প্রমাণ করতে চাও?

কুন্তি বললে—আমার মুখ দিয়ে আর সে কথাটা নাই বা বলালেন।

সদাব্রত আর থাকতে পারলে না। হঠাৎ সকলের দিকে চাইলে। চেয়ে বললে—আপনারা সকলে হয়ত এই এর কথাই বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু আজ আমি বলে যাচ্ছি আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলুম তা আমার বন্ধু শম্ভু জানে। আমি মেয়েমানুষ দেখবার লোভে এখানে আসি নি, এই কথাটাই আপনারা জেনে রাখুন—আমি আর কিছু বলতে চাই না।

কালীপদ হঠাৎ বললে—তা কুন্তি গুহর সঙ্গে কি আপনার আগে থেকেই আলাপ ছিল?

সদাব্রত বললে—সে কথা ওকেই জিজ্ঞেস করুন না—

কিন্তু কুন্তিকে তা আর জিজ্ঞেস করতে হলো না। সে বোধ হয় তখন ভয়

পেয়েছে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। বললে—কালীপদবাবু, আমি আপনার কাছে টাকা নিয়ে এখানে কাজ করতে এসেছি, তার জন্যে এমন কী অপরাধ করেছি যে একজন বাইরের লোক আমাকে অপমান করে যাবে আর আমাকে তাই সহ্য করতে হবে? আমি তো সেই জন্যেই বলেছিলুম রিহার্সালের সময় বাজে লোক থাকতে পারবে না—

কালীপদ বললে—কিন্তু আমি তো কিচ্ছু জানি না, শম্ভুই তো এনেছে ওকে—

শম্ভু এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার সে সাফাই গাইলে—বাঃ, তুই তো আগে সেকথা আমাকে বলিস নি, তা হলে আমি আজকে ক্লাবে ঢুকতুম না—

কালীপদও রেগে উঠলো—তা তোকে সেটা বলতে হবে কেন? তুই নিজে একটু বুঝতে পারিস না? তোর ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই?

শম্ভু রুখে দাঁড়ালো—খবরদার বলছি, কালীপদ, একটা ইডিয়েটের মত কথা বলিস্ নি—

—কী? তুই আমাকে ইডিয়ট্ বললি?

শম্ভু বললে—ইডিয়ট্ তো সামান্য কথা, কুস্তি না থাকলে তোকে আরো অনেক কথা বলতুম। ক্লাব কি তোর একলার? কে তোকে ডিরেক্টর করেছে, কে তোর জন্যে ভোট ক্যানভাস্ করেছিল বল্ তো? এখন যে বড় মাতব্বরি করছিস?

কালীপদ দাঁড়িয়ে উঠলো এবার, বললে—কী? ডিরেক্টারের রেস্‌পেক্ট রেখে কথা বলতে পারিস না? জানিস এ 'তরুণ সমিতি' নয়, এখানে বেশ্যা নিয়ে প্লে করছি না আমরা, ভদ্দরলোকের মেয়ে নিয়ে থিয়েটার করছি। কী করে ভদ্র ভাষায় কথা বলতে হয় তা আগে শিখে তবে এখানে আসবি—

—তুই আমাকে অভদ্র বললি?

আর রাগ সামলাতে পারলে না শম্ভু। এক চড় কষিয়ে দিলে কালীপদর মুখে। আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে ধরে ফেললে দুজনকে। ক্লাবের ভেতরে তখন সে এক তুমুল গোলমাল শুরু হলো। গোলমালে কান পাতা যায় না। কালীপদও যত চীৎকার করে, শম্ভুও তত।

সদাব্রত দেখলে তাকে নিয়েই যত গণ্ডগোল। তার জন্যেই এত ঝগড়া। সে হঠাৎ শম্ভুর হাত দুটো ধরে ফেললে। বললে—ছিঃ, চল্ এখান থেকে—চলে আয়—

শম্ভু তখনও চেঁচাচ্ছে—আমার ফ্রেণ্ডকে ইন্‌সাল্ট্ করবে, এত বড় সাহস! আমার ফ্রেণ্ডকে ইন্‌সাল্ট্ করা মানে আমাকে ইনসাল্ট্ করা! আমি দেখবো

কী করে তোর 'মরা-মাটি' প্লে হয়, একটা রাবিশ নাটক লিখেছে তার আবার বড়াই—ও-রকম আমিও লিখতে পারি—

অক্ষয় পাশেই ছিল। সে বললে—তোরা কী রে, ছোটলোকদের মত ঝগড়া করতে লাগলি? কুন্তি কী ভাবছে বল্ দিকিনি?

কুন্তির গলা এতক্ষণে শোনা গেল—ও কালীপদবাবু, আমি মশাই চলে যাই, আমার ট্যাক্সি-ভাড়াটা দিয়ে দিন্—

সদাব্রত এবার হ্যাঁচ্‌কা টান দিলে শম্ভুকে। টেনে বাইরে নিয়ে এলো। বললে—কেন তুই ঝগড়া করতে গেলি ওদের সঙ্গে? আমি তো আগেই বলেছিলুম আমি ক্লাবের ভেতরে যাবো না—

শম্ভু তখন বাইরে এসেও গজ্‌রাচ্ছে—কেন ভেতরে যাবি না? ওর একলার ক্লাব? আমি মেম্বার নই? আমি চাঁদা দিই না? আমার একটা ভয়েস্ নেই?

—তুই থাম্! আমি আগেই জানতুম! এ-সব বাজে বাজে কাজ নিয়ে কেন থাকিস? আর কোনও কাজ নেই তোদের?

শম্ভু তখনও রাগে গর-গর করছে। রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে শম্ভু যেন তখনও অন্যমনস্ক। বললে—আমি কালীপদকে কিছুতেই প্লে করতে দেবো না, তুই দেখে নিস্, অথচ আমিই সবাইকে বলে রাজী করিয়েছিলুম, জানিস—

কুঞ্জ গাড়ির ভেতরে চুপ করে বসে ছিল। সদাব্রত সেখানে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—আমি চলি—

শম্ভু কিছু কথা বললে না। তখনও সে বোধ হয় অপমানটা ভুলতে পারছে না।

সদাব্রত বললে—আমার জন্যই তোকে এই অপমানটা সহ্য করতে হলো তো, আমি তোদের ক্লাবে না গেলে আর কিছুই হতো না এ-সব।

শম্ভু বললে—তুই গ্যাখ্ না আমি কালীপদর কী করি। প্লে ওরা কী করে করে তাই আমি দেখবো—

সদাব্রত বললে—কিন্তু আমি অনেক দিন থেকেই তোকে বলবো ভাবছিলুম, তুই ক্লাব আর থিয়েটার নিয়ে কেন এত সময় নষ্ট করিস? আর কিছু কাজ নেই তোদের? চারদিকে মানুষ এত সব সমস্যা নিয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে, আর তোরা কিনা এই সব থিয়েটার নিয়ে মেতে আছিস?

—কিন্তু করবোটা কী? সারাদিন অফিসে খেটে আসার পর, একটা কিছু করতে হবে তো? বাড়িতে একটা ঘর নেই যে একটু বিশ্রাম করি—কী করবো বল্?

—কেন? বাইরের জগতে কত কাজ পড়ে রয়েছে দেখতে পাস্ না? এককালে তোরাই তো রায়টের সময় চাঁদা তুলেছিলি, যুদ্ধের সময় যখন দুর্ভিক্ষ হলো, তখন লঙ্গরখানা খুলেছিলি। ক্লাব না করে গরীব ছেলে-মেয়েদের ওই ঘরে তো পড়াতে পারিস স্কুল করে।

শম্ভু বললে—দূর, ও-সব আর ভাল লাগে না।

—এই গ্যাখ্ না, সমস্যার কি শেষ আছে এখনও? কেদারবাবু, আমাকে যিনি পড়াতেন, তিনিই বলেছিলেন কাণ্ট্রি ফ্রি হলেই শুধু হয় না, এখনই শুরু হলো আসল প্রব্লেম্। এখনই বলতে গেলে নতুন করে সব ভাবতে হবে। এই যে এত ম্যান্-পাওয়ার নষ্ট হচ্ছে, এর কী হবে? এই গ্যাখ্ না, আমি! আমার কথাই ভেবে গ্যাখ্ না—

—আরে তোর কী ভাবনা, তোর বাবার টাকা আছে, তোর কিছু না-করলেও চলবে।

সদাব্রত বললে—ওই তো তোদের ভুল ধারণা! আমাদের টাকা আছে বলেই তো বেশি ভাবনা! কোন্ লাইনে যাবো তাই-ই বুঝতে পারছি না। কত দিকে কত ওপ্নিং রয়েছে, কিন্তু কোন্‌টা যে নেবো তাই-ই বুঝতে পারছি না কিছুতে। বাবা বলছে বিলেত যেতে, কিন্তু বিলেত গিয়ে করবোটা কী? কী শিখে আসবো? তাতে আমারই বা কী হবে আর দেশেরই বা কী উন্নতি হবে! চারদিকে তো দেখছি, যাতে টাকা হয় সেইটেই সবাই চাইছে। টাকা পেলেই যেন ভগবান পাওয়া হলো। ডাক্তারি পাস করলে চলবে না, ডাক্তারি করে টাকা উপায় করতে হবে। পাড়া-প্রতিবেশী যত লোক আছে তাদের সকলের চেয়ে বড়লোক হতে হবে—

—তা তোরা তো তাই-ই। তোরা তো বড়লোক আছিসই?

সদাব্রত বললে—না, আরো বড়লোক হতে হবে। লোকের ধারণা বেশি টাকা না উপায় করতে পারলে জীবনই ব্যর্থ—টাকা না থাকলে পরমার্থও মিথ্যে তাদের কাছে। দেখিস্ নি যে-আশ্রমের যত টাকা সেই আশ্রমের শিষ্য হতে চায় সবাই। টাকা না থাকলে আজকাল সাধুদেরও কেউ খাতির করে না—

শম্ভু বললে—তা তো দেখছি, কিন্তু দেখে কী-ই বা করবো। আমাদের টাকা হবেও না, আমরা তাই টাকা উপায় করবার চেষ্টাও করি না—

—কিন্তু টাকা না-ই বা হলো, তা বলে এই রকম করে সময় নষ্ট করতে ভাল লাগে তোদের?

শম্ভু বললে—আমাদের কথা ছেড়ে দে, আমরা সোসাইটির জঞ্জাল—

সদাব্রত বললে—তোকে এ-সব কথা বলছি বলে কিছু মনে করিস নি তুই, চারদিকের এই সব দেখেই আমার এই কথা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে বাংলা দেশের কপালে অনেক দুঃখু আছে ভাই—

তার পর একটু থেমে বললে—আচ্ছা আসি ভাই—

শম্ভু বললে—আয়, সময় পেলে এদিকে আসিস্ আর আসল ব্যাপারটা তো চুকে গেল, এখন আর কোনও ভাবনা নেই তোর, দুলালদাকে আমি খুব বলে দিয়েছি। বলেছি—এ-সব জিনিস নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে?

শম্ভু চলে গেল।

সদাব্রত গাড়ির ভেতরে উঠে বসলো।

বাড়িতে পৌঁছতেই বদ্যিনাথ বেরিয়ে এসেছিল। বললে—এত দেরি হলো দাদাবাবু, মাস্টারবাবু অনেকক্ষণ বসেছিলেন আপনার জন্যে—

—কোন্ মাস্টারমশাই?

বদ্যিনাথ বুঝিয়ে বললে। দাদাবাবুকে এককালে যিনি পড়াতেন।

—কেদারবাবু? কী জন্যে এসেছিলেন?

—তা তো জানি না, আমি বললাম এখুনি দাদাবাবু অফিস থেকে আসবেন, আপনি বসুন। মাস্টারমশাইকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখলুম, অনেকক্ষণ বসে বসে এই তিনি চলে গেলেন—এখ্খুনি—

সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—কী জন্যে এসেছিলেন কিছু বলেছেন?

বদ্যিনাথ বললে—বললেন একটা বাড়ি দরকার, এই মাসের মধ্যেই একটা বাড়ি না-হলে আর চলছে না তাঁর—

সদাব্রত আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। বললে—আচ্ছা—

সারা দিন অফিসের নিষ্ক্রিয়তা, আর তার পর মধু গুপ্ত লেনে শম্ভুদের ক্লাবের তিক্ততা সদাব্রতকে যেন অসাড় করে তুলেছিল। নিজের ওপরেই তার ঘৃণা হচ্ছিল। কেন সে ওখানে গিয়েছিল? আর কি তার যাওয়ার কোনও জায়গা নেই? কলেজে পড়বার সময় কত জায়গায় সে গিয়েছে। ওয়াই-এম-সি-এ ক্লাবের সেই বিলিয়ার্ড খেলার দল। সেখানেও তো যেতে পারে

সে। আর শুধু কি তাই? একটা সিনেমাও তো দেখতে পারে। আশ্চর্য! কী হলো তার? কোনও দিকেই যেন কোন আকর্ষণ অনুভব করবার তাগিদ নেই তার মনের মধ্যে! এই কলকাতা শহর! রাস্তা-ফুটপাথ-দোকান-স্টল সব যেন মেকি! সকলকেই মেকি মনে হয়। বড় হওয়ার পর থেকেই যেন সব কিছু অন্য চোখ দিয়ে দেখছে সে। কারো কোনও স্থির লক্ষ্য নেই। দক্ষিণ দিকে চলতে চলতে হঠাৎ একজন বাঁ দিকে ঘুরে যায়, শ্যামবাজার যেতে যেতে হঠাৎ একজন চলে যায় দক্ষিণেশ্বরে। সব মানুষ যেন পাগল হয়ে যাবে। ফুটপাথের ওপরেই বা এত ভিড় কেন? ছুটির দিনে লোকগুলো কী করবে ভেবে না পেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। পার্কে মীটিং থাকলে সেখানে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ সময় কাটায়। পার্কের রেলিং-এ ফ্রক্ ঝুলিয়ে দোকানদাররা সওদা বেচছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ফ্রক্‌গুলো নাড়াচাড়া করে। তার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—এ ফ্রক্‌টার দাম কত গো?

দোকানী লাফিয়ে কাছে আসে। বলে—নিন্ না বাবু—সস্তা করে দিয়ে দেবো, বউনির সময়—

—কত দাম, তাই বলো না?

—ক'টা নেবেন? এক জোড়া নিন, সাত টাকায় দিয়ে দেবো—নিয়ে যান—

খদ্দের ততক্ষণ পেছিয়ে গেছে। বলে—না, জিনিসটা তত ভালো নয় হে—

তার পর আবার খানিক দূর গিয়ে হয়ত দেখে গেঞ্জি বিক্রী হচ্ছে। সেখানেও ওই রকম। সেখানেও দরাদরি। এবং শেষে না-কেনা। তার পর এমনি অনির্দিষ্ট ঘোরাঘুরি। তার পর অনেকক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে যাওয়া। গিয়ে খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। তার পর আবার অফিস, আবার অনির্দিষ্ট যাত্রা। এমনিই চলেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। সদাব্রতও কতদিন এমনি জীবন দেখতে রাস্তায় বেরিয়েছে। গাড়িটা রাস্তার পাশে পার্ক করে চাবি দিয়ে ফুটপাথে নেমে পড়ে। এ আর এক শহর। কলকাতা শহরের মধ্যেই আর এক আজব কলকাতা। এ-কলকাতাকে ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর দেখেন নি, স্বামী বিবেকানন্দও দেখেন নি। আর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তাঁরাও কেউই দেখেন নি। ১৯৪৭ সালের পরের এই নতুন কলকাতা শুধু একলা সদাব্রতই দেখেছে। দেখতে দেখতে কেমন অবাক হয়ে যেতো। সিনেমা-হাউসের সামনে মানুষ কিউ দিয়েছে। কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সিনেমার ভেতরে কেন কী দেখতে যায় লোকেরা। সিনেমার বাইরের এই

কিউ কি কম দেখবার মত ? এখানেই কি কম মজা ! লাইন দিয়ে দিয়ে যখন আর দাঁড়াতে পারে না, তখন আবার কেউ কেউ সময় নষ্ট না করে তাস খেলে। সিগারেট টানে আর তাস খেলে। সদাব্রত সেই দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায় ! মনে হয় যেন এ অপচয়। এত অপচয় যেন ভালো লাগে না তার।

হঠাৎ কোনও পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখাও হয়ে যায় এক-একদিন।

—কী রে ? তুই ? কোথায় যাচ্ছিস ?

বিনয় ! রোল নাম্বার থার্টি-থি। প্রোফেসার যা বলতো, সমস্ত নোট করে নিতো খাতায় মন দিয়ে।

বিনয় বললে—এমনি হাঁটছি, তুই কোথায় ?

সদাব্রত বলে—আমিও হাঁটছি—

—গাড়ি কোথায় ? গাড়ি নেই ?

তার পর সদাব্রতর দিকে চেয়ে একটা শ্লেষ-মেশানো সুরে বলে—তোদের কী ভাবনা, তোরা বেশ আছিস—মানুষের অভাব নিয়ে একটু কাব্য করতে বেরিয়েছিস তো—

—কিন্তু তুই যাচ্ছিস কোথায় ? তুইও তো কাব্য করতে বেরিয়েছিস !

বিনয় হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—ঠিক ধরেছিস কিন্তু তুই—কী করে ধরলি রে ?

সদাব্রত বললে—আমি জানি, এই ফুটপাথে-ফুটপাথে বেড়াবি, এর পর রমেশ মিত্র রোড দিয়ে ঘুরে যদুবাবুর বাজারের মোড়ে গিয়ে পড়বি। রাস্তায় জিনিসের দর করবি, কিন্তু কিনবি না, সিনেমার কিউয়ের সামনে দাঁড়িয়ে মজা দেখবি, তার পর হয়ত গেঞ্জির দোকানে গিয়ে গেঞ্জির দর জিজ্ঞেস করবি, সেখানেও কিছু কিনবি না, তার পর অনেক রাস্তা ঘুরে টায়ার্ড হয়ে বাড়ি গিয়ে মাকে বলবি—ভাত দাও—

—তুই বড়লোকের বাড়ির ছেলে হয়ে এ-সব কী করে জানলি ?

সত্যি, বিনয়ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। এত লেখা-পড়া, এত টাকা কলেজে মাইনে দেওয়া, এত লেক্‌চার শোনা, এত নোট লেখা সব বরবাদ হয়ে গেছে তার। কেমন যেন একটা ফ্রাসট্রেশনের হাসি ফুটে উঠেছিল বিনয়ের মুখে।

বিনয় বললে—তুই ঠিক বলেছিস কিন্তু সদাব্রত, কিন্তু কী করবো বল্‌ ! বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে দোতলা বাসে উঠে শ্যামবাজারে চলে যাই, তার পর সেই বাসেই আবার ফিরে আসি, আবার

যাই, আবার ফিরে আসি। এই করি সমস্তক্ষণ। কিন্তু রোজ পারি না, পয়সা তো খরচ হয়—

ওই বিনয়ই বলেছিল তাদের সামনের বাড়ির ফ্ল্যাটে একটা মেয়ে আছে। কিছু করে না। সমস্ত দিন জানলার রেলিং ধরে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর বিকেলবেলা বেরোয় সেজেগুজে। হাতে একটা বটুয়া ব্যাগ নিয়ে। কোনও দিন সিনেমায় যায়। কোনও দিন সিনেমাতেও যায় না, কোথাও যায় না। শুধু সেজেগুজে রাস্তায় বেরোয়।

—তার পর?

—তার পর দেখি সে আমারই মত। এ-রাস্তা দিয়ে ঘুরে ও-রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে অন্য রাস্তায় পড়ে, তার পর আবার অন্য রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে বাড়ি ফেরে—তার পর হয়ত আমার মতই বাড়িতে ফিরে মাকে বলে—ভাত দাও—

সদাব্রত বললে—বিয়ে হয় নি?

—হবে কোত্থেকে! কে বিয়ে করবে? করলে তো আমরাই করবো। কিন্তু আমরাই বা করবো কী করে? আর করবোই বা কেন?

তার পর একটু থেমে বললে—আর বিয়ে করবার দরকারই বা কী? বাসে-ট্রামে আজকাল কী-রকম ভিড় দেখেছিস তো? সেই ভিড়েই তো আমাদের ভারি সুবিধে, সেই ভিড় দেখলেই বাসের-ট্রামের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি, মেয়েদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যায়, বেশ আরাম লাগে—

শম্ভুকে দেখে এই কথাগুলোই মনে পড়ছিল সদাব্রতর। হয় শম্ভুদের মত কেউ ক্লাব করে থিয়েটারের রিহার্সাল দেয়, নয় তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, নয় তো সিনেমায় গিয়ে ঢোকে। এই-ই তো কলকাতার জীবন। ক'জন তার বাবার মত দেশের কথা ভাবে। ক'জন গোয়ার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়। শিবপ্রসাদবাবুর বাড়িতে যেসব পেনসন-হোল্ডাররা আসেন তাঁরা তো নেই তাঁরা তো জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন চাকুরির ঘেরা ঘরের ঘেরাটোপের মধ্যে। কেদারবাবুরা তো সারা দিন ছাত্র পড়িয়ে পড়িয়ে তাদের মানুষ করে তুলেছে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক? আর নিজে সে কোন্ দলে? সেও কি বেশির ভাগ লোকের দলে?

—আজ যে খাস নি কিছু? ব্যাপার কী? যেমন খাবার পাঠিয়েছিলুম, তেমনি পড়ে আছে যে?

খাবারের সামনে বসে মা যেন তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে।

—কাজ করবি সারা দিন অথচ না-খেলে শরীর টিঁকবে কী করে ?

সদাব্রত মা'র মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। আশ্চর্য ! এই মাকেই কিনা সদাব্রত আজ বিকেল পর্যন্ত সন্দেহ করেছিল।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল সদাব্রত, হঠাৎ বদ্রিনাথ এসে বললে—মাস্টারবাবু আবার এসেছেন দাদাবাবু—

মাস্টারবাবু ! কেদারবাবু ! সদাব্রত বললে—দরজা খুলে দিয়ে বসতে বল, আমি এখনি আসছি, পাখাটা খুলে দিবি—

খাওয়া শেষ হবার আগেই চেয়ার থেকে উঠে পড়লো সদাব্রত।

—ওমা, খেয়ে যা, না খেয়ে উঠছিস যে ?

কিন্তু সে-কথা তখন কে শোনে ! বাইরের দিকে যেতে যেতে বললে—মাস্টারমশাইকে বসিয়ে রেখে আমি খাবো ? তুমি বলছো কী ?

সতেরো নম্বর ঘরে নতুন মেয়ে ভাড়াটে এসেছিল। একেবারে আনকোরা নতুন। না বোঝে বাংলা না বোঝে কিছু। এখানকার নিয়ম-কানুন আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল পদ্মরাণী।

পদ্মরাণী বলেছিল—এ তোমার নিজের ঘর-বাড়ি মনে করবে, বুঝলে বাছা !

মেয়েটার নাম কুসুম। পদ্মরাণী বলেছিল—বেশ নাম, কুসুম বলে আমার আর একটা মেয়ে ছিল মা, আহা, বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিল আমার, তা ভালো মেয়ে তো আমার ফাটা কপালে টিঁকবে না—একদিন পোয়াতি হলো আর দাঁতে-কিল্কপাটি লেগে মরে গেল। তুমি বাছা নতুন এ-লাইনে, তোমাকে বলি—লাইনে একবার পীরিত করেছ কি মরেছ—সব্বদা মনে রাখবে বাছা, ঢিলে বনের আয়ু বেশি—

বিন্দু পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—কাকে বলছো মা অত কথা, কুসুম যে বাংলা বোঝে না—

পদ্মরাণী অবাক হয়ে গেল—ওমা, তাই নাকি ? আমি বারবার মুখ পচিয়ে ফেলছি, তা তুই তো আমাকে বলিসও নি—

এমনি করেই কত নতুন নতুন মেয়ে এসেছে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে। কখনও উড়িষ্যা থেকে, কখনও মাদ্রাজ থেকে, কখনও গুজরাট থেকে, আবার কখনও বা

রাজস্থান থেকে। প্রথম প্রথম সবাই আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তার পর কিছু কিছু বাংলা শেখে। তার পর একেবারে পুরোপুরি বাঙালী হয়ে যায়। তা বাঙালী হয়ে গেলেও পোশাক-পরিচ্ছদ বদলায় না। অনেক বাবুর অনেক রকম শখ। কারোর হঠাৎ শখ হলো মাদ্রাজী মেয়ের ঘরে বসবে। তা তার ব্যবস্থাও আছে। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে শখ মেটাবার খোরাকের কমতি আছে এ-কথা কেউ বলবে না।

পদ্মরাণীর কাছে সবাই সমান। পদ্মরাণী সবাইকেই বলে—এ তোমার নিজের ঘর-বাড়ি মনে করবে বাছা, নিজের মতই রান্না-বান্না করে খাবে, আমি তাতে ভাগ বসাতে যাবো না—আমায় তুমি তোমার রোজগারের টাকার চার আনা করে দিও—ব্যস্, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ—

পদ্মরাণী জাঁক দেখাতেও জানে। বলে—এই তো ময়না। ময়নার এখন ঠ্যাকার কত। এই দু'পা গেলেই দেখবি এই সোনাগাছিতেই ময়নার তিন তিনখানা পাকা বাড়ি, দেড়শো ভরির গয়না, সিন্দুকে মোহর, ছোকরা মারোয়াড়ী বাবু—বলি এ-সব হলো কোত্থেকে? বলি এ-সব হলো কার দৌলতে?

বিন্দু বলে—আমি তো জানি মা সব, লোকে যে-যা-ই বলুক—

—আমি তো তাই বলি মা, সেই কথায় আছে না, তাল পাকলেই শাল—

তার পর একটু থেমে আবার বলে—তা লোকের ভালো হলেই ভালো মা, সকলের ভালো হোক জন্ম-জন্ম সেই কামনাই করি। কর্তা বলেন—তোমার তো কিছু হলো না পদ্ম, তুমি তো যে-কে-সেই রয়ে গেলে! আমি বলি না-হোক, আমায় ভালো হয়ে কাজ নেই, চটি জুতোর আর ফিতের বাহার দরকার নেই—কর্তা শুনে হাসেন—

তা এই পরিবেশেই যখন কুসুম এসে গেল, তখন পদ্মরাণী তাকেও তাই শোনালে। যা সকলকে শোনায়। সতেরো নম্বর ঘরখানা খালি ছিল, সেখানেই তাকে বসিয়ে দিয়ে এলো।

বললে—এই তোমার রাজ্যপাট, এই তোমার গদি, এখন তোমার হাতযশ মা—আজকে রাত্তিরটা দরজায় হুড়কো লাগিয়ে আরাম করে নাক ডাকিয়ে শোও—আজকে আর তোমার ঘরে কাউকে বসতে দেবো না—কাল থেকে আমিই সব বন্দোবস্ত করে দেবো—

তার পর বিন্দুকেও সেই রকম হুকুম দিয়ে দিলে। গোলাপী, বাসন্তী, যূথিকা সবাই কুসুমের ঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাদের দলে আর

একজন বাড়লো।

পদ্মরাণী বললে—তোরা এখন যা মা এখান থেকে, ছুদিন রেলগাড়িতে চেপে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এসেছে, এখন একটু জিরুতে দে ওকে, তুমি মা কেঁদো না—ভয় কী ? যে দেশে কাক নেই সে দেশে কী আর রাত পোয়ায় না মা ?

নতুন যখন কেউ এখানে আসে তখনই পদ্মরাণীর আসল কাজ পড়ে। একেবারে নতুন। পাঞ্জাব কি জয়পুর কি গোয়ালিয়র থেকে চালান এসে পৌঁছোয়। আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করা থাকে বোধ হয় পদ্মরাণীর। আড়কাটি থাকে জায়গায়-জায়গায়। তারা নানান জায়গায় চালান দেয় মেয়ে। কিছু অমৃতসরে, কিছু বোম্বাইতে, কিছু কলকাতায়। কে যে তারা তা কেউ জানে না। ট্রেন থেকে নেমেই ট্যাক্সি ধরে সোজা মাল নিয়ে এসে একেবারে হাজির হয় পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে। ঘর আগে থেকেই খালি করা থাকে। সেখানেই এনে পোরে। তার পর উড়ো পাখীকে কেমন করে পোষ মানাতে হয় পদ্মরাণীর সে আর্ট জানা আছে। তেমন তেমন বুঝলে নিজের বিছানায় পাশে নিয়েই ছু-চারদিন শোয়। তার পর যে একবার পাত পাতে সে হাতও পাতে। সে-সব পদ্মরাণীর অনেক দেখা আছে।

পদ্মরাণী দরোয়ানকে ডাকলে। বললে—খুব সাবধান আজ দরোয়ান, মাল যদি খোয়া যায় তো কত্তা আমাকেও খেয়ে ফেলবে, তোমাকেও আস্ত রাখবে না—তা বলে রাখছি—

তার পর নিজের ঘরে বিছানায় উঠে বসে বললে—বিন্দু, তুই একবার সনাতনকে খবর দে তো বাছা, বলবি মা ডাকছে, এখ্‌খুনি আসতে—

সনাতন এলো। সনাতন এ-পাড়ার আদি দালাল। দালালি করে করে তার হাড়-মাংস-কলজে পর্যন্ত শিঁটিয়ে গেছে। সচরাচর তার ডাক পড়ে না মা'র কাছে। রাস্তার বাবুদের নিয়েই তার ব্যবসা। কিন্তু মা'র কাছে যখন ডাক পড়ে তখন সে বুঝতে পারে। তখন হাসি বেরোয় তার পোড়া মুখে। হাসলে সনাতনের পোড়া মুখটা আরো বীভৎস দেখায়।

পদ্মরাণী বললে—হ্যাঁ রে সনাতন, খবর কী তোর ?

—আদেশ করুন মা, সন্তান হাজির !

পদ্মরাণী মুখ বেঁকালো। বললে—তুই আর হাসিস্‌নি বাপু, তোর হাসি দেখলে ভয় লাগে আবার—মুরগীর পোঁদে তেল হলে মোল্লার দোর দিয়ে রাস্তা, তোর হয়েছে তাই ! বলি ঠগনলালকে খবর দিতে পারবি ? নাকি রসিককে ডাকবো ?

—আজ্ঞে আমি যখন মা বলে ডেকেছি তখন আমি কী দোষ করলুম মা বলুন ?

—তা হলে যা, ঠগনলালকে খবর দিয়ে আয়। বলবি যে নতুন মাল চেয়েছিল সে, নতুন মাল এয়েচে, আনকোরা নতুন। যদি নথ খুলতে চায় তো যেন কাল আমার সঙ্গে দেখা করে—বলবি এবার পঁচিশ হাজার টাকার কমে মাল আমি ছাড়বো না—

সনাতন বললে—আমি এখুনি যাচ্ছি মা, এখনও গদ্দিতে আছে বোধ হয় ঠগনলালজী—

হঠাৎ কুন্তি ঘরে ঢুকলো।

পদ্মরাণী কুন্তিকে পেয়ে অবাক হয়ে গেল। বললে—হ্যাঁ লা টগর, এই তোর কথার ঠিক ? কাল যে বলে গেলি আজ সকাল-সকাল আসবি ? তা এই এখন তোর সকাল হলো ?

অথচ এখানে যে তার আজ আসাই হতো না তা জানে না পদ্মরাণী। মধু গুপ্ত লেনের ক্লাব থেকে ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে সে সোজা এখানে চলে এসেছে। এখনও বেশি রাত হয় নি। এখনই শুরু হয় পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের কারবার। এই সন্ধ্যে থেকেই শুরু হয়। এই সন্ধ্যেবেলা থেকেই অফিসের বাবুরা আসতে শুরু করে। মাসকাবারের শুরু থেকেই বাজারটা ভাল হয়। তার পর বেশি রাতে আসে বনেদী বাবুরা। আধাবয়সী বেশি বয়েসী লোক সব। তারা খানদানী মানুষ। কারো কারো সঙ্গে তাদের মাসকাবারী বন্দোবস্ত আছে। তারা বেশি রাতে আসে, বেশি রাত পর্যন্ত থাকে। তার পর যদি বাড়ি যেতে পারে তো যায় নইলে আবার কোনও দিন বাড়ি যাবার ক্ষমতাই থাকে না। ট্যাক্সিতে উঠে প্রথমে কুন্তি ভেবেছিল সোজা বাড়িই চলে যাবে। বাবার শরীর খারাপ। সোজা বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু টাকার কথাটা মনে হতেই সোজা এদিকে চলে এলো। এখানে আসতে ভালো লাগে না তার, তবু আবার না-এসেও পারে না।

ব্যাগ থেকে কুড়িটা টাকা বার করে দিয়ে কুন্তি বললে—এই কুড়িটা টাকা এনেছিলুম—

পদ্মরাণী টাকা ক'টা নিয়ে বললে—কুড়ি টাকা ? কুড়ি টাকা নিয়ে কি আমি বুড়ো আঙুল চুষবো মা ? কুড়ি টাকা তুমি কোন্ আক্কেলে মায়ের হাতে তুলে দিচ্ছ মা ? আমার দুধটা ঘিটা···

আর কথা শেষ হলো না। হঠাৎ সুফল দৌড়তে দৌড়তে ঘরে এলো।

বললে—মা, পুলিস এসেছে—

বলে আর দাঁড়ালো না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কোথায় উধাও হয়ে গেল। পদ্মরাণী টাকা ক'টা পেট-কাপড়ে গুঁজে ফেললে টপ্ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে দু-তিন জন কনস্টেবল ঘরে ঢুকে পড়েছে। পেছনে থানার ও-সি।

—কী বাবা? আপনারা কাকে চান?

ইন্‌স্‌পেক্টর কুন্তির মুখের দিকে চাইলে। কুন্তি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলে—আপনিই কি এ-বাড়ির মালিক?

—হ্যাঁ বাবা! আপনিই বুঝি চিৎপুর থানার দারোগাবাবু? আমাদের তিনি কোথায় গেলেন, সেই অবিনাশবাবু? অবিনাশবাবু তো আমাদের চিনতেন বাবা—

সে কথার জবাব না দিয়ে দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলে—এ কে?

—ও আমার টগর মেয়ে বাবা। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে আমার, আমার নিজের পেটের মেয়ে বাবা—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না বাবা, অ বিন্দু···

ইন্‌স্‌পেক্টর কনস্টেবলদের কী যেন ইঙ্গিত করলো। তারা গিয়ে কুন্তির একটা হাত ধরে ফেললে।

ইন্‌স্‌পেক্টর আবার বললে—আমি আপনার মেয়েকে এখন থানায় নিয়ে যাচ্ছি।—

কুন্তির তখন বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসবার যোগাড় হচ্ছে। যেন মা বলে একবার চীৎকার করতে চেষ্টাও করলে। কিন্তু কিছুই করতে পারলে না। চোখের সামনে তার সব যেন ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। পদ্মরাণী যেন কী বলছিল পুলিসকে। তার কিছুই কানে গেল না। কুন্তির মনে হলো সে যেন ধপ্ করে মাটিতে পড়ে যাবে। তার কান-নাক-মুখ সব ঝাঁ ঝাঁ করছে।

সকালবেলাই সদাব্রত খোঁজখবর নিয়েছিল। এক দিন দু' দিন করে অনেক দিন কেটে যাওয়ার পরও একটা ভাল বাড়ি খুঁজে পায় নি। কেদারবাবুর দুখানা ঘর হলেই চলে যায়। একখানা হলেও চলতো। রাস্তায় বাস করতেও আপত্তি ছিল না কেদারবাবুর। কেদারবাবু বলেছিলেন—আমি একলা মানুষ

আর আমার গোটাকতক বই, আমার জন্যে তো বেশি ভাবি না, শৈলকে নিয়েই তো মুশ্‌কিল হয়েছে—

সদাব্রত বলেছিল—আমাদের বাড়ি থাকলে আপনাকে আমি নিশ্চয় দিতুম মাস্টারমশাই—আমাদের তো বাড়ি নেই, শুধু জমির ব্যবসা আমাদের—

কেদারবাবু বলেছিলেন—তা হলে তুমি বাড়ি যোগাড় করে দাও আমাকে—তোমার ভরসাতেই তো এলুম—

সদাব্রতর ওপর অনেকখানি ভরসা করেই কেদারবাবু এসেছিলেন বটে। সারা দিন এত কাজ থাকে, তার মধ্যে বাড়ির কথাটা মনেই থাকে না কেদারবাবুর। বাড়ির সামনে এসেই মনে পড়ে যায়। কথা দিয়েছেন এক মাসের মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে দেবেন। পনেরো-ষোল দিন কেটে গেছে। এই পনেরো-ষোল দিনের মধ্যে চেষ্টা করাও হয় নি কোথাও। সব ছাত্রদেরই বলেছেন। কেউই বাড়ি দিতে পারে নি। এতদিন যে-বাড়িতে থাকেন তার জন্যে বাড়িওয়ালাকে নিয়ম করে কুড়ি টাকা ভাড়া দিয়ে আসছেন। এখন কুড়ি টাকায় বাড়ি পাওয়া অসম্ভব। তা না-হয় চল্লিশ টাকাই হলো। কষ্টে-সৃষ্টে চল্লিশ টাকাই না-হয় দেবো। কিন্তু চল্লিশ টাকাতেই বা কে বাড়ি দিচ্ছে। দিতে পারতেন একশো দুশো টাকা তো না-হয় বাড়ি মিলতো। কিন্তু অত কোত্থেকে দেবেন! দিন-কাল তো খারাপ কি না।

—তা তোমাদের বাড়ির কিছু ঘর আলাদা করে দাও না। আমি চল্লিশ টাকাই ভাড়া দেবো—আর একটা টিউশ্যানি না-হয় নেবো'খন!

সদাব্রত বলেছিল—আমাদের বাড়িতে আর জায়গা কোথায় মাস্টারমশাই?

কেদারবাবু বলেছিলেন—কেন? এ-ঘরটা? এ-ঘরটাতে তো কেউ শোয় না, এ ঘরটা তো রাত্রে খালি পড়েই থাকে—

—রাত্রে খালি পড়ে থাকে, কিন্তু দিনের বেলা তো মাঝে-মাঝে বাবা বসেন।

কেদারবাবু বলেছিলেন—তা না-হয় দিনের বেলা আমি বাইরে বাইরে ঘুরবো, রাত্রে এখানে ঢুকবো—

সদাব্রত হাসলো। বললে—আপনি না-হয় থাকলেন, কিন্তু আপনার ভাই-ঝি?

—সে তোমার মার সঙ্গে থাকবে। আমি না-হয় তোমার মা'র সঙ্গে কথা বলছি, মাকে ডাকো না একবার—

সদাব্রত বললে—মাস্টারমশাই, আপনি ঠিক ব্যাপারটা বুঝছেন না। এ

তো একদিনের কথা নয়, বরাবর যখন থাকতে হবে তখন তো একটা পাকা বন্দোবস্ত করতে হবে—

—আচ্ছা তোমাদের ছাদের ওপরে? ছাদের ওপরে চিলে-কোঠা নেই? সেখানে কে থাকে?

শেষকালে সব শোনার পর বলেছিলেন—না, দেখছি আমাকে ভাড়া দেবার ইচ্ছে তোমার নেই—সেইটে বললেই পারো—বলে উঠছিলেন।

সদাব্রত বলেছিল—আচ্ছা মাস্টারমশাই, আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে একটা সস্তার বাড়ি খুঁজে দেবোই—

অত আশ্বাসবাণী পেয়েও কেদারবাবু কিন্তু খুশী হন নি শেষ পর্যন্ত। রাত হয়ে যাচ্ছিল। কেদারবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—দেখ, আমি এতদিন চোখ বুজে ছিলুম, কেবল এন্‌সিয়াণ্ট হিস্ট্রি নিয়েই ডুবে ছিলুম, এখন দেখছি তলে তলে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে। মন্মথ আমাকে ঠিকই বলেছিল···

বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কেদারবাবু। তখন রাত অনেক হয়েছিল। সদাব্রত পেছন থেকে ডেকে বলেছিল—স্যার, গাড়িতে করে আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, আপনি দাঁড়ান—

—না হে না,—বলে সে রাত্রে হন্ হন্ করে কেদারবাবু চলে গিয়েছিলেন। আর দাঁড়ান নি।

সদাব্রত পেছনে গিয়ে বললে—স্যার, আমি তো বলেছি আপনাকে একটা বাড়ি খুঁজে দেবো সস্তায়—

কেদারবাবু রেগে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কোত্থেকে খুঁজে দেবে শুনি? দিলে তো তুমিই দিতে পারতে। তোমার বাবা তো এত বড়লোক, পেছন দিকে তো অনেকখানি জায়গা পড়ে আছে, ওখানে দুটো ঘর তুলে দিতে পারতে না? তোমাদের কি টাকার অভাব? কলকাতায় কত বড়লোক রয়েছে তোমাদের মত, তারা কেউ একটা লোকের উপকার করতে পারে না? এ কি একটা কথা হলো? টাকা হলে কি মায়া-দয়াও থাকতে নেই? আমি কি শৈলকে নিয়ে পথে দাঁড়াবো বলতে চাও? সেইটেই তোমাদের ভালো লাগবে? এই তো চারদিকে কত বড়-বড় বাড়ি রয়েছে, কত ঘর ওম্‌নি পড়ে আছে, ইচ্ছে থাকলে কেউ দিতে পারে না মনে করেছ? এবার থেকে আমি মডার্ন হিস্ট্রি পড়ে দেখবো, দেখবো ইণ্ডিয়ায় কিছু লোক বড়লোক হলো কী করে, আর আমরা কিছু লোক কী করে গরীব হয়ে গেলাম—

খুব রেগে গিয়েছিলেন কেদারবাবু।

সদাব্রত জানতো রাগ করবার লোক কেদারবাবু নন। কিন্তু কথাগুলো তো খারাপ কিছু বলেন নি মাস্টারমশাই।

বাড়ির ভেতর ঢুকতেই মা জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, এত রাত্তিরে তোর মাস্টারমশাই কী করতে এসেছিল আবার? জমি কিনতে চায়? না কি? তুমি যেন বাপু আবার পুরোনো মাস্টার দেখে সস্তায় জমি-টমি দিয়ে দিও না—উনি ফিরে এসে জানতে পারলে রাগারাগি করবেন—

কেদারবাবুর কথাগুলো তখনও কানে বাজছিল সদাব্রতর। চারদিকে এত বাড়ি রয়েছে, তাদের এত ঘর খালি পড়ে রয়েছে, তারা কেউ মাস্টারমশাইকে থাকতে দিতে পারে না? সত্যিই তো, সদাব্রতরাই বা বড়লোক হয়ে উঠলো কী করে? আর মাস্টারমশাইরাই বা অত লেখাপড়া শিখে গরীব হয়ে গেল কী করে? কে এসব করলে? কখন করলে?

সেদিন অফিস থেকে সোজা গিয়ে হাজির হলো ফড়েপুকুর স্ট্রীটে। কুড়ি দিন হয়ে গেল। আর মাত্র দশ দিন। এই ক'দিনের মধ্যেই কেদারবাবুকে একটা নতুন বাড়ির সন্ধান করে নিতে হবে।

—মাস্টারমশাই!

দরজার কড়াটা নাড়তেই কে যেন ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে। দিয়ে নিঃশব্দে সরে গেল।

দরজাটা ফাঁক করে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। সেই তক্তপোশটার ওপর রাজ্যের বই ছড়ানো। কাকে কী বলবে সদাব্রত বুঝতে পারলে না। ঘরের ভেতরেই সে একলা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তবে বোধ হয় মাস্টারমশাই বাড়িতে নেই। চলে আসতেই যাচ্ছিল। অন্ততঃ একটা খবরও দিয়ে গেলে হতো! কিন্তু চারদিকে চেয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই।

তার পর হঠাৎ মনে হলো যেন একটা শাড়ির একটুখানি আঁচল দেখা যাচ্ছে।

সেই দিকে চেয়েই সদাব্রত বললে—আপনি মাস্টারমশাইকে বলে দেবেন যে সদাব্রত এসেছিল···

তখনও কোনও উত্তর নেই।

সদাব্রত আবার বললে—আর আরো বলে দেবেন যে আমি একটা বাড়ির চেষ্টা করছি, দু-একদিনের মধ্যেই খবর দেবো—

ভেতর থেকে শৈল বললে—আপনি বসুন, তিনি হয়ত এখুনি এসে পড়বেন—

সদাব্রত তক্তপোশটার ওপর বসলো। একটা-দুটো বই টেনে নিয়ে দেখতে লাগলো। সবই কলেজের বই। ছাত্রদের পড়াতে হয়। ঘরখানার চারদিকে খুব ড্যাম্প্। একটা ভ্যাপ্সা গন্ধ চারদিকে। তার পর আর কিছু করবার নেই।

সদাব্রত বাড়ির অন্দরের দিকে মুখ করে বললে—আমি বরং এখন উঠি, আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন—

শাড়ির আঁচলটা আবার দেখা গেল দরজার পাশে।

সদাব্রত বললে—তাঁকে বলে দেবেন বাড়ির জন্যে চেষ্টা আমি খুবই করছি, কিন্তু এখানে কি আর কিছুদিন থাকতে পারেন না আপনারা ?

ভেতর থেকে আওয়াজ এলো—আজকে বাড়িওয়ালারা জলের কল কেটে দিয়েছে—

সদাব্রত অবাক হয়ে গেল।

—সে কি ! জলের কল কেটে দিয়েছে ? তা হলে সংসারের কাজ-কর্ম চলছে কী করে ? কী করে চালাচ্ছেন ?

—বড় কষ্ট হচ্ছে। কাকা নেই। আমি বড় মুশকিলে পড়েছি !

সদাব্রত অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো—মাস্টারমশাই কি জানেন যে কল কেটে দেওয়া হয়েছে ?

—না।

—বাড়িওয়ালা কখন কল কেটে দিয়েছে ?

—আজ সকালে।

—মাস্টারমশাই খেয়ে বেরোন নি ?

—তিনি সেই ভোর বেলা কলে জল আসবার আগেই বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছেন।

—আপনার ? আপনার খাওয়া হয়েছে ?

কোনও উত্তর এল না এবার।

সদাব্রত কী করবে বুঝতে পারলে না। বললে—আপনি লজ্জা করবেন না, আমি কেদারবাবুর ছাত্র। আপনি সারাদিন না-খেয়ে আছেন, আর এখানে আমি চুপ করে বসে থাকবো, এ তো হতে পারে না ! আমার গাড়ি রয়েছে, আমি দোকান থেকে আপনার খাবার আনিয়ে দিচ্ছি—দাঁড়ান—

ভেতর থেকে শৈল বললে—না থাক, তার দরকার নেই।

—কিন্তু সারা দিন-রাত কি না-খেয়েই থাকবেন ? সে কি কথা ? আর

মাস্টারমশায়েরই বা কী আক্কেল, তিনি নিজে বেরিয়ে গেলেন আর আপনি খেলেন কি না-খেলেন তা দেখলেন না! আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি—

মেয়েটি এবার যেন আর একটু সামনে এলো। অর্ধেক মুখখানা দেখা গেল। বললে—না থাক, তার চেয়ে বরং যদি একটু খাবার জল এনে দিতে পারতেন—

—তা হলে কুঁজো কি কলসী যা হোক কিছু একটা দিন, আমি রাস্তার কল থেকে নিজেই এনে দিচ্ছি—

শৈল ভেতরে চলে গেল। একটা পেতলের কলসী নিয়ে এসে বাড়িয়ে দিলে সদাব্রতর দিকে। সদাব্রত কলসীটা নিয়ে বাইরে গিয়ে কুঞ্জকে বললে—কুঞ্জ, রাস্তার কলে বোধ হয় এখনও জল আছে, এই কলসীটায় খাবার জল ভরে নিয়ে এসো তো—এসে ওই বাড়ির ভেতর দিয়ে যেও—আমি আছি ওখানে—

আবার বাড়িটার সামনে যেতেই দেখলে কে যেন একজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি মারছে।

—কে আপনি? কাকে চান?

বেশ প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সদাব্রতর দিকেও চেয়ে দেখলেন তিনি। বললেন—আপনি কে?

সদাব্রত বললে—আমি কেদারবাবুর ছাত্র—আপনি কাকে চান?

ভদ্রলোক বললেন—আমি মশাই এই বাড়ির মালিক—আমি কেদার-বাবুকেই খুঁজতে এসেছি—

'মালিক' কথাটা বলতেই সদাব্রত ভালো করে দেখলে ভদ্রলোককে। তার পর বললে—আপনিই মালিক! তা হলে জলের কল কেটে দিয়েছেন আপনিই? কোন্ অধিকারে আপনি জলের কল কাটেন? কে আপনাকে এ-অধিকার দিয়েছে?

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। বললেন—আপনি যে বড়-বড় কথা বলছেন দেখছি?

—বড়-বড় কথা আমি বলছি না মোটেই। আমি সোজা বাংলায় জিজ্ঞেস করছি আপনাকে, আপনি বাড়ির মালিক হতে পারেন কিন্তু জলের কল কেটে দেবার আপনি কে? জানেন এ-বাড়ির লোক আজ এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেতে পায় নি? জানেন আপনাকে আমি পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিতে পারি?

—কী বললেন আপনি? আপনি আমায় পুলিসের ভয় দেখাচ্ছেন?

চেঁচামেচিতে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। কেউ-কেউ ভেতরে

এসে ব্যাপারটা দেখছিল।

সদাব্রত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললে—আপনি জলের কল কেটে দেবার কে?

ভিড়ের মধ্যে একজন লোক সমর্থন করে উঠলো—সত্যিই তো জলের কল কেটে দেওয়া অন্যায় হয়েছে আপনার—

দেখতে দেখতে আরো গোলমাল বেড়ে গেল। কুঞ্জ জলের কলসীটা এনে সদাব্রতর হাতে দিলে। সেটা নিয়ে সদাব্রত ভেতরের দিকে গেল। অল্প-অল্প অন্ধকার বারান্দা-মতন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শৈল বোধ হয় ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল। সদাব্রত কলসীটা শৈলর হাতে দিয়ে বললে—এই জলটা নিন্ আর আমি এখুনি খাবার কিনে আনছি আপনার জন্যে—

শৈল কলসীটা নামিয়ে রেখে বললে—না না, আপনার পায়ে পড়ছি, আপনি আর হাঙ্গাম করবেন না—

সদাব্রত বললে—আপনি কিছু ভাববেন না, ভয় পাবেন না, আমি তো আছি, আমি ও-ভদ্রলোককে পুলিসে দিয়ে তবে ছাড়বো…

শৈল হঠাৎ সদাব্রতর হাতটা চেপে ধরলো।

বললে—না, আপনি দয়া করে কিছু করবেন না, আপনি তো আমাকে একলা ফেলে বাড়ি চলে যাবেন, তখন? তখন তো আমাকে এখানেই একলা থাকতে হবে, তখন কে আমাকে বাঁচাবে?

ততক্ষণ হরিচরণবাবু বোধ হয় চলে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

কে একজন তাঁকে বললে—কিন্তু আপনি জল বন্ধ করলেন কেন মশাই? আপনি তো কোর্টে নালিশ করতে পারতেন। ওরা কি আপনার ভাড়া বাকিটাকি ফেলেছিল? ওরা কি ভাড়া কম দিচ্ছিল? ওরা কি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছিল?

হরিচরণবাবু বললেন—কিন্তু আপনারা এত কথা বলবার কে? আপনারা আমাদের কথার মধ্যে কথা বলতে এসেছেন কেন? আমি জলের কল কেটে দিয়েছি কে বললে? আমাকে কল কাটতে দেখেছেন আপনারা? আপনারা যে মাতব্বরি করতে এসেছেন!

সদাব্রত ভেতর থেকে কথাটা শুনতে পেয়েই বাইরে এলো, বললে—কল না-কাটলে জল এরা পায় নি কেন? কেন পায় নি তার উত্তর আমাকে দিন?

—পায় নি কেন তা আমি কী জানি? জলের কল খারাপ হয় না? আমি

মশাই বাড়ির মালিক বলে আমারই যত কসুর? কলের মিস্ত্রি নেই? পয়সা খরচ করলে কলের মিস্ত্রির অভাব? সেও কি আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে সারিয়ে দেবো বলতে চান?

তার পর একটু থেমে আবার বললেন—আর আমার বাড়িতে যদি ওদের এতই অসুবিধে হচ্ছে তো কে ওদের থাকতে বলেছে আমার বাড়িতে? বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেই হয়।

সদাব্রত বললে—না, বাড়ি ছাড়বে না! আপনি বললেই বাড়ি ছাড়বে ওরা? আপনার কথায় ছাড়বে!

ভদ্রলোক গুম্ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ বললেন—কিন্তু আমিও ওদের বাড়ি ছাড়িয়ে তবে ছাড়বো এই আমি বলে যাচ্ছি—!

সদাব্রত বললে—এখানে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাবেন না, আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, আমি আপনাকে এ-বাড়িতে থাকতে দেবো না আর, চলুন, বাইরে চলুন—

বলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। ভদ্রলোক পিছু হটতে হটতে দরজার বাইরে গেলেন। তার পর শাসিয়ে বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, আমিও দেখে নেবো, এ বাড়িতে আর কতদিন ওরা থাকে—

বলে হরিচরণবাবু আর দাঁড়ালেন না।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই কেদারবাবু এসে হাজির। তাঁর বাড়ির ভেতরে এত লোক দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তার পর সামনেই হরিচরণ-বাবু আর সদাব্রতকে দেখে বুঝতে পারলেন যেন ব্যাপারটা।

বললেন—কী হয়েছে হরিচরণবাবু!

হরিচরণবাবু তাঁর কথার জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে বললেন—কী হয়েছে, তা দু'দিন বাদেই দেখতে পাবেন, আজকে দলে ভারী পেয়ে আমাকে অপমান করা—এর শাস্তি পেতে হবে আপনাকে—

আশেপাশের বাড়ির জানলা থেকে মেয়েরা উঁকি মেরে দেখছিল। হরিচরণ-বাবু চলে যাবার পর তখন আরো যে-ক'জন লোক জটলা করছিল তারাও আস্তে আস্তে চলে যাবার উপক্রম করলো।

একজন বললে—কলকাতা শহরে মশাই বাড়িওয়ালারা ভাবে তাদেরই যেন দেশ! আর আমরা যেন কেউ নই! আর বেশি দিন নয় বাবা তোমাদের, তোমাদের দিন এবার ঘনিয়ে এসেছে—ব্রিটিশ গভর্মেন্টকে যেমন করে তাড়িয়েছি,

এবার ক্যাপিট্যালিস্ট্দেরও তেমনি করে তাড়াবো—

—তা বাড়িওয়ালারা কী দোষ করলো? সবাই কি আর এর মতন?

ভদ্রলোক বললে—কলকাতায় বাড়ি ক'জনের আছে তা জানেন? ওন্‌লি টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট! আর পঁচাত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে ভাড়াটে! রাশিয়াতে কী হয়েছে জানেন? মস্কোতে সব বাড়ি গভর্মেণ্ট ন্যাশন্যালাইজ করে নিয়েছে—

একজন বললে—রাশিয়ার সঙ্গে ইণ্ডিয়ার তুলনা করছেন? সেখানকার লোক কত অ্যাড্ভান্সড্ তা জানেন?

—এই তো বুল্গানিন্ আর ক্রুশ্চেভ আসছে মশাই এবারে ক্যালকাটায়। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবারে, দেখুন না মজাটা—আমাদের শালা গভর্মেণ্ট হয়েছে যেমন, গরীবের দুঃখুটা তো বুঝবে না—এবার সব কমিউনিস্ট হয়ে যাবো, তখন বুঝবে ঠেলাটা—

—আরে মশাই, তা যদি ওরা বুঝতো তা হলে সেদিন গভর্মেণ্টের গুলিতে কত লোক মরে গেল শুনেছেন তো?

গল্প করতে করতে লোকগুলো আস্তে আস্তে যে-যার পথ ধরলো। সদাব্রত তখনও দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের ভেতর। কেদারবাবু ডাকলেন—শৈল, কোথায় গেলি রে—

শৈল এতক্ষণে আবার সামনে এলো।

—কী হয়েছিল রে! হরিচরণবাবু কী বলছিল? হঠাৎ অত শাসিয়ে গেল কেন? আমি তো কথা দিয়েছি যে এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেবো—

সদাব্রত বললে—কিন্তু এর পরেও আপনি বাড়ি ছেড়ে দেবেন? আজকে জলের কল কেটে দিয়েছে, কালকে হয়ত বাড়িতে গুণ্ডা লাগাবে, আর আপনার ভাই-ঝি একলা বাড়িতে থাকে!

—তা কী করবো? আমি যে ভাড়া কম দিই—

—আর এই যে আপনার ভাই-ঝি, আজ সারা দিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেতে পায় নি, তা জানেন? আপনি তো সকালবেলা বেরিয়ে এখন ফিরলেন? এখন খাবেন কী?

—কেন? হ্যাঁ রে, রান্না করিস নি তুই আজ?

সদাব্রত বললে—আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন মাস্টারমশাই!

কেদারবাবু রেগে গেলেন—তা—তা স্বপ্ন দেখবো না তো কী করবো

বলো? আমায় ছ'টা টিউশ্যানি করতে হয়, তা জানো? ইস্কুলগুলো যেমন হয়েছে তেমনি হয়েছে কলেজগুলো—কোথাও আর পড়াশুনো হয় না, বুঝলে? কেবল পলিটিক্স্‌ করতে আরম্ভ করেছে। কেবল ইউনিয়ন আর ইউনিয়ন! আমি তো দেখে-শুনে অবাক। কে কমিউনিস্ট কে কংগ্রেসী এই নিয়েই…

সদাব্রত বললে—কিন্তু মাস্টারমশাই, আপনার সারাদিন খাওয়া হয় নি, সেটা একবারও মনে হয় নি?

কেদারবাবু রেগে গেলেন। বললেন—তুমি থামো! তুমিও তো বড়-লোকদের দলে—

—তার মানে!

হঠাৎ তার ওপর মাস্টারমশাই-এর কেন এই রাগ বোঝা গেল না।

কেদারবাবু বললেন—আমাকে মন্মথর বাবা সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমি এতদিন জানতুম না—মন্মথর বাবা গভর্মেণ্ট অফিসে চাকরি করেন—তিনি বললেন, কলকাতা শহরে যত বড়লোক আছে সবাই চুরি করে বড়লোক হয়েছে। তিনি আমাকে সব বুঝিয়ে বলেছেন। কেউ সেলস্‌-ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, কেউ লিমিটেড কোম্পানি করে ফাঁকি দেয়, চ্যারিটেবল-ট্রাস্ট করে ফাঁকি দেয়, মোট কথা চুরি না করলে বড়লোক হওয়া যায় না। শশীপদবাবু আমাকে সব জলের মত বুঝিয়ে দিয়েছেন—মাসে তিন হাজার টাকা মাইনে পেয়েও আজকাল বড়লোক হওয়া যায় না।

তার পর হঠাৎ যেন অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল। বললেন—আচ্ছা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম না, তোমার বাবার ইনকাম কত? তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

সদাব্রত বললে—আমি খবর নিয়েছি—সাড়ে চারশো টাকা।

সাড়ে চারশো টাকা!

যেন হতাশ হলেন কেদারবাবু। সাড়ে চারশো টাকা! বললেন—তা হলে তো তোমরাও বড়লোক নও, তোমরা গরীব। না গরীব ঠিক নও, মধ্যবিত্ত! মিড্‌ল্‌ ক্লাস। কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল বড়লোক তোমরা! আমাকে শশীপদবাবু সব বুঝিয়ে দিয়েছেন, গভর্মেণ্ট অফিসে চাকরি করেন কি না, কী করে সরকারী টাকা চুরি করে অফিসাররা, সব বলেছেন। বেনামীতে বাড়ি করে বিক্রী করে তারা। এই ধরো অফিসের স্টেশন-ওয়াগন

নিয়ে তারা নাকি বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে পিক্‌নিক্ করতে যায়, কী সর্বনেশে কথা ভাবো—সেই শুনতে-শুনতেই তো আর বাড়ির কথা মনে ছিল না, খাবার কথাও মনে ছিল না—

—কিন্তু আপনার ভাই-ঝি ? তার কথাও তো একবার আপনার ভাবতে হয় ? আজ আপনি ছিলেন না বাড়িতে, আমি না থাকলে কী হতো বলুন তো ? এখন আমি রাস্তার কল থেকে জল এনে দিলুম, তাই খেতে পেলে ! এদিকে আমি ভাবলুম আপনি বাড়ির জন্যে ভাবছেন—দু'দিন ধরে তো আমি আপনার বাড়ির চেষ্টা করছি—

—কেদারবাবু চম্‌কে উঠলেন—তুমি বাড়ি ঠিক করে ফেলেছ নাকি ?

সদাব্রত বললে—না, চেষ্টা করছি—

—ভাগ্যিস্ পাও নি তুমি, বাঁচিয়েছ—

সদাব্রতও অবাক হয়ে গেল—কেন ?

—আরে আমি যে এদিকে একটা বাড়ি পেয়ে গেছি—খুব কম ভাড়া, চারদিকে বেশ কাম্ অ্যাটমোস্‌ফিয়ার, কোনও ঝামেলা নেই, বড়লোকের পাড়াও নয়, ভাড়াটাও কম—দশ টাকা মাসে, পাঁচখানা ঘর—

—বাড়িটা কোথায় ?

কেদারবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—বাগমারিতে—

বাগমারি ! সে কোথায় ? সদাব্রত শুনেছে বাগমারির নাম। কিন্তু কোথায় যে জায়গাটা তাও জানে না। কেদারবাবু যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন—সেখানে এ-রকম জলকষ্ট নেই, আলো-হাওয়া রোদ প্রচুর, তোর সেখানে আরাম হবে শৈল,—বুঝলি—

—কিন্তু আপনি নিজের চোখে সে-বাড়ি দেখেছেন ? দশ টাকা ভাড়া বলছেন যে ! কী রকম ঘর ? কলের জল না টিউব-ওয়েল ?

কেদারবাবু বললেন—আমি এখনও সে-বাড়ি দেখি নি, শুনেছি বাড়ির সামনে বিরাট একটা পুকুর আছে, অঢেল জল তাতে—

সদাব্রত হাসছিল। কেদারবাবু সদাব্রতকে হাসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন —হাসছো যে ?

শৈল বোধ হয় আর থাকতে পারে নি। সেও হেসে ফেলেছিল কাকার কথা শুনে।

কেদারবাবু অবাক হয়ে বললেন—তুইও হাসছিস যে ! বিশ্বাস হচ্ছে

না? এক মাসের ভাড়া আমি অ্যাড্ভান্স দিয়ে দিয়েছি, ও-রকম স্থবিধের বাড়ি আমি ছাড়ি?

সদাব্রত বললে—কিন্তু আজকে আপনি কী খাবেন স্যার? আপনার ভাই-ঝিই বা কী খাবে? সে কথা কিছু ভাবছেন?

কেদারবাবু শৈলর দিকে চাইলেন। বললেন—কী খাওয়া যায় বল্ তো মা!

সদাব্রত বললে—আর কালকেও কী খাবেন তাও ভাবুন। কালকেও কলে জল আসবে না—

কেদারবাবু যেন অসহায় বোধ করলেন। ভাই-ঝির দিকে ফিরে বললেন—তা হলে কী হবে মা শৈল! কাল যদি জল না আসে সকালে? আর হরিচরণবাবু যে রকম রাগারাগি করে গেলেন, তাতে তো কিছু ভরসা হচ্ছে না—

সদাব্রত বললে—তার চেয়ে এক কাজ করুন স্যার, আজকের মত আপনারা দু'জনে আমাদের বাড়িতে চলুন, ওখানেই থাকবেন, ওখানেই খাবেন—

কেদারবাবু বললেন—তা মন্দ নয় মা, তাই চল্ সদাব্রতদের বাড়িতেই এ ক'টা দিন কাটিয়ে দিই—

বলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—সঙ্গে কী কী নেবো?

সদাব্রত বললে—যা আপনার খুশি, আমার গাড়ি রয়েছে, নিয়ে যেতে কষ্ট হবে না—

তার পর শৈলর দিকে চেয়ে সদাব্রত বললে—আপনিও চলুন—

কেদারবাবু তক্তপোশের ওপর থেকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। বললেন—আরে, তুমি দেখছি একটা আস্ত পাগল! ওকে আবার তুমি 'আপনি' বলছো কেন? ও যে আমার ভাই-ঝি—তোমার চেয়ে অনেক ছোট—

সদাব্রত বললে—সত্যি, তুমিও চলো—

শৈল বললে—না—

—কী রে? তুই যাবি না? কেন? তোর আবার কী হলো? তুই এখানে একলা পড়ে থাকবি?

শৈল বললে—না, তোমারও যাওয়া হবে না কাকা—

—কেন? সদাব্রত তো ভালো কথাই বলছে! ওদের বাড়িতে কোনও কষ্ট হবে না, দেখবি কী চমৎকার বাড়ি! ভালো ভালো খাট, গদি, ওর গাড়ি

আছে, সেই গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে বেড়াবি—

শৈল বললে—আমি তো তোমার মত পাগল নই—

কেদারবাবু ভাই-ঝির মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। শৈলর কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলেন না। শেষকালে এই ভাঙা ড্যাম্প বাড়িটাই এত ভালো লাগলো শৈলর!

বললেন—না রে, তুই বুঝতে পারছিস না মা, সে এ-রকম বাড়ি নয়, সে হিন্দুস্থান পার্ক, বড় বড় লোকেরা থাকে সেখানে। বুঝলে সদাব্রত, শৈল মনে করছে সেও বুঝি এঁদোপড়া বাড়ি, এই বাড়ির মত—না রে পাগলী না, সে বাড়ি দেখলে তুই চমকে যাবি, ওদের বাড়িতে কত ঝি চাকর ঠাকুর, সেখানে গেলে তোকে রান্না-বান্না কিছু্ছু করতে হবে না। তোকে বাসন মাজতেও হবে না—তুই পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে কেবল আরাম করে বসে থাকবি—

শৈল হঠাৎ কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—তুমি থামো তো কাকা—আমি নিজেও যাবো না আর তোমাকেও আমি যেতে দেবো না—

কেদারবাবু বললেন—কিন্তু কেন যাবি না সেটা তো বলবি?

শৈল বললে—তুমি সে-সব বুঝবে না—

সদাব্রত বললে—সত্যিই চলো না তুমি, আমিই তোমাকে যেতে বলছি, সেখানে গেলে তোমাদেরও কোনও অসুবিধে হবে না, আমাদেরও না—

শৈল চুপ করে রইল। কিছু উত্তর দিলে না।

সদাব্রত আবার বলতে লাগলো—আর তা ছাড়া, হরিচরণবাবু লোক ভাল নয়, তিনি তো শাসিয়ে গেলেন, আর কলের জলও নেই, এর পরে এখানে থাকবেই বা কী করে তাও বুঝতে পারছি না—। কাল যখন আবার মাস্টার মশাই বাইরে চলে যাবেন, তখন একলা কী করে থাকবে? আবার যদি কেউ এসে কিছু বলে আজকের মত?

কেদারবাবুও কথাটা সমর্থন করলেন। বললেন—হ্যাঁ, সদাব্রত বুদ্ধিমান ছেলে, ঠিক কথাই তো বলেছে—এই কথার জবাব দে তুই?

তার পর হঠাৎ যেন মাথায় কী একটা খেয়াল এলো। সদাব্রতর দিকে ফিরে বললেন—আচ্ছা সদাব্রত, একটা কথা, আমাদের ঘর-ভাড়া দিতে হবে না তো?

সদাব্রত কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই শৈল বাধা দিলে।

বললে—কাকা না হয় পাগল-মানুষ, কিন্তু আপনি কেন পীড়াপীড়ি করছেন? আপনি তো কাকাকে চেনেন?

সদাব্রত হতাশ হয়ে বললে—এর পর আমার কিছুই বলবার নেই, কিন্তু আজ যা ঘটলো এর পর আমার এখান থেকে চলে যেতেই ভয় করছে—এক ফোঁটা জল নেই, খাবার বন্দোবস্তও নেই, এ-সব দেখেও আমি চলে যাই কেমন করে?

শৈল হাসলো। বললে—এতদিন যখন চলেছে তখন এর পরেও চলবে, আপনি ভাববেন না কিছু, গরীবদের এই রকম করেই জীবন কাটে, আপনি নতুন দেখলেন, তাই কষ্ট হচ্ছে, আপনি বাড়ি চলে যান—

সদাব্রত শৈলর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকালে। বললে—কিন্তু জলের কী করবে?

শৈল বললে—বস্তির লোকেরা যা করে তাই করবো।

সদাব্রত ভালো করে চেয়ে দেখলে শৈলর দিকে। এতক্ষণ এ মেয়েটা সম্বন্ধে যা ভেবেছিল সদাব্রত, তা যেন ঠিক নয়। ঘরের কোণে যে মেয়ে বন্দী হয়ে থাকে তার মধ্যেও যে এত তেজ থাকতে পারে তা যেন কল্পনা করতে পারে নি সে। কুন্তিকেও দেখেছে এতবার। কিন্তু একবার দেখেই শৈলকে যেন আরো তেজী বলে মনে হয়েছে।

—তা হলে সত্যিই আমাকে চলে যেতে বলছো?

শৈল বললে—হ্যাঁ আপনি যান—

—তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না?

শৈল বললে—অসুবিধে তো হবেই। অসুবিধে হলে গরীব লোকেরা যা করে আমরাও তাই-ই করবো—

সদাব্রত বললে—তা হলে কথা দাও দরকার পড়লে আমাকে একটা খবর দেবে তুমি—

শৈল এবার হাসলো। বললে—বা রে, যাদের কেউ নেই তাদের বুঝি কিছু গতি হয় না?

সদাব্রত বললে—আমি মাস্টারমশাইয়ের জন্যেই ভাবছি, মাস্টারমশাইয়ের কথা ভেবেই আমি এত কথা বলছি—

শৈল বললে—আপনার না-হয় মাস্টারমশাই, কিন্তু আমারও তো কাকা, আমার কাকাকে আমি ভালো করেই চিনি—

তবু সদাব্রত দরজার কাছে গিয়ে একটু দ্বিধা করতে লাগলো।

বললে—কিন্তু তোমাদের খাওয়া ?

শৈলও দরজাটা বন্ধ করতে এগিয়ে এসেছিল। হেসে বললে—আপনার মাস্টারমশাইকে আমি উপোস করিয়ে রাখবো না, আপনার সে ভয় নেই,—এখনও খাবারের দোকান খোলা আছে—আপনি যান—

সদাব্রত আর দাঁড়ালো না। বাইরে রাস্তায় নেমে পড়লো। তার পর হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে গিয়ে বললে—কৃষ্ণ চলো—

হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে তখন বঙ্কুবাবু, অবিনাশবাবু, অখিলবাবু সবাই আসর জমিয়ে বসেছেন।

অবিনাশবাবু বললেন—তা পণ্ডিত নেহরু শুনে কী বললেন ?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—নেহরুর মুখে আর কোনও কথা নেই। একেবারে চুপ। আমি বললুম, আপনাকে এর জবাব দিতেই হবে পণ্ডিতজী ! চুপ করে থাকলে আমি ছাড়বো না। কাশ্মীর নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন, কিন্তু বাংলা দেশের অবস্থাটা কী একবার ভেবে দেখুন ! বাংলা দেশও তো একটা বর্ডার-স্টেট্। বাংলা দেশের রেফুজী প্রব্লেম্ নিয়ে সেন্টার কী করছে ? কত-টুক করেছে ? ওয়েস্ট বেঙ্গলকে আপনারা যে নেগ্লেক্ট্ করছেন, একে বলছেন প্রব্লেম্ স্টেট্, কিন্তু এর জন্যে আপনারা করছেনটা কী ? এখানকার উদ্বাস্তুরা জমি পায় নি, টাকা পায় নি, বড়-বড় ভালো-ভালো জমিতে বস্তি বানিয়ে বাস করছে, রাস্তার ফুটপাথে-ফুটপাথে সংসার করছে, এদের কথা কে ভাববে ? এখানকার ইয়াং ছেলেরা আন্-এম্প্লয়েড্, এখানকার গরীব মেয়েরা কিছু না পেয়ে দেহ বিক্রি করছে···

বঙ্কুবাবু চম্‌কে উঠলেন—আপনি বললেন এই কথা ?

—বলবো না কেন ? আমি পাব্লিক ম্যান, পাব্লিকের কাজ করছি আজ সাতাশ বছর ধরে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রব্লেম্ আমি জানি না তো কে জানবে ? নেহরু তো খুব ইন্টেলিজেন্ট লোক, চুপ করে সব শুনলে। তার পর বললে—অলরাইট্, ম্যয় দেখুঙ্গা—আই শ্যাল্ থিঙ্ক্ ওভার ইট—

—তার পর ?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—তারপর ডাক্তার রায় পর্যন্ত চমকে গেছেন আমার সাহস দেখে। তিনি ভাবতে পারেন নি যে আমি নেহরুর মুখের সামনে এমন করে বলবো। বাইরে এসে বললেন—শিবু, তুমি তো দেখছি খুব স্পষ্টবক্তা হে! আমি বললুম—স্যার, স্যাংটোর নেই বাটপাড়ের ভয়, আমার কী আছে যে আমি বলতে ভয় করবো? আমি মিনিস্টারও নই, আমি কংগ্রেসেরও কেউ নই, দল থেকে আমার নাম কাটা যাবারও ভয় নেই, আমার বলতে কী?

অখিলবাবু বললেন—আপনি এতবার পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে দেখা করেন আর আমাদের কথাটা একবার বলতে পারেন না?

—আপনাদের কী কথা আবার?

—ওই যে আপনাকে বলেছিলুম, পেন্‌সন্‌-হোল্ডারদের কথাটা। এই যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হু হু করে অথচ আমাদের ডিয়ারনেস্‌ অ্যালাউয়্যান্স্‌ও নেই, কিছু নেই, সেই এক ফিক্সড্‌ পেন্‌সন্‌—এটা তো কেউ ভাবছে না—

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—আপনারা তবু তো ভালো আছেন মশাই, কিন্তু অর্ডিনারী পীপ্‌লদের কথাটা একবার ভাবুন তো—যারা আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছে! আমি তো মশাই রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতেও এক-একদিন জেগে উঠি, তার পর আর ঘুম আসে না। সমস্ত রাত জেগে জেগে ভাবি দেশ কোথায় চলেছে! এ-রকম করে চললে তো এ জেনারেশন্‌টা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে! নেহরুজী তো বলছেন আরাম হারাম হ্যায়, কিন্তু কর্তারা আরাম করা ছাড়া আর কী করছে বলুন তো! কেবল আজ অমুক কন্‌ফারেন্স আর কাল তমুক কন্‌ফারেন্স—আমাদের সময়ে মশাই আমরা এত কন্‌ফারেন্স করতুম না, কেবল কাজ করেছি একমনে। রায়টের সময় আমি আর শ্যামাপ্রসাদবাবু এক-একদিন ভাত খাবারই সময় পেতুম না। আর আজকাল কন্‌ফারেন্সের আগে মিনিস্টাররা কী ডিশ খাবে তারই আয়োজন করতে সবাই গলদ্‌ঘর্ম—এইরকম করে চললে কমিউনিস্ট পার্টিকে আর কদ্দিন চেপে রাখতে পারবেন?

—আপনি নেহরুকে এই কথা বললেন?

—না নেহরুজীকে বলি নি, বললুম ডাক্তার রায়কে। বললুম আপনিই তো কমিউনিস্টদের প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে এত বাড়িয়েছেন স্যার! একবার অতুল্যবাবুর হাতে ছেড়ে দিন, দেখবেন সব একদিনে ঠাণ্ডা করে দেবেন তিনি! ডাক্তার রায় তো বুঝতে পারছেন না। কিন্তু এখন পাশেই আমাদের চায়না

রয়েছে, অত বড় কমিউনিস্ট দেশ, আজ না হয় ভেরি ফ্রেণ্ড্‌লি—কিন্তু কখন কী হয় কিছু বলা যায়?

অবিনাশবাবু বললেন—কী বলছেন আপনি শিবপ্রসাদবাবু, চৌ-এন-লাই? চৌ-এন-লাই কখনও খারাপ কাজ করতে পারে?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—না, চৌ-এন-লাই খারাপ লোক বলছি না। চৌ-এন-লাই তো অত্যন্ত ভালো লোক, নেহরুর পার্সোন্যাল ফ্রেণ্ডের মত। কিন্তু চৌ-এন-লাই তো চিরকাল বেঁচে থাকবে না। চৌ-এন-লাই মারা যাবার পর আবার কে উঠবে, তার কী পলিসি হবে বলা যায়? তখন এদের ঠেকাবে কে? জানেন এই ক্যাল্‌কাটার বুকে বসে এরা কী করছে? মশাই, বস্তিতে-বস্তিতে গিয়ে উদ্বাস্তুদের খেপাচ্ছে, আর গভর্মেণ্টের এগেন্‌স্টে···

গাড়িটা বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছতেই সদাব্রত অবাক হয়ে গেল। বাবা এসে গেছেন।

কুঞ্জও দেখেছিল। সদাব্রত বললে—কুঞ্জ, বাবা এসে গেছেন দেখছি—

হঠাৎ বদ্যিনাথ ঘরে ঢুকলো। শিবপ্রসাদবাবু তার দিকে চাইতেই সবাই বুঝতে পারলেন। উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—আপনার আবার পুজোর সময় হয়ে গেল বুঝি?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—হ্যাঁ উঠি—

—দিল্লীতে থাকবার সময় সেখানে পুজো করবার সময় পেতেন?

শিবপ্রসাদবাবু হাসলেন। বললেন—একদিন তো তাই হলো। লালবাহাদুর শাস্ত্রী আমার বাড়িতে এসেছেন। কথা বলছি, এমন সময় আমি উঠে দাঁড়ালুম, পুজোর সময় পণ্ডিত নেহরুও কেউ নয়, লালবাহাদুর শাস্ত্রীও কেউ নয়, ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টও কেউ নয়, সকলের ওপরে আমার মা—

সদাব্রত যখন পাশের দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকছিল তখন সবাই বেরিয়ে আসছিলেন। শম্ভুবাবু, অবিনাশবাবু অখিলবাবু সবাই। সদাব্রত তাঁদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে পা বাড়ালো।

ছ দিন কেটে গেল তবু নতুন মেয়েটার আড়ষ্টতা কাটলো না। কোথায় কোন্ বালেশ্বর জেলায় না ময়ূরভঞ্জ স্টেটে বুঝি বাড়ি ছিল। বাপ চাষ করতো

পরের ক্ষেতে। দিনমজুর। গাঁয়ের প্যাটেলের কাছে টাকা ধার করেছিল অনাবাদীর সময়ে। কিন্তু সময়মত সুদও দিতে পারে নি। তার পর শুরু হলো প্যাটেলের তাগাদা। প্যাটেল ঘটি-বাটি নিলে, ভিটের জমি নিলে। শেষে তাতেও যখন দেনা শোধ হলো না, তখন মেয়ে আর বউকেও নিলে। তারা গতরে খেটে দেনা শোধ করবে। সেই প্যাটেলের বাড়িতেই এতদিন গতর দিয়ে খেটে এসেছে কুসুম। গরুর খড় কেটেছে, জাব দিয়েছে, বাসন মেজেছে, গোবর নিকিয়েছে। ফুটফুটে চেহারা, যোয়ান বয়েস। তার পরেই একদিন বলা-নেই কওয়া-নেই রাত থাকতে ঘুম ভাঙিয়ে প্যাটেলই একদিন একটা অচেনা লোকের সঙ্গে রেলগাড়িতে তুলে দিয়েছে। আর তার পর এই এখানে। এই কলকাতায়।

প্রথম-প্রথম এখানকার হাল-চাল দেখে কুসুম অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার পর সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। কোথায় সেই অজ জঙ্গল জায়গা। আর কোথায় এই শহর। তা শহর আর কুসুম দেখলো কই? সেই যে একদিন এখানে এসে ঢুকেছিল, তার পর আর কোথাও বেরোতে পায় নি। রাস্তার দিকে দোতলার বারান্দায় যখন সবাই সেজে-গুজে দাঁড়ায়, তখন তাকেও সাজিয়ে দেয় পদ্মরাণী!

পদ্মরাণী বলে—পরো মা, এই শাড়িখানা পরো—

পদ্মরাণী প্রথম-প্রথম সবাইকেই নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে শাড়ি কিনে দেয়, গিল্টির গয়না কিনে দেয়, দুধটা ঘিটা খেতে দেয়। নিজের পেটের মেয়ের মত তরিবৎ করে। পাশে নিয়ে শোয়। কুসুমকেও তেমনি করতে লাগলো। বড় ভীতু মেয়ে। আদর পেলে গলে যায় আবার পুরুষ দেখলে ভয়ে শিউরে ওঠে।

এ লক্ষণটা ভালো। এই সব মেয়েরাই পরে পাকা হয়। এ-লাইনে যারা পাকা নামজাদা, তাদের সকলেরই আগেকার ইতিহাস এই। সবাই পুরুষ-মানুষের দিকে চোখ তুলে দেখতে ভয় পেত। পরে তারাই ডাকসাইটে বলে এ-পাড়ায় নাম কিনেছে।

ঠগনলালজীর ক'দিন দেরি হলো আসতে। শেয়ার মার্কেটের রাঘব-বোয়াল শেঠ ঠগনলাল। শেঠ ঠগনলাল এক হাতে বেচে আর-এক হাতে কেনে। জীবনে সঞ্চয় কাকে বলে জানে না। সঞ্চয়টা ঠগনলালজীর বাপের মতে ছিল হারাম। টাকা কখনও জমাতে নেই। ওতে টাকারও ইজ্জত

যায়, টাকার মালিকেরও ইজ্জত চলে যায়। টাকা শুধু ইনভেস্ট্‌মেন্টের জন্যে। একটা শেয়ারে টাকা ইনভেস্ট্‌ করে কিছু প্রফিট খেয়ে আবার সেই টাকাটা আরো বেশি ডিভিডেণ্ডের শেয়ারে ইনভেস্ট্‌ করো। টাকার ডিম পাড়াও কেবল। টাকা সঞ্চয় করলে টাকা বাঁজা মেয়েমানুষের মত অকেজো হয়ে যায়। আজ আয়রন, কাল কপার, পরশু স্টীল, তার পর অ্যালুমিনিয়াম। ১৯৪৭-এর পর থেকে ইণ্ডিয়ায় ইণ্ডাস্ট্রি বাড়ছে। আগে সাহেবদের জ্বালায় ইনভেস্ট্‌ করার সুবিধে ছিল না তত। তখন সব শেয়ার সব ডিভিডেণ্ড্‌ চলে যেতো ইংলণ্ডে। এখন বিলিতি কোম্পানী ইণ্ডিয়াতে ফ্লোট করতে গেলে ফিফ্‌টি-পার্সেন্ট শেয়ার ইণ্ডিয়ানদের হাতে বেচতেই হবে। তাতে ডলারের বাজারে ইণ্ডিয়ার প্রেস্টিজ বাড়বে। ইণ্ডিয়ার লোক খেয়ে-পরে বাঁচবে। তাই শেঠ ঠগনলালজীদের পোয়া বারো। শেঠ ঠগনলালজী তাই আর আগেকার মত এ-পাড়ায় আসতে পারে না। আজ যাচ্ছে হংকং, কাল সিঙ্গাপুর, পরশু বম্বে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে কারবার চলছে। মোটর গাড়ির পার্টস আসছে বাইরে থেকে। সেই মোটর কোম্পানীর শেয়ার আছে ঠগনলালের। তার পারমিটের কথাবার্তা বলতে দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে যেতে হচ্ছে। আর পার্টস যখন বাইরে থেকে আসছে তখন সেই পার্টসের সঙ্গে কত কী আসছে তার হিসেব কাস্টম্‌স্‌ অফিসের হিসেবের খাতায় লেখা নেই। এমনিতে বাইরে থেকে গোল্ড আনা যায় না। আনলে ডিউটি দিতে হয়। অথচ ডিউটি দিলে আর মজুরি পোষায় না। স্মাগলিং বড় বিপজ্জনক কাজ। বিশ্বাস করে গদীর কাউকে দিয়ে করানো যায় না। ওটা নিজেই হাতে কলমে করতে হয়। তাই নিজেকেই সব দেখতে শুনতে হয়। ওই সব করতে গিয়েই এ-পাড়ায় অনেক দিন আসা হয় নি।

তা এবার সনাতন গিয়ে খবরটা দিতেই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে এলো।

ঠগনলালজীর বিরাট গাড়ি। এ-গাড়ির কলকব্জাই আলাদা। সব ড্রাইভার চালাতে পারে না।

ফ্ল্যাটের সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়াতেই সুফল দেখতে পেয়েছে। ভেতরে ঠগনলালজী বসে ছিল, সামনের সীটে সনাতন।

আর কথাবার্তা নেই। মোগলাই পরোটার তাওয়াটা উনুনের ওপর রেখেই এক লাফ দিলে সুফল। তার পর মোটরের সামনে গিয়ে আভুমি নিচু হয়ে নমস্কার করলে। বললে—নমস্কার হুজুর—

সনাতন আগেই নেমে হুজুরের জন্যে দরজা খুলে দিয়েছিল।

হুজুর রাস্তায় নেমেই সুফলকে দেখে চিনতে পারলে। তার পর জোরে পিঠ চাপড়ে দিলে সুফলের।

বললে—কী রে সুফল, ক্যামোন্ আছিস ?

সুফল বললে—হুজুর কি আমাদের ভুলে গেলেন নাকি ? অনেক দিন হুজুরের পায়ের ধুলো পড়ে নি—

—পড়বে, পড়বে, এবারে পায়ের ধুলো পড়বে—তা কী রেঁধেছিস আজকে ? মেট্‌লি চচ্চড়ি করেছিস ?

সুফল বললে—ক'প্লেট দেবো হুকুম দিন না হুজুর, আজকে খুব ভালো মেট্‌লি চচ্চড়ি আছে, পাটনাই পাঁঠার মেট্‌লি, সবটাই পাঠিয়ে দেবো ? কার ঘরে বসছেন ?

সনাতনই জবাবটা দিলে। বললে—তুই থাম্ তো, আসুন শেঠজী, চলে আসুন—কাজের সময় এরা বড় দিল্লাগী করে !

শেঠজীর পরনে ফিন্‌লে মিলের ফিন্‌ফিনে ধুতি, গলাবন্ধ কোট। পায়ে বার্নিশ করা মোকাসিন। হাতে সিগারেটের টিন। সনাতন টেনে-টেনে নিয়ে চললো সামনের দিকে। সুফলও পেছন-পেছন আসছিল।

শেঠজী সুফলকে লক্ষ্য করে বললে—তোর যে চেহারা ফিরে গেছে রে সুফল—খুব মাল খাচ্ছিস্ বুঝি ?

সুফল আবার মাথা নিচু করে বললে—হুজুরের নেকনজর পড়লে চেহারা আরো ফিরে যেতো হুজুর—

শেঠজী অভয় দিয়ে বললে—ঠিক আছে, তোর কিছু ভাবনা নেই, তুই যা—ডাকবো'খন তোকে—

ততক্ষণ বোধ হয় খবরটা রটে গেছে ঘরে ঘরে। সবাই দৌড়ে এসেছে বারান্দায়। রেলিঙ্ ধরে ঝুঁকে পড়েছে। জোর-গলায় হাসছে। সবাই শেঠজীর চেনা। সকলের ঘরেই বসেছে শেঠজী। আগে এক-একদিন অনেক কাণ্ড করে গেছে ঠগনলাল। সে তখন বয়েস কম ছিল ঠগনলালজীর। তখন ঠগনলালজীর বাবা শেঠ চমনলাল বেঁচে ছিল। বাপের টাকায় ফুর্তি করতে আসতো ছেলে এই পাড়ায়। এক-একদিন এই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটেরই সব মেয়েদের নিয়ে হুল্লোড় করেছে। এক-একদিন সমস্ত বাড়িটাই এক রাত্রির জন্যে একলা ভাড়া নিয়েছে। সে-সব দিন আলাদা। ওই সুফলের দোকান

থেকেই তখন প্লেট-প্লেট কাঁকড়া এসেছে, মাংস এসেছে, মেট্‌লি-চচ্চড়ি এসেছে। কেউ আর হাঁড়ি চড়ায় নি সেদিন। সবাই ভরপেট মদ খেয়েছে। ঠগনলালের চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে নি। ঠগনলাল যা হুকুম করেছে তাই-ই করতে হয়েছে। দরোয়ান গেট-এ তালা দিয়ে দিয়েছে আর ভেতরে ঠগনলাল নিজে কৃষ্ণ সেজে মেয়েদের গোপিনী সাজিয়েছে। দরোয়ানেরও সে-সব কথা এখনও মনে আছে। অত মোটা বখশিশ পেলে মনে থাকারই কথা!

শেঠজীকে দেখে দরোয়ানও একটা লম্বা সেলাম ঠুকলে।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ঠগনলাল রেলিঙ-এর দিকে চেয়ে দেখলে। মেয়েগুলো ঠগনলালের নজরে পড়বার জন্যে একেবারে সিঁড়ির সামনে এসে হাজির।

ঠগনলাল হঠাৎ বললে—কী রে, দুলারী না?

দুলারী রাজপুতানার মেয়ে। হেসে গড়িয়ে পড়লো—আমাদের তো আর চিনতে পারবেন না, এখন শেঠজী হয়েছেন—

—তুই তো বেশ দুব্‌লা ছিলি, এমন খোদার খাসী হলি কী করে? খুব দিশী খাচ্ছিস বুঝি?

দুলারী বেশ বাংলা শিখে গেছে। বললে—বিলিতির পয়সা কোথায় পাবো শেঠজী যে বিলিতি খাবো?

—কেন? তোর বাবু নেই? সেই মল্লিকবাবু কী হলো? উড়ে গেছে বুঝি?

পাশ থেকে বাসন্তী বললে—শেঠজী আমাদের আর দেখতেই পাচ্ছে না—আমরা বুড়ী হয়ে গেছি কি না—

ঠগনলাল কথাটা শুনেই এক থাম্‌চায় বাসন্তীর মুখের সামনে যা পেলে তাই ধরে ফেললে—

—ওমা, লাগে লাগে, ছাড়ুন শেঠজী, ছাড়ুন—

—আর বলবি? তোর এ নাকছাবিটা কে দিয়েছিল বল্? বল্ তুই? না বললে ছাড়ছি না—

এতক্ষণে পদ্মরাণী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। পাশে বিন্দু। বিন্দুই খবরটা দিয়েছিল পদ্মরাণীকে।

বললে—ওলো, ও মেয়েরা, বলি আক্কেলখানা তোদের কেমন লা? তোরা কি ছেলেকে ছিঁড়ে খাবি নাকি?

পদ্মরাণীকে দেখে ঠগনলালও তখন বাসন্তীকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু

আসলে বাসন্তীর ভালোই লেগেছে। সে খিল্ খিল্ করে তখনও হাসছে। পদ্মরাণীর গলা পেয়ে তখন অন্য মেয়েরা সরে দাঁড়ালো।

ঠগনলাল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে—বাসন্তী কি বলছে জানো গো পদ্মঠাকরুন, বলছে আমি নাকি চিনতে পারছি না ওদের—

—তুমি বাবা ওদের কথায় কান দিও না, তুমি ওপরে এসো—অ বিন্দু, ছেলেকে চেয়ার দে বাছা—

ঠগনলালজী ওপরে উঠে গেল। কিন্তু ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলো না। একেবারে পদ্মরাণীর খাটের ওপর পা তুলে বসলো।

পদ্মরাণীও বিছানার এক পাশে বসে বললে—তুমি তো অনেক দিন আসো নি বাবা এ-পাড়ায়, তাই তুমি জানো না লোক দেখলেই আমার মেয়েরা আজকাল ওই রকম ছেঁকে ধরে—

ঠগনলাল ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখছিল। বললে—কেন? অত নোলা বাড়লো কেন?

—আর কেন বাবা? দিনকাল তো ভাল নয়। বাড়িতে কাক-চিল পর্যন্ত এসে বসছে না আর—

ঠগনলাল তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কেন? আগে তো ঘর খালি থাকতো না দেখেছি—

—সে-সব দিন ভুলে যাও বাবা। এবার কারবার গুটিয়ে ফেলে কাশীতে গিয়ে ধর্ম করতে হবে। আগে ভালো ভালো ঘরের ছেলেরা এখানে নির্ভয়ে আসতো, রাত-কাবার করে বাড়ি যেতো। একদিনের তরে কারো মুখে কড়া কথা শুনতে হয় নি বাবা, এখন পাড়া ফাঁকা বাবা, একেবারে ফাঁকা—তুমি এই পাড়াটা একবার ঘুরে এসো না, অ্যাদ্দিন পরে এলে, একবার এই সনাতনকে নিয়ে যাও না বাবা, এ-পাড়ার হাল-চাল দেখে এসো না! যা না সনাতন, শেঠজীকে একবার সকলের হাড়ির হালটা দেখিয়ে নিয়ে আয় না—

সনাতন দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। সে-ও পদ্মরাণীর কথায় সায় দিলে। বললে—হ্যাঁ হুজুর, মা যা বলছে সব সত্যি কথা বলছে হুজুর,—আমাদের কারবার আর চলবে না পুলিসের জ্বালায়—

—পুলিস!

হো হো করে হেসে উঠলো শেঠ ঠগনলাল। বললে—দূর, বাজে কথা শুনিয়ে কেবল সময় নষ্ট করছিস্ আমার। কাজের কথা বল্, কাজের কথা বল্—

পদ্মরাণী বললে—না বাবা, সনাতন আজ চল্লিশ বছর দালালি করছে, ও ঠিক কথা বলছে—

—তা কোন্ পুলিস বলো না? কোন্ থানা? এই তো তোমার টেলিফোনেই আমি বলে দিচ্ছি, সব তো আমার কাছে টিকি বাঁধা—বলো না কোন্ থানা? কাকে ধরছে? কাদের? থানার অফিসার কে? অবিনাশবাবু তো?

পদ্মরাণী বললে—দুঃখের কথা আর কার কাছেই বা বলি বাবা, আইন করেছে যে! আইন করেছে তা শুনেছ তো তুমি?

শেঠ ঠগনলাল জীবনে আইনের ধার ধারে নি কখনও। বললে—দূর, আইন শেখাচ্ছ তুমি ঠগনলাল শেঠকে? ঠগনলাল শেঠের বাবা চমনলাল শেঠ কখনও আইন মেনেছে? আইন মানলে গভর্মেন্ট চলবে? তুমি অ্যাদ্দিন কারবার করছো এ-পাড়ায়, তুমি কখনও আইন মেনেছ? আইন তো আছে রাত সাড়ে আটটার পর মদ কেউ বেচবে না। তুমি রাত তিনটের সময় আমার সঙ্গে চলো, কলকাতার যে-পাড়ায় খুশি চলো, তোমাকে পিপে-পিপে মদ কিনে দিচ্ছি—কত মদ তুমি চাও, বলো না—

পদ্মরাণী বললে—মদের কথা হচ্ছে না বাবা, মেয়েমানুষের কারবারের কথা হচ্ছে, আইন হয়েছে মেয়েমানুষের কারবার আর চলবে না—

শেঠ ঠগনলাল তাতেও পেছপাও নয়। বললে—রাখো না, আইনও হয়েছে, আর আমরাও তাই মানছি! আমি তো কোনও দেশ দেখতে বাকি রাখি নি! লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, সিঙ্গাপুর, বার্মা সব জায়গাতেই তো হামেশা যাচ্ছি, কই সব জায়গাতেই তো মেয়েমানুষ পেয়েছি, মেয়েমানুষ না পাওয়া গেলে খাবো কী বলো? শুধু রুটি খেয়ে পেট ভরে? তুমিই বলো না ভাই পদ্মঠাকরুন—

তার পর হঠাৎ যেন এই সব বাজে কথায় বিরক্ত হয়েছে এমন ভাবে বললে —কই, খালি পেটে আর কতক্ষণ রাখবে?

পদ্মরাণী বুঝলো। আঁচলের চাবিটা দিলে বিন্দুকে। বললে—যা তো বাছা, ভালো দেখে একটা নিয়ে আয় তো—

তার পর ঠগনলালের দিকে ফিরে বললে—মাইরি বলছি আমি মিছে কথা বলছি না ঠগন, মা-কালীর দিব্যি বলছি, বড় জ্বালাচ্ছে এরা, এই দেখ না, আমার ছুটো মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিসে—

—কেন? ধরেছে কেন?

—আমার টগর আর যূথিকাকে চিনতে তো? তাদের দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে। যূথিকা না-হয় এখানেই থাকে, কিন্তু টগরের জন্যেই ভাবছি বাবা, আহা বড় ভাল মেয়ে, বাপের বড় অসুখ বলছিল, ওদের বাড়িও নাকি জমিদারে ভেঙে দেবে, বস্তি কিনা?

—তা কী করেছিল তারা?

পদ্মরাণী বললে—মুখপোড়ারা বলে মেয়েরা নাকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোক ডাকছিল। মুখপোড়াদের কথা শুনলে? টগরকে তো তুমি দেখেছ বাবা, সে কি লোক ডাকবার মেয়ে? সে বলে বাপের অসুখের জন্যে এখানে আসতে পারে না, তাকে আমি বলে-বলে তবে আনি, সে ডাকবে লোক? টগরকে তো তুমি চেনো ঠগন!

জীবনে কত টগরকে দেখেছে ঠগন, কত টগরের ঘরে রাত কাটিয়েছে, সব মনে রাখবার মত লোক নয় শেঠ ঠগনলাল। বললে—ওসব কথায় গুলি মারো তুমি, টগর কি কলকাতা শহরে একটা? তা তার কী হয়েছে? তাকে পুলিসে আটকে রেখেছে থানায়? তা হলে এখনি অবিনাশবাবুকে টেলিফোন করে দিচ্ছি—

বলে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিতে যাচ্ছিল—

পদ্মরাণী বললে—ও হরি, তুমি তাও জানো না, অবিনাশবাবু যে বদ্‌লি হয়ে গেছে, অবিনাশবাবু থাকলে আর আমার ভাবনা? অবিনাশবাবুকে কি আমি কম চিনি তোমার চেয়ে?

—তা কে আছে এখন তার জায়গায়?

হঠাৎ বিন্দু হাঁউ-মাউ করতে করতে ঘরে ঢুকলো। বিন্দু চাবি নিয়ে বোতল আনতে গিয়েছিল ভাঁড়ার থেকে। এসেই পদ্মরাণীর দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় করে বললে—সব্বোনাশ হয়েছে মা—

—কী হলো রে? কী সব্বোনাশ হলো আবার? কোথায়?

বলে ধড়ফড় করে উঠলো পদ্মরাণী বিছানা ছেড়ে। তার পর বেতো শরীর নিয়ে বাইরে এলো বিন্দুর পেছন পেছন। ওদিক থেকে বাসন্তীরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সতেরো নম্বর ঘরের সামনেই ভিড়টা জড়ো হয়েছে। ঘরটার ভেতর থেকে হুড়কো দেওয়া। পদ্মরাণী জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েই চমকে উঠলো।

তার পর আর দাঁড়াতে পারলো না সেখানে। ডাকলে—দরোয়ান কোথায়? দরোয়ান, দরোয়ান—

দরোয়ান সামনে আসতেই পদ্মরাণী হুকুম দিয়ে দিলে—সদর-দরোজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দাও দরোয়ান।

আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফ্ল্যাট-বাড়িখানা নিঝুম হয়ে এলো এক নিমেষে। আর অমন যে পদ্মরাণী, যে হাজার বিপদের মধ্যেও মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারে, সে-ও যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—যা মা তোরা, যে যার ঘরে চলে যা, এখানে ভিড় বাড়াস নে—যা—

শেঠ ঠগনলাল পদ্মরাণীর ঘরের মধ্যে তখন সবে বোতল খুলেছে। সনাতন অতি যত্নে গেলাসে মাল ঢেলে দিয়ে সোডা মিশিয়ে দিয়েছে। গেলাসটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—নিন্ হুজুর—

ঠগনলাল গেলাসটা হাতে নিয়ে ঠোঁটে চুমুক দিলে। বললে—তুই নিয়েছিস্?

সনাতনের পোড়া মুখে এবার হাসি চল্‌কে উঠলো। বললে—আজ্ঞে……

ঠগনলাল ধমক দিলে। বললে—আর ভালোমানুষি করতে হবে না, খা, সোনাগাছিতে সবাই সমান আমরা, এখানে বড়লোক গরীবলোক কেউ নেই—লে চাল—

সনাতন অনিচ্ছার সঙ্গে গেলাসে মাল ঢালতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মারমূর্তিতে পদ্মরাণী ঘরের ভেতর এসে হাজির। যেন হাঁপাচ্ছে। বললে—সব্বোনাশ হয়েছে বাবা ঠগন, কুসুম গলায় দড়ি দিয়েছে—

—কুসুম? কুসুম কে?

—ওই যে যার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলুম, বিকেলবেলাও আমি কিছু জানতাম না। আমি নিজের হাতে চুল-টুল বেঁধে দিয়েছি, তার পর সাবান দিয়ে গা ধুয়েছে, তুমি আসবে বলে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী করে রেখেছি, এদিকে……

কথা আর শেষ হলো না। শেঠ ঠগনলাল দাঁড়িয়ে উঠলো।

—তুমি বাবা যেও না, একটু বোস, তুমি থাকলে তবু একটু ভরসা পাবো, তোমার তো তবু থানার দারোগাদের সঙ্গে জানাশোনা আছে, এখন কী করি বলো তো—

কিন্তু শেঠ ঠগনলালের নেশা তখন ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকেছে। আর দাঁড়াবার সময় নেই তার। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে জুতোটা পায়ে গলিয়ে নিলে। বললে—কিন্তু আমি তো চাবিটা ফেলে এসেছি—

—কিসের চাবি?

—আমার গদি-বাড়ির চাবি, এখন হঠাৎ মনে পড়লো, চাবিটা না নিলে আমার মুনিম যে দরজা বন্ধ করতে পারবে না, আমি এখুনি আসছি, চাবিটা নিয়ে এখুনি আসছি, তুমি কিচ্ছু ভেবো না পদ্মঠাকরুন—

বলে সোজা নিচে নেমে গেল। দরোয়ান ততক্ষণে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। সে তালাও খোলালে শেঠ ঠগনলাল। সনাতন পেছন পেছন যাচ্ছিল। তার আজ বরাতটাই খারাপ। পেছন থেকে ডাকলে—হুজুর—

হুজুরের তখন কথা বলারই সময় নেই। সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো।

স্থফল দেখতে পেয়েই দৌড়ে কাছে গেছে—হুজুর, চলে যাচ্ছেন যে, আপনার মেট্‌লি-চচ্চড়ি?

কিন্তু স্থফলের কথার উত্তর দেবার আগেই শেঠ ঠগনলালের আমেরিকা-মেড্ গাড়িটা স্টীয়ারিং হুইল্ ঘুরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্থফল সনাতনের দিকে চেয়ে দেখলে। সনাতন মুখের জ্বলন্ত বিড়িটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। নিজের মনেই বললে—দুশ্‌শালা, আজকের দিনটাই মাটি—

শিবপ্রসাদবাবুর এমনিতে বেশি সময় হয় না। অনেক কাজের মানুষদের সময় হওয়া শক্ত। সন্ধ্যেবেলা সকলের সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করেন। ওই একটু যা বিশ্রাম। তাও সব দিন হয় না। মাসের মধ্যে পনেরো দিনই পাড়ার বৃদ্ধরা এসে ফিরে যায়। একদিন শোনে মীটিং-এ গেছেন, আবার একদিন শোনে দিল্লী গেছেন, আবার কোনও দিন শোনে অফিস থেকে ফেরেন নি তখনও। বড় কাজের মানুষ। এই এত বয়েস হলো তবু কাজের কামাই নেই তাঁর। কেমন করে সংসার চলছে তা দেখবার দরকার নেই, কেমন করে কারবার চলছে তা-ও যেন দেখবার দরকার নেই, দেশের কাজ করলেই হলো।

বলেন—আর কাজও কি একটা হে, দিন দিন কাজ বেড়েই চলেছে যেন—

হিমাংশুবাবু বলেন—এত পরিশ্রম করলে চলবে কী করে? নিজের দিকটাও একটু দেখুন—

শিবপ্রসাদবাবু বলেন—আর নিজের দিক! কেউ তো কোনও কাজের নয়, কাউকে কোনও কাজের ভার দিয়ে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সব আমাকেই দেখতে হবে—

ছাব্বিশে জানুয়ারীতে কী প্রোগ্রাম হবে তা-ও তাঁর ভাবনা। গোয়ার মীটিং হবে হাজরা পার্কে, তা-ও তাঁর ভাবনা। আবার ক্রুশ্চেভ আসবে কলকাতায় তা-ও তাঁকেই ভাবতে হয়। তাঁকে না হলে কোনও কমিটিই কমপ্লিট হয় না। তার ওপর আছে লৌকিকতা, কোন্ মিনিস্টারের বাড়িতে মাতৃশ্রাদ্ধ সেখানে শিবপ্রসাদবাবুকে হাজির থাকতে হবে। কোন্ পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারির বাড়িতে ছেলের বিয়ে সেখানেও তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য। সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে না গেলেও চলে না। না-গেলে সবাই ভুল বোঝে। তাহলেই বলবে—ওর বাড়িতে গিয়েছিলেন, আমার বাড়িতে এলেন না। কিন্তু আজকাল আর খান না কোথাও।

বলেন—আমার আর খাওয়া-টাওয়া চলে না হে—তার চেয়ে বরং আমার ড্রাইভারটাকে খাইয়ে দাও, আমি বাড়ি চলে যাই—

সেদিন হিমাংশুবাবুকে বললেন—কী-রকম দেখলে হিমাংশু? খোকাকে কাজ-টাজ বুঝিয়ে দিলে?

হিমাংশুবাবু বললে—আজ্ঞে, ছোটবাবু খুব ইন্‌টেলিজেণ্ট, ওঁকে আর কী বোঝাবো, উনি নিজেই সব বুঝে ফেললেন—

—কী রকম?

—হ্যাঁ, ফাইলগুলো পড়তে পড়তে সব ক্লিয়ার হয়ে গেল, আমাকে কিছু বলতেই হলো না—

—ব্যালেন্স-শীট্? ব্যালেন্স-শীট্টা দেখিয়েছ?

হিমাংশুবাবু বললে—ব্যালেন্স-শীট্টাই আগে দেখতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন—ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অ্যালাউয়ান্স্ মোটে সাড়ে চার শো টাকা কেন?

—তাই নাকি? জিজ্ঞেস করলে ওই কথা?

যেন নিজের ছেলের বুদ্ধিতে খানিকটা গর্ব বোধ করলেন মনে মনে।

তার পর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। বললেন—পার্ক স্ট্রীটের প্রপার্টি সম্বন্ধে আর কোনও কোয়্যারী এসেছিল?

—এসেছিল, আমি বলেছি আপনি দিল্লী থেকে না ফিরলে কিছু হবে না—

—আচ্ছা তা হলে ফাইলটা একবার আমাকে দাও তো, আর অপারেটারকে

বলো আমাকে একবার কংগ্রেস অফিসের লাইনটা দিতে, বলো অতুল্যবাবু আছেন কিনা জেনে যেন আমাকে লাইনটা দেয়—

তার পর একটু পরেই হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন—এই যে, কেমন আছেন মশাই···

তার পর কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলেন—কে ?

—আমি শম্ভু, সদাব্রত আছে ? সদাব্রত গুপ্ত ?

রিসিভারটা ঝপাং করে রেখে দিলেন। তার পর হিমাংশুবাবুকে ডাকলেন। বললেন—আমাদের অপারেটার কি ঘুমোয় না কী বলো তো? যার-তার টেলিফোন আমাকে দেয় কেন ? খোকাকে খুঁজছিল কে ? শম্ভু কে ? কোথাকার শম্ভু ? খোকার বন্ধু ? এখানেবসেবুঝি টেলিফোন করতো বন্ধুদের সঙ্গে ?

ওদিকে শম্ভু শিবপ্রসাদবাবুর গলা শুনেই ভয়ে লাইনটা ছেড়ে দিয়েছে। একে লুকিয়ে লুকিয়ে টেলিফোন করেছিল, তার ওপর সদাব্রতর বাবার সঙ্গে ডাইরেক্ট কানেক্শন হয়ে গেছে। মধু গুপ্ত লেনের পাড়ার ছেলেরা ছোটবেলা থেকেই শিবপ্রসাদবাবুকে ভয় পেতো। সরস্বতী পুজোর সময় শিবপ্রসাদবাবুর কাছে গিয়ে চাঁদা চাইবারও সাহস পর্যন্ত ছিল না কারো। শিবপ্রসাদবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া মানে বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাওয়া। আসলে শম্ভু জানতোই না যে শিবপ্রসাদবাবু দিল্লী থেকে এসে গেছেন! টেলিফোনটা করেছিল আসলে কুন্তির জন্যে।

সব ক্লাবের যা হয় এ-ক্লাবেও তাই হয়েছিল। সদাব্রত চলে যাবার পর ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে কুন্তিও চলে গিয়েছিল ট্যাক্সি-ভাড়া নিয়ে। কুন্তি চলে যাবার পর তখন মীটিং বসেছিল ক্লাবের ঘরের ভেতরে।

শম্ভু আর কালীপদ দুজনেই তখন রাগে গর-গর করছে।

অক্ষয় বললে—এই জন্যেই তো বাঙালীদের ক্লাব টেঁকে না—

কালীপদ বললে—না টিঁকলে আমি কী করবো ? আমার কী দোষ ?

—কুন্তির সামনে তা'বলে আমাকে কিনা ইডিয়ট বলে গালাগালি দেবে শম্ভুটা—

শম্ভু সদাব্রতকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আবার ক্লাবেই ঢুকেছিল। সে বললে—আমি ইডিয়ট আগে বলেছি না তুই আমাকে আগে অভদ্র বললি ? সবাই এখানে সাক্ষী আছে—

কালীপদ বললে—ইডিয়ট আর অভদ্র এক কথা হলো ?

শম্ভু বললে—এক কথা হলো না ? তুই ড্রামা লিখতে পারিস বলে আমার চেয়ে ভালো ইংরিজি জানিস বলতে চাস্ ?

আবার বোধ হয় ঝগড়া শুরু হতে যাচ্ছিল। সবাই মিলে ঠেকিয়ে দিলে।

অক্ষয় বললে—এ-রকম করলে ক্লাব চলবে কী করে বলো তো ! এই জন্যেই তো বাঙালীদের ক্লাব টেঁকে না কোথাও—

তার পর দুজনের হাতে হাতে মিলিয়ে দিয়ে অক্ষয় বললে—যা হয়ে গেছে, গেছে, এখন তোরা হাত মেলা—'প্লে'টা আগে হোক, তার পরে তোরা যত ইচ্ছে ঝগড়া করিস, আমি নিজে প্রথম রিজাইন দেবো ক্লাব থেকে—আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে—

তা সেই সব আবার মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। এ-রকম ঝগড়া নতুন নয় এই বউবাজার সংস্কৃতি সংঘে। ক্লাব যেদিন থেকে হয়েছে সেই দিন থেকেই এই রকম একবার ঝগড়া হয়, আবার মিটে যায়।

—কিন্তু তা হলে কুন্তি যে চলে গেল, ওকে তো কিছু বলে দেওয়া হলো না। ও কি কালকে আসবে ?

কালীপদ বললে—আসবে না মানে ? আমি ক্যাশ পঞ্চাশ টাকা অ্যাড্ভান্স দিয়েছি ওকে, আর আসবে না বললেই হলো ?

শম্ভু বললে—ঠিক আছে, আসে তো ভালোই—কিন্তু আমি আর খবর দিতে পারবো না—

কালীপদ বললে—খবর দিতে হবে কেন ? সে আপ্সে আসবে, না এলে ছাড়বো কেন ?

পরদিন সবাই সন্ধ্যাবেলা আবার ক্লাবে এসে হাজির হলো। কিন্তু কুন্তি এলো না। তার পরদিনও না। তার পরদিনও না।

শম্ভু বললে—আমি বলেছিলুম সে আসবে না—কালীপদটা আমার চেয়ে যেন বেশি জানে—

কালীপদও একটু ভাবনায় পড়েছিল। তিন দিন যখন এলো না, তখন ভাবনার কথাই বটে। শম্ভু আর থাকতে পারে নি। তার মনে হয়েছিল সদাব্রতর সঙ্গে কুন্তি মেয়েটার বোধ হয় একটা কী-রকম জানাশোনা আছে।

কালীপদ বললে—জানাশোনা আছেই তো! সেদিন তো কুন্তি নিজের মুখেই বলে গেল—কুন্তিকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে কোথায় বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল—

—দূর! বাজে কথা, সদাব্রত সে-রকম ছেলেই নয়, তুই ওকে জানিস্ না—

দুলালদা বললে—না রে, বড়লোকদের পুষ্যিপুত্তুরদের পক্ষে কিচ্ছু অসম্ভব নয়—

শম্ভু বললে—আবার তুমি ওকে পুষ্যিপুত্তুর বলছো দুলালদা! জানো ক'দিন খুব মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর!

দুলালদা বললে—দূর! ওদের কথা ছেড়ে দে, তোরা তো নিজের চোখেই দেখলি, মেয়েমানুষের গন্ধ পেয়েই ক্লাবে আসতে আরম্ভ করেছিল—

কালীপদ বললে—না দুলালদা, তুমি ছিলে না সেদিন, আমাদের কুন্তিকে নিয়ে ও ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়ায়—কুন্তি নিজে এখানে সকলের সামনে বলে গেল—

শম্ভু বললে—ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়াতে যাবে কেন? ওদের গাড়ি নেই? ওদের ক'খানা গাড়ি জানিস তুই!

দুলালদা বললে—আরে আহাম্মক, নিজের গাড়িতে কেউ মেয়েমানুষ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়! তার বেলায় ট্যাক্সি—

তা সেই সব কথার প্রমাণ পাবার জন্যেই শম্ভু সদাব্রতের অফিসে টেলিফোন করেছিল। কিন্তু বাঘের মুখ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে সে। তবে কালীপদ হাল ছাড়ে নি। এত কষ্ট করে তার লেখা 'মরা-মাটি', এমন সুযোগ আর আসবে না। বেশ ভালো করে দপ্তরীর দোকান থেকে 'মরা-মাটি'র চারখানা কপি চামড়া দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছিল। প্ল্যান্ ছিল 'প্লে' হবার আগে কোনও পাব্লিশার পাক্ড়ে বইখানা ছাপিয়ে ফেলবে। তার পরে 'মরা-মাটি' একবার সাক্সেস্ফুল হলে তখন নেক্সট্ 'প্লে'টা কোনও পাবলিক স্টেজে ধরাবার জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করবে। বাংলা দেশ বড় জঘন্য দেশ। এখানে কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। যে ধরাধরি করতে পারে, যে তেল দিতে পারে, তারই এখানে জয়জয়কার। কালীপদ এ-সব খুব ভালো করে জানে। আর জানে বলেই এত ইন্সাল্ট সহ্য করে এই ক্লাবের মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। একবার নাম হয়ে গেলে তখন লাথি মেরে এ-ক্লাব থেকে চলে যাবে কালীপদ। তখন হাজার খোশামোদ করলেও আর এই চ্যাংড়াদের ক্লাবে পা দিচ্ছে না।

খুব শিক্ষা হয়ে গেছে তার। বাংলা দেশে জন্মেছে যখন, তখন এটুকু সহ্য করতেই হবে।

ক্লাব থেকে সেদিন রাস্তায় বেরিয়েই আর বাড়ির দিকে গেল না কালীপদ। আজ এর একটা হিল্লে করতেই হবে।

রাস্তার মোড় থেকে বাস ধরে একেবারে সোজা যাদবপুর।

বালিগঞ্জের মোড়ে আর একবার বাস বদলাতে হয়েছিল। তা হোক, উদ্বাস্তু মেয়েকে দিয়ে উদ্বাস্তুর রোল্‌টা শেষ পর্যন্ত ভালোই সিলেকশান্ হয়েছিল! এই শেষ চান্স! আর পঞ্চাশটা টাকাও অ্যাড্‌ভান্স দেওয়া হয়েছে। তারও একটা হিসেব দিতে হবে তো ক্লাবের কাছে।

ভর্তি বাস। ঢাকুরিয়া লেক পেরিয়ে সোজা চলেছে বাসটা। তার পর দু-পাশে ডোবা আর ফাঁকা পোড়ো জমি। মাঝে মাঝে দু-ধারে দোকান। রাত হয়ে এসেছে বেশ। কালীপদ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চলছিল। এক-একটা স্টপেজ আসে আর এক ঝাঁক লোক নেমে যায়।

—যাদবপুর, যাদবপুর—

কালীপদ জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলে। আগের দিনও এখানে এসেছিল এই রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এমনি দোকানপাট, এমনি ভিড় ছিল সেদিনও। তবে আজ রাত হয়েছে বলে যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা।

হঠাৎ একটা জায়গায় বাস থামতেই কালীপদ চেঁচিয়ে উঠলো—রোখ্‌কে, রোখ্‌কে—

প্রথমটায় চিনতে পারে নি কালীপদ। সেদিন বিকেলবেলার দিকে এসেছিল, আর আজ রাত হয়ে গেছে। 'মরা-মাটি' নাটকের মধ্যে এইদিককার সিন আছে। হিরোইন 'শান্তি' এইখান থেকে বাসে উঠে যায় চৌরঙ্গীর দিকে। সেখানে গিয়ে সেজে-গুজে বেড়ায়। তার পর তেমন কোনও লোক পাকড়াতে পারলে তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে ওঠে।

—হ্যাঁ মশাই, এদিকে উদ্বাস্তু কলোনীটা কোন্ দিকে?

লোকটা বললে—কোন্ কলোনীতে যাবেন? বাঘা যতীন কলোনী, না নেতাজী কলোনী?

নামটা জানে না কালীপদ। বললে—নাম তো ঠিক জানি না—

—কার বাড়িতে যাবেন? নাম কী ভদ্রলোকের?

কালীপদ বললে—মনোমোহন গুহ, ফরিদপুরে বাড়ি, এখানে তাঁর মেয়ে কুন্তি গুহ থিয়েটারে প্লে-টে করে—

আর বলতে হলো না। বাপের নামের চেয়ে মেয়ের নামই বেশি বিখ্যাত।

—ও বুঝতে পেরেছি, ওই নতুন কলোনীটা, ওটার এখনও নাম হয় নি, এই সামনের মাঠের ওপর দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ আছে, সোজা চলে যান—

কালীপদ চেয়ে দেখলে। রাত্রে জায়গাটা একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে। ঝাঁ ঝাঁ অন্ধকার। সামনে কিছু দেখা যায় না। কুন্তি রাত্তিরে এই রাস্তা দিয়ে একলা ফেরে কী করে? কালীপদরই তো ভয় করছে। দূরে, অনেক দূরে কয়েকটা আলো টিম টিম করে জ্বলছে। কালীপদ সেই আলোগুলো লক্ষ্য করেই অন্ধকার মাঠের ওপর পা বাড়ালো। আশে-পাশে লোকজন কেউ নেই।

চলতে চলতে হঠাৎ কালীপদর মনে হলো যেন কালো ছায়ামূর্তির মত কয়েকজন লোক ঘোরাফেরা করছে। গা-টা ছম্ ছম্ করতে লাগলো। আর তার পরেই যেন হঠাৎ কোথায় হৈ-চৈ-হল্লা শুরু হলো। দূর থেকে অনেক লোকের চীৎকার। কালীপদ একবার থমকে দাঁড়ালো। ফাঁকা মাঠের ওপার থেকে একসঙ্গে অনেক লোক যেন আর্তনাদ করছে। অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় না। কোথা থেকে একদল লোক যেন এদিক থেকে ওদিকে দৌড়ে যাচ্ছে। ভারী-ভারী পায়ের আওয়াজ। সমস্ত যেন কেমন রহস্যময়। অথচ সেদিন, সেই আগের দিন তো কিছুই মনে হয় নি।

কালীপদর মনে হলো আর এগোনো উচিত হবে না। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

আর তার পরেই সামনে যেন দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। যেন বাড়িগুলোতে আগুন ধরে উঠেছে। সামনের টিমটিমে আলোগুলো হঠাৎ লক্ষ লক্ষ শিখা বার করে আকাশে হাত বাড়াতে চাইছে।

কালীপদ ফিরে আসছিল। পেছন থেকে হঠাৎ কারা যেন দৌড়তে-দৌড়তে আসছে। থমকে দাঁড়াতেই আরো চেঁচামেচি শোনা গেল। অনেক লোক। একেবারে দু-তিন শো লোকের ভিড়। যেন মেয়েমানুষের গলাও শোনা যাচ্ছে। একেবারে কালীপদর কাছে এসে পড়েছে সবাই। কাছে আসতেই লোকগুলোর কথা কানে এলো।

—মার শালাদের, মার, মার—

—কী হয়েছে মশাই?

আবার একজন লোক চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছে—পুলিস, পুলিস—

কালীপদ আবার জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মশাই ওখানে ?

—মশাই, কলোনী দখল করতে এসেছে—গুণ্ডা লাগিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—

—কারা ? কারা গুণ্ডা লাগিয়েছে ?

—জমিদার, জমিদারের লোক—বলতে বলতে সোজা উল্টোদিকে দৌড়ে চলে গেল। আর দাঁড়ালো না। পেছনেও অনেক লোক আসছিল। সঙ্গে মেয়েমানুষ। কোলে ছেলে। তারা কাঁদছে। কালীপদ তাদেরও জিজ্ঞেস করলে। কিন্তু তাদের বোধ হয় তখন উত্তর দেবার মত মনের অবস্থা নয়। ক্রমেই তাদের সংখ্যা বাড়ছে। ওদিকে হল্লাও বাড়ছে। চীৎকার গালাগালি কান্না। আর সেখানে দাঁড়াতে সাহস হলো না কালীপদর। এখনি হয়ত পুলিস এসে যাবে। এখনি হয়ত গুলি চলতে শুরু করবে। এখনি হয়ত সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। রায়টের সময়ও এইরকম হয়েছিল কলকাতায়। যুদ্ধের সময় মিলিটারী লরী পোড়াবার সময়ও এই রকম হয়েছিল। বামার লরীর অফিসের ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের ক্লার্ক কালীপদ এ-সব অনেক দিন থেকে দেখে আসছে। কিন্তু এতদিন পরে আবার যে এমন হতে পারে তা ভাবতে পারে নি। উদ্বাস্তরা যে আবার এই ওয়েস্ট-বেঙ্গল থেকেও বাস্তহারা হবে, তা কালীপদ কেন, কেউই ভাবতে পারে নি—

কালীপদ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আবার যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই ফিরে চললো ; 'মরা-মাটি'র যেন আবার নতুন করে মৃত্যু হলো।
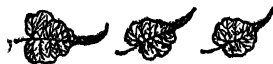
এ-দিকটা কিন্তু তখনও দিন। এই চিৎপুরে। এখানে তখনও গড়-গড় করে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি গড়িয়ে চলছে। এখানে তখনও ফুর্তির গড়ের মাঠ। ফুটপাথের ভিড়ের মধ্যে একটা শাড়িপড়া মেয়েমানুষ দেখলেই লোকে ঘুরে ফিরে মুখখানাকে দেখবার চেষ্টা করে। রাস্তা দিয়ে সাবধানে চলতে হয়, নইলে পানের পিচ্ এসে পড়ে মাথায়। মালাই-কুলপীর ব্যারিটোন্ আওয়াজের কদর খুব বেশি এ-পাড়ায়। তারা সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারে না রাত একটা-দুটো পর্যন্ত। আর আছে মেট্‌লি-চচ্চড়ি !

দূর থেকে সুফলের দোকানের আলোটা জল্-জল্ করে। সামনের কাচের কেসের ভেতর লাল লাল ডিম-ভাজা আর কাঁকড়ার দাঁড়া সেই ঝক্‌ঝকে আলোয় রসিক লোকের চিনতে ভুল হয় না।

কিন্তু সে-দোকানটা বন্ধ দেখেই যূথিকার কেমন সন্দেহ হয়েছিল।

—ওলো, সুফলের দোকান বন্ধ দেখছি যে টগর? কী হলো ভাই বল্ তো?

কুন্তি চেয়ে দেখলে। থানা থেকে বেরিয়ে দুজনেই হাঁটতে হাঁটতে আসছিল। দু' রাত থানার হাজতে থেকেই চেহারা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। সত্যিই সুফলের দোকান বন্ধ। পেছন থেকে কে যেন শিস্ দিয়ে উঠলো।

—আ মর্ মিন্‌সে, এখন বলে খিদেয় পেট জ্বলছে, এখন এসেছে ফষ্টি-নষ্টি করতে!

সুফলের দোকান বন্ধ হলে খাবে কী? সুফল ছাড়া ধারে কে আর খাওয়াবে?

কিন্তু পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের সামনে আসতেই আরো অবাক কাণ্ড! যূথিকাও অবাক হয়ে গেছে, কুন্তিও অবাক।

যূথিকাই জোর করে টেনে এনেছিল কুন্তিকে। নইলে কুন্তি আসতে চায় নি। তার ভাবনা ছিল বাড়ির জন্যে। বাবার হাঁপ-কাশিটা বেড়েছিল। একলা ছোট বোনটা কী করছে কে জানে! বাড়ি ছেড়ে তো কোনও দিন বাইরে রাত কাটায় নি! বাড়িতে গিয়ে কী জবাবদিহি করবে তাই-ই মনে মনে ভাবছিল। কিন্তু এখানে এসেই থমকে দাঁড়াতে হলো।

সামনেই দু'জন পুলিস দাঁড়িয়ে। কিছু রাস্তার লোকও জড়ো হয়েছে।

কে একজন পুলিসদের লক্ষ্য করেই বুঝি জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে এখানে সেপাইজী?

পাশের একজন লোক উত্তর দিলে—মশাই ওদিকে যাবেন না, চলে আসুন—

—কেন কী হয়েছে তাই বলুন না?

—ভেতরে একটা মাগী গলায় দড়ি দিয়েছে শুনছি—

কথাটা কানে যেতেই কুন্তি থর থর করে কেঁপে উঠলো। তার পর যূথিকাকে নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এলো। গলায় দড়ি দিয়েছে? কে? গোলাপী? না বাসন্তী? না দুলারী, না সিন্ধু? না···কে?

সন্ধ্যেবেলাই সকলের সন্দেহ হয়েছিল। এই কলোনীর সামনে অচেনা লোক কয়েকজন ঘোরাফেরা করছিল। এমন অচেনা লোক দেখলেই সবাই কেমন সন্দেহ করে। উদ্বাস্তুদের ঘর-বাড়ি হবার পর থেকেই এমনি নানা ধরনের লোকজনের যাতায়াত চলছিল। ঈশ্বর কয়াল শেয়ালদ' স্টেশন থেকে সবাইকে যেদিন প্রথম এখানে নিয়ে এসেছিল, সেই দিন থেকেই।

রাস্তায় কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখলেই প্রশ্ন করতো—এদিকে কী? কাকে চাই?

রাস্তার লোকেরা বলতো—আজ্ঞে এমনি বেড়াচ্ছি—

—বেড়াচ্ছি মানে? বেড়াবার আর জায়গা নেই কোথাও? কলকাতায় অত বড় গড়ের মাঠ রয়েছে সেখানে বেড়াতে যান না, এখানে কী দেখতে এসেছেন?

লোকেরা সেই থেকেই সবাই একটু সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিরাট কলোনী গড়ে উঠেছে। রমেশ কাকাই ঈশ্বর কয়ালকে ডেকে এনে এখানে বসিয়েছিল। তখন কুন্তি ছোট। ছোট মানে এই বারো-তেরো বছর বয়েস তখন তার। ফরিদপুরের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে একেবারে সোজা এখানে। নামেই শুধু এ কলকাতা। কলকাতার কিছুই নেই। জীবন সামন্ত, বিষ্টু সান্যাল, সবাই বাবার জানাশোনা।

ছোট ভাইটার জন্যেই বেশি ভাবনা ছিল। তা এখানে আসবার পরই মারা গেল সেই ভাইটা। কুন্তির কান্না এসেছিল সেদিন খুব। বাবা ডাকতো বিশু বলে। আসল নাম বিশ্বনাথ। সেই বিশু মারা যাবার পর থেকেই মনোমোহনবাবুর শরীরটা ভেঙে গেল। রাতারাতি যেন বুড়ো অথর্ব হয়ে গেল লোকটা। ধন্দ'র মতো দাওয়ায় বসে বসে শুধু তামাক খেতো আর কাশতো। কেশে কেশে থুতু ফেলতো সামনের উঠোনে।

ডাকতো—ও বুড়ি, বুড়ি—

ছোট মেয়েটার আর নাম দেওয়া হয় নি। ওই বুড়ি হবার পরেই মনোমোহনবাবুর স্ত্রী মারা যায়। মনোমোহনবাবু ভেবেছিল, যে-মেয়ে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মা'কে খেলে তার নাম দিলেও যা, না-দিলেও তাই। তাই সে

অনামী হয়েই রইল। কিন্তু তবু ডাকতে হলে একটা নাম তো চাই, তাই সহজ উচ্চারণের অতি সাধারণ নামটাই তাকে দিয়ে দিয়েছিল সবাই। সেই বুড়িই দিদির মতন বড় হতে আরম্ভ করেছে। দিদির মতই হয়ত একদিন বুড়ো বাপকে খাওয়াবে। আর তার পর? মনোমোহনবাবু তার পরের কথা আর ভাবতে পারে না।

বলে—তার পর তো আমি আর থাকছি না—

বিষ্টু সান্যাল বলতো—থাকছো না মানে?

—থাকছি না মানে থাকছি না। একদিন চোখ উল্টে চিৎপাত হয়ে চণ্ডীতলার শ্মশানে পুড়ে ছাই হয়ে যাবো—তোমরা আমায় কাঁধে তুলে পুড়িয়ে আসতেও সময় পাবে না বিষ্টু—

এমনি করেই কাটতো এই কলোনীর দিনগুলো। বুড়োরা দাবার আড্ডায় কেউ কেউ বসতো। আর জোয়ান ছেলেরা এদিক-ওদিক কাজের চেষ্টায় ঘুরতো। কোথায় রাইটার্স বিল্ডিং, কোথায় করপোরেশন অফিস, কোথাও চাকরি খুঁজতে আর বাকি রাখতো না কেউ। তার পর রেফুজীদের লোন্ দেওয়ার আইন হলো। যারা পাকিস্তান ছেড়ে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসেছে তারা যাতে বাড়ি-ঘর তৈরি করতে পারে, দোকানপাট করে পেট চালাতে পারে তার জন্যে টাকা বরাদ্দ হলো। সেই টাকা নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একটা দুটো টাকা নয়, হাজার-হাজার টাকা। কেউ চার হাজার, কেউ বা আবার দশ হাজার টাকা। মনোমোহনবাবু বুড়ো মানুষ। আর সকলের মত মনোমোহনবাবুও ফর্মে সই করে দিলে। যে-ছোকরা সই নিয়ে গিয়েছিল সে বললে—দিন পনেরোর মধ্যে টাকা পাওয়া যাবে। দিন পনেরো শুধু নয়, পনেরো মাসের মধ্যেও টাকা এলো না। গুপ্তপাড়ার হরিপদ গুপ্ত, উত্তরপাড়ার সাধু সামন্ত, বিষ্টু সান্যাল সবাই টাকা পেয়ে গেল। কিন্তু মনোমোহনবাবুর টাকার আর পাত্তা নেই।

হরিপদ গুপ্ত বললে—তুমি নিজে একবার যাও মনোমোহন, টাকা-কড়ির ব্যাপারে নিজে না-গেলে হয়?

তা শেষ পর্যন্ত নিজেই গিয়েছিল মনোমোহনবাবু। কুন্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। কোথায় অক্ল্যাণ্ড্ হাউস্, অনেক খুঁজে-খুঁজে সেখানে যখন মেয়ে নিয়ে পৌছোল তখন সেখানকার বড়বাবু বললে—আপনার টাকা তো দেওয়া হয়ে গেছে, এই দেখুন, আপনি এখানে সই দিয়ে টাকা নিয়ে গেছেন—

কুন্তির সেই-ই প্রথম বলতে গেলে বাইরের মানুষের সংস্পর্শে আসা। বৃহৎ পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়া। সেই প্রথমবার জানতে পারলে তার রূপ আছে, তাকে দেখতে লোকের ভালো লাগে। সে হাসলে লোকে খুশী হয়। তাকে দেখলে লোকে বসতে চেয়ার দেয়। তার জন্যেই তার বাবাকে তারা বসতে চেয়ার দিলে। তাকে খুশী করবার জন্যেই চা দিলে দু'জনকে।

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলে—এই আপনার মেয়ে বুঝি?

মনোমোহনবাবু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি, একলা মানুষ, এদের মা নেই তো—

বড়বাবুর মুখ দিয়ে 'আহা' শব্দ বেরোলো। অনেক সহানুভূতির কথাও বেরোলো। দিনকাল কত খারাপ পড়েছে তার প্রসঙ্গও উঠলো। বাবার কিন্তু কিছুই সন্দেহ হয় নি। ভেবেছিল গভর্মেণ্ট অফিসে এত ভালো-ভালো লোক থাকতে এতদিন মিছিমিছি হয়রানি হয়েছে তার। আগে জানলে এখানে এসেই ধর্না দিতো ফরিদপুরের মনোমোহন গুপ্ত মশাই—

মনোমোহনবাবু বললে—তা হলে কবে আসবো আবার?

বড়বাবু ভদ্রলোকের বয়েস বেশি নয়। বেশ কোট-প্যাণ্ট নেকটাই পরা মধ্যবয়সী মানুষ। বললে—সে কি, আপনি এই শরীর নিয়ে মিছিমিছি কেন টানা-পোড়েন করবেন? আর কেউ নেই আসবার?

কুন্তি বললে—আমি আসতে পারি, আমি এলে চলবে?

ভদ্রলোক খুশী হলো খুব।—নিশ্চয় নিশ্চয়! এই তো চাই! আপনার মেয়ে বড় হয়েছে, এই মেয়েই আপনার ছেলের কাজ করবে! কত বয়েস হলো আপনার মেয়ের?

মনোমোহনবাবু বললে—এই তো তেরোয় পড়েছে—

—না বাবা, আমার তো ষোল বছর বয়েস হলো এই অঘ্রাণে—

তা ষোল ষোলই সই। বুড়ে বাপ মেয়ের বয়েস কমিয়েই বলতে চেয়েছিল। কিন্তু বেশি বয়েস বললে যদি কাজ হয়, যদি টাকা দেয় গভর্মেণ্ট তো ষোলই হোক না, ক্ষতিটা কী? সেই ষোল বছরের কুন্তির দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল ভদ্রলোক। তার পর বলেছিল—হ্যাঁ, বুড়ো বাপের জন্যে এইটুকু আর করতে পারবে না?

মনোমোহনবাবু কৃতজ্ঞতায় একেবারে গলে গিয়েছিল সেদিন।

কুন্তির আজো মনে আছে সে-সব কথা! কুন্তির জীবনে সেই-ই বলতে

গেলে প্রথম এ-লাইনে হাতে-খড়ি। সেই টাকা আনতে যাবার নাম করে 'অক্ল্যাণ্ড হাউসে' যাওয়া। তার পর সেখান থেকে রেস্টুরেন্ট, সিনেমা, নিউ মার্কেট। তার পরে ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে একেবারে স্বর্গে উঠে যাওয়া। কিংবা সত্যি কথা বললে নামাও বলা যায়। ধাপে ধাপে নামতে নামতে একেবারে নরকে গিয়ে পৌঁছোনো। সেই টাকা আনতে যাওয়ার উপলক্ষ করেই কুন্তির গায়ে একদিন সিল্কের শাড়ি উঠলো, ঠোঁটে লিপ্-স্টিক্ লাগলো, চুলে ডোনাট্ খোঁপা উঠলো। কুন্তির এই হঠাৎ রূপান্তরে কলোনীর মেয়ে-মহলেও চমক লাগলো। তাদের আর ঘরে এঁটে রাখা দায় হয়ে উঠলো। তারাও দলে দলে বেরিয়ে পড়লো শহরে। কলকাতা শহরে রূপ-যৌবন থাকলে ভাবনা!

বাড়িতে এসেই বাবার হাতে টাকা এনে দিত কুন্তি। কোনও দিন কুড়ি, কোনও দিন তিরিশ, আবার কোনও দিন দশ। এক-একদিন হয়ত আবার পঞ্চাশ!

বাবা বলতো—এ রকম খেপে-খেপে দিচ্ছে কেন রে? একসঙ্গে থোক টাকাটা দিতে পারে না ওরা?

কুন্তি বলতো—দিচ্ছে ওরা এই-ই যথেষ্ট, না দিলেও তো পারতো—

বাবা বলতো—তা বটে—দিচ্ছে এই-ই তো যথেষ্ট—

কিন্তু বরাত খারাপ কুন্তির। সুখের মুখ দেখবার মুখেই বাড়া ভাতে ছাই পড়লো। অক্ল্যাণ্ড্ প্রেসের বড়বাবু বিভূতিবাবু ধরা পড়লো পুলিসের হাতে। আর কুন্তির কপাল পুড়লো।

বাবা জিজ্ঞেস করলে—তা পুলিসে ধরলো কেন? কী করেছিল ভদ্রলোক?

কুন্তি বললে—তা ধরবে না? সংসারে ভালো লোকের হেনস্থা হয় না?

—তা হলে বাকি টাকাটা?

কুন্তি বলতো—দেখি, সেই বাকি টাকাটার জন্যেই তো এখন রোজ যাচ্ছি—

তা অক্ল্যাণ্ড হাউসের বড়বাবু ধরা পড়লো তো বয়ে গেল। কুন্তি ততদিনে কলকাতা শহরটাকে গুলে খেয়ে ফেলেছে। কলকাতা শহরের নাড়ী-নক্ষত্র তখন তার নখদর্পণে! কোন্ রাস্তার কোন্ মোড়ে কখন গিয়ে দাঁড়ালে কারা পিছু নেয় তাও জানা হয়ে গিয়েছে। থিয়েটারের ক্লাবে রিহার্সাল দেবার উপলক্ষ করে তারা কী চায় তাও জানতে বাকি নেই।

আর কলকাতার কোন্ গলিতে এক ঘণ্টার জন্যে কত দরে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় তাও প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

সেই অক্ল্যাণ্ড্ হাউসের বড়বাবুর কাছে হাতে-খড়ি হয়েছিল আর শেষ হয়েছে এই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে। কিন্তু এত দিন পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে এসেছে, এমন করে কখনও থানার হাজতে আটক থাকতে হয় নি। তাই প্রথমটা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জালঘেরা পুলিসের গাড়ি। তারই ভেতর পুরে দিয়েছিল তাকে আর যূথিকাকে।

যূথিকা পাকা মেয়ে। হাড়কাটা গলিতে আগে ছিল। এখন পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে এসেছে। সে অত ভয়-টয় পায় নি। এ-রকম অনেকবার তাকে হাজতে থাকতে হয়েছে। কখনও মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামি করার জন্যে, কখনও বা মানুষ খুন করার অপরাধে। প্রত্যেক বারই খালাস পেয়ে গেছে।

সে বললে—দূর, পুলিসকে আবার ভয় কী রে? পুলিস কি বাঘ?

কুন্তি বললে—ওরা যদি জেলে পুরে দেয়—

—দেয় দেবে, পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে খাবো আর ঘুমুবো—

এ-লাইনেই জন্ম হয়েছিল যূথিকার, এই লাইনেই কর্ম। যূথিকার মা-ও ছিল এই লাইনের মেয়েমানুষ। তার সব দেখা আছে। হাজতঘরও দেখা আছে, জেলখানাও। যূথিকা কতদিন তেঁতুল-গোলা জল খাইয়ে তার মা'র নেশা ভাঙিয়েছে। কতদিন তার মা'র ঘরে মাতালদের মধ্যে খুনোখুনি বেধে গেছে। সে-সব ছোটবেলাকার কাহিনী। তখন মা'র সঙ্গে কতদিন তাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছে জেলখানায়। হাড়কাটার গলিতে মা পায়ের কাছে লম্ফ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো রাস্তার দিকে চেয়ে। এক-একটা মাতাল যেতো আর মা উদ্‌গ্রীব হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতো। শেষকালের দিকে মা'র বয়েস হয়ে গিয়েছিল। আর কেউ আসতো না ঘরে। তখন মা আরো বেশি করে পাউডার ঘষতো মুখে, আরো বেশি পান খেয়ে ঠোঁট লাল করতো! তার পর এক-একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতো আবার। সব যূথিকার মনে আছে।

কুন্তি জিজ্ঞেস করেছিল—তা তুই কেন এ-লাইনে এলি?

যূথিকা বলেছিল—আমার মা'ই তো আমাকে নিয়ে এলো ভাই, নইলে আমি তো একটা মোটর-ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলুম, সে আমায় বিয়ে করেছিল—

—তার পর ?

—তার পর মামলা হলো। মা মামলা করে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে ঘর ভাড়া করে দিলে—বললে—বুড়ো বয়েসে আমি খাবো কী ?

কিন্তু যূথিকা ছিল বলে যা-হোক দু' দিন দু' রাত্তির কোনও রকমে কেটেছিল। যূথিকা পুলিসকেও ভয় করতো না, দারোগাকেও না। সমস্ত হাজত-ঘরখানা চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একেবারে মাত করে তুলতো। মুখ-খিস্তি করতো গলা বাজিয়ে।

দারোগাবাবু বলতো—অত চেঁচাচ্ছো কেন ? কী হয়েছে ? থামো।

যূথিকাও কম নয়। বলতো—বেশ করবো চেঁচাবো, পুলিসের আমি খাই না পরি ? ও বেটারা কেন গালাগালি দেবে ?

—কখন তোমাদের গালাগালি দিলে ?

—গালাগালি দেয় নি ? আমাদের মাগী বলে নি ? আমরা হলুম মাগী ! আমরা যদি মাগী হই তো তোর মা-ও মাগী, তোর মাগ্‌ও মাগী, তোর চোদ্দ-পুরুষ মাগী—

সেই অন্ধকার হাজত-ঘরখানার মধ্যেও যূথিকা যেন মারমুখী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আর বেশি বলতে হয় নি তাকে। পুলিস-কনস্টেবল্‌রাই যূথিকাকে ধরে মারতে মারতে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আর তার সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। ফিরে এলো যখন তখন থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত তিনটে বাজছে। মেরে বোধ হয় যূথিকার পিঠখানাকে একেবারে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। কাল্‌শিটে পড়ে গিয়েছে সারা পিঠে। কুন্তি দেখলে হাত দিয়ে দিয়ে।

কুন্তি জিজ্ঞেস করলে—কী দিয়ে মারলে রে ?

—দ্যাখ্‌ না, হারামজাদাদের কী করি ! হারামজাদাদের হয়েছে কী ? মা'র কাছে যেতে হবে না ? কত টাকা মা'র কাছ থেকে নেয় পোড়ারমুখোরা তা জানি না ভেবেছে ? আমাদের পাড়ায় মাগ্‌না মাল খেতে আসতে হবে না ? তখন ঝামা দিয়ে মুখ ঘষে দেব না ? আমি খান্‌কির মেয়ে, আমার গায়ে হাত তোলা !

কী অদ্ভুত মেয়ে ! কুন্তিকে কেউ অপমান করে নি। তবু কুন্তির যেন মনে হয়েছিল যেন যূথিকাকে নয় তাকেই কেউ চাবুক মেরেছে ! তাকেই কেউ চাবুক মেরে পিঠে দাগ দিয়ে দাগী করে দিয়েছে। অথচ যূথিকার যেন গ্রাহ্যই নেই। সেই অবস্থাতেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলো। তার পরদিন সকালবেলা মা

মত। আচ্ছা, তুমি শ্যামলীকে চেনো তো? তোমরা তো বকুলবাগান ক্লাবে একসঙ্গে প্লে করেছ, তাকেই 'আলেয়া' দেওয়া হয়েছিল, তার আবার শুনছি নাকি ছেলে হবে…

কুন্তি এ-কথারও কোনও জবাব দিলে না।

শম্ভু বললে—তুমি যদি চালিয়ে দিতে পারো তো বলো, করবে?

কুন্তি বললে—পরে কথা বলবো, সারাদিন রেলগাড়িতে এসেছি, মাথা টলছে এখন—তিন নাইট ধরে প্লে করে টায়ার্ড হয়ে গেছি—

—তা পরে কবে কথা বলবে বলো? কবে কোথায় কখন দেখা হবে বলো তুমি?

—কেন? আমার বাড়ি-ঘর নেই? বাড়িতেই দেখা করবেন, সকালবেলার দিকে দেখা করবেন—

শম্ভু বললে—তা হলে তোমার নতুন ঠিকানাটা বলো—

—নতুন ঠিকানা মানে? আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি, কালীপদবাবু তো আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন—

শম্ভু বললে—সে কি! কালীপদ তোমার বাড়িতে গিয়েছিল! সে বললে তোমাদের বাড়ি-টাড়ি সব ভেঙে মাঠ করে দিয়েছে—

—ভেঙে মাঠ করে দিয়েছে? কারা?

শম্ভু আরো অবাক। বললে—তুমি জানো না কিছু? তুমি আসানসোলে কবে গিয়েছিলে? ও যে বললে—সেখানে উদ্বাস্তুদের মাটির বাড়ি-টাড়ি সব গুণ্ডারা এসে ভেঙেচুরে মাটি-সমান করে দিয়েছে, তুমি জানো না? শোন নি কিছু?

কুন্তিও যেন আকাশ থেকে পড়লো।

শম্ভু বলতে লাগলো—তার পরদিন সকালবেলা আবার কালীপদ গিয়েছিল, সে বললে সেখানে একগাদা পুলিস-টুলিস জমা হয়েছে, পুলিস পাহারায় পাঁচিল গাঁথা হচ্ছে, দেখে এসেছে—

কুন্তির মাথার ওপর যেন বাজ ভেঙে পড়লো! তা হলে তার বাবা? বুড়ি? তারা কোথায় গেল? এই যে সেদিন দেড়শো টাকা খরচ করে টিনের চাল লাগিয়েছিল! বাবার যে হাঁফ-কাশি হয়েছিল! কবিরাজের কাছ থেকে যে কুন্তিই ওষুধ এনে দিয়েছিল কত টাকা খরচ করে! বাড়ি ভেঙে দিলে কোথায় আছে তারা? সেই বিষ্টুকাকা, সেই সাধুকাকা, সেই…

হঠাৎ যাদবপুরের একটা বাস আসতেই কুন্তি তাতেই উঠে পড়লো। আর তার পর ভিড়ের মধ্যে আর তাকে দেখা গেল না।

শম্ভুও সরে এলো। বড্ড চাল্ হয়েছে আজকাল ছুঁড়িদের। চারদিক থেকে 'কল্' আসছে কিনা! দু' হাতে টাকা লুঠছে! আর তাদেরও যেমন হয়েছে! মেয়ে না হলে প্লে-ও হবে না। তাই সাপের পাঁচ পা দেখেছে এরা। এই মেয়েগুলো।

শম্ভু আর দাঁড়ালো না। তার বাসও এসে গিয়েছিল ওদিকে।

সেই বিনয়ের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ আবার রাস্তায় দেখা।

—কী রে সদাব্রত? কী খবর?

বিনয়! সদাব্রত গাড়িটা ব্রেক কষে থামিয়ে দিলে। বিনয় কাছে এসে দাঁড়ালো। সদাব্রত বললে—কোথায় যাচ্ছিস? চাকরি পেয়েছিস নাকি?

বিনয় কোট-প্যাণ্ট পরেছে। নেকটাই পরেছে। চকচকে জুতো। আগের দিন ধুতি-শার্ট ছিল গায়ে। বললে—আজকে একটা ইণ্টারভিউ আছে ভাই—আমাকে একটু পৌঁছে দিবি তোর গাড়িতে—

বিনয় উঠলো। বললে—ডালহৌসীর মোড়ে নামিয়ে দিলেই চলবে, তুই কোথায় যাচ্ছিস, অফিসে?

সদাব্রত বললে—না, তুই আমার একটা সাহায্য করতে পারিস? কোনও বাড়ি-টাড়ি তোর খোঁজে আছে? এই দু'খানা ঘর হলেই চলে যাবে—

—তোর আবার বাড়ির কিসের দরকার?

সদাব্রত বললে—আমার জন্যে নয়, আমার এক প্রাইভেট টিউটর ছিলেন, তাঁর জন্যে—

বিনয় বললে—দূর, ভগবান চাইলে ভগবান পাওয়া যায়—বাড়ি কোথায় পাবো? তা তোদের তো নিজেদেরই বাড়ি আছে।

বিনয়টা আগে কত ভালো ছেলেই না ছিল! আশ্চর্য! সেও কিনা বেকার! সদাব্রত গাড়ি চালাতে চালাতেই বিনয়ের কথাগুলো শুনছিল। একদিন এই বিনয়ই মাতব্বর ছিল কলেজে। কতবার ইউনিয়নের ইলেক্শানে দাঁড়িয়েছে। প্রেসিডেণ্ট না ভাইস-প্রেসিডেণ্ট কী যেন হয়েছিল ইউনিয়নের।

সেই সূত্রেই আলাপ, আর সেই সূত্রেই মুখ চেনা। সেদিন বিনয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই মনে হয়েছিল সকলের কাছে। রেজাল্টও ভালো করেছিল ফাইনালে। এখন যেন একটু ম্রিয়মাণ দেখায়। মাঝে মাঝে রাস্তায় যখন দেখা হতো তখনও তাই মনে হতো।

বিনয় বললে—সাড়ে দশটার সময় ঠিক আরম্ভ হবে ইণ্টারভিউ—এখন সাড়ে ন'টা বেজেছে—

তার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তুই বেশ আছিস, তোকে অফিস যেতে হয় না, অফিস যাবার দরকারই নেই তোর—

সদাব্রত বললে—ওটা তোর মনের ভুল—এ পৃথিবীতে কেউই বেশ নেই, অন্ততঃ এই কলকাতায় কেউ বেশ নেই—

—তুই কী করে জানলি ?

সদাব্রত বললে—তুই যদি এ চাকরিটা পাস্ তো তখন দেখিস্ আমি যা বলেছি তা সত্যি কি না—দেখবি চাকরি পাবার আগেও যা, পরেও ঠিক তা-ই —এ আমি অনেক দেখে তবে জেনেছি ভাই—

—তা হলে তোরা আরামে নেই বলতে চাস ?

সদাব্রত বললে—শুধু আমি কেন, কেউই আরামে নেই—এ-যুগটা আরামের জন্যে নয়—

বিনয় বোধ হয় এ-সব কথা আগে কখনও ভাবে নি। তাই একটু অবাক হয়ে গেল। বরাবর কলেজের টেক্সট বই পড়েছে মন দিয়ে। পড়া মুখস্থ করেছে। নোট পড়েছে, প্রোফেসারের মুখস্থ বুলি একমনে গিলেছে। আর দিনের পর দিন, সব কণ্ঠস্থ করেছে সমস্ত এগজামিনের খাতায় ঢেলে দেবার জন্যে! বিনয় জানে না যে এই গাড়ি, অর্থ, এই চাকরি, এই সুট-টাই এতে মনের নিউট্রিশান হয় না।

—তা হলে এই যে দু' পাশে বড় বড় বাড়ি, এদের মালিকরা সুখী নয় বলতে চাস্ ?

সদাব্রত বললে—হয়ত ডান্‌লোপিলোর গদিতে ওরা শোয়, হয়ত দশটা চাকর ওদের সারাদিন সার্ভ করে, হয়ত তিন কোটি টাকা ওদের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, কিছুই আশ্চর্য নয়—কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখবি হয়ত স্লিপিং-পিল না খেলে ওদের ঘুম আসে না—কিংবা হয়ত রেফ্রিজারেটারে-রাখা পেঁপে খেলেও ওদের অম্বল হয়—

বিনয়ে বললে—ওটা তো যাদের কিছু নেই তাদের পক্ষে কন্সোলেশন্—ওই ভেবেই তো গরীব লোকেরা শান্তিতে আছে—

সদাব্রত বললে—গরীব লোকদের তো শান্তিই নেই, তারা তো মানুষই নয়, তাদের কথা ছেড়েই দে না—

—তা হলে তোর বাবা? শিবপ্রসাদ গুপ্ত? তোর বাবাও কি আন্হ্যাপি?

সদাব্রত হাসতে লাগলো। বললে—জীবনে অ্যাম্বিশন্ থাকলে হ্যাপিনেস্ তো আসতে পারে না—

বিনয়ও হেসে উড়িয়ে দিলে। বললে—তুই ফিলজফি নিয়ে এম-এ পড়লেই পারতিস্—

—তা যা বলেছিস্—মডার্ন ওয়ার্ল্ডের পক্ষে ফিলজফিই দরকার হয়ে পড়েছে, তা জানিস?

বিনয়ের এ প্রসঙ্গ ভাল লাগছিল না। বললে—যাক্ গে, ও-সব কথা থাক, আমাকে কী রকম দেখাচ্ছে বল্ তো? স্মার্ট দেখাচ্ছে?

সদাব্রত মাথাটা ঘুরিয়ে একবার বিনয়ের সর্বাঙ্গ দেখলে। বললে—কই, কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না?

—নতুন এই স্যুটটা করালুম, ইণ্টারভিউ-এর জন্যে।

—তাই নাকি?

স্যুট নিয়ে কখনও জীবনে মাথা ঘামায় নি সদাব্রত। সাদাসিধে পোশাকই নিজে বরাবর পরে এসেছে।

বিনয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কত করে গজ বল্ তো?

সদাব্রত আর একবার দেখে নিয়ে বললে—কী জানি, চার-পাঁচ টাকা গজ হবে হয়ত—

—দূর, তোর কোনও আইডিয়াই নেই, তেইশ টাকা—

সদাব্রতর কাছে চার-পাঁচ টাকাও যা তেইশ টাকাও তা-ই। বললে—সবসুদ্ধ কত পড়লো?

—মেকিং চার্জ নিয়ে দেড়-শো টাকা—কিন্তু আমার এক-পয়সাও লাগে নি।

সদাব্রত অবাক হয়ে গেছে। দেড়শো টাকার জিনিসটা ওম্নি পেয়েছে বিনয়! জিজ্ঞেস করলে—কেন? পয়সা লাগে নি কেন?

বিনয় বিজয়-গর্বের সঙ্গে বললে—একটা আধলাও নয়, ফ্রি একেবারে—

—তার মানে ? কেউ দিয়েছে তোকে ?

—না, ইন্স্টল্‌মেণ্টে কিনেছি। মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে দিতে হবে শুধু, তার মানে একেবারে ফ্রি—

আসলে ফ্রি নয়। সদাব্রতর মনে হলো—আসলে ফ্রি নয় ধার। মনে মনে হাসলেও সদাব্রত মুখে কিন্তু হাসলো না। বিনয়ের কথা শুনে সদাব্রত হাসবে না অবাক হয়ে যাবে তা-ও বুঝতে পারলে না।

বিনয়ের ডালহৌসী-স্কোয়ারের মোড় এসে গিয়েছিল। সে নেমে গেল। নামবার পর বিনয়কে শুভেচ্ছা জানানো উচিত ছিল। তার চাকরি হবে। অনেক আশা নিয়ে সে ইণ্টারভিউ দিতে যাচ্ছে। তাকে উৎসাহিত করাও উচিত ছিল। তার সুট, তার টাই, তার জুতো দেখেও প্রশংসা করা উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই করা হলো না। বিনয়ের কথা থেকেই তার অন্য কথা মনে পড়লো। বর্তমান কলকাতাটাও যেন ধার-করা। আর শুধু কলকাতাটাই বা কেন ? যা-কিছু চোখের সামনে দেখছে সবই যেন ফ্রি, সবটাই যেন ধার, সবই যেন লোন্। এই লোন্ নিয়েই তো ইণ্ডিয়া চলেছে। কেউ আমেরিকার কাছে ধার করছে, কেউ রাশিয়ার কাছে। সবাই যেন ধার-করা জৌলুস, ধার-করা যৌবন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনে দিয়ে একটা মেয়ে যাচ্ছিল অফিসে। হন্ হন্ করে রাস্তা পার হচ্ছে।

সদাব্রত ব্রেক কষে একটু থামিয়ে দিলে স্পীড্।

আশ্চর্য ! সদাব্রত তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত লক্ষ্য করে দেখলে। সবটা ধার-করা। মাথার খোঁপা ধার-করা, ঠোঁটের রংটা ধার-করা, বুকের ঢেউটা পর্যন্ত ধার-করা। এই ধার যেদিন শোধ করতে হবে সেদিন কতটুকু বাকি থাকবে ওদের ? কোন্ ক্যাপিট্যাল নিয়ে বাঁচবে ?

সদাব্রত আবার অ্যাক্সিলেটারে পায়ের পাতাটা চেপে ধরলো। গাড়ি আবার স্পীড্ নিলে।

ফড়েপুকুর স্ট্রীটে যখন ঢুকলো তখনও জানতো না সদাব্রত। কিন্তু বাড়িটার সামনে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দরজার সামনে যেতেই নজরে পড়লো।

দরজার সামনের কড়ায় একটা বিরাট তালা ঝুলছে।

কী হলো! কেদারবাবু কি বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন? বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য পাড়ায় চলে গেছেন?

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো সদাব্রত। পাড়ার কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলে হয়ত জানা যেতে পারে কোথায় গেলেন তাঁরা। রাস্তায় তখন অফিসের যাত্রী সবাই। পাশের একটা বাড়ির দরজায় গিয়ে সদাব্রত কড়া নাড়তে লাগলো। হয়ত বাড়িওয়ালা শেষ পর্যন্ত মাস্টার মশাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

—কে?

একজন বুড়ো মতন ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতেই সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, এই সামনের বাড়িতে কেদারবাবুরা থাকতেন, তাঁরা কোথায় গেছেন বলতে পারেন?

ভদ্রলোক হয়ত বিরক্ত ছিলেন আগে থেকেই। তার ওপর এই প্রশ্নে আরো বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

বললেন—না, মশাই, আমি জানি না—অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন—

বলে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বোধ হয় সদাব্রতর গাড়িটা নজরে পড়লো। তার পর সদাব্রতকে আবার ভালো করে মিলিয়ে দেখলেন।

বললেন—ও গাড়ি কি আপনার?

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ—

—তা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ছি ছি, ভেতরে আসতে হয়, আমি ভালো করে চোখে দেখতে পাই না কিনা—

তার পর ভেতরের দিকে কাকে লক্ষ্য করে চীৎকার করতে লাগলেন—ওরে কার্তিক, এখানকার চেয়ারটা কী হলো, চেয়ারটা দিয়ে যা—

জিনিসটা সদাব্রতর ভালো লাগলো না। গাড়ির মালিক বলেই তাকে চেয়ার দিয়ে এত খাতির। বললে—কোন্ গাড়িটার কথা বলছেন?

ভদ্রলোক বললেন—ওই যে, যে-গাড়িটা রয়েছে ওখানে?

সদাব্রত বললে—আমি যে-কথা জিজ্ঞেস করছি সেইটের জবাব দিন না—গাড়ি আমার কি কার তা নিয়ে আপনার দরকার কী?

—গাড়ি আপনার নয়? আমি ভেবেছিলুম—

চাকরটা ততক্ষণে একটা চেয়ার এনে হাজির করেছিল, কিন্তু ভদ্রলোক

ইঙ্গিতটাই যথেষ্ট। হিমাংশুবাবু বললেন—খবর যা পেলাম তাতে তো বেশ ভয়ের মনে হলো, আজকের 'স্বাধীনতা' দেখেছেন ?

—হ্যাঁ দেখেছি, তুমি ওদের খবর কিছু পেয়েছ কিনা বলো না—

—আজ্ঞে ওরা তো সব ছিট্‌কে-ছড়িয়ে আছে, কিন্তু পেছনে ওদের অনেক লোক আছে, তারাই উস্কুনি দিচ্ছে, এদিকে ডাক্তার বিধান রায়ের কাছে একটা দরখাস্ত করেছে, আর পণ্ডিত নেহেরুর কাছেও নাকি পাঠিয়েছে একটা নকল—

—তা লোকাল থানার পুলিস কি বলছে ?

—বলছে ষড়যন্ত্র চলছে ওদের, একদিন সবাই মিলে আমাদের ওখানে হামলা করবে এই মতলব করেছে। একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না করে ছাড়বে না শুনছি—

শিবপ্রসাদবাবু চুপ করে রইলেন। কী যেন ভাবতে লাগলেন মনে-মনে। খদ্দরের চাদরটা কাঁধ থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সেটা কাঁধে তুললেন। বললেন—এদিকে মিস্ত্রীদের কাজ কতদূর হলো ?

—ওরা তো দিনরাত কাজ করছে, কাজের ফাঁক দিই নি। দিনের বেলা একদল আবার রাত্তিরবেলা আর এক দল—চারদিকের কম্পাউণ্ড্-ওয়ালটা কালকেই ফিনিশ্ হয়ে যাবে।

শিবপ্রসাদবাবু আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—তা ওরা ডাক্তার রায়ের কাছে একটা কপি দিয়েছে তুমি জানো ঠিক ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তার বিধান রায়কে দরখাস্তখানা অ্যাড্রেস্ করেছে আর কপি দিয়েছে পণ্ডিত নেহরুকে—

—আচ্ছা ডাক্তার রায়ের লাইনটা একবার দিতে বলো তো ?

বলে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই সেটা বেজে উঠলো। শিবপ্রসাদবাবু রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন—হ্যালো—

ওপাশ থেকে গলার আওয়াজটা পেতেই বলে উঠলেন—এই যে গোলক-বাবু, আমি রেডি—আমি এখনি যাচ্ছি, সব পেপার্স আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি—বুঝেছি, বুঝেছি—

বলে রেখে দিলেন। তার পর বললেন—থাক্‌গে, এখন আর লাইনের দরকার নেই,—আমি চললুম—বদ্যিনাথ !

বদ্যিনাথ সামনে এলো—বাবু—

—কুঞ্জ কোথায়? ওকে বলেছিস্?

বদ্যিনাথ বললে—কুঞ্জ গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

শিবপ্রসাদবাবু আর দাঁড়ালেন না। অফিস পেরিয়ে লিফ্‌টের দরজার দিকে হন্ হন্ করে এগিয়ে চললেন।

সুফল আবার দোকানের ঝাঁপ খুলেছে। একদিনের মামলা মাত্র। বলতে গেলে একটা রাতের। পুলিস-দারোগা হুড়মুড় করে এসে পড়েছিল তখনই। পদ্মরাণীই খবরটা দিয়েছিল।

পদ্মরাণী বলছিল—আহা মা, সুখ কি সকলের সয় মা? সয় না। কোথায় কোন্ পাড়াগাঁয়ে পড়ে ছিলি, গোবর নিকোতে হতো, বাসন মাজতে হতো, আমি শাড়ি দিলুম, নিজের ঘরে পাশে শোয়ালুম, তা কপালে না-সইলে আমি কী করবো মা! আমার যতটা সাধ্যি ততটা করিচি।

পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের মেয়েদের এ-সব কথা বলা বৃথা। পুলিসের আসাটাও তাদের কাছে নতুন নয়। পুলিস আসে, কাউকে-কাউকে ধরে নিয়ে যায়, দু' দিন হাজতেও পুরে রাখে, তার পর আবার একদিন ছেড়েও দেয়। কেন ধরে আবার কেন ছাড়ে তা তারা জানে না। এইটেই নাকি নিয়ম। এই নিয়মই চলে আসছে সেই আদ্যিকাল থেকে—যখন এই গোলাপী ছিল না, এই যুথিকা ছিল না, এই সিন্ধু, টগর, দুলারী, বাসন্তী কেউই ছিল না। তখনও এমনি এক-একদিন পুলিস-দারোগা আসতো, এসে হামলা করতো। বাবুরা, যারা এখানে ফুর্তি করতে আস্‌তো, তারাও নাজেহাল হতো। তখন আরো গুণ্ডার রাজত্ব ছিল এ-সব জায়গা। বলা-নেই কওয়া-নেই ভদ্রলোকের ভালোমানুষ ছেলেদের ধরে নিয়ে যেতো। ফ্ল্যাটের পেছন দিকে খিড়কির দরজা ছিল। পদ্মরাণী সেইখান দিয়ে পার করে দিত তাদের। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছিল এখানে। হঠাৎ শোরগোল শুনে ভয় পেয়ে যেতো। একবার জানাজানি হয়ে গেলে তাদের পক্ষেও কেলেঙ্কারি, পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটেরও বদনাম। পদ্মরাণী দরজা খুলে দিয়ে বলতো—এই এখান দিয়ে তোমরা চলে যাও বাছা, এই গলি দিয়ে বেরিয়ে ডান দিকে বড় রাস্তা পাবে—

আসলে কেউ অপরাধ করুক আর না-করুক, ছুটো পয়সা দিলেই সব মামলা হাসিল হয়ে যেতো। টাকাটা সিকেটা ওদের প্রাপ্য। এ এই অঞ্চলের থানাদারের উপ্‌রি পাওনা। যে-দারোগা একবার এই থানায় আসে সে আর কোথাও বদ্‌লি হতে চায় না। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার কিংবা ডেপুটি-কমিশনার করে দিলেও না। এক-একজন দারোগা এখানকার থানায় এসেছে, আর তার পর পাঁচ সাত বছরের মধ্যে কলকাতা শহরের বুকে তিন-খানা চারখানা পাকা-বাড়ি করে ফেলেছে, বউয়ের গায়ে গয়নার পাহাড় তুলেছে, জমিজমা করে লক্ষপতি হয়ে গেছে, আর শেষকালে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

পদ্মরাণী অমন অনেক দারোগা দেখেছে, অনেক থানা-পুলিসও দেখেছে। সুতরাং তার ভয় পাবার কথা নয়। ভয় পায়ও নি। পুলিস আসতে হাউ-মাউ করে একেবারে কেঁদে ভাসিয়েছিল।

পুলিস অনেক প্রশ্ন করেছিল। কুসুমের নাম-ধাম লিখে নিয়েছিল। সরেজমিন তদন্তও করেছিল। কুসুমের বয়েস কত ছিল! আঠারো কি সতেরো! মাথার ওপর কড়িকাঠে একটা ইলেকট্রিক পাখা ঝুলছিল, তাইতেই বিছানার চাদরটা বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়েছিল।

দারোগা জিজ্ঞেস করেছিল—ওর ঘরে আজ কেউ এসেছিল? আজ ছুপুরবেলা?

—না বাবা, ওর ঘরে আমি কাউকে ঢুকতেই দিতুম না।

—কেন? ঢুকতে দিতেন না কেন?

—না বাবা, ও বলেছিল ও এ-লাইনে থাকবে না, বিয়ে করবে। সকলের কি ভালো লাগে বাবা এ-সব? কারো কারো তো বিয়ে করে সংসার-ধর্মও করতে সাধ হয়!

—কাল কেউ এসেছিল?

—না বাবা, ছোটবেলা থেকে একদিনের তরে কারো সঙ্গে রাত কাটায় নি আমার মেয়ে। আমি কাটাতে দিই নি। বলেছিলাম—তোকে বড়ঘরে বিয়ে দেবো আমি,—ওর জন্যে আমি বর খুঁজছিলাম বাবা—

—তা এত মেয়ে থাকতে ওরই বা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কেন?

—ও যে ভাল মেয়ে বাবা! যে-সংসারে ও যেতো সেখানে যে আলো করে থাকতো ও।

তার পর পুলিস জিজ্ঞাসা করেছিল—ওর বাপ-মা কেউ আছে? আপন বলতে কেউ আছে ওর?

—আপন বলতে তো এক আমিই ছিলাম বাবা, ওর বাপ-মা যদি তেমন হতো তো ওর ভাবনা!

—ওর নিজের বাপ-মা কোথায়?

—ও হরি, তা যদি আমি জানতুম তো ওর বাপ মা'র কাছেই তো ওকে পাঠিয়ে দিতুম বাবা!

—তা ও কোত্থেকে এলো আপনার বাড়িতে?

পদ্মরাণী কথা বলতে-বলতেই কেঁদে ফেলছিল। এবার আর থাকতে পারলে না। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললে—পোড়ারমুখী এই পাপ-পুরীতেই জন্মেছিল বাবা—

—তার পর?

নাকের এক রকম অদ্ভুত শব্দ করতে করতে পদ্মরাণী বলতে লাগলো—তার পর, ছেলে হলে তো ব্যবসা ভাল চলে না বাবা, তাই একদিন পোড়ারমুখীকে আমার কাছে ফেলে রেখে ওব মা কোথায় যে পালালো তা জানি নে। সেই থেকে আমিই ওকে মানুষ করেছি বাবা—ওকে আমারই পেটের মেয়ে বলে ধরতে পারো তোমরা। বলতে গেলে পেটেই শুধু ধরি নি ওকে, নইলে ও আমারই মেয়ে, আমিই ওর মা বাপ সব কিছু বাবা। আমার যে বুকের মধ্যে এখন কেমন করছে তা যদি তোমাদের দেখাতে পারতুম! জানো বাবা, আজকে আহ্নিক পর্যন্ত করা হয় নি আমার ওর জন্যে···

বলতে বলতে আবার ভেঙে পড়েছিল পদ্মরাণী। দারোগাবাবুও আর পদ্মরাণীকে বিরক্ত করে নি। অন্য মেয়েদের জেরা করেছিল। দুলারীও ওই একই কথা বললে। সেও বললে—কুসুমের বড় বিয়ে করবার ইচ্ছে ছিল। বিয়ে করে সংসার করবার ইচ্ছেই ছিল তার। মা তার জন্যে পাত্র খুঁজছিল। বোধ হয় বিয়ে না-হওয়াতেই আত্মহত্যা করেছে—

বাসন্তীও তাই বললে।

গোলাপীও তাই-ই বললে। সিন্ধু, বিন্দু, ঠাকুর দরোয়ান সকলের মুখেই ওই একই জবানবন্দি বেরোলো।

কারো জবানবন্দির সঙ্গে কারো জবানবন্দির অমিল হলো না। সে-রাত্রে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে মানুষের অপমৃত্যুর ওপর এমনি করেই যবনিকা নেমে এলো

এক মিথ্যের গোঁজামিল দিয়ে। এই কলকাতা শহরের ওপরেই নেমে এলো আর একটা কালো যবনিকা। নেমে এলো জীবনের ওপর, যন্ত্রণার ওপর। সত্য-মিথ্যে-জীবন-মৃত্যু সব একাকার হলো আর একবার। লক্ষ-লক্ষ বারের মত আর একবার ইতিহাসে প্রমাণ হলো—সবার ওপর মানুষ সত্য। কুইন ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে যে প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্যে এত আইন, এত কানুন, এত পুলিস-দারোগা মিনিস্টার-গভর্নর এতকাল ন্যায়ের বিধানে এই ভূখণ্ডে সুশাসন চালিয়ে আসছিল, এবার স্বাধীন ইণ্ডিয়াতেও তারই পুনরাবৃত্তি হলো। স্বর্ণাক্ষরে সুঘোষিত হলো আর একবার যে, সত্যমেব জয়তে। একমাত্র সত্যেরই জয় অনিবার্য। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের পদ্মরাণী থেকে শুরু করে থানার দারোগা পর্যন্ত সবাই একবাক্যে সত্য ঘোষণা করেই ন্যায়ের মর্যাদা বজায় রাখলে। ওপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট গেল —এ কেস্ অব্ নরম্যাল্ সুইসাইড্। দণ্ড-মুণ্ডের কর্তার কিছু করবারই নেই।

সত্যিই কারো কিছু করবার থাকে না কখনও। কারো কিছু করবার থাকতেও নেই। করবার থাকলে অনেক আগে অনেক কিছুই করা যেতো। তা হলে গোলাপীকেও আর সন্ধ্যেবেলা স্বামী ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে-দাইয়ে এখানে আসতে হতো না। বাসন্তীকেও আবার পটলডাঙার সংসার ঘুচিয়ে এখানে এসে নতুন করে ঘরভাড়া নিতে হতো না। কুন্তিকেও আর টগর নাম ভাঁড়িয়ে এখানে এসে টাকা রোজগারের ধান্দায় ধকল পোয়াতে হতো না। সত্যিই করতে পারা যেতো অনেক কিছুই। কিন্তু তা করতে গেলে অনেক লোকের অন্ন যাবে, অনেক লোকের নেশা ঘুচে যাবে, পেশাও যাবে। অনেক লোকের বাড়া-ভাতে ছাই পড়বে। অনেক লোকের মান-সম্ভ্রম চিরকালের মত মুছে যাবে ইতিহাসের পাতা থেকে! পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট বন্ধ হলে যে অনেক লোকের গাড়িতে পেট্রল ফুরিয়ে যাবে, রেফ্রিজারেটার নীলেম হয়ে যাবে, রেডিওগ্রাম অচল হয়ে যাবে। তার চেয়ে এই-ই ভালো। এমনি করেই ধামা-চাপা থাক্ সব। ওই মধু গুপ্ত লেনের পাড়ার ছেলেরা যেমন ড্রামা নিয়ে মেতে আছে তেমনি থাকুক। যাদব-পুরের উদ্বাস্তরা যেমন ডালহৌসী স্কোয়ারের সামনে এসে মিছিলের নামে হল্লা করে, তেমনি করুক। ফড়েপুকুর স্ট্রীটের কেদারবাবুরা মনুষ্যত্বকে আদর্শ করে লোভ-মোহ-মাৎসর্য থেকে দূরে থাকুক। ততক্ষণে আমরা আরো সম্পত্তি বাড়াই। ডেপুটি মিনিস্টার থেকে মিনিস্টার হই, আর তার পর একদিন একটা ডেলী নিউজ পেপার যদি করতে পারি, তখন তো আমি সুপারম্যান। তখন তো আমি

অবতার। তখন যে-ই প্রেসিডেন্ট হোক, যে-ই প্রাইম্ মিনিস্টার হোক, আমিই ডিক্‌টেটর!

কিন্তু সে-সব কথা পরে হবে।

তার আগে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের কথা আরো অনেক বলতে হবে।

পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কোথা দিয়ে যে সে-রাতটা কেটে গেল তার কোন হিসেব লেখা রইল না কোথাও। সেদিনও ভুল করে চেনা খদ্দেররা এসে পড়েছিল এখানে। পকেটে টাকা নিয়ে তারা কয়েক ঘণ্টা ফুর্তি কিনতে এসেছিল অন্য দিনকার মত। সেদিনও বেলফুলওয়ালা এসেছিল, কুলপী মালাইওয়ালা এসেছিল, আলুকাবলী ফুচকাওয়ালাও এসেছিল। কিন্তু এসে দেখেছিল সুফলের দোকান বন্ধ। দেখেছিল পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের সদর দরজাটা বন্ধ। বড় থম্‌থমে রাত। অন্য দিনকার মত কেউ আর সাজলো না গুজলো না, কুঙ্কুমের টিপ পরলো না, পায়ে ঘুঙুর বাঁধলো না। গা ধোয়া সাবান মাখা কিছুই হলো না কারো। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে সেদিন নিরম্বু উপোস চললো। কোনও ঘরে হারমোনিয়ামের সঙ্গে কেউ গান গাইলেও না—'চাঁদ বলে ও চকোরী বাঁকা চোখে চেয়ো না।'

এ-রকম হয় মাঝে মাঝে।

তবু পদ্মরাণী সকলকে অভয় দিলে—কিছ্ছু ভয় পাস্ নে মা, আমি তো আছি, আমি তো এখনও মরি নি রে—যেদিন মরবো সেদিন জগৎবাসীকে জানান্ দিয়ে মরবো, হ্যাঁ—

বিন্দু বললে—সবাই বলছে এক ঘরে সবাই শোবে আজ—

—তা শো না বাছা! ভাতার নেই তো ফুলশয্যের অত শখ কেন বাছা তোদের?

এ রসিকতার সময় নয়, তবু খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো মেয়েরা।

পদ্মরাণী হাসি শুনে বললে—হাসিস্ নে বাছা, আমার অনেক বয়েস হলো, অনেক দেখেই তবে তোদের বলছি মা, ভাতারে ভাত দেয় না, ভাত দেয় গতরে —গতর থাকলে অনেক ভাতার জুটবে মা, অনেক জুটবে—

বলে একটু থেমে আবার বললে—তা রাঁধলি কি তোরা?

বাসন্তী বললে—আজ কেউ রাঁধিনি মা—

—কেন বাছা? ভাতের ওপর রাগ করলি কেন? পোড়া পেটের জন্যেই তো ভাত মা, নইলে ভাতের বয়ে গেছে পেট খুঁজতে—

তা একটা তো রাত। সেই রাতটা কাটতেই যেন আবার নতুন করে

জেগে উঠলো ফ্ল্যাট-বাড়িটা। আবার ধোয়া-মোছা শুরু হলো। আবার দরজা খুললো দরোয়ান। সুফল কোথায় যেন রাতটা কাটিয়েছিল, আবার ফিরে এলো। আস্তে আস্তে চারদিক দেখে নিয়ে আবার ভেতরে ঢুকলো। দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে—কী রে জগু, মড়া সরিয়ে নিয়েছে?

হঠাৎ পিছন ফিরে দেখলে যূথিকা। সে-ও এসে হাজির হয়েছে।

সুফল জিজ্ঞেস করলে—সব শুনেছ তো?

সমস্ত রাত ময়নাদি'র বাড়িতে ঘুমিয়ে এসেছিল সে। একদিন সে জন্মেছিল এই পরিবেশেই। আবার এই পরিবেশেই মানুষ হয়েছে সে। পুলিসের নামেও ভয় পায় না, খুন-খারাপিও তার কাছে নতুন জিনিস নয়। তবু ভয় পাচ্ছিল। পাছে আবার কোন নতুন হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়ে। বললে—কে মরেছে রে সুফল?

পদ্মরাণী ওপর থেকে দেখতে পেলে। তাকে দেখেই আর উত্তরটা শোনা হলো না। একেবারে মা'র কাছে গিয়ে হাজির হলো।

—কবে ছাড়লে রে তোকে হারামজাদারা?

—কাল রাত্তিরে।

—ও দারোগা-হারামজাদার চাকরি ছাড়িয়ে তবে আমি জল খাবো। তা টগর? টগর কোথায় গেল? সে এলো না?

—সে তো মা বাড়ি চলে গেল, তার বাবার যে অসুখ খুব। আমি আর কোথায় যাবো, তাই ময়নাদি'র বাড়িতে শুতে গিয়েছিলাম—

—তা হাজতে তোকে কী করলে হারামজাদারা?

যূথিকা আঁচলটা সরিয়ে পিঠটা দেখালে। পদ্মরাণী দেখলে, কিন্তু কিছু বললে না। তার পর সোজা গিয়ে খাটের ওপর বসে টেলিফোনটা তুলে নিলে। কাকে যেন কী সব বলতে লাগলো পদ্মরাণী।

পদ্মরাণী টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে—তা এমনি করে সব সময় যদি হারামজাদারা জ্বালায় আমাকে তো আমি কী করে চালাই? আমার মেয়েরা কী দোষ করলো? এই তো সোনাগাছিতে আরো অনেক ফ্ল্যাট্ আছে, আমার মেয়েদের মত এমন স্বভাব-চরিত্র কোথাও পাবে? কেউ বলুক দিকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কারো দিকে চেয়ে এরা হেসেছে! তা হলে তাকে আমি আস্ত কেটে ফেলবো না!

আবার খানিকক্ষণ চুপ।

আবার বলতে লাগলো—তা বলি, আমার থানায় অমন লোককে রাখে কেন? ওকে বদ্‌লি করে দিতে পারো না?

টেলিফোনে কথা বলছিল পদ্মরাণী আর বাইরে দাঁড়িয়ে সবাই শুনছিল। এমন করে পদ্মরাণীকে কড়া কথা বলতে কেউ কখনও শোনে নি।

—তা অবিনাশবাবুকে কেন সরালে? অবিনাশবাবু তো বেশ ভদ্রলোকটি। তা চাকরিতে উন্নতি হলো তো তা বলে যত ঘাটের মড়া এনে আমার ঘাড়ে ফেলে দিতে হয়! তা বলবো না? জানি টেলিফোনে এত কথা বলা ঠিক নয়, কেউ শুনতে পাবে! কিন্তু আমার মেয়েকে কেমন করে মেরেছে সেটা একবার দেখে যাও দিকিনি, নিজের চোখেই দেখে যাও না—

কী জানি টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিল পদ্মরাণী। উঠোন রোয়াক সব ধোয়া-মোছা পরিষ্কার হয়ে গেছে। পদ্মরাণী যখন টেলিফোন ছেড়ে উঠলো তখন ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ক'দিন ধরে এমনিই চললো। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে পরদিন থেকেই আলো জ্বলতে লাগলো আবার। আবার সদর দরজাটা হাট করে খুলে রেখে দাঁড়িয়ে রইল জগু দরোয়ান। সুফলও আবার ঘরে ঘরে মোগ্‌লাই পরোটা সাপ্লাই করতে লাগলো। যেন কিছুই হয় নি এ-বাড়িতে। যেন কুসুম বলে কোনও মেয়েই আসে নি এখানে। বালেশ্বর জেলার না ময়ূরভঞ্জ স্টেটের কোনও যুবতী মেয়েকে যেন কেউ স্মাগল্ করে আনে নি এই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে। যে-ঘরে সে গলায় দড়ি দিয়েছিল সে-ঘরও আর চেনা যায় না। সে-ঘরও ভাড়া নিয়ে নিলে আর একটা মেয়ে। সেই ঘরে সেই কড়িকাঠেরই তলায় আবার সুফলের কাঁকড়া-ভাজা আসতে লাগলো ডিশ-ডিশ। সেই বিছানাতেই বেলফুলের মালা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে থেঁতলে পিষে শুকিয়ে যেতে লাগলো। সেই আয়নাতেই পাউডার-মাখা আর একখানা মুখের ছায়া পড়তে লাগলো রোজ। আর আবার সেই ঘরেই গান চলতে লাগলো হারমোনিয়ামের সুরের সঙ্গে—'চাঁদ বলে ও চকোরী বাঁকা চোখে চেয়ো না।'

কিন্তু পদ্মরাণীর মুখ-ভার তখনও কমে নি।

কমলো তখন যখন খবর এলো থানার দারোগাকে বদ্‌লি করে দিয়েছে ওপর থেকে।

তখনই পদ্মরাণীর মুখে আবার হাসি ফুটলো। বললে—সেই কথায় আছে না—চালের দর কত, না মামার ভাতে আছি, দারোগারও হয়েছে তাই,—

ও যদি না সরতো তো আমি ওর চালে তেঁতুলে করে দিতুম না। পদ্মরাণীকে এখনও চেনে নি মুখপোড়া!

তা ঠিক এই সময় একদিন হঠাৎ কুন্তি এসে হাজির!

—ওমা, টগর তুই? কোথায় ছিলি মা অ্যাদ্দিন? তোর এ কি চেহারা হয়েছে?

কুন্তির রুক্ষ চুল, গাল দুটো যেন বসে গেছে, চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। খবর পেয়ে যে-যার ঘর থেকে ছুটে এলো। বাসন্তী, যূথিকা, সিন্ধু, গোলাপী, দুলারী সবাই। তারাও অবাক হয়ে গেছে কুন্তির হাল দেখে।

—শুনিচিস্ তো মা, সেই দারোগা মুখপোড়াকে আমি এখান থেকে বদ্‌লি করে দিয়ে তবে ছেড়েছি, আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিল মা, একেবারে দশভুজো দেখিয়ে দিয়েছি—তা তোকেও হারামজাদা মেরেছিল নাকি, যূথিকাকে যেমন মেরেছিল?

বিন্দু দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। বললে—চা করবো মা!

হঠাৎ সুফল ঢুকলো ঘরে। সেও কুন্তিকে দেখলে। পদ্মরাণীর দিকে চেয়ে বললে—ডিমের ঝাল্-কারি দরকার নাকি মা?

পদ্মরাণী কুন্তির দিকে চেয়ে বললে—চেহারা শুকিয়ে গেছে, তুই কিছু খাবি মা? ডিমের কারি খাবি?

কুন্তি বললে—না মা, আবার বাবা মারা গেছে—

—ওমা! কিসে মারা গেল বুড়ো? হাঁফ-কাশিতে?

—না মা, গুণ্ডারা লাঠি মেরে, মেরে ফেলেছে বাবাকে!

—কেন লা? বুড়ো মানুষকে মারতে গেল কেন? কী করেছিল তোর বাপ?

কুন্তির গলাও বোধ হয় বুজে আসছিল। আর যেন সে দাঁড়াতে পারছিল না। চেয়ারটা ধরে ফেললে টপ্ করে। তার পর বললে—আমাদের বাড়ি-ঘর-বস্তি সব ভেঙে আগুন জেলে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে মা, আমার থাকবার জায়গাই নেই মা কোথাও—

—তা আছিস কোথায় এখন?

কুন্তি বললে—ব্যায়লায়! কিন্তু সেখানেও আর থাকা চলবে না, কালীঘাটে আসবার চেষ্টা করছি, দেখি, যদি ঘর পাই একখানা—

—কেন? এখানে উঠে আয় না। এখানেই থাক না, আমার এমন ঘর থাকতে আবার কোথায় ঘর খুঁজবি?

কুন্তি বললে—আমার বোন্ বুড়ি রয়েছে যে—

—তা এখন তার বয়েস কত হলো?

—এই তেরো-চোদ্দ।

পদ্মরাণী বললে—তা এই তো বয়েস! এখন থেকেই এখানে নিয়ে আয় মা, আমি ঠগনলালকে ডেকে তার নথ খুলিয়ে দেবো, কিছু টাকা পেয়ে যাবি মবলক্, দুটি বোনে আরাম করে থাকবি, তার পরে জোয়ারের জল কতক্ষণ? যা সুফল, আমার জন্যে এক প্লেট ঝাল্-কারি নিয়ে আয় বাছা—

সুফল তবু জিজ্ঞেস করলে—আর টগরদি? টগরদি খাবে না?

পদ্মরাণী খেঁকিয়ে উঠলো—দূর মড়া, শুনছিস্ ওর বাপ মরেছে, এখন অশৌচ চলছে, এখন কেউ ডিম খায়? তোর কেবল পয়সা পয়সা পয়সা, যা আমার ডিম এনে দে—বিন্দু চা নিয়ে আয়—যা—

সুফল তাড়া খেয়ে চলে গিয়েছিল। বিন্দুও চলে গেল। নিচের উঠোনে বুঝি তখন দু-একজন করে লোকজন আসতে শুরু করেছে। তাদের আওয়াজ কানে যেতেই বাসন্তীরা বাইরে গেল।

কুন্তি একলা পেয়েই পদ্মরাণীকে বললে—আমার টাকাটা আমি দিতে পারছি নে মা, এই কথাটা বলতেই এসেছিলাম—

পদ্মরাণী কুন্তির গাল দুটো টিপে দিয়ে হেসে উঠলো।

বললে—দূর পাগলী, তোর বাপ মারা গেছে, আর আমি এখন তোকে টাকার কথা বলবো? তুই তেমনি মা পেয়েচিস্? তোর যদি টাকার দরকার থাকে তো বল্, আমি দিচ্ছি—

কুন্তি বললে—আর টাকা নিয়ে দেনা বাড়াতে চাই না মা—

—তা তোর বাপের ছেরাদ্দ করতে টাকা লাগবে না? কিছু না করলেও তো তিন জন বামুন খাওয়াতে হবে, পুরুতকে নতুন কাপড় একখানা গামছা কচু-ঘেঁচু দিতে হবে, কোত্থেকে পাবি সে-সব? পাড়ার পাঁচজন ভদ্দরলোকও তো আছে? তারাই বা কী বলবে? নে, টাকা নিয়ে যা—

বলে লোহার আলমারী খুলে একতাড়া নোট বার করলে পদ্মরাণী। তার পর গুনে গুনে নোটগুলো কুন্তির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—নে মা। এই একশো টাকা দিলাম, ব্যাগের মধ্যে ভালো করে পুরে নে—

কুন্তি তবু নিচ্ছিল না।

পদ্মরাণী বললে—ছেনালী রাখ্, নে তুই টগর। মা নিজের হাতে তুলে দিচ্ছে, নিতে হয়, 'না' বলতে নেই—আমারও তো বাপ ছিল মা, নিজের বাপের ছেরাদ্দ আমি ভাল করে করতে পারি নি, তখন টাকাও ছিল না হাতে, সে-সব তো ভুলি নি মা, নাও ভালো করে ব্যাগে পুরে নাও—

হঠাৎ সুফল ঘরে ঢুকল। হাতে গরম ডিমের কারি, ধোঁয়া উড়ছে।

পদ্মরাণী বললে—ঝাল দিয়েছিস তো? যদি খারাপ লাগে তো পয়সা পাবি না, এই বলে রাখছি—

—না মা, আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার সামনে আপনি চেখে দেখুন—

বিন্দুও চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকলো তখন।

কুন্তি আর দাঁড়ালো না। তার চোখে সব তখন কেমন ঝাপ্সা ঠেকছে। এই পাড়া, এই পদ্মরাণী! একদিন এখানে প্রথম তাকে নিয়ে এসেছিল বিভূতিবাবু। সেই অকল্যাণ্ড্ প্রেসের অফিসের বড়বাবু। এখানেই এক ঘণ্টার জন্যে এসেছিল ঘর ভাড়া করতে। সে কতদিন আগের কথা! ফ্রক ছেড়ে তখন সবে শাড়ি পরতে শুরু করেছে সে। সেই সময়ের কথা। তার পর কত দিন কত জায়গায় গিয়েছে, কত লোকের সংস্পর্শে এসেছে। সেই কলকাতাও দিনে-দিনে কত বদলে গিয়েছে। কিন্তু এই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে এসেই শেষ পর্যন্ত সে ঠেকে গিয়েছিল। কোথায় গেল সেই বিভূতিবাবু, আর কোথায় গেল তার বাবা! আজকে এই পদ্মরাণীর ডিমের ঝাল-কারি খাওয়ার আড়ালে যেন আর একটা মূর্তি দেখে একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছিল কুন্তি।

একটা ট্রাম আসতেই শাড়িটাকে সারা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে ভেতরে উঠে বসলো। তার পর চলন্ত ট্রামের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।

সেদিন সমস্ত কলকাতা ছুটি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর এত বড় ঘটনা কলকাতার জীবনে আর কখনও ঘটে নি। কলকাতার ইতিহাসে সে বুঝি এক স্মরণীয় দিন। কলকাতাও বুঝি নিজের জীবনে এত মানুষ কখনও একসঙ্গে দেখে নি। যেদিকে চাও শুধু মানুষ, শুধু মানুষের মাথা। ময়দানের

চার-পাঁচশো বিঘে জমির মধ্যে এতটুকু ফাঁক নেই। গাছের মাথায়, মনুমেন্টের ছাদে, রাস্তার দু'পাশের বাড়ির জানালায়, ট্রামে বাসে, ট্রামের মাথায় শুধু মানুষ আর মানুষ। সবাই ময়দানের দিকে চলেছে। সব রাস্তা এসে মিশেছে আজ ময়দানের ব্রিগেড্ প্যারেড্ গ্রাউণ্ডে। এ আলেক্‌জাণ্ডারের দিগ্বিজয়-ঘোষণার উৎসবও নয়, এ স্বামী বিবেকানন্দের ইণ্ডিয়ায় ফিরে আসা নয়, রাজা হয়ে পঞ্চম জর্জের প্রজাদের দর্শন দেওয়া নয়। যারা প্যারেড্ গ্রাউণ্ড পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে নি তারা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লনের ওপরই শতরঞ্চি পেতে বসে পড়েছে। স্বামী-স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে আসর জমিয়েছে। ফ্লাস্কে চা আছে, কাজু-বাদামের প্যাকেট আছে, আরো আছে স্যাণ্ডুইচ্। গাছের ডালে এরিয়্যাল টাঙিয়ে রেডিওতে বক্তৃতা শুনবে মহাপুরুষের। চিনেবাদামওয়ালাদেরও সুদিন। তারা সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারছে না। মাঠের ওপরে কমিউনিস্টদের বইয়ের দোকান বসে গেছে। ছ' আনায় রেক্সিনে বাঁধাই 'ভি-আই-লেনিন্'।

কলকাতার মানুষ রাসের মেলা দেখেছে, রথের ভিড় দেখেছে, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মিছিল দেখেছে। ভিড় দেখতে কলকাতার লোক এর আগেও ভিড় করেছে বহুবার। রাস্তার ফুটপাতে বাঁদর-নাচ দেখতেও ভিড়ের অভাব হয় নি কখনও। কিন্তু এ অন্য ভিড়। এ-ভিড় পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য। এ রাজনীতি! এ ডিপ্লোমেসি! আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই ভিড় সৃষ্টি করে সকলকে টেক্কা দিয়েছেন।

শিবপ্রসাদবাবু আগের দিন থেকেই ব্যস্ত। আগের দিনই নেমন্তন্ন ছিল রাজভবনে। রাজ-অতিথিদের অভ্যর্থনায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানিয়ে কলকাতার বিশিষ্টদের কার্ড পাঠানো হয়েছিল। প্রোলেটারিয়েটদের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনায় ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়েটদের স্থান নেই। ইনকাম-ট্যাক্সের লিস্ট দেখে দেখে নিমন্ত্রিতের লিস্ট তৈরি হয়েছে। প্রোলেটারিয়েটদের জন্যে শুধু শুকনো দর্শন। জওহরলাল নেহরুকে মস্‌কোতে বিরাট সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। এবার তাঁদের প্রতি-অভ্যর্থনা জানানোর পালা। তাই এবার মস্‌কো থেকে এসেছেন ক্রুশ্চেভ, এসেছেন বুলগানিন।

হঠাৎ বিনয়ের সঙ্গে দেখা।

—কী রে? তুই?

বিনয়ও সদাব্রতর মত মীটিং দেখতে এসেছে। বললে—এই দেখতে এলুম ভাই—এত ভিড় কল্পনা করতে পারি নি—

—তোর সেই চাকরিটা হয়েছে? সেই ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলি সেদিন?

বিনয় বললে—না রে, হলো না ভাই—

—কেন?

কিন্তু উত্তরটা শোনবার আগেই হঠাৎ যেন দূরে মন্মথকে দেখা গেল। মন্মথ! সেই কেদারবাবুর ছাত্র। সে-ও এসেছে! তাড়াতাড়ি মন্মথকে গিয়ে ধরল। মন্মথর সঙ্গে তার বন্ধু-বান্ধব ছিল। সেও সদাব্রতকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—কেদারবাবুর খবর কিছু জানো তুমি? বাগ্‌মারীর ঠিকানাটা বলতে পারো?

মন্মথ বললে—বাগ্‌মারীতে তো নেই মাস্টারমশাই, তিনি তো এখন বাগবাজারে আছেন—

—বাগবাজারে? কেন?

—সেখানে এক ভূতুড়ে বাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠেছিলেন, মানুষ-জন কিছু নেই, চারদিকে জলা-জমি কচুরিপানা, সেখানে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলেন, শেষকালে আমি গিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি—এখন বাগবাজারে আছেন—

—ঠিকানাটা বলতে পারো ভাই তুমি? আমি একবার দেখা করতে যেতুম—

ওদিকে হঠাৎ খুব হৈ-চৈ উঠলো। পণ্ডিত নেহরু, ডাক্তার বিধান রায়, ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন সবাই উঠেছেন উঁচু ডায়াসের ওপর। পেছন দিক থেকে এক ঝাঁক সাদা পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হলো আকাশে। হঠাৎ ভিড়ের চাপ শুরু হলো পেছন থেকে। ভিড়ের চাপে আর দাঁড়ানো গেল না।

সদাব্রত তাড়াতাড়ি নোটবইতে ঠিকানাটা লিখে নিয়ে আবার সরে এলো। তখন পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে—

এই কলকাতাতেই এখনও এমন জায়গা আছে যেখানে মুরগী পুষলে মুরগী মরে যায়, কিন্তু মানুষ বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করছে। যেখানে মাছি মাথা গলাতে ভয় পায়, কিন্তু মানুষ সেখানে বেশ নিশ্চিন্তে আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তারই মধ্যে বেশ গুলজার করে বসে মেয়েরা সংসার চালিয়ে যাচ্ছে আর পুরুষেরা অফিসে যাচ্ছে, বাড়িতে ফিরে তাস খেলছে আর রাত্রে সবাই মানব-সন্তানের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর!

সদাব্রতর অন্তত এ-পাড়ায় ঢুকে তাই-ই মনে হলো।

মাস্টার মশাইয়ের অসুখ। তবু তিনি সদাব্রতকে দেখে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন।

—এই তোমার নাম করছিলুম শশীপদবাবুর কাছে। গভর্মেণ্ট অফিসার হলে কী হবে, অমায়িক ভদ্রলোক, বুঝলে, আমাকে যে-সব কথা বললেন, আমি তো শুনে অবাক,—

—কে শশীপদবাবু?

—মন্মথর বাবা। হাজার টাকা প্রায় মাইনে পান অফিসে, সেদিন আমাকে সব বললেন। বললেন—বড় ভয়ের কথা মশাই, কলকাতায় নাকি আজকাল মেয়ে নিয়ে থিয়েটার হচ্ছে, আসলে থিয়েটার-টিয়েটার কিছু নয়, অন্য মতলব—আমি তো শুনে অবাক হয়ে গেছি সদাব্রত!

—কেন, আপনি জানতেন না?

—আমি তো তা জানতাম না থিয়েটারের নাম করে অন্য কাণ্ড হয় ওখানে—

—কী কাণ্ড?

—সে শুনে দরকার নেই তোমার, সে-সব জঘন্য কাণ্ড! আর শশীপদ-বাবু বললেন গভর্মেণ্টও নাকি চায় ও-সব চলুক, জানো? এ অত্যন্ত অন্যায়—

তারপর যেন হঠাৎ খেয়াল হলো।

—আরে তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে! বোস, বোস, আমার তক্তপোশের ওপরেই বোস, এবার ভাবছি দু'একটা চেয়ার-টেয়ার কিনতে হবে, লোক এলে বসতে দেবার জায়গাই নেই—

সদাব্রত বললে—আমি একদিন বাগমারীতে গিয়েছিলুম আপনাকে খুঁজতে, কিন্তু বাড়ি খুঁজে পেলুম না—

—আরে রাম রাম, তুমি খুঁজে পাবে কী করে? সে তো বাগমারী নয়, বাগমারী ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে—সে একেবারে সমুদ্রের মধ্যে বলতে গেলে—

—আপনি সেখানে যেতে গেলেন কেন? আমি তো তখুনি বলেছিলাম দশ টাকায় তিনখানা ঘর, ও কখ্‌খনো ভাল বাড়ি হতে পারে না—

কেদারবাবু বললেন—তাও আমি থাকতুম, কিন্তু শৈল যে একদিন ডুবে গেল—

—ডুবে গেল মানে ?

কেদারবাবু বললেন—হ্যাঁ, ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে একেবারে ডুবে গিয়েছিল, ওই শৈলর মুখ থেকেই শোন না—

বলে ডাকলেন—শৈল, ও শৈল—

তারপর বললেন—এখান থেকে শৈল শুনতে পাবে না, অনেক দূর কিনা, শৈল অন্য বাড়িতে আছে—তুমি ওই দরজার কাছে গিয়ে 'শৈল' 'শৈল' বলে খুব চেঁচিয়ে ডাকো তো—ডাকো, খুব জোরে জোরে ডাকো। এখানে রান্নাঘর নেই তো, বাড়িওয়ালার উঠোনে গিয়ে রাঁধতে হয় যে—তুমি ডাকো না—তুমি ওই নর্দমাটার কাছে গিয়ে ডাকো—

সদাব্রত কী করবে বুঝতে পারছিল না। বললে—থাক্ গে, ওকে আর ডেকে কী লাভ—

—না না, তুমি ওর মুখ থেকেই শোন না, একেবারে ডুবে গিয়ে মারা যাচ্ছিলো, শেষকালে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সব জল পাম্প করে বার করে দেওয়াতে তবে বেঁচে উঠলো—বুঝলে, সেদিন শৈল মরেই যেত সত্যি সত্যি—ও তো সাঁতার জানে না—সেই দেখেই তো মন্মথ এখানে জোর করে টেনে নিয়ে এল আমাকে—নইলে কি আমি আসতুম নাকি ?

সদাব্রত বললে—কিন্তু এখানেই বা কী করে আছেন ? এই দুর্গন্ধ নর্দমা ?

কেদারবাবু সে-কথায় কান দিলেন না। বললেন—তেমন বেশি দুর্গন্ধ নয়, ওই রাত্তিরবেলাটা যা একটু নাকে লাগে, তা তুমি নাকে রুমালটা চেপে যাও না, গিয়ে ডাকো, ওর মুখ থেকেই শুনবে কী-রকম হাবু-ডুবু খেয়েছিল ও,—ডাকো, ডাকো—পকেটে তোমার রুমাল আছে তো ? ভাবছো কী ? রুমাল নেই ?

—আমি ও-রকম করে ডাকতে পারবো না মাস্টারমশাই, ওদিকে অনেক মহিলা রয়েছেন—

—মহিলা রয়েছেন তো কী হয়েছে ? এক বাড়িতে আমরা সাতজন ভাড়াটে থাকি, মহিলা থাকবে না ? তুমি চেঁচাও, তা ভেতরে না যেতে চাও তো এখান থেকেই চেঁচাও—

হঠাৎ বাইরে থেকে শৈলর গলার আওয়াজ এল—কাকা, তোমার কাপড়টায় সাবান দিতে হবে না ?

ঘরে ঢুকে সামনেই সদাব্রতকে দেখে শৈল নিজেকে সামলে নিয়েছে। বোধ হয় কাপড়ে সাবান দিতে-দিতেই উঠে এসেছে। হাতে তখনও সাবানের ফেনা লেগে আছে। আঁচলটা কোমরে জড়ানো। উস্কো-খুস্কো মাথার চুল। একেবারে অগোছালো চেহারা। সদাব্রতকে দেখে প্রথমে একটু জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল। তার পর আঁচলটা ভাল করে গায়ে দিয়ে বললে—আপনি কখন এলেন?

—এই যে শৈল, তুই সেই কেমন করে জলে ডুবে গিয়েছিলি, বল্ সদাব্রতকে বল্! কেমন করে হাবু-ডুবু খেয়েছিলি তুই বল্ ওকে! ও শুনতে চাইছিল তোর মুখ থেকে।

সদাব্রত যেন বিব্রত বোধ করলে। বাধা দিয়ে বললে—না না, আমি শুনতে চাইব কেন? ছি ছি, এটা আপনি কী বলছেন? আমি কখন শুনতে চাইলুম?

কেদারবাবু বললেন—তুমি শোন না ওর মুখ থেকে—সে এক মজার ব্যাপার খুব—। সে এক বদ্‌মাইশ দালালের পাল্লায় পড়ে বাগমারীতে গিয়েছিলুম, মিছিমিছি আমার ক'টা টাকা নষ্ট হলো, শেষকালে শৈলটার প্রাণ নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি—

সদাব্রত শৈলর দিকে চেয়ে বললে—আমি গিয়েছিলুম তোমাদের খুঁজতে—

শৈল অবাক হয়ে গেল।

বললে—বাগমারীতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, জীবনে কখনও ওদিকে যাই নি তো, আর ঠিকানাটাও জানতুম না তোমাদের। তোমাদের পাড়ার কেউই তোমাদের ঠিকানা বলতে পারলে না—সেখানে গিয়ে সে আর এক বিপদ—

শৈল বললে—বিপদ? কেন?

—গাড়িটা ঘোরাতে গিয়ে গাড়িসুদ্ধ আমিও আর একটু হলে ডুবে যাচ্ছিলুম একটা পানা-পুকুরের মধ্যে—

—তাই নাকি? তুমিও ডুবে যাচ্ছিলে? কেদারবাবু অসুখের মধ্যেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

শৈল বললে—আপনি আছেন তো কিছুক্ষণ, কাকার সাবু চড়িয়েছি, সেটা নামিয়েই চা করে আনছি—

—ডুবে গেল মানে ?

কেদারবাবু বললেন—হ্যাঁ, ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে একেবারে ডুবে গিয়েছিল, ওই শৈলর মুখ থেকেই শোন না—

বলে ডাকলেন—শৈল, ও শৈল—

তারপর বললেন—এখান থেকে শৈল শুনতে পাবে না, অনেক দূর কিনা, শৈল অন্য বাড়িতে আছে—তুমি ওই দরজার কাছে গিয়ে 'শৈল' 'শৈল' বলে খুব চেঁচিয়ে ডাকো তো—ডাকো, খুব জোরে জোরে ডাকো। এখানে রান্নাঘর নেই তো, বাড়িওয়ালার উঠোনে গিয়ে রাঁধতে হয় যে—তুমি ডাকো না—তুমি ওই নর্দমাটার কাছে গিয়ে ডাকো—

সদাব্রত কী করবে বুঝতে পারছিল না। বললে—থাক্ গে, ওকে আর ডেকে কী লাভ—

—না না, তুমি ওর মুখ থেকেই শোন না, একেবারে ডুবে গিয়ে মারা যাচ্ছিলো, শেষকালে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সব জল পাম্প করে বার করে দেওয়াতে তবে বেঁচে উঠলো—বুঝলে, সেদিন শৈল মরেই যেত সত্যি সত্যি—ও তো সাঁতার জানে না—সেই দেখেই তো মন্মথ এখানে জোর করে টেনে নিয়ে এল আমাকে—নইলে কি আমি আসতুম নাকি ?

সদাব্রত বললে—কিন্তু এখানেই বা কী করে আছেন ? এই দুর্গন্ধ নর্দমা ?

কেদারবাবু সে-কথায় কান দিলেন না। বললেন—তেমন বেশি দুর্গন্ধ নয়, ওই রাত্তিরবেলাটা যা একটু নাকে লাগে, তা তুমি নাকে রুমালটা চেপে যাও না, গিয়ে ডাকো, ওর মুখ থেকেই শুনবে কী-রকম হাবু-ডুবু খেয়েছিল ও,—ডাকো, ডাকো—পকেটে তোমার রুমাল আছে তো ? ভাবছো কী ? রুমাল নেই ?

—আমি ও-রকম করে ডাকতে পারবো না মাস্টারমশাই, ওদিকে অনেক মহিলা রয়েছেন—

—মহিলা রয়েছেন তো কী হয়েছে ? এক বাড়িতে আমরা সাতজন ভাড়াটে থাকি, মহিলা থাকবে না ? তুমি চেঁচাও, তা ভেতরে না যেতে চাও তো এখান থেকেই চেঁচাও—

হঠাৎ বাইরে থেকে শৈলর গলার আওয়াজ এল—কাকা, তোমার কাপড়টায় সাবান দিতে হবে না ?

ঘরে ঢুকে সামনেই সদাব্রতকে দেখে শৈল নিজেকে সামলে নিয়েছে। বোধ হয় কাপড়ে সাবান দিতে-দিতেই উঠে এসেছে। হাতে তখনও সাবানের ফেনা লেগে আছে। আঁচলটা কোমরে জড়ানো। উস্কো-খুস্কো মাথার চুল। একেবারে অগোছালো চেহারা। সদাব্রতকে দেখে প্রথমে একটু জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল। তার পর আঁচলটা ভাল করে গায়ে দিয়ে বললে—আপনি কখন এলেন?

—এই যে শৈল, তুই সেই কেমন করে জলে ডুবে গিয়েছিলি, বল্ সদাব্রতকে বল্! কেমন করে হাবু-ডুবু খেয়েছিলি তুই বল্ ওকে! ও শুনতে চাইছিল তোর মুখ থেকে।

সদাব্রত যেন বিব্রত বোধ করলে। বাধা দিয়ে বললে—না না, আমি শুনতে চাইব কেন? ছি ছি, এটা আপনি কী বলছেন? আমি কখন শুনতে চাইলুম?

কেদারবাবু বললেন—তুমি শোন না ওর মুখ থেকে—সে এক মজার ব্যাপার খুব—। সে এক বদ্‌মাইশ দালালের পাল্লায় পড়ে বাগমারীতে গিয়েছিলুম, মিছিমিছি আমার ক'টা টাকা নষ্ট হলো, শেষকালে শৈলটার প্রাণ নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি—

সদাব্রত শৈলর দিকে চেয়ে বললে—আমি গিয়েছিলুম তোমাদের খুঁজতে—

শৈল অবাক হয়ে গেল।

বললে—বাগমারীতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, জীবনে কখনও ওদিকে যাই নি তো, আর ঠিকানাটাও জানতুম না তোমাদের। তোমাদের পাড়ার কেউই তোমাদের ঠিকানা বলতে পারলে না—সেখানে গিয়ে সে আর এক বিপদ—

শৈল বললে—বিপদ? কেন?

—গাড়িটা ঘোরাতে গিয়ে গাড়িসুদ্ধ আমিও আর একটু হলে ডুবে যাচ্ছিলুম একটা পানা-পুকুরের মধ্যে—

—তাই নাকি? তুমিও ডুবে যাচ্ছিলে? কেদারবাবু অসুখের মধ্যেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

শৈল বললে—আপনি আছেন তো কিছুক্ষণ, কাকার সাবু চড়িয়েছি, সেটা নামিয়েই চা করে আনছি—

সদাব্রত বললে—না, তোমাকে সেজন্যে ব্যস্ত হতে হবে না, আমি কালকে হঠাৎ মন্মথর কাছে তোমাদের এখানকার ঠিকানাটা পেলাম। শুনলাম মাস্টার মশাইয়ের অসুখ—তাই এসেছি। তা এখানে এসেও যা দেখছি তাতে বুঝতে পারছি খুব আরামেই আছো তোমরা—

—তা এই বাড়িরই তো কুড়ি টাকা ভাড়া!

—কিন্তু সেই ফড়েপুকুর স্ট্রীট থেকেই বা উঠতে গেলে কেন? বাড়িওয়ালা কলের জল বন্ধ করে দিলে আর তোমরা ভয় পেয়ে উঠে গেলে?

কেদারবাবু বললেন—ওইটেই তো আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল, আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছিলুম—

—তা সেই জন্যেই তো তখন বলেছিলুম দিনকতকের জন্যে আমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে, সেখানে গেলে আর মাস্টার মশাইয়েরও অসুখ হতো না, তুমিও ডুবে যেতে না পুকুরে—

তারপর একটু থেমে বললে—আর তা ছাড়া কুড়ি টাকা দিয়ে যদি এখানে আছেন তো তিরিশ টাকা দিলে কালীঘাটে এর চেয়ে ভাল একখানা ঘর পাবেন, সেইখানেই চলুন না—পাকা বাড়ি, কড়ি-বরগার ছাদ, আলাদা কল বাথরুম—

কেদারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আর রান্নাঘর? উঠোনে রান্না করতে হবে না তো?

—সে আমি নিজে দেখে সব ঠিক করে বলে যাবো আপনাকে।

—তাহলে তুমি আজই দেখে এসো—

শৈল বললে—কিন্তু এখানে যে আমরা ছ'মাসের ভাড়া একসঙ্গে অ্যাডভান্স দিয়ে ঢুকেছি—সেটার তাহলে কী হবে? লোকসান যাবে?

সদাব্রত বললে—তার জন্যে তুমি ভেবো না—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই ওর জন্যে ভাবিস্ নি। লোকসান যায় যাবে! শেষকালে ছ'মাস পরে যদি সে-বাড়ি না পাওয়া যায়? আর এখানে ওই অত দূরে রান্না করতে যেতে তোর বুঝি কষ্ট হয় না? দেখ্ দিকিনি তোর চেহারাটা কীরকম রোগা হয়ে গেছে? কী বলো, সদাব্রত, শৈল রোগা হয়ে যায় নি আগের চেয়ে? দেখ না, কণ্ঠার কীরকম হাড় বেরিয়ে গিয়েছে? দেখছো তুমি?

শৈল শাড়ি দিয়ে নিজের গলাটা আরো ভালো করে ঢেকে নিলে।

—ওর জন্যেই আমার ভাবনা, জানো সদাব্রত, নইলে আমার আর কী? আমার গাছতলা হলেও চলে যায়—আমি একলা মানুষ, আমার ছাত্রগুলো মানুষ হলেই আমি খুশী রে বাবা!

সদাব্রত বললে—তাহলে আমি এখন আসি মাস্টার মশাই—

কেদারবাবু বললেন—তাহলে সেই বাড়িটা ঠিক করে আমায় খবর দিও—

সদাব্রত আর দাঁড়াল না। আস্তে আস্তে নর্দমাটা ডিঙিয়ে বাড়ির বাইরে এসে একবার থামলো। আসবার সময় কোথা দিয়ে এখানে ঢুকেছিল তা আর মনে ছিল না। বাগবাজারের গলির পর গলি। তস্য গলি। তার পর পায়ে-চলা পথ। দু'পাশে পাঁচিল, দেয়ালে ঘুঁটে। আঁকা-বাঁকা রাস্তা। রাস্তাটার মুখে এসেই সদাব্রত কোন্ দিকে যাবে বুঝতে পারলে না।

—শুনুন!

সদাব্রত পেছন ফিরেই অবাক হয়ে গেল। শৈল। তাকেই ডাকছে। মুখের চেহারাখানা অন্যরকম হয়ে গেছে একেবারে।

—আপনি যেন সত্যি সত্যি আবার বাড়ির চেষ্টা করবেন না। সেই কথাটা আপনাকে বলতেই এলুম।

—কেন?

শৈল বললে—না, আমি বলছি আমি চালাতে পারবো না—তিরিশ টাকা ভাড়া দেবার ক্ষমতা আমার নেই—তা কাকা যাই-ই বলুক!

—কিন্তু অত দূরে রান্নাঘর, এই দুর্গন্ধ নর্দমা, এর মধ্যে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে যে!

—স্বাস্থ্য খারাপ হতে আর বাকিটা কী আছে? জানেন আমার কাকার টি-বি! যার নাম যক্ষ্মা!

—সে কি! সদাব্রত আকাশ থেকে পড়ল যেন।

শৈল বললে—হ্যাঁ, কাকা জানে না, ডাক্তার আমাকে বলেছে। দুধ-মাখন-ডিম-মাংস এই সব খেতে হবে, আর ওষুধের যা ফিরিস্তি দিয়েছে তা কিনতে কত টাকা লাগবে কে জানে!

এর পর সদাব্রত কী বলবে বুঝতে পারলে না। তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলে—তাহলে কী করবে?

—সে যা-হয় আমি করবো, আপনাকে এ-নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

—কিন্তু এই শোনার পরেও তুমি আমাকে ভাবতে বারণ করছো ?

শৈল বললে—তাহলে আপনি ভাবুন, ওদিকে কাকার সাবু হয়ত পুড়ে যাচ্ছে, আমার সময় নেই, আমি যাই। আর তা ছাড়া ভাবলেই যদি একটা উপায় বেরোত তো অ্যাদ্দিন কাকা ভালো হয়ে উঠতো, কাকার এ অসুখও হতো না। নইলে সাধ করে কি আমি জলে ডুবে মরতে যাই ? আমি সেদিন মরে গেলেই বোধ হয় শান্তি হতো—আমারও মরণ নেই !

—সে কি ? তুমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে নাকি ?

কিন্তু শৈলর তখন বোধ হয় আর দাঁড়িয়ে কথা বলবার মত অবস্থা ছিল না। সে তখন সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সদাব্রত তার সেই পালিয়ে চলে যাওয়ার দিকে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল। সেই বাগবাজারের গলির ভেতর ঘুঁটে ভর্তি দেয়ালের গোলকধাঁধার মধ্যে বন্দী হয়ে ছটফট করতে লাগলো অসহায়ের মত।

রোটারী ক্লাবে বিরাট মীটিং ছিল সন্ধ্যেবেলা। সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফুড্-স্পেশ্যালিস্ট্ এসেছিল কলকাতায়। তাকে রিসেপ্শ্যান্ দেওয়া হয়েছে। কফি, কাজুনাট, কোকোকোলার বন্দোবস্তও ছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফুড্-মিনিস্টারও ছিলেন। কলকাতার বিশিষ্ট রোটারিয়ানরাও ছিল। শিবপ্রসাদ গুপ্তও ছিলেন।

সকলেই ওয়েল্-ফেড্। যারা ভাল-ভাল ফুড্ খেতে পায় পৃথিবীর ফুড্ প্রব্লেম নিয়ে মাথা ঘামাবার দায় তাদেরই। তাই তারাই মাথা ঘামাচ্ছে।

মীটিং-এর পর শিবপ্রসাদবাবুর বক্তৃতা শেষ হতেই চটাপট্-চটাপট্ করে অনেকক্ষণ ধরে হাততালি পড়লো।

বাইরে গাড়িতে বসে চলতে চলতেও যেন হাততালির শব্দটা কানে ভাসছিল তাঁর।

স্পেশ্যালিস্ট্ যা বলবার তা বলেছিল। কত ক্যালোরি ফুড্ প্রত্যেক মানুষের বাঁচার পক্ষে দরকার তারই স্ট্যাটিস্টিকস্। ইণ্ডিয়ার মত আন্-ডেভেলপড্ কান্ট্রির কী করলে আবার ফুড্ প্রোডাকশান বাড়তে পারে তারই কথা। ফুডের সঙ্গে পপুলেশনের কথাও ছিল। সাত হাজার মাইল

দূর থেকে এসে স্পেশ্যালিস্ট্ ভদ্রলোক অত্যন্ত কষ্ট করে এবং অত্যন্ত অনুগ্রহ করে ভাল-ভাল উপদেশ দিয়ে গেল। যে-দেশের লোক ফুড্ খেয়ে ফুরিয়ে উঠতে পারে না, যে-দেশের লোক নিজেদের বাড়ির পোষা কুকুরের ফুডের জন্যে মাসে গড়ে পঞ্চাশ টাকা খরচ করে, কুকুরের অগ্নিমান্দ্য হলে যে-দেশের লোক পঞ্চাশ টাকা ফি দিয়ে ডাক্তার দেখায়, স্পেশ্যালিস্ট্ সেই দেশের লোক। আফ্রো-এশিয়ার আনফেড লোকদের জন্যেই ফুডের গবেষণা করার চাকরি তার। খুব চমৎকার বক্তৃতা। রোটারিয়ান্রা কাজুনাট খেতে খেতে তার বক্তৃতা শুনে তার পাণ্ডিত্য দেখে হতবাক হয়ে গেল।

তার পর উঠেছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফুড-মিনিস্টার। তিনিও বললেন অনেক কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়ে' যে-সব সদুপদেশ আছে, তার চেয়েও ভাল-ভাল উপদেশ দিলেন।

বললেন—খাওয়ার হ্যাবিটটাই আমাদের বদলাতে হবে। আমাদের ফুড্-হ্যাবিটই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা ভাত খাই। কেন, ভাত খেয়ে কী হয়? শুধু ভুঁড়ি হওয়া ছাড়া আর কোনও উপকারিতা নেই এই ভাতের। আপনারা রুটি খেতে পারেন না? শুকনো, হাতে-গড়া গরম-গরম রুটি গাওয়া-ঘি মাখিয়ে খেয়ে দেখবেন, আর স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা যে কত উপকারী তা ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করবেন। আজ যে বাঙালীদের স্বাস্থ্য খারাপ তা ওই ভাতের জন্যে। তাও আবার ভাতের আসল বস্তু ফ্যানটাই ফেলে দেন আপনারা। কতগুলো ঘাস খাওয়াও যা এই ভাত খাওয়াও তাই। তার পর ধরুন মাছ। আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে, ছোটবেলা থেকে মাছ খেয়ে আসছি। কিন্তু সে কি এই বরফ-দেওয়া মাছ যা আপনারা খাচ্ছেন? বাজারে বরফ দেওয়া বড়-বড় রুই মাছ বিক্রী হয়। আপনারা সাড়ে পাঁচ টাকা ছ' টাকা সের দরে তাই কেনেন। কিন্তু আমার কথা শুনে একবার টাটকা পুঁটি, খল্সে, মৌরলা, চাঁদা, বেলে এই সব মাছ খেয়ে দেখুন, এতে অনেক উপকার—। তার পর আর একটা কথা না-বলে পারছি না। আজকাল দেখেছি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে চপ-কাটলেট খাওয়ার রেওয়াজ বেড়েছে। এতে স্বাস্থ্য নষ্ট, পয়সা নষ্ট, তার চেয়ে আপনারা ফল খান। ও-সব আঙুর বেদানা আপেল নয়, আমাদের বাংলা দেশের ফল। এই ধরুন, শশা, কলা, পেঁপে, নারকোল এই সব খেয়ে দেখবেন। আপনারা

সরকারের হাতে খাদ্য-সমস্যা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবেন না—সরকার যা করবার তা করছে···

হঠাৎ কুঞ্জ গাড়িটা থামিয়ে দিলে।

—থামালে কেন? কী হলো এখানে?

কুঞ্জ বললে—দাদাবাবু—

—দাদাবাবু মানে? সদাব্রত? কই?

মীটিং-এর কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলেন তিনি। সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেল। চেয়ে দেখলেন সত্যিই সদাব্রত দাঁড়িয়ে আছে চৌরঙ্গীর মোড়ে! এমন সময়ে খোকা এখানে!

বললেন—ডাকো তো কুঞ্জ, ডাকো তো—

হঠাৎ নজরে পড়লো সদাব্রতর পাশে যেন একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গেই কথা বলছে। কোনও দিকেই খেয়াল নেই।

কুঞ্জ ডাকতেই গাড়ির পাশে এল।

—এখানে কী করছো? বাড়ি যাবে?

সদাব্রত বললে—আমার একটু দেরি হবে বাড়ি যেতে—

এর পর শিবপ্রসাদবাবু চলেই আসছিলেন। কিন্তু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন—কার সঙ্গে গল্প করছো? ও কে?

সদাব্রত বললে—ও কেদারবাবুর ভাইঝি,—

কেদারবাবু! কেদারবাবু কে তাই-ই মনে পড়লো না শিবপ্রসাদবাবুর। জিজ্ঞেস করলেন—কেদারবাবু আবার কে?

—আমাকে পড়াতেন। আমার মাস্টার মশাই—

—তা তাঁর ভাইঝির সঙ্গে তোমার কিসের দরকার?

—ও ওষুধ কিনতে এসেছে। কেদারবাবুর খুব অসুখ।

শিবপ্রসাদবাবু তবু যেন যোগসূত্রটা ধরতে পারলেন না।

বললেন—ও ওর কাকার জন্যে ওষুধ নিতে এসেছে তাতে তোমার কী? তুমি কি এখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করো নাকি? সেখানে যাও তুমি?

সদাব্রত চুপ করে রইল। এ কথার আর কী উত্তর আছে!

শিবপ্রসাদবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—কী অসুখ?

—টি-বি! সাস্‌পেক্‌টেড্ টি-বি! ডাক্তারে যে মেডিসিন্ প্রেসক্রাইব করেছে তা বাজারেই পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে দুধ-ঘি-মাখন-ডিম-মাংস সব খেতে বলেছে—

আর দাঁড়ালেন না শিবপ্রসাদবাবু। কুঞ্জকে ইঙ্গিত করতেই সে গাড়ি ছেড়ে দিলে। আবার ভাবতে লাগলেন তিনি। কাল সকালবেলার খবরের কাগজেই রিপোর্টটা বেরোবে। ফুড্ মিনিস্টারের লেকচারটাই বড় করে বেরোবে তাঁরটার কিছুই থাকবে না। হয়ত তাঁর নামটাও থাকবে না। অথচ এরাই সাপ-ব্যাং যা বলবে তাই সাজিয়ে-গুছিয়ে ছেপে বার করতেই এডিটারদের প্রাণান্ত! অথচ ফুড্ মিনিস্টার হয়ে এতটুকু ঘটে বুদ্ধি নেই যে এ ধরনের লেক্‌চার আর চলে না। লোকে এখন সেয়ানা হয়ে গেছে।

মিনিস্টারের বক্তৃতাটা তখনও বাতাসে যেন ভাসছে—

—আমরা চাই ভারতবর্ষের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের মানুষ যেন নিজেরাই তাদের সমস্যা মেটাতে পারে। আমরা পিচ্-ঢালা রাস্তা করে দেবো, আপনারা সবাই মিলে সেই রাস্তার দু'ধারে ফলের গাছ পুঁতে দেবেন। দেশের খাদ্য-সমস্যা মেটাবার ভার আপনাদের হাতে। পুকুরে মাছ ছাড়ুন, ক্ষেতে ধান বুনুন, অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাটা আপনারা একটু চেষ্টা করলেই মেটাতে পারবেন। তুচ্ছ কারণে সরকারকে বিরক্ত করবেন না, সরকার আরো বড় বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এই ক' বছরে সরকার কত কাজ করেছে তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। ডি-ভি-সি বাঁধ হয়েছে, ময়ূরাক্ষী বাঁধ হয়েছে, ভাখরা-নাঙ্গাল বাঁধও হয়েছে। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বাঁধ এই ভাখরা-নাঙ্গাল বাঁধ—আমেরিকার হুভার বাঁধ উঁচুতে সাত শো কুড়ি ফুট, আর আমাদের ভাখরা-নাঙ্গাল বাঁধ সাত শো ষাট ফুট। এই সেদিন ক্রুশ্চেভ আর বুলগানিন এসে দেখে গেছেন, আসছে বছরে আমরা চায়নার প্রাইম মিনিস্টার চৌ-এন-লাই-কে ইণ্ডিয়াতে আসতে নেমন্তন্ন করেছি—তিনিও দেখে যাবেন—

—কুঞ্জ!

গাড়িতে বসেই শিবপ্রসাদবাবু বললেন—একবার এলগিন রোডের দিকে ঢোক তো—

কুঞ্জ গাড়ি ঘুরিয়ে নিলে পুতুলের মত।

অথচ ফুড্ মিনিস্টার বসেই গলা নিচু করে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগলো আমার লেক্‌চার?

শিবপ্রসাদবাবু আর কী বলবেন? বললেন—খুব ভাল—আমারটা?

গাড়ি ততক্ষণ মিস্টার বোসের বাড়ি এসে গেছে।

শৈল জিজ্ঞেস করলে—উনি কে ?

সদাব্রত বললে—আমার বাবা। বাড়ি যেতে বলছিলেন। আমি বললাম: এখন যাবো না, একটু পরে—

—বাড়ি চলে গেলেই পারতেন আপনি। আমি একলা যেতে পারবো'খন।

সদাব্রত বললে—না না, চলো আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

শৈল বললে—কিন্তু আপনি আবার সেই বাগবাজারে যাবেন নাকি এখন ? সমস্ত দিনটাই তো আপনার খুব ধকল গেল—

সদাব্রতর দিকে চেয়ে দেখলে শৈল। বললে—কী ভাবছেন ?

—ভাবছি, ওষুধ যখন পাওয়া গেল না, তখন আর একবার ডাক্তারের কাছে গেলে কেমন হয় ! যে ওষুধ পাওয়া যায় না, তা প্রেস্‌ক্রিপশ্যান্ করার কী দরকার ছিল ? আর কোনও দোকানে দেখবে ?

—চলুন !

সদাব্রত চলতে লাগলো। পাশে-পাশে শৈলও। বললে—আমার কাছে কিন্তু আর বেশি টাকা নেই—

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সদাব্রত বললে—জানো, আজকাল সবাই কী করে আরো বেশি টাকা উপায় করা যায় তাই-ই কেবল ভাবছে, অথচ এই মাস্টার মশাই-ই একদিন আমার বাবার কাছে গিয়ে মাইনে কমাবার কথা বলেছিলেন !

শৈল চুপ করে চলতে লাগলো।

—সব দেখে শুনে মনে হয় এ-যুগে হয়ত এত সৎ হওয়াও ভাল নয়। আমাদের পৃথিবী বোধ হয় অ্যাব্‌সলিউট ট্রুথকে সহ্য করতে পারে না। সক্রেটিসকেও সহ্য করে নি, ক্রাইস্টকেও করে নি, আমাদের মহাত্মা গান্ধীকেও তাই সহ্য করতে পারলে না !

শৈল বললে—আপনি যেন আবার কাকাকে এই সব কথা বলবেন না।

—কেন ?

—আমি বলতে গিয়ে বকুনি খেয়েছি—আমি বললেই আমাকে বলে—তুই

মুঠো ভাতের জন্যে কথার খেলাপ করবো? অথচ অন্য লোকে যখন ঠকায় তখন কিছু নয়। কত ছাত্র যে কাকাকে মাইনে দেয় না, তা বলতে গেলেই দোষ! অথচ সংসার তো আমাকেই চালাতে হয়! আমি কোথায় পাই?

সদাব্রত পকেটের ভেতর থেকে মনিব্যাগ বার করলে। বললে—তুমি আপত্তি কোর না, আমার কাছে এখন কুড়ি টাকা আছে, এটা নাও—

হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে শৈল সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। সদাব্রত তাড়াতাড়ি তার হাতটা ধরে ফেলেছে।

—কী হলো?

আর একটু হলেই ফুটপাথের ওপর পড়ে যেত শৈল। একটা পাথর উঁচু হয়েছিল রাস্তার ওপর। তাতেই ধাক্কা খেয়েছে।

—লাগলো নাকি পায়ে?

তবু শৈল কথা বললে না। নিচের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

—চটি ছিঁড়ে গেল নাকি?

লজ্জায় তখন জড়োসড়ো হয়ে উঠেছে শৈল। একটা চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে তার। বহুদিনের চটি। চটিরও দোষ নেই, ফুটপাথের পাথরেরও দোষ নেই। ছেঁড়া চটিটা ঘষে ঘষে চলবার চেষ্টা করলে একবার। তারপর চটি দু'টো হাতে তুলে নিতে যাচ্ছিল। সদাব্রত বললে—দাও, ওটা আমাকে দাও—

—না না, আপনি কেন নেবেন? আমিই নিয়ে যাচ্ছি—

বলে নিজেই এগিয়ে চললো শৈল সামনের দিকে।

—বরং নতুন চটি একজোড়া কিনে নাও না—এই কাছেই তো জুতোর দোকান।

—না, চলুন একটা মুচি যদি কোথাও থাকে, দেখি—

জর্জ টম্‌সন্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর অফিসে তখন রিহার্সাল বসেছে। জর্জ টম্‌সন্ কোম্পানীর বড়-সাহেবরা বিলেতে থাকে। ইণ্ডিয়া তাদের পক্ষে ফরেন ল্যাণ্ড। কিন্তু ব্যালান্স-শীট তৈরী হয় ইণ্ডিয়ায়। কোম্পানীর স্টাফের খাতায় যাদের নাম আছে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় ইণ্ডিয়ায়, কিন্তু স্টাফ-পলিসি ঠিক হয় ইংলণ্ডে। সেখান থেকে কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল

নোট আসে কোন্ স্টাফকে প্রমোশন দিতে হবে আর কোন্ স্টাফকে ডিস্চার্জ করতে হবে। কোন্ স্টাফ প্রো-কমিউনিস্ট আর কোন্ স্টাফ প্রো-ব্রিটিশ তার কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল ডেসপাচও যায় এখান থেকে। আগে এ নিয়ে মাথা ঘামাত না ইংলণ্ডের বড় কর্তারা। তারা তখন শুধু জানতো প্রফিট্। কিন্তু এখন কিছু শেয়ার ইণ্ডিয়ানদের হাতে বেচতে হয়েছে। এখন অফিসে ইউনিয়ন হয়েছে। এখন স্টাফের অ্যামিনিটির সঙ্গে কোম্পানীর প্রফিটের পার্সেন্টেজের কথাও ভাবতে হয়! স্টাফকে যদি কোম্পানী না দেখে তো স্টাফও কোম্পানীকে দেখবে না। এখন আর শুধু বোনাস দিয়েও সন্তুষ্ট করা যায় না তাদের। তারা প্রফিটেরও পার্সেন্টেজ চায়। তাই তাদের তোয়াজ করবার জন্যে ওয়েলফেয়ার-অফিসারের নতুন পোস্ট তৈরী করা হয়েছে। রিক্রিয়েশান ক্লাব হয়েছে। লাইব্রেরী হয়েছে, লিটারারী সেক্‌শ্যান হয়েছে, ড্রামাটিক সেক্‌শ্যান হয়েছে। ড্রামাটিক সেক্রেটারিও হয়েছে। লিটারারী সেক্‌শ্যান নিয়ে বেশি মাতামাতি হয় না। কোম্পানী বই কেনবার জন্যে কয়েক হাজার টাকা দিয়েছে। কিন্তু ড্রামাতেই উৎসাহটা বেশি।

দুলাল সান্যাল বললে—আমাদের এই প্রথম ড্রামা, বুঝতেই তো পারছেন, তাই ভাল করে রিহার্সাল দিয়ে নামতে চাই—

শুধু কুন্তি নয়, কুন্তি গুহ ছাড়া শ্যামলী চক্রবর্তী, বন্দনা দাস। সকলকেই যোগাড় করেছে দুলাল সান্যাল। দুলাল সান্যাল পাকা লোক। অমল ঘোষ, সে-ও কম উৎসাহী নয়। আর আছে সঞ্জয়।

মেয়েদের জন্যে ক্লাবের খরচায় চপ-কাটলেট-পান-জর্দা সব এসেছিল।

কুন্তি বললে—মেক-আপের ভার কার ওপর দিচ্ছেন? মেক-আপ কিন্তু ভাল লোককে দিয়ে করাবেন।

বন্দনা বললে—বৈঠকখানায় ডি-প্রামাণিক আছে, তাকে দিতে পারেন।

কুন্তি বললে—ড্রেসের ব্যাপারে ডি-দাস আছে বৌবাজারে, সেখানে সব সাইজের শাড়ি-ব্লাউজ পাবেন, গায়ে ফিট্ করবে—

দুলাল সান্যাল বললে—আপনি যাকে বলবেন, তাকেই দেব—আমার ফার্স্ট-ক্লাস মাল চাই, আমাদের জেনারেল-ম্যানেজার সাহেব প্রিসাইড করবে, সিন্-সিনারি, ড্রেস, মেক্-আপ পারফেক্ট না হলে বদনাম হয়ে যাবে আমার—

অমল ঘোষ জিজ্ঞেস করলে—ড্রামাটা কেমন শুনলেন? ওটা আমি লিখেছি—

কুন্তি বললে—রিহার্সালে না-পড়লে ড্রামার ভাল-মন্দ ঠিক বোঝা যায় না—

দুলাল সান্যালও বললে—ঠিক বলেছেন, একেবারে খাঁটি কথা—

সঞ্জয় এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বললে—আপনার জন্যেই আমাদের প্লে অ্যাদ্দিন বন্ধ ছিল, তা জানেন?

—কেন?

—হ্যাঁ, অনেক দিন আগে স্টারে আপনার একটা পার্ট দেখেছিলাম, খুব মিষ্টি লেগেছিল, তারপর থেকেই আপনার খোঁজ করছি, কিন্তু আপনার খোঁজ পাচ্ছিলুম না কিছুতেই। শুনলাম আপনি যাদবপুরে থাকেন, সেখানেও গিয়েছিলুম, গিয়ে দেখি কলোনীর বাড়িগুলো সব ভাঙা, সেখানে পাকা ইটের গাঁথ্নি উঠছে—

দুলাল সান্যাল বললে—তারপর একবার তিনজনে মিলে সে আর এক কাণ্ড—

—কী কাণ্ড?

—চিৎপুরে একটা বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে হাজির। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট না কী যেন বাড়িটার নাম—

কুন্তি চিনতে পারলে না।

—পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট? সে আবার কোথায়? সে-ঠিকানা কার কাছে পেলেন?

সঞ্জয় বললে—কত রকম বিচিত্র লোক যে আছে এ লাইনে! যার যা খুশি বলে যায়। এ এক অদ্ভুত লাইন! আমরা তো সেখানে গিয়ে হতভম্ব। সে একগাদা মেয়ে আমাদের ঘিরে ধরল। বললে—আমরাও প্লে করতে পারবো—

—ওমা তাই নাকি?

কুন্তি শ্যামলী বন্দনা সবাই হাসতে লাগলো হো হো করে।

—শেষে আমরা বিপদে পড়ি আর কি! কত সব মেয়ের নাম—টগর, গোলাপী, বাসন্তী, দুলারী, বাড়িময় কিল্‌বিল্ করছে সব। আমরা যেতেই ভেবেছে বুঝি খদ্দের এসেছে—

কুন্তিদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বললে—এবার তাহলে আসি দুলালবাবু!

—কালকে কখন আসবেন?

—যে-সময় বলবেন।

বাইরে এসেও পেছন-পেছন জর্জ টমসন্ কোম্পানীর ছেলেরা আসছিল। মেয়েরা আর-একবার নমস্কার করলে। তবু কেউ সঙ্গ ছাড়তে চায় না। তারপর বাসে উঠে পড়লো তিনজনে। পেছন থেকে সবাই বললে—নমস্কার—

বন্দনা বললে—আমি ভাই একবার ধর্মতলায় যাবো, ছোট বোনের জন্যে উল কিনতে হবে—

চারদিকে ভিড়। অফিস অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় বাত্তি জ্বলছে। এই দেশেরই বুকের ওপরে কবে একদিন জন্মেছিল এরা। এখন এদের পাখা গজিয়েছে। খুঁটে খেতে শিখেছে। এখন এরাই এই নাগরিক-সংস্কৃতির উত্তরসাধিকা। বাসটা সেই তাদেরই বুকে তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো।

বাগবাজারের গলিটার মধ্যে বোধহয় কেদারবাবু এতক্ষণ ছটফট করছেন। সন্ধ্যে উৎরে গেছে অনেকক্ষণ। হয়ত ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে সমস্ত বাগবাজারটা। শৈল ভাবতেও পারে নি এত দেরি হবে তার ফিরতে।

আসবার সময় শৈল বলে এসেছিল—তুমি যেন আবার ওঠা-হাঁটা কোর না কাকা—আমি যাবো আর আসবো—

সেই ফুটপাথের ওপর মুচির সরঞ্জামের সামনে দাঁড়িয়েই সদাব্রত চারদিকের মানুষের মিছিলের দিকে চেয়ে দেখছিল। এত মানুষ! এত মানুষ, সবাই কোথায় চলেছে? কোন্ রাজকার্যে? ফুটপাথের ওপরেই দোকানপাট সাজিয়ে বসেছে ফেরিওয়ালারা। সেই ছোটবেলাকার কলকাতা ক্রমে-ক্রমে দিনরাত্রির পরিক্রমায় আজ যেন আরো জনবহুল হয়ে উঠলো। আরো বাড়ি, আরো গাড়ি, আরো ভিড়। দিনে দিনে ঐশ্বর্যময়ী প্রাসাদপুরী হয়ে উঠলো কলকাতা। ধনে-জনে-দারিদ্র্যে-দুঃখে-রোগে-শোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। বিচিত্র হয়ে উঠলো এর ইতিহাস। এই ফুটপাথে একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সমস্তটা ভাবতে বেশ লাগছিল তার। এখানে এই শহরে কেদারবাবুরাও থাকে, আবার শম্ভুরাও থাকে। এখানে কুন্তি গুহরাও থাকে, আবার শৈলরাও থাকে। এখানে একটা দরকারী ওষুধ পয়সা দিয়েও কিনতে পাওয়া যায় না, আবার পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে সিনেমায়

ঢোকবার জন্যে এখানে মানুষ ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কিউ দিয়ে দাঁড়ায়। এখানে এত কাজ, আবার বিনয়ের মত কত ছেলে কাজের চেষ্টায় পায়ের জুতো ক্ষইয়ে ফেলে।

মুচিটা একমনে জুতো সারাচ্ছিল। শৈল সেই দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

কাজ শেষ হলেই সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—কত দিতে হবে?

হঠাৎ যেন পেছনে ভিড়ের ধাক্কা লাগলো গায়ে। ধাক্কা লেগে শৈল আর একটু হলে পড়ে যেত!

—লোক দেখে হাঁটতে পারেন না?

কথাটা বলেই কিন্তু সদাব্রত আশ্চর্য হয়ে গেছে। এমন করে আবার হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি। কুন্তির সঙ্গে আরো দু'জন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সদাব্রত কথাটা বলে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। কিন্তু কুন্তি থেমে রইল না। বললে—কী বললেন?

এবার শৈলই কথা বললে—আমি আর একটু হলে পড়ে যেতুম যে—

কুন্তি ভাল করে শৈলর আপাদমস্তক দেখলে একবার। তার পর সদাব্রতর দিকে চেয়ে বললে—আবার একে জোটালেন কোত্থেকে?

সদাব্রত চুপ করে রইল। তার দৃষ্টিটা পাথর হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

—আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবার একে ধরেছেন বুঝি? এ রকম ক'টা আছে আপনার?

সদাব্রত আর থাকতে পারলে না। বললে—কাকে কী বলছো তুমি?

কুন্তি মুখ বেঁকিয়ে বললে—কেন? ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা হচ্ছে বুঝি? একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছেন? বড়লোকের ছেলে বলে মনে করেছেন আপনি যা করবেন লোকে তাই সহ্য করবে? আমাদের ঘর-বাড়ি সব ভেঙে-চুরে তছ্-নছ্ করে দিয়েও বুঝি আপনার তৃপ্তি হয়নি? আবার আর একটা মেয়ের পেছনে লেগেছেন? এখনও বুঝি এ আপনার স্বরূপ চেনে নি?

আশে-পাশে অনেক লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। তারা কৌতূহলী হয়ে ঘিরে ধরলো।

—কী হয়েছে? কী হয়েছে মশাই?

কুন্তি আবার বলতে লাগলো—কিন্তু ভাববেন না আমি অত্নে আপনাকে ছেড়ে দেব, আপনি আমার বাবাকে খুন করেছেন, সে কি আমি ভুলবো ভেবেছেন ?

সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। সেদিন সেই জনবহুল রাস্তার মধ্যে বহু বেকার লোক সদাব্রতকে ঘিরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল দু'জনকে।

শেষ পর্যন্ত কুন্তি চলেই গিয়েছিল। কিন্তু তখনও সদাব্রতর মাথাটা ঘুরছে। মুচিকে পয়সা দিয়ে যখন ট্যাক্সিতে উঠেছিল দু'জনে তখন অনেকক্ষণ কোনও কথা মুখ দিয়ে বেরোয় নি সদাব্রতর। কুন্তির বাবাকে কে মেরেছে ? আর একটু হলেই রাস্তার মধ্যেই হয়ত একটা সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটে যেত। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছিল সে। কিন্তু মাথার মধ্যে যেন পৃথিবীর সমস্ত আগুন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল তার।

পাশেই শৈল বসে ছিল চুপ করে। ট্যাক্সিটা হু-হু করে চলেছে।

শৈল একবার জিজ্ঞেস করলে—ও মেয়েটা কে ?

সদাব্রতর তখন উত্তর দেবার ক্ষমতাটুকুও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

শৈল খানিক চুপ থেকে আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনি চেনেন নাকি ওকে ?

সদাব্রত এ-কথারও কোনও জবাব দিতে পারলে না। ট্যাক্সিটা হু-হু করে চলতে লাগলো বাগবাজারের দিকে।
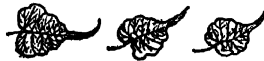
সদাব্রত নিজের আঘাতে নিজেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল সেদিন। এমন করে কখনও আঘাত পাবার প্রয়োজন হয়নি তার আগে, হয়ত প্রয়োজন ছিলও না এমন আঘাতের। জীবনে সহযোগিতার যতটা প্রয়োজন আঘাতের প্রয়োজন হয়ত ঠিক ততটাই। আঘাতের সময় দুঃখটা তীব্র থাকে বলেই আঘাতের উপকারিতা বুঝতে পারি না। কিন্তু যাকে বড় হতে হবে, যাকে মহৎ হতে হবে, যাকে প্রাত্যহিক বিপর্যয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, তার যে এ ছাড়া আর পথ নেই! তাই শৈল যত প্রশ্নই করেছে তাকে, তার মুখ দিয়ে কোনও উত্তরই বেরিয়ে আসে নি সেদিন।

শৈল জিজ্ঞেস করেছিল—কী হলো, আপনি উত্তর দেবেন না ?

সদাব্রত বলেছিল—উত্তর চাও না কৈফিয়ৎ চাও ?

—ছিঃ !

শৈল বলেছিল—আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার আমার অধিকার আছে নাকি ? আমি শুধু জানতে চাইছিলুম, ও কে ? ও মেয়েটা অমন করে আপনাকে অপমান করছিলই বা কেন ? আর আপনিই বা ওর একটা কথারও জবাব দিলেন না কেন ?

সদাব্রত অপরাধীর মত চুপ করে রইল। তার উত্তর দেবার ক্ষমতা যেন কেউ কেড়ে নিয়েছে।

—থাক গে, আপনাকে আর ও-কথার জবাব দিতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি—

—কী বুঝতে পেরেছো ?

ট্যাক্সিটা তখন বাড়ির সামনে এসে গিয়েছিল। সদাব্রতও শৈলর পেছন-পেছন নামছিল। শৈল বললে—আপনাকে আর ভেতরে আসতে হবে না—

সদাব্রত বললে—মাস্টার মশাইকে বলে আসি—

—কী বলবেন ?

—এই তোমাকে নিয়ে এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলুম, কেন এত দেরি হলো ফিরতে—

শৈল বললে—কাকা পাগল-মানুষ, সকলকেই বিশ্বাস করে, কেউ মিথ্যে কথা বলে গেলেও কাকা কখনও অবিশ্বাস করে না। কিন্তু তার দরকার নেই, আমি গিয়ে সত্যি কথাই বলবো—

সদাব্রত সামনে এগিয়ে এসে বললে—তা হলে এই সত্যি কথাটাও বলো যে, রাস্তায় আজ যে-মেয়েটা আমাকে তোমার সামনে অপমান করে গেল তার সঙ্গে আমি এমন কোনও অন্যায় ব্যবহার করি নি যার জন্যে সে অমন অভদ্র হতে পারে—

—তা হলে আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি ওকে চেনেন ?

সদাব্রত বললে—তোমাকে যতটুকু চিনি, ওকেও ঠিক ততটুকুই চিনি, একতিল বেশি নয়। তুমি যেন আমায় ভুল বুঝো না—

শৈল হেসে ফেললে।

—বা রে, আপনি আমার কাছে যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন মনে হচ্ছে। আমি

কি আপনার কাছে সে-কৈফিয়ৎ চেয়েছি ? আর তা ছাড়া আমি আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার কে ?

সদাব্রত আরো এগিয়ে গেল। বললে—না, তবু তোমার শোনা উচিত। আমার সম্বন্ধে কেউ ভুল ধারণা করে রাখবে, এটা আমি চাই না। আমি তোমাকে সমস্ত জিনিসটা খুলে বলি—

—কিন্তু আমার কি সংসারের আর কিছু কাজ নেই ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার মিথ্যে কথাগুলো শুনলেই চলবে ?

—ঠিক আছে, না-শুনতে চাও শুনো না, কিন্তু দয়া করে একতরফা জবাব শুনেই যেন মামলার রায় দিয়ে বোস না, ওতে অবিচার হয়—

আশে-পাশে পাড়ার লোকজন যাতায়াত করছিল। অন্ধকার হয়ে গেছে গলিটা। দু-একজন শৈলর মুখের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেও চেষ্টা করছিল। দু'জনের কথায় তখন একটু ছেদ পড়েছে।

সদাব্রত বললে—আমি কালকে একবার দোকানে খোঁজ নেবো'খন, ওষুধটা পাওয়া যায় কি না—

হঠাৎ নতুন করে কাকার কথাটা মনে পড়তেই শৈলর যেন হুঁশ হলো। বললে—আচ্ছা আমি যাই—

অন্ধকারের মধ্যে কে যেন শৈলকে দেখেই বললে—ও মা, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ?

—কেন মাসীমা ?

—তোমার কাকা যে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে সারাক্ষণ 'জল' 'জল' করে চেঁচিয়েছে —আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছো ?

শৈলর আর কথা বলা হলো না। ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। সদাব্রতও পেছন-পেছন গিয়ে ঢুকলো ঘরে।

মাসীমাকে যাবার সময় বলে গিয়েছিল দেখতে। মাসীমাই বুঝি একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গিয়েছে। তক্তপোশটার ওপর একপাশে শুয়ে কেদারবাবু 'মা' 'মা' করছিলেন।

শৈল কাছে গিয়ে মাথায় হাত দিলে,—কাকা!

কেদারবাবু যেন একটু চোখ চাইলেন।

—এই তো আমি এসেছি কাকা, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে ?

কাকার মুখ দিয়ে তখন আর কথা বেরোচ্ছে না। অথচ কথা বলতে যেন

চেষ্টা করছেন। কপাল তখন জ্বরে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি থার্মোমিটারটা নিয়ে শৈল কাকার জ্বর দেখতে লাগলো।

সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—জ্বর এখন কত?

—একশো চার—একবার ডাক্তারবাবুকে খবরটা দিলে ভালো হতো!

—আমি যাচ্ছি—

শৈল বলে দিলে—এই বড় রাস্তার মুখেই ডাক্তারবাবুর ডিস্‌পেন্‌সারি—

সদাব্রত আর দাঁড়ালো না। অন্ধকার গলি দিয়ে এঁকে-বেঁকে বড় রাস্তায় পড়তে হয়। ঠিক মুখেই যেন একটা চেনা মুখের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মন্মথ!

—একি, সদাব্রতদা, কোথায় চললে?

সদাব্রত বললে—মাস্টার মশাইয়ের অসুখটা খুব বেড়েছে ভাই, তুমি যাও, আমি একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসছি—

—কিন্তু ক'দিন আগেই তো ভাল দেখে গিয়েছিলুম, মঙ্গলবার দিন যে আমি এসেছিলুম—

—আজ দুপুরে হঠাৎ বেড়েছে, তুমি যাও—

সদাব্রত বাগবাজার স্ট্রীটের মোড়ে এসে ডাক্তারখানাটা খুঁজতে লাগলো।

জীবনের অনেক সত্যের মধ্যে একটা মহান সত্য এই যে যা সব চেয়ে সহজ 'তা প্রথমে সহজ হয়ে সহজ চেহারা নিয়ে সামনে উদয় হয় না। প্রথমে মনে হয় এ-রাত্রি কেমন করে কাটবে, এ-সমুদ্র কেমন করে পার হবো। কিন্তু সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলে কখন সব বাধা দূর হয়ে যায়, সব ভয় তুচ্ছ হয়ে আসে, কখন সব কাঁটা ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। তখন নিজেরই হাসি পায়। এই আমি সদাব্রত গুপ্ত একদিন সামান্যকে অসামান্য ভেবে হতাশ হয়েছিলাম। অথচ এখনও তো বেঁচে আছি, এই গাড়ি চালিয়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি!

শুধু একদিন নয়। শুধু একজনের জীবনে নয়। হয়ত আমার আগে পৃথিবীতে যারা এসেছে তাদেরও এমনি প্রতিদিন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। আমি, আমার বাবা, ওই শম্ভু, ওই কেদারবাবু, ওই শৈল, ওই

মন্মথ, যাদের চোখের সামনে দেখছি, তারাই তো শুধু এ-পৃথিবীর মানুষ নয়। আমাদের আগেও আরো কত অসংখ্য মানুষ এই পৃথিবীতে এসে বাস করে গেছে, বাস করে জীবনকে ভালবেসে গেছে, জীবনকে ঘৃণা করে গেছে, জীবনকে অভিনন্দিত করেছে, জীবনকে আবার ধিক্কার দিয়ে গেছে। তারা সব কোথায় গেল আজ?

গাড়িটা গিয়ে থামলো মিস্টার বোসের বাড়ির সামনে।

শিবপ্রসাদবাবু বলে দিয়েছিলেন—ঠিক সকাল ন'টার সময় গিয়ে হাজির হবে, এক মিনিট দেরি করবে না—

মিস্টার বোস নিজে পাঙ্‌চুয়াল লোক, পাঙ্‌চুয়ালিটি পছন্দও করেন, চুরোট টানতে টানতে বললেন—সো ইউ আর জুনিয়ার গুপ্ত?

আগেই পরিচয় দিয়েছিল সদাব্রত। আগে থেকেই পাকা ব্যবস্থা করা ছিল বাবার। এ পছন্দ করার প্রশ্ন নয়। এ সিলেক্‌শানের প্রশ্নও নয়। দশ জায়গায় দরখাস্ত দিয়ে একটা জায়গায় ইণ্টারভিউ পাওয়াও নয়। সব জায়গাতেই এ-রকম সিস্টেম্ থাকে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের নিজের ক্যাণ্ডিডেট্ থাকলে তাকে নিতেই হবে।

—আচ্ছা, একটা কথা, খবরের কাগজ নিশ্চয়ই পড়ো?

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ—

—সে-রকম পড়া নয়, মানে ইন্-বিটুইন্-দি-লাইনস্ পড়ো?

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ—

—তা হলে হোয়াট ইজ ইওর ওপিনিয়ন্ অ্যাবাউট্ দিস—

বলতে গিয়ে একটু দ্বিধা করলেন যেন।

সত্যিই অদ্ভুত সব প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। বুলগানিন আর ক্রুশ্চেভ সম্বন্ধে তোমার ওপিনিয়ন কী?

—তাঁরা আমাদের গেস্টস্, অতিথি।

—কিন্তু তাঁদের ইণ্ডিয়ায় ইন্‌ভাইট্ করে নিয়ে এসে আমাদের কিছু উপকার হবে মনে করো?

—এটা তো ডিপ্লোমেসি! ফ্রি কাণ্ট্রির মধ্যে এ-রকম এক্স্‌চেঞ্জ অব্ গেস্টস্ হয়ে থাকে।

—তাতে তোমার কি মনে হয় আমাদের দেশের কিছু উপকার হবে?

সদাব্রত ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। চুরোট-ধরা মুখের প্রশ্ন,

নিজের জীবনের দৈনন্দিন প্রশ্নগুলোর যেন একটা উত্তর খুঁজছেন তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে। তাঁর নিজেরও একটা ওপিনিয়ন্‌ আছে। মিস্টার বোস শুনতে চাইছেন, জানতে চাইছেন তাঁর নিজের উত্তরের সঙ্গে সদাব্রতর উত্তরের তফাৎ আছে কি-না। ভবিষ্যৎ জীবনে অন্য কোনও বিষয়ে দুজনের মতের মিল হবে কি-না। সদাব্রত এক সেকেণ্ড ভেবে নিলে। বাবা তাকে কিছুই বলেন নি আগে থেকে। বলেন নি যে সদাব্রতকে এই রকম কূট প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।

—এই যে আজ ব্রিটেন আর ফ্রান্স ইজিপ্টকে অ্যাটাক্‌ করেছে—ডু ইউ সাপোর্ট ইট্‌ ?

সদাব্রত দেখলে প্রশ্নটা করার পরই চুরোটের ছাইটা ভেঙে পড়লো টেবিলের ওপর।

—ভেরি গুড ? নাউ অ্যাবাউট্‌ পাকিস্তান, তুমি কি চাও যে ইণ্ডিয়া আর পাকিস্তান আবার ইউনাইটেড্‌ হোক ?

বিরাট কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিস্টার বোস। গভর্মেণ্ট অর্ডার পান বছরে ষাট লক্ষ টাকার ওপর। তার পরে আছে লোক্যাল আর ইণ্টারস্টেট্‌ মার্কেট। তাতেও কয়েক লক্ষ টাকার সেল্‌ গ্যারাণ্টিড্‌। বলতে গেলে ফ্যান্‌ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং-এর ব্যাপারে 'সুভেনীর ইঞ্জিনীয়ারিং'-এর মনোপলি। কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক পাখার সঙ্গে রাজনীতির কী সম্পর্কে তা বোঝা গেল না। ইণ্টারন্যাশন্যাল রাজনীতির সঙ্গে এ-সব কথার কি এতই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ?

—আচ্ছা, ডাক্তার রায়ের এই বিহার-ওয়েস্টবেঙ্গল-মার্জার সম্বন্ধে তোমার কী মত ? তুমি কি এর ফেভারে ?

তার পর প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেল যেন। একটার পর একটা অনেক প্রশ্ন উঠলো। কমিউনিজম্‌, ক্যাপিট্যালিজম্‌, ইউ-এন-ও, পিপলস্‌ রিপাবলিক অব্‌ চায়না, দালাই লামা, রেফিউজী-প্রব্‌লেম্‌ কোনও কিছুই বাদ রইল না।

—তুমি চা খাবে ?

উত্তরের অপেক্ষা না-করেই বোধ হয় টেবিলের তলার বোতামটা টিপে দিয়েছিলেন মিস্টার বোস। বেয়ারা এলো, চা এলো। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন মিস্টার বোস। চা খেতে খেতে আরো ফ্র্যাঙ্ক হলেন। গলার টাইটা ঢিলে করে দিলেন।

—দেখো, তোমাদের জেনারেশনটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না সদাব্রত! মিস্টার গুপ্ত আর আমি দু'জন এক আইডিওলজিতে মানুষ। আমরা মানুষের ইন্‌টেগ্রিটিতে বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বাস করি সব মানুষ সমান ইন্‌টেগ্রিটি নিয়ে জন্মায় না। মানুষে-মানুষে যে তফাৎ, এ-শুধু গডের ডিস্‌ক্রিশন নয়, এটা ল অব্‌ নেচার! একজনকে মেরে তবে আর একজন বাঁচবে! সবাইকে সমান করতে গেলে সবাই মরে যাবে। পৃথিবীতে আবার সেই ডেলিউজ নেমে আসবে। আমরা আবার সেই স্টোন এজ-এ ফিরে যাবো! সেইটেই কি তোমরা চাও?

—কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যে রামরাজ্যের কথা বলেছিলেন?

—ওই একটা ম্যান্‌। গান্ধীজী যখন ছিলেন তখন ছিলেন। ইণ্ডিয়ার হিস্ট্রিতে গান্ধীজীর মত লোকের দরকার ছিল তাই তাঁকে আমরা ডেমি গড করে তুলেছিলাম। দরকার ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি। ভাবো তো একবার কী বিপদ হতো যদি এখন তিনি বেঁচে থাকতেন? কুইন ভিক্টোরিয়া বেশি দিন বেঁচে থাকায় এডওয়ার্ড-দি-সেভেন্থের কী দুর্দশা হয়েছিল ভাবো তো? যে-কোনও সংসারের কথাই ধরো না—বুড়ো বাপ বেশি দিন বেঁচে থাকলে সে-সংসারে শাস্তি থাকে? কিছু মনে করো না, গান্ধীজীর ওপর তোমার চেয়ে আমার কম রেস্‌পেক্ট্‌ নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি হিস্ট্রি ক্রিয়েটেড্‌ হিম্‌, হি ডিড'নট্‌ ক্রিয়েট্‌ হিস্ট্রি! ইতিহাস বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে এক-একজন মানুষের এক-একজন প্রাইম মিনিস্টারেরও বদলাবার প্রয়োজন হয়! ইংলণ্ডে, জার্মানীতে, ফ্রান্সে—প্রত্যেক সভ্য দেশে তাই-ই হয়েছে, আর তোমাদের স্বর্গ সোভিয়েট রাশিয়াতে কী হচ্ছে তা কারো জানবার উপায় নেই। স্টালিনকে সরাতে গিয়ে কত হাজার-হাজার লোক যে খুন হয়েছে সে-খবর পরে কোনও দিন হয়ত বেরোতেও পারে—

'সুভেনীর ইঞ্জিনীয়ারিং'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার সহজ মানুষ নন। আট বছর হলো মাত্র কোম্পানী করে বিরাট ফ্যাক্টরি করে দু'হাজার লোকের অন্নদাতা হয়ে উঠেছেন। নিজে বাড়ি করেছেন এলগিন রোডের শৌখীন পাড়ায়। কলকাতার নতুন বনেদী সমাজে নাম লিখিয়েছেন। এর পর মিস্টার বোস যা ফতোয়া দেবেন, তাই-ই বেদ, তাই-ই কোরান, তাই-ই বাইবেল। সাক্‌সেস্‌ফুল মানুষ যা বলবে তার প্রতিবাদ করতে নেই। সাক্‌সেস্‌ফুল মানুষেরা প্রতিবাদ সহ্য করে না।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মিস্টার বোস এবার হাত-ঘড়িটা চিৎ করে দেখলেন।

—অল্‌রাইট্‌ সদাব্রত—

সদাব্রতও উঠলো। বুঝলো তার কাজ হয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে আবার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলে। তাদের সমাজে বাঁধা নিয়মে কাজ চলে। তাদের সমাজে সময়ের দাম বলে একটা জিনিস আছে। এবার তাকে তাদের নিজেদের সমাজের নিয়ম মেনে চলতে হবে—এইটেই শিবপ্রসাদবাবু চান। সদাব্রত বিনয় নয়, সদাব্রত শম্ভুও নয়, কেদারবাবুও নয়। সদাব্রত শিবপ্রসাদবাবুর ছেলে। শিবপ্রসাদ গুপ্ত! এই কলকাতা এখন দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা হ্যাভ্‌দের দল, আর একটা হ্যাভ-নটদের। সকলকে তুমি চেষ্টা করেও হ্যাভদের দলে আনতে পারো না। চেষ্টা করেও তাদের সকলের জন্যে ফ্ল্যাট যোগাড় করে দিতে পারো না, তাদের মুখে ফুড দিতে পারো না। ইতিহাসে তা কখনও হয় নি, তা কখনও হবেও না। একজন শাসন করবে, আর একজন শাসন মেনে চলবে। যেমন সকলকে এডুকেশন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করতে পারো না, তেমনি সকলকে সমান ফেসিলিটি দিয়ে শিবপ্রসাদ গুপ্ত করে তুলতে পারো না। ওটা ইন্‌টেগ্রিটির প্রশ্ন। ওই ইন্‌টেগ্রিটি তোমার আছে, কারণ তুমি শিবপ্রসাদ গুপ্তর ছেলে। যে-মিস্টার বোসের কাছে অন্য ছেলেরা হাজার চেষ্টা করেও পৌঁছতে পারে না, তুমি এক-কথায় সেখানে ঢুকে গেলে। তুমি সদাব্রত গুপ্ত, তুমি কলকাতা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট, এখুনি দু'হাজার টাকার মাইনে পেয়ে যাবে। কারণ তুমি আমাদের সমাজে জন্মেছো, আমাদের ক্লাসে তুমি উঠেছো তোমার বাবার কল্যাণে! তোমাকে প্রোভাইড্‌ করা আমাদের ডিউটি। আমাদের গ্রুপের মধ্যে পড়ে গেছ তুমি। আমাদের গ্রুপের যে কেউ আন্‌-এমপ্লয়েড্‌ থাকবে তাকে আমরা এমপ্লয়মেণ্ট দেবো। আমরা আমাদের নিজের স্বার্থ দেখবো। আর যদি রোটারী ক্লাবে কি ইউ. এন্‌. ও.-তে লেক্‌চার দিতে হয় তো তখন যা বলবার তা বলবো। তখন বলবো গরীব মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা, বলবো ত্যাগের কথা, কল্যাণের কথা। তখন বলবো স্বামী বিবেকানন্দের কথা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা, গীতার কথা, উপনিষদের কথা। বলবো ধর্ম, ঈশ্বর আত্মার কথা। সে-সব কথা বলবার জন্যে আমরা লেক্‌চার মুখস্থ করে রেখে দিয়েছি।

ক্রমে কলকাতার মাথার ওপর দিয়ে সূর্যটা আরো কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে গেল। কিন্তু তবু সদাব্রত যেন অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো শহরময়।

বাড়িতে ফিরে আসতেই মন্দাকিনী বলে—কী রে, কী হলো তোর? কোথায় থাকিস্ সারাদিন?

সদাব্রতর উত্তর দেবার কিছু থাকে না তাই উত্তর দিতে পারেও না। কী করে বলবে সে কোথায় থাকে? কী করে বলবে কার সঙ্গে সে সারা দিনটা কাটায়? আসলে কোথাও তো যায় না সে! কারো সঙ্গে সে দেখা করে না। ওদিকে কেদারবাবুর বাড়িতে হয়ত তাঁর জ্বর বেড়েছে। সেই যে একদিন ডাক্তার ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, আর যায় নি ওদিকে। তাকে হয়ত আর প্রয়োজনও নেই তাদের। মন্মথ আছে। সে-ই দেখাশোনা করতে পারবে। সে—এই সদাব্রত গুপ্ত, মাস্টার মশাইয়ের জীবন থেকে মুছেই যাবে। এর পর থেকে প্রতিদিন সকালে গাড়িটা নিয়ে মিস্টার বোসের 'স্নুভেনীর ইঞ্জিনীয়ারিং'-এর ফ্যাক্টরির অফিসে গিয়ে বসবে। এয়ার-কন্‌ডিশান করা ঘর। তার ভেতরে দিনের সূর্য সন্ধ্যেবেলায় পশ্চিম দিগন্তে গিয়ে অস্ত যাবে। আর মাস গেলে সে দু'হাজার টাকা মাইনে নিয়ে আসবে। কারো প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা থাকবে না, কারো প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও থাকবে না। কারণ সদাব্রত গুপ্ত 'স্নুভেনীর ইঞ্জিনীয়ারিং'-এর পারচেজিং অফিসার। মিস্টার বোসের জামাতা। মিস্টার বোসের মেয়ের সে স্বামী। মিসেস মনিলা গুপ্তর সে হাজ্‌ব্যাণ্ড।

মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করে—তা হ্যাঁ গো, ও কীরকম নাম? নামের মানে কী?

শিবপ্রসাদবাবু বলেন—কেন?

—মানে, মলিনা শুনেছি কিন্তু মনিলা তো শুনিনি কখনও—

—তা শোন নি কখনও, এইবার শুনবে। নাম নামই, নামের কি মানে থাকতেই হবে এমন কোনও কথা আছে? কেন? খোকা:কিছু বলছিল নাকি?

—না, খোকা আবার কী বলবে? তুমি যা ভাল বুঝবে তাই-ই হবে!

শিবপ্রসাদ বললেন—সেদিন দেখলুম কি-না! তাই তাড়াতাড়ি করে ফেললুম। মিস্টার বোস তো অনেক দিন থেকেই বলছিল আমাকে, আমিই

সময় পাচ্ছিলুম না, তাই একটু দেরি করে ফেলছিলুম। কিন্তু সেদিন ব্যাপার দেখে আমার টনক নড়লো—

—কী ব্যাপার দেখলে আবার? আমায় তো কিছু বলো নি?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—আসছি রোটারী-ক্লাবের একটা মীটিং সেরে, হঠাৎ দেখি চৌরঙ্গীর ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে—

—কে? আমাদের খোকা?

—সে দেখলে ভদ্রলোকরাই বা কী ভাবে বলো তো! আমি যেটা পছন্দ করি না, তা-ই হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আজকাল দেখেছি ট্রাউজার আর হাওয়াই শার্ট পরে ইয়াং ছোকরারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করছে। কিংবা চায়ের দোকানে বসে সমস্তটা দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। আর জানো, আমি যখন দিল্লী গিয়েছিলুম, দু-চার দিন ও অফিসে বসতো। তা বসে বসে কিছু কাজ করতো না, শুধু বন্ধুদের টেলিফোন করতো।

বেশি কথা বলার সময় থাকে না শিবপ্রসাদবাবুর, ছেলের দিকে এতদিন নজর দেন নি বলেই একেবারে সমস্ত যেতে বসেছিল। শেষকালে আজকালকার যা ব্যাপার—কবে কী করে ফেলবে বলা যায়? দেখ না, জওহরলাল নেহেরুর মেয়ে কাকে একটা বিয়ে করে বসলো। গান্ধীজীর ছেলেরাও মানুষ হলো না। আমরা পাবলিক-ম্যান্ যারা, দিনরাত কেবল কাজ নিয়েই থাকি, ছেলে-মেয়ে-বউ কখন দেখবো? তা হলে আর কান্টির কোনও কাজ করা যায় না, অফিস থেকে এসে ছেলেকে পড়াতে বসলেই হয়। কিংবা বউকে নিয়ে সিনেমায় গেলেই হয়। ও-সব কেরানীদের পক্ষেই সম্ভব। আমার অফিসের ক্লার্করা ওই সবই করে। ওটা ওদের পোষায়।

হিমাংশুবাবু সব খবরই রাখতেন।

বললেন—আমি তো অত জানতুম না, তাই সেদিন ছোটবাবু সব জিজ্ঞেস করছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—

—সদাব্রত? সে আবার কবে অফিসে এসেছিল?

—এই আপনি তখন ছিলেন না, আমাকে সব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, যাদবপুরে আমাদের জমির ওপর কোনও উদ্বাস্তু কলোনী ছিল কি-না, আমরা গুণ্ডা লাগিয়ে কলোনী ভেঙে দিয়েছি কি-না,—

—তার পর? আর কী জিজ্ঞেস করলে?

—কোনও বুড়ো লোক মারা গেছে কি-না, এই সব।

—তা তুমি কী বললে ?

—আমি বললুম আমরা তো মারতে কাউকে চাই নি, আমরা ভালোয় ভালোয় সকলকে উঠে যেতেই বলেছিলুম, তবে মারা যদি কেউ গিয়েই থাকে তো মরে যাবার বয়েস হয়েছিল বলেই মারা গেছে। আমরা এত নিষ্ঠুর নই যে কাউকে ইচ্ছে করে মেরে ফেলবো।

—ঠিক বলেছ তুমি। তা শুনে খোকা কী বললে ?

—ছোটবাবুর তো বয়স কম। শুনে বললেন, কোনও কম্‌পেন্‌সেশান্‌ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে কি-না। আমি বললুম অ্যাকৃসিডেণ্ট ইজ অ্যাকৃসিডেণ্ট্—

—তা বললে না কেন রায়াটের সময় হাজার-হাজার লোক খুন হয়েছে, ফেমিনের সময় লক্ষ-লক্ষ লোক মরে গেছে, তা হলে তাদের সকলকেও কমপেন্‌-সেশান্‌ দিতে হয় !

তার পর হঠাৎ প্রসঙ্গ থামিয়ে বললেন—যাক গে, ও-সব কথার কোনও উত্তর দেবার দরকার নেই তোমার, ওই সব কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশে-মিশে ওই রকম আইডিয়া হয়েছে আর কি ! আমি এবার অন্য ব্যবস্থা করে ফেলেছি, এবার যদি আসে, তুমি ও-সব কথার উত্তর দিও না—আর···

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই কথা বন্ধ করতে হলো। রিসিভারটা তুলে নিয়ে কথা বলতেই মুখে হাসি বেরোলো।

বললেন—এই যে, আপনার কথাই ভাবছিলাম, নমিনেশন্‌ বেরিয়ে গেছে শুনেছেন তো ?

ও-পাশ থেকে মিস্টার বোস বললেন—তাই নাকি ? পার্লামেণ্টে কে যাচ্ছে আমার কন্‌স্টিটিউয়েন্সি থেকে ?

—ও, আপনি এখনও খবর পান নি ?

মিস্টার বোস বললেন—কিন্তু মিস্টার সাহা যে অত চাঁদা দিলেন—

—কোথায় চাঁদা দিলেন ?

—সে কি, আপনি জানেন না ? ফ্লাড-রিলিফ ফাণ্ডে মিস্টার সাহা তো ফর্টি থাউজ্যাণ্ড রুপিজ ডোনেশান দিয়েছেন—অথচ নমিনেশান দেবার বেলায়···তা সি-পি-আই ক্যাণ্ডিডেট্ কে ?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—টেলিফোনে সব বলা ঠিক নয়। আমি সব বলবো-'খন আপনাকে, ওয়েস্ট-বেঙ্গলের হাত কেটে দিয়েছে এবার সেণ্টার।

—কী-রকম ?

—আরে জানেন না ? দিল্লী থেকে নেহরুর ডাইরেক্‌টিভ্‌ এসেছে কোনও ক্যাণ্ডিডেট্‌ ইলেক্‌শানে লুজ করলে ব্যাক্‌ডোর দিয়ে তাকে ক্যাবিনেটে নেওয়া চলবে না।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো অত স্ক্রুটিনী !

মিস্টার বোস মাঝখানে আবার বাধা দিলেন—হ্যাঁ একটা কথা, মনিলা বলছিল……

—মনিলা ?

—হ্যাঁ, বলছিল সদাব্রতের সঙ্গে একবার ইন্‌ট্রোডিউস্‌ড হতে চায়…একটা চায়ের পার্টিতে—

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—খুব ভালো কথা, নিশ্চয় নিশ্চয়—

—মানে লাইফের পার্টনারকে একবার দেখতে চায়, অবশ্য আমি তাকে খুব ভালো করেই পরীক্ষা করে নিয়েছি, জানেন ? ভারি ইন্‌টেলিজেন্ট্‌ বয় সদাব্রত, আমি যতগুলো কোশ্চেন করলুম সবগুলোর স্যাটিস্‌ফ্যাক্টারি উত্তর দিলে। তবে ওই যে আজকালকার ছেলেরা যা হয়, একটু মনে হলো প্রো-রেড্‌—

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—না না, আসলে আমিও তা-ই ভাবতুম আগে, আসলে আমারও একটু সন্দেহ ছিল। আমি একদিন ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে দেখেছি—দেখলাম সদাব্রত প্রো-কমিউনিস্টও নয়, অ্যান্টি-কমিউনিস্টও নয়—

—তা হলে কী ?

—আসলে নানান্‌ রকমের লিটারেচার পড়ছে তো, আর ক্যালকাটাতে এখন নানান্‌ রকম সব এলিমেণ্ট জুটেছে, ও আসলে নন্‌-কমিউনিস্ট—

মিস্টার বোস বললেন—তা সে প্রো-কমিউনিস্টই হোক আর অ্যান্টি-কমিউনিস্টই হোক, ইট ম্যাটারস্‌ ভেরি লিট্‌ল্‌ টু মি ! আমি ওকে রেজিমেণ্টেশন্‌ করে ঠিক করে নেবো—

—তা হলে কবে ঠিক করছেন ?

মিস্টার বোস বললেন—সে আমি আপনাকে সব ঠিক করে জানিয়ে দেবো, সামনেই আমার স্টাফদের একটা ফাংশান্‌ আছে। ফাউণ্ডার্স ডে উপলক্ষে

একটা ফাংশান্ করছি আমার অরগ্যানিজেশান্ থেকে। সেইদিন মীট্ করলে কেমন হয়?

—আমার কোনও আপত্তি নেই। যেদিন আপনি বলবেন।

—বেশ, আপনি থাকবেন, আপনার মিসেসও থাকতে পারেন, আর মনিলা আর আমি তো থাকবোই, আর সদাব্রত। আর কাউকে রাখতে চান আপনি?

—না না, খুব ভালো আইডিয়া।

—সেই দিনই দু'জনে দু'জনকে চিনতে পারবে, বুঝতে পারবে, আমাদের সময়ে যা হয়েছিল তা হয়েছিল, আজকাল বুঝতেই পারছেন দিন-কাল আলাদা—লাইফ্-পার্টনারদের দু'জনের দু'জনকে ভালো করে বোঝা দরকার বিফোর দে ম্যারি—

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—ইউ আর অ্যাব্সোলিউট্লি কারেক্ট মিস্টার বোস, আপনার সঙ্গে আমি কমপ্লিটলি একমত, আপনি আগে থেকে আমাকে জানিয়ে দেবেন শুধু—

ফোন রেখে দিলেন শিবপ্রসাদ গুপ্ত।

ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টও বসে ছিল না। সেকেণ্ড-ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান তৈরী হয়ে গিয়েছিল। শুধু 'সুভেনীর ইঞ্জিনীয়ারিং'ই নয়। ইণ্ডিয়াতে আরো অনেক হেভি ইণ্ডাস্ট্রী তৈরী করতে হবে। সেকেণ্ড-ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের এইটেই বড় কথা। এই প্ল্যানে ন্যাশন্যাল ইনকাম আরো টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেণ্ট বেড়ে যাবে। লোকের মাথা পিছু এইটিন্ পার্সেণ্ট ইনকাম বাড়বে, অথচ ফার্স্ট-ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে বেড়েছিল মাত্র টেন পার্সেণ্ট। এবার আশি মিলিয়ন পাউণ্ড খরচে ব্রিটিশ ফার্মদের সঙ্গে একসঙ্গে একটা স্টীল-প্ল্যাণ্ট্ তৈরী হবে দুর্গাপুরে।

কলকাতাও জমজমাট। আড়াই হাজার বছর পরে বুদ্ধের 'মহাপরিনির্বাণ জয়ন্তী' উৎসব হয়েছে। দালাই লামা আর পাঞ্চেন লামা এসেছে কলকাতায়। আর এসেছে চৌ-এন-লাই। চায়নার প্রাইম্ মিনিস্টার। ইণ্ডিয়ার সব শহরে বিপুল সমারোহ করে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। সব চেয়ে সমারোহ

হয়েছে কলকাতায়। কলকাতার লোকই বুঝি বেশি তাঁর ভক্ত। বড়-বড় করে ছবি ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে। চৌ-এন-লাই নেহরুর জন্মদিনে উপহার দেবার জন্যে সঙ্গে এনেছে এক শিশিভর্তি গোল্ড-ফিশ লাল-নীল মাছ আর একটা হরিণ-ছানা না কী যেন। ছবিটা দেখে সবাই খুশী। পণ্ডিত নেহরুর মুখেও হাসি, চৌ-এন-লাই-এর মুখে হাসি। হাসি আর ধরে না—

রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যেও খুব শোরগোল পড়ে গেছে সব। কোম্পানী তিন হাজার টাকা স্যাংশান্ করেছে স্টাফ রিক্রিয়েশনের জন্যে। সব অফিসেই এই ব্যাপার। যে-কলকাতায় একদিন ছুটো কি তিনটে থিয়েটার চলতো, সেখানে এখন পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার। এবার আর ম্যারাপ খাটিয়ে পাল টাঙিয়ে মাঠের মধ্যে নয়। এবার বোর্ড ভাড়া করে। এখন তিন ঘণ্টার জন্যে পাবলিক স্টেজ ভাড়া লাগে তিনশো-চারশো টাকা। তা তাই-ই সই। লাগে টাকা দেবে মিস্টার বোসরা। এক-একটা আর্টিস্ট দশ জায়গায় দশটা ক্লাবে রিহার্সাল দিয়েও কুলিয়ে উঠতে পারে না। এই বরানগর, তার পরেই যেতে হয় সালকে, তার পরেই আবার ভবানীপুরে। শুধু কি কলকাতায়? কলকাতার বাইরেও আছে। সে-সব পার্টি এলে কুন্তি গুহ বলে—না মশাই, অত দূরে যাবার টাইম নেই আমার—

পার্টি বলে—আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবো আবার পৌঁছে দেবো—

কুন্তি গুহ বলে—মাফ করবেন, আমারও তো শরীর বলে একটা জিনিস আছে, না আমি পাথর?

এমনি অনেককেই ফিরে যেতে হয়। তারা কত কষ্ট করে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আসে আর তাদের শুকনো মুখে ফিরিয়ে দিতে হয়।

কুন্তি বলে—এই ছুটো তো দিন, যখন বয়েস চলে যাবে তখন তো আর কেউ ডাকতে আসবে না ভাই—

বন্দনা বলে—তখন পিসীমার পার্ট করতে ডাকবে—

শ্যামলীও থাকে দলে। তিনটে ফিমেল-রোল যেখানে থাকে সেখানে তিন-জনেরই দেখা হয়ে যায়। রিহার্সালে বসে একসঙ্গে চা খায় আর গল্প করে। আবার রিহার্সালের পর দল বেঁধে আবার অন্য এক ক্লাবে রিহার্সাল দিতে যেতে হয়। এমনি করে সারা কলকাতা।

শ্যামলী বন্দনা দু'জনেই সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বন্দনা বলেছিল—ও-লোকটাকে তুই অমন করে বকলি কেন? ও কে? চিনিস্ নাকি তুই?

কুন্তি বলেছিল—চিনি না? ও যে একদিন আমার পেছন নিয়েছিল!

—তার মানে?

—আমার সঙ্গে ভাব করবার জন্যে ক্লাবের রিহার্সালে গিয়ে বসে থাকতো, ট্যাক্সিতে করে ঘুরে বেড়াতে চাইত। আসলে মতলব খারাপ ওসব ছেলেদের—

বন্দনা বললে—আমার পেছনেও ভাই একজন ছেলে ওই রকম লেগেছিল—

—তুই কী করলি?

—আমি ভাই অনেকদিন মিশলুম তার সঙ্গে। রোজ আমাকে সিনেমা দেখাতো, রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতো—শেষকালে একদিন বললুম আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে চলো, তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও—তার বেলায় আর নয়—

কুন্তি বললে—ওই তো মজা, দশ-বারো টাকার ওপর দিয়ে ফুর্তি মারতে চায় সবাই। চা খাওয়াবে, ট্যাক্সি চড়াবে, শাড়ি-গয়নাও কিনে দেবে, আর যেই বিয়ে করবার কথা উঠবে ওম্‌নি হাওয়া—! আজকাল এক ক্লাস ছেলে ওই রকম ঘুরে বেড়াচ্ছে কলকাতায়—

মেয়েরা কেউ থাকে বেহালায়, কেউ টালিগঞ্জে, কেউ আবার খাস বউবাজারে। সবাই যে যার নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে থাকে, আবার ক্লাবের রিহার্সালে গিয়ে দেখা হয়। তখন এ ওর ডিবে থেকে পান নেয়, জর্দা নেয়। তার পর একদিন স্টেজে গিয়ে রঙ-পাউডার-ম্যাক্স্‌ফ্যাক্টর মেখে পরচুলের খোঁপা পরে প্লে করে আসে। তার পর আবার ক'দিন কারোর সঙ্গে কারোর দেখা নেই।

মিস্টার বোস সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের চেম্বারে বসেছিলেন। দিল্লীর অনেক করেস্‌পণ্ডেন্স বাকি পড়েছিল, সেগুলোর একটা হিল্লে করছিলেন। স্টেনোগ্রাফার ডেকে নোট দিয়ে দিলেই খালাস। ফ্যাক্টরির এক কোণে স্টাফ-টিফিন রুম। সেখানকার শব্দ সামান্য ভেসে আসছিল। ওরা থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছে ছুটির পর।

—বাবা!

টেলিফোন তুলে মেয়ের গলা পেয়েই গলে গেলেন মিস্টার বোস।

—মনিলা! তুমি কোত্থেকে? নিউ এম্পায়ার থেকে? এখানে চলে এসো, একসঙ্গে ক্লাবে যাবো, আই অ্যাম্ রেডি—ও কে—

রিহার্সালও বোধ হয় ওদিকে হয়ে এসেছিল। সামনেই প্লে। এক মাস ধরে 'স্থভেনীর ইঞ্জিনীয়ারিং' ওয়ার্কসের স্টাফরা থিয়েটারের রিহার্সাল দিয়ে আসছে। রিক্রিয়েশনের জন্যে তিন হাজার টাকা স্যাংশান করেছে কোম্পানী। তার মধ্যে স্পোর্টস্ আছে, ইনডোর-গেমস্ আছে, ফ্যান্সি-ফেয়ার আছে, আর আছে থিয়েটার। 'স্থভেনীর ইঞ্জিনীয়ারিং'-এর ফাউণ্ডার্স-ডে উপলক্ষে এ-উৎসব বরাবর হয়।

মিস্টার বোস বলেছিলেন—আমাকে প্রেসিডেন্ট করছো কেন তোমরা, একটা সাহিত্যিক-টাহিত্যিক কাউকে যোগাড় করতে পারো না—

সেক্রেটারি বলেছিল—না স্যার, সাহিত্যিকদের নেমন্তন্ন করলে খবরের কাগজে ছবি ছাপা হবে না—তার চেয়ে কোন ডেলী পেপারের এডিটর-টেডিটর যদি চিফ গেস্ট্...

ঠিক আছে। সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। মিস্টার বোসের একটা টেলিফোনেই সে কাজ হয়ে যাবে। কুন্তি গুহরা তাই দিন-রাত খেটে রিহার্সাল দিয়েছে। সেদিনও রিহার্সালের পর লম্বা খোয়া বাঁধানো রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সবাই বাইরের দিকে আসছিল। কুন্তি গুহ, বন্দনা, শ্যামলী চক্রবর্তী, সঙ্গে কো-অ্যাক্টররা। সবাই প্লে করবে। সামনে গেট। গেট বন্ধ রয়েছে। গেট পেরোলেই বাইরে ট্রাম-রাস্তা। সেই ট্রামে উঠে কুন্তি গুহ, বন্দনা, শ্যামলী যে-যার আস্তানায় চলে যাবে। প্লে'র আলোচনাই করছিল সবাই। ড্রপ সিন্ ওঠবার পর ওপর থেকে লাল ফোকাস কুন্তির মুখের ওপর পড়বে। কুন্তি মাথা উঁচু করে সেই দিকে চেয়ে থাকবে। হাত জোড় করে একটা স্তব পাঠ করবে।

সংস্কৃত স্তব। তার পর ভায়োলিনে একটা স্যাড্-টিউন বেজে উঠবে ব্যাক্-গ্রাউণ্ড থেকে...

—ওই ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের গাড়ি আসছে।

—বড় সাহেব যে এতক্ষণ অফিসে?

কুন্তি গুহ, বন্দনা, শ্যামলীও পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে। খোয়ার রাস্তাটা ধরে বিরাট একটা অটোমোবাইল সরীসৃপের মত গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে তাদের দিকে। ভেতরে আলো জ্বলছে।

কুন্তিরা সরে দাঁড়ালো রাস্তা থেকে।

ভেতরে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আর তার মেয়ে। মেয়েটাকেই বেশি দেখবার মত। ফরসা টক্-টক্ করছে গায়ের রং। একটা দামী পিওর সিল্কের হলুদ শাড়ি, টিয়াপাখীর রং-এর চওড়া নকশা বর্ডার। মাথায় একটা বিরাট স্কাই-স্ক্রেপার খোঁপা।

সকলে সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়িয়েছিল। গাড়িটা গড়াতে গড়াতে গেটের বাইরে চলে যেতেই আবার সবাই রাস্তায় নেমে দাঁড়ালো।

কুন্তি জিজ্ঞেস করলে—সঙ্গে বুঝি আপনাদের বড়-সাহেবের মেয়ে?

—হ্যাঁ, মনিলা বোস। ওর মা ডাকে ম্যানিলা বলে।

কুন্তি গুহ, বন্দনা, শ্যামলী সবাই যেন হঠাৎ বড় ছোট হয়ে গেল নিজেদের চোখেই। একটা ছোট ঘটনা যেন তাদের তিনজনকে বড় তুচ্ছ করে দিয়ে উধাও হয়ে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে!

সেক্রেটারি বললে—ওর শিগ্‌গিরই বিয়ে হচ্ছে কি-না, তাই খুব সেজেছে আজকে—

শ্যামলী জিজ্ঞেস করলে—কোথায় বিয়ে হচ্ছে?

—খুব বড়লোকের সঙ্গে, বালিগঞ্জে শিবপ্রসাদ গুপ্ত আছেন, একজন পোলিটিক্যাল্ সাফারার, তাঁরই ছেলের সঙ্গে।

কুন্তি গুহর মাথাটার ওপর যেন পাথর ভেঙে পড়লো।

—শিবপ্রসাদ গুপ্তের ছেলে? কী নাম বলুন তো?

সেক্রেটারি বললেন—সদাব্রত গুপ্ত—

কথাটা যেন আর কানের ভেতরে ঢুকলো না। মাথা নাক কান সব যেন ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো।

সেক্রেটারি তখনও বলে চলেছে—সেই সদাব্রত গুপ্তই তো আমাদের এখানকার পারচেজিং অফিসার হয়ে আসছে। দু' হাজার টাকা স্যালারি—

এতদিন কলকাতা শহরটাকে কুন্তি একটা ধারালো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এসেছিল। কলকাতার নিজের জৌলুস, কলকাতার নিজের ক্ষুধা, কলকাতার নিজের পাপ, কলকাতার নিজের ইতিহাস, সবটাই ছিল

ফুন্তির অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়েই সে কলকাতাকে একদিন জয় করতে বেরিয়েছিল। এ যেন সেই নিজের বিরুদ্ধেই নিজে যুদ্ধ করা। কুন্তি মনে করতো এ-কলকাতা তার নিজের সম্পত্তি। সে যেমন করে ইচ্ছে, তার নিজের সুবিধে অনুযায়ী, একে ব্যবহার করবে। কলকাতাকে সে ভোগ করবে, কলকাতাকে সে জড়িয়ে ধরে আদর করবে। আবার দরকার হলে কলকাতাকে সে লাথিও মারবে। সেই বহুদিন আগে অকল্যাণু প্রেসের বড়বাবুই তাকে এর হাতে খড়ি দিয়েছিল। সেই বিভূতিবাবুই প্রথম তার চোখ খুলিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—খবরের কাগজে বইতে সব জায়গায় দেখবে লিখছে কলকাতার লোক গরীব, এখানকার লোক আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকে—কিন্তু আসলে এত ব্ল্যাক টাকা ইণ্ডিয়ার আর কোথাও নেই—

সেই-ই প্রথম 'ব্ল্যাক' কথাটার মানে বুঝেছিল কুন্তি ; ব্ল্যাক টাকা কাকে বলে, কী রকম করে আমদানী হয়, কেমন করে সে ব্ল্যাক টাকা খরচা হয়, তা-ও জেনেছিল।

সেই বিভূতিবাবুই বলেছিল—ওয়ার্ল্ডের সব ব্ল্যাক টাকা—সব এইখানে এই কলকাতায় এসে জড়ো হয়—

কুন্তি অবাক হয়ে গিয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল—কেন ? এখানে, এই কলকাতায় কেন আসে ?

—আসে, কারণ ইণ্ডিয়াতেই সোনার দাম সব চেয়ে বেশি, আর কলকাতায় কেন আসে ? তার কারণ কলকাতার পাশেই পাকিস্তান—

কখনও বা পার্ক-স্ট্রীটের নির্জন নিরিবিলি ফ্ল্যাট-বাড়িতে, কখনও কালী-মন্দিরের পাণ্ডাদের খোলার ঘরে, আবার কখনও বা পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে কুন্তি সেই কলকাতাকেই দেখেছিল। কারো নাম জানতো না, কারো নাম জানবার চেষ্টাও করতো না। শুধু পাশে শুয়েই ঘণ্টায় একশো দুশো টাকা পর্যন্ত কামিয়েছে। সে-টাকা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা কি-না তাও কখনও জিজ্ঞেস করে নি তাদের। সোনা-বেচা টাকা না সুপারি-বেচা টাকা তাও জানতে চায় নি। টাকা পেলেই কুন্তি খুশী হয়েছে বরাবর। টাকার জাত বিচার করে নি। টাকাই যখন দরকার, তখন যেমন করে হোক টাকা উপায় করাই ভালো—তা সে ব্ল্যাক টাকাই হোক আর হোয়াইট টাকাই হোক। তুমি কেরানীগিরি করে টাকা উপায় করেছ, না মদ-চোলাই

করে টাকা উপায় করেছ তা আমার জেনে লাভ নেই। সে-টাকায় ত্রি-সিংহ মূর্তি আঁকা থাকলেই হলো।

এতদিন কুন্তি এই বিশ্বাস নিয়েই কলকাতার বুকে বসে রাজত্ব করছিল। রাজত্ব করছিল কখনও চেহারা বেচে আবার কখনও বা চেহারা ধার দিয়ে। কিন্তু এই-ই বোধ হয় প্রথম নিজের ওপর তার ঘেন্না হলো। ঘেন্না হলো কোন এক মনিলা বোসকে দেখে।

কুন্তি খানিকক্ষণের জন্যে বুঝি মনমরা হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—মেয়েটা বুঝি খুব লেখাপড়া-জানা?

স্টাফরা সব-কিছুই জানে। মিস্টার বোসের নাড়ী-নক্ষত্র জেনে তারা বসে আছে। তারাই বললে, দার্জিলিঙের মিশনারী-স্কুলে পড়তো এতদিন। সেখান থেকে পাস করে এই নতুন কলকাতায় এসেছে।

—মিস্টার বোসের বাড়ি কোথায়?

—বাড়ি মানে?

—মানে কলকাতার ঠিকানা?

কলকাতার ঠিকানাও দিলে তারা। কুন্তি এলগিন রোডের ঠিকানাটা মনে মনে টুকে নিলে।

—কেন? মিস্টার বোসের ঠিকানা নিয়ে কী করবেন?

কুন্তি বললে—এই, এমনি জানতে ইচ্ছে হলো—

তার পর যখন কুন্তি বাড়ি ফিরলো, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। কালীঘাটের রাস্তাটা অনেকটা নির্জন। এই নতুন পাড়ায় আসার পর থেকে আর দেরি করে ফিরতে ভয় হয় না কুন্তির। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট থেকে রাত একটার সময় বেরিয়েও রিক্সা পেয়েছে, ট্যাক্সি পেয়েছে।

বাড়িওয়ালী জ্যাঠাইমা বিধবা-মানুষ। একটা কোলের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন জামাই এসে শ্বশুর বাড়িতে থাকে। একটা অভিভাবক হয়েছে বরং বিধবার। যে একখানা পাশের ঘর ছিল, সেখানাই কুন্তিকে ভাড়া দিয়েছিল।

জ্যাঠাইমা এক-একদিন জিজ্ঞেস করতো—তা হ্যাঁ বাছা, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে মা তুমি?

—থিয়েটারে!

—তা থিয়েটার কি এত রাত পর্যন্ত হয় নাকি? এই রাত একটা?

কুন্তি বলতো—থিয়েটার তো সেই সাড়ে দশটার সময় ভেঙে গেছে জ্যাঠাইমা! কিন্তু আমাদের যে তার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকতে হয়, থিয়েটার হয়ে গেলেই তো চলে আসতে পারি না আমরা, সাজ-পোশাক সব খুলে হিসেব মিলিয়ে দিয়ে তবে তো আসতে হবে—

সেদিন সব নিঝুম। কুন্তি নিজের বাড়ির দরজায় এসে ঘা দিতে লাগলো—বুড়ি, ও বুড়ি—

কুন্তির যেন কেমন অদ্ভুত লাগলো। ভেতরে যেন কার গলা শুনতে পেলে। এত রাত পর্যন্ত জেগে-জেগে বুড়ি পড়ছে নাকি? কিন্তু ভেতরে তো অন্ধকার।

—বুড়ি! দরজা খোল—ও বুড়ি—

হঠাৎ এক কাণ্ড হয়ে গেল। সেই অন্ধকার মাঝ-রাত্তিরে দড়াম্ করে দরজার হুড়কোটা খুলে গেল। আর ভেতর থেকে হুড়মুড় করে কে যেন বাইরে বেরিয়ে এল মুখ ঢেকে। আর তার পর কুন্তিকে ঠেলে দিয়ে কে যেন অন্ধকারের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক নিমেষের ব্যাপার। কিন্তু এক নিমেষেই কুন্তি সমস্ত জিনিসটা বুঝে নিলে।

—কে? কে? কে?

একবার চীৎকার করতে গিয়েছিল কুন্তি। কিন্তু কী ভেবে, তখুনি চেপে গেল। ঘরের ভেতরে অন্ধকারে বুড়ি ঘাপটি মেরে ছিল নিশ্চয়ই। তার নিশ্বাস টানার শব্দটাও যেন শুনতে পাচ্ছিল কুন্তি।

এবার আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারে নি। তাড়াতাড়ি অন্ধকারের মধ্যেই সুইচটা টিপে আলো জ্বালতেই কুন্তি দেখে সামনে বিছানার পাশে বুড়ি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

—কে ও, বল্ শিগ্‌গির? বল্? বল্ ও কে? কে পালিয়ে গেল?

বুড়ি দিদির সামনে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে তখনও। একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরোলো না তার। বিছানাটা ওলোট-পালোট হয়ে রয়েছে।

কুন্তি সামনে এগিয়ে গিয়ে বুড়ির চুলের মুঠি টেনে ধরলো।

—এবার বল্ মুখপুড়ী, কাকে ঘরে ঢুকিয়েছিলি? উত্তর না দিলে আমি ছাড়ছি না। বল্—

বুড়ি এবার কেঁদে ফেললে।

—তোর মড়া-কান্না দেখে আমি ভুলছি নে, তুই কাকে ঘরে ঢুকিয়েছিলি আগে বল্, বলতেই হবে তোকে। তোকে আর আস্ত রাখবো না আমি—বলে কী যেন খুঁজতে লাগলো কুন্তি ঘরের চারদিকে চেয়ে। তার পর এক কোণে রাখা তরকারী-কাটা বঁটিটা নিয়ে তেড়ে এলো—

—ও দিদি, মেরো না আমাকে, তোমার পায়ে পড়ছি, মেরো না, আমি আর করবো না।

—তা হলে বল্, কেন মুখ পোড়াতে গেলি এমন করে? কাকে ঘরে ঢুকিয়েছিলি এত রাত্তিরে, বল্?

আর কথা বলে না বুড়ি। দিদির পা জড়িয়ে ধরে মাথা গুঁজে পড়ে আছে।

—বলবি নে মুখপুড়ী? বলবি নে তুই?

কুন্তি আর রাগ সামলাতে পারলে না। একেবারে বঁটিটা মাথায় তুলে দুম করে বসিয়ে দিলে বুড়ির মাথার ওপর। বুড়ি প্রাণপণে একটা বিকট আর্তনাদ করেই থেমে গেল।

আর জ্যাঠাইমা বাড়ির ভেতর থেকে বোধ হয় শুনতে পেয়েছিল। তার গলাও শোনা গেল। গলার আওয়াজটা এদিকে আসছে—ও লো, ও মেয়ে, ওকে অত মারছিস কেন লা? কী হয়েছে? ও মেয়ে!

জ্যাঠাইমা বোধ হয় এই ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কুন্তির সেদিকে খেয়াল নেই। তখনও বলে চলেছে—ওঠ্, মুখপুড়ী, ওঠ্, উঠে দাঁড়া—

জ্যাঠাইমা ঘরে ঢুকে পড়লো। বললে—মারছো কেন মা বুড়িকে? কী করেছে ও?

—দেখুন না জ্যাঠাইমা, আমি দিনরাত খেটে ওকে মানুষ করতে চাইছি, মুখে রক্ত উঠে আমি পয়সা রোজগার করছি, আর ওই মুখপুড়ী কিনা তলায় তলায়......

—তা মারছো কেন মা ওকে? মরে যাবে যে! ওঠো মা, তুমি ওঠো, দিদি তোমার জন্য খেটে-খেটে হয়রান, তোমার তো একটু বুঝতে হয়—

কুন্তি বললে—আমি সেদিন বাইশ টাকা খরচ করে ওর বই কিনে দিলুম, ছ'মাসের মাইনে দিয়ে কত বলে কয়ে হেডমিস্ট্রেস্‌কে পায়ে ধরে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলুম, আর ও কিনা......

—তা ছোট মেয়ে, এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে কি পারে মা? সারা দিন রান্না-বান্না করে আর জেগে থাকতে পারে নি, তা তুমি আমাকে ডাকলে না কেন মা, আমি বুড়ো-মানুষ, আমার তো ঘুমই আসে না। আমি সারা রাত জেগে-জেগে আকাশ-পাতাল করি। আগে জানতে পারলে আমিই সদর দরজা খুলে দিতুম—

—আপনাকে কেন ডাকতে যাবো জ্যাঠাইমা? অত বড় ধিঙ্গী মেয়ে থাকতে আপনাকে কষ্ট দেবো? আর তা' ছাড়া সব আমিই করবো? ও কিছুই করবে না? আমি রান্না করে রেখে দিয়ে গেছি, যাতে ওর লেখাপড়ার ক্ষতি না হয়। এটুকু যদি না পারে তো কী পারবে? কেবল সারাদিন রাস্তায়-রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ালেই চলবে? তা হলে কার জন্যে আমি এত মেহনত করি? আমার নিজের জন্যে?

বলতে বলতে গলাটা যেন ধরে এলো কুন্তির। কবে একদিন ঠিক বুড়ির মতই কুন্তি রাস্তায় বেড়াতে বেরোতে আরম্ভ করেছিল। সে সেই যাদবপুরের কলোনীর কথা। তার পর সেই রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতেই ধাপে-ধাপে নামতে নামতে এই আজ সে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে কোনও আশা নেই, সামনে কোন ভবিষ্যৎও নেই তার। আজ এখানে কাল সেখানে করে করে উঞ্ছবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় বুঝি একটা আশা ছিল বুড়ি তার মানুষ হবে। বুড়িকে সে এ-লাইনে আনবে না। বুড়ি জানতেও পারবে না দিদি কেমন করে কত অপমান সহ্য করে দু' পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। তা কল্পনাও করতে পারবে না। যখন স্ফেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের অফিসে বড়-সাহেবের মেয়েকে দেখেছিল কুন্তি, তখনও নিজের ওপর তার এতটা ধিক্কার আসে নি। তখনও নিজের সম্বন্ধে এতটা ঘেন্না আসে নি। কিন্তু বাড়িতে এসে যে-কাণ্ড দেখলে তার পরে যেন একেবারে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

কুন্তি বললে—যান জ্যাঠাইমা, আপনি ঘুমোন গে যান, আপনি বুড়োমানুষ, আপনি কেন জেগে কষ্ট করবেন?

—আমার কি আর পোড়া চোখে ঘুম আছে মা! ঘুম এলে তো বাঁচতুম বাছা!

—না জ্যাঠাইমা, আপনি যান, কাল সকালে উঠেই আপনাকে আবার সংসারের কাজ করতে হবে—আপনি যান—

বলে কয়ে কুন্তি জ্যাঠাইমাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলে। উঠোন পেরিয়ে জ্যাঠাইমা আবার নিজের ঘরখানায় গিয়ে ঢুকে পড়লো। বুড়ি তখনও কুন্তির পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

জ্যাঠাইমা চলে যেতেই কুন্তি ধমক দিয়ে উঠলো—ওঠ্ মুখপুড়ী ওঠ্, আবার ন্যাকামি করে ঘাপটি মেরে পড়ে আছিস? ওঠ্—

কিন্তু তবু বুড়ির ওঠার নাম নেই। কুন্তি তখনও হাতের ব্যাগটা রাখে নি। সেটা টেবিলের ওপর রেখে কাপড়টা বদলে নিলে, ওই শাড়িটা পরেই আবার বেরোতে হবে কাল। মাত্র তিনখানা শাড়ি। সেই তিনখানা শাড়িই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাবান দিয়ে কেচে ইস্ত্রী করে পরতে হয়। শাড়ি-ব্লাউজ বদলাতে-বদলাতেই বললে—ওঠ্ বলছি, এখনো ওঠ্—এই বয়সেই এত আস্পর্ধা হয়েছে তোমার—আমি যা দু'চক্ষে দেখতে পারি নে, তাই হয়েছে! আমি কোথায় ভাবছি বুড়ি বসে বসে ইস্কুলের পড়া পড়ছে, আর উনি ভেতরে-ভেতরে আমার মুখ পোড়াবার ব্যবস্থা করছেন—

তার পর ঘরের কোণের দিকে চেয়ে দেখলে রোজকার মত ভাত ঢাকা রয়েছে। ভাতের ঢাকাটা খুলতেই নজরে পড়লো ওপর-ওপর দু'থালা ভাত। বুড়ি খায় নি!

—একি, ভাত খাস নি যে তুই বড়? এ আবার কী ঢং?

বলতে বলতে আবার বুড়ির কাছে এলো।

—এই ওঠ্, ভাত খেলি নে কেন? কী হয়েছে তোর? ওঠ্—আবার ন্যাকামি হচ্ছে মেয়ের—

বলে বুড়ির হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই চমকে উঠে এক-পা পেছিয়ে এসেছে কুন্তি। হঠাৎ যেন সাপে ছোবল মারলে তাকে। তার পর আবার বুড়ির গায়ে হাত দিলে। ডাকলে—বুড়ি, ও বুড়ি—

হ্যাঁচকা টান দিতেই বুড়ি উল্টে পড়েছিল। সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা বরফের মত। গালের কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মেঝের ওপর। কুন্তির তখন মাথায় বাজ পড়েছে যেন। একটা বুক-ফাটা হাহাকার যেন হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে ঠেলে প্রাণপণে বাইরে আসতে চাইল। কুন্তি বুড়ির মুখের কাছে মুখ এনে ডাকতে লাগলো—বুড়ি, ও বুড়ি—

বুড়ির মুখে, চোখে, গায়ে পায়ে তখন কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। কুন্তি সেই অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরের ভেতর ভেঙে পড়লো যেন। কী করবে

বুঝতে পারলে না। চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে। কেউ কোথাও নেই। বাইরের পৃথিবীর জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বুড়িকে সেখানে সেই অবস্থাতেই রেখে উঠে দাঁড়ালো। তার পর আর কোনও উপায় না দেখে উঠোনে গিয়ে জ্যাঠাইমার ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। সামনের ঘরটায় জ্যাঠাইমা থাকে আর তার পাশের ঘরে থাকে জ্যাঠাইমার মেয়ে-জামাই।

জ্যাঠাইমার ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিতে লাগলো কুন্তি।

—জ্যাঠাইমা, জ্যাঠাইমা!

বুড়ো-মানুষের ঘুম এমনিতে হয় না। তার ওপর দরজায় টোকা পড়তেই ধড়মড় করে উঠে পড়েছে। বাইরে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী মা! কী হয়েছে?

—জ্যাঠাইমা, বুড়ি কথা বলছে না—

বলতে বলতে গলা বুজে এলো।

—কথা বলছে না কী রে? কী হলো? কেন কথা বলছে না? রাগ করেছে?

কুন্তি আর দাঁড়াতে পারছিল না। বললে—না জ্যাঠাইমা, আমার খুব ভয় করছে···

জ্যাঠাইমা বুঝতে পেরেছে ততক্ষণে। কুন্তির পেছন-পেছন দৌড়তে-দৌড়তে এলো। তার পর আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা জামাইয়ের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকতে লাগলো—ও হরিপদ, হরিপদ—

মেয়ে-জামাই অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। ডাকাডাকিতে তাদেরও ঘুম ভেঙে গেল। তারাও উঠে এসে সব দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে—

তুমি এই কলকাতায় জন্মেছ, এই কলকাতার মধু গুপ্ত লেনের সাধারণ মানুষের মধ্যে মানুষ হয়েছ, বড় হয়েছ। এখন বংশ-কৌলীন্যের মই বেয়ে তুমি আর এক সমাজের মাথায় চড়ে বসতে চলেছ। এখন তোমাকে ভুলে যেতে হবে ওই শম্ভুদের কথা, ওই কেদারবাবুদের কথা, ওই বিনয়দের কথা! এখন তুমি শিবপ্রসাদ গুপ্তের সমাজের মানুষ, মিস্টার বোসের গ্রুপের লোক। এখন তোমার ভাবনা-চিন্তা-সমস্যা সমস্ত কিছু তোমার নিজের সমাজকে

ঘিরে। এখন যদি তুমি রেফিউজিদের নিয়ে চোখের জল ফেলো তো তোমার নিজের উন্নতিতে বাধা পড়বে। এখন যদি কেদারবাবুর ভাইঝিকে নিয়ে দোকানে-দোকানে ওষুধ খুঁজে বেড়াও, কেদারবাবুর টি-বি নিয়ে রাত্রের ঘুম নষ্ট করো তো তোমারও টি-বি হবে। নিজের স্বার্থটা আগে দেখ তুমি। আর তার পরে নিজের সমাজের। এইখানেই তোমার আনন্দের আর আবেগের খোরাক খুঁজে পেতে চেষ্টা করো। এখানেই তুমি তোমার অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে পাবে। ভালো করে চোখ মেলে দেখো, এখানে আছে ডিনার, এখানে আছে পার্টি। এখানে কস্‌মেটিক্‌স্‌-ঢাকা মুখের তলাতেও আছে প্রেম। সবটাই এখানকার অভিনয় মনে কোর না। এরাও কাঁদে, এরাও খিদে পেলে স্যাণ্ডুইচ্‌ কামড়ায়। পর্দা, গালচে, সুট্‌-টাই, রেডিওগ্রাম, টেলিভিশনের আড়ালে আসল মানুষ খুঁজলেও তাকে পাবে। এইটুকু জেনে রেখো, এখানে এলে তোমার লাভ বই লোকসান নেই। এখানে এলে রাজভবন, এখানে এলে প্রেসিডেণ্টের অ্যাওয়ার্ড, এখানে এলেই পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, ভারত-রত্ন।

সমস্ত কলকাতাটা ঘুরে-ঘুরেও যেন মনের দ্বন্দ্ব কাটে না।

রাস্তায় পেছন থেকে একটা লোক থামা-গাড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেয়—একটা পয়সা সাহেব—

আবার চলতে চলতে একেবারে সোজা যশোর রোড ধরে গাড়িটা আকাশে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এই রকম করে যদি হঠাৎ এখান থেকে হারিয়ে যাওয়া যেতো। গুণ্ডারা যদি কলোনী ভেঙে দিয়ে উদ্বাস্তুদের উৎখাত করে দেয় তো তাদের নাকি ক্ষতিপূরণ না-দিলেও চলে। কেদারবাবুর যদি ডিম-মাছ-মাংস না-কেনবার ক্ষমতা থাকে তো তাতে স্টেটের কোনও দায়িত্বই নাকি নেই! কেন সদাব্রত জন্মালো এখানে? এই চারিদিকের দুঃখ-দারিদ্র্য অন্যায়-অত্যাচারের একেবারে কেন্দ্রস্থলে!

সেদিন শম্ভু দেখতে পেয়েছে। গাড়িটা দাঁড়াতে-দাঁড়াতেও অনেক দূরে গিয়ে থেমেছে। রাস্তার পাশে গাড়িটা রেখে নেমে পড়লো সদাব্রত।

দূর থেকে চটি ফটাস্‌-ফটাস্‌ করতে করতে দৌড়ে শম্ভু কাছে এলো।

এসেই বললে—খুব খুশী হয়েছি রে তোর কথা শুনে, আমাদের ক্লাবে তোকে নিয়ে কথা হচ্ছিল—

—ব্যাপার কী? আমার কী কথা?

শম্ভু বললে—দু' হাজার টাকা মাইনের চাকরি হয়েছে তোর—

সদাব্রত অবাক হয়ে গেল।

—কে বললে ?

—শুনলুম। সত্যি কি-না বল্ না তাই ?

—কিন্তু কে বলেছে তোকে খবরটা ? তুই কোত্থেকে জানতে পারলি ?

শম্ভু হাসতে হাসতে বললে—কুন্তি, কুন্তি গুহ—সেই কুন্তি গুহকে মনে আছে ? আমাদের ক্লাবে সেই একটা মেয়ে···

—হ্যাঁ মনে আছে, কিন্তু সে জানলো কী করে ?

শম্ভু বললে—আরে সে সব জানে। ওরা তো দিনরাত চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত রকম লোকের সঙ্গে মিশছে সব সময়—ও-ই বলছিল। আমরা দু' হাজার টাকার স্বপ্নও তো কখনও দেখতে পাবো না—ওই শুনেই যা আনন্দ—আর আরো একটা খবর বললে—

—কী ?

—শুনলুম তোর বিয়েও হচ্ছে। খুব সুন্দরী বউ। সত্যি, শুনে খুব আনন্দ হলো, দুলালদা'কে তো তাই বলছিলুম, যে আমরা কেবল ভ্যারেণ্ডা ভাজতেই এসেছি পৃথিবীতে, যারা ওঠবার তারা ঠিক উঠছে। দেখ্ না, তুই মন দিয়ে লেখাপড়া করেছিলি, আমাদের মত আড্ডা দিয়ে বেড়াস নি তো। তা তোর উন্নতি হবে না তো কি আমাদের হবে ?

তার পর একটু থেমে বললে—দেখিস্ ভাই, বুড়ো বয়সে ছেলে-পিলে হলে তখন তাদের চাকরির জন্যে তোকেই কিন্তু ধরবো—

এ-সব কথা সদাব্রতর ভালো লাগছিল না। মনে হলো তাকে ধরে যেন কলকাতার মানুষ চাবুক মারছে। সবাই যেন জেনে গেছে সে তাদের সকলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সবাই বুঝেছে লুকিয়ে লুকিয়ে সে ওদের দলে চলে গেছে। এদের দল সে ছেড়ে দিয়ে ওদের দলে গিয়ে ভিড়েছে। কলেজে পড়বার সময় সে কেদারবাবুর কাছে যা-কিছু শিখেছিল সব যেন সে ভুলতে চেষ্টা করছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রচনা লিখে সে ফার্স্ট হয়েছিল ক্লাসে। আজ যেন সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর স্বামী বিবেকানন্দই তাকে দেখে ঠাট্টা করছেন সামনে দাঁড়িয়ে—তাঁকে চোর মিথ্যেবাদী কুইস্লিং বলে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন। ওই দেখ, ওই ছেলেটা একদিন এগ্জামিনের খাতায় লিখেছিল—'দরিদ্রকে ঘৃণা করিও না। মনে

রাখিও এই কোটি কোটি ভারতবাসী তোমার ভাই। মানুষের কল্যাণে যে-মানুষ জীবন বলি দেয় সেই-ই আদর্শ পুরুষ।'

সামনের দেয়ালের ওপর ওদিককার একটা মোটরের হেড-লাইটের আলো পড়তেই বিরাট একটা বিজ্ঞাপনের ওপর নজর পড়লো। বড় বড় অক্ষরগুলোও যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো চোখের সামনে। "জাতির সেবায় আমাদের সুবিখ্যাত চাঁদ-তারা মার্কা বনস্পতির পঁচিশ বৎসর।"

জাতির সেবাতেই বটে! সদাব্রতর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো।

জাতির সেবার জন্যেই 'সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং'-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জাতির সেবার উদ্দেশ্যেই সে দু' হাজার টাকা মাইনে নিয়ে পারচেজিং অফিসার হতে চলেছে। সবাই তো জাতির সেবাই করছে। ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেণ্ট থেকে শুরু করে সদাব্রত গুপ্ত পর্যন্ত!

—হাসছিস্ যে তুই? তা আমাদের অবস্থা দেখে তোরা তো হাসবিই ভাই!

সদাব্রত কথায় বাধা দিলে।

—তোদের ক্লাব কেমন চলছে?

শম্ভু বললে—সেই ক্লাবের ব্যাপারেই তো কুন্তি গুহর কাছে গিয়েছিলুম—

—তা কুন্তি গুহ ছাড়া কলকাতায় কি আর আর্টিস্ট নেই? আরো তো দু-তিন শো মেয়ে আছে শুনেছি—

শম্ভু বললে—কিন্তু কালীপদ যে কুন্তিকেই সিলেক্ট করেছে। মরা-মাটিতে 'শান্তি'র পার্টে ও-ছাড়া যে আর কাউকে মানাচ্ছে না! আমি তো কুন্তিকে সেই কথাই বললুম। কিন্তু ওরও এখন খুব বিপদ চলেছে যে—

—কী বিপদ?

—ওর একটা বোন আছে, সে মারাই যেতো একেবারে। সেই নিয়েই ক'দিন হাসপাতাল আর ঘর করছে সে। একেবারে মরো-মরো অবস্থা হয়েছিল তার। এই ক'দিনেই চেহারা খারাপ হয়ে গেছে—তার কাছেই তো শুনলুম তোর চাকরির কথা—

সদাব্রত শম্ভুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। আসলে মুখে খুশী হলেও, মনে-মনে খুব খুশী হয় নি শম্ভু। সেটা ভাল করে দেখলেই বোঝা যায়। সদাব্রত এখন তাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। শম্ভুদের নাগালের বাইরে। শম্ভু হাজার চেষ্টা করলেও আর সদাব্রতকে ধরতে-ছুঁতে পারবে না।

এমনি করেই বোধ হয় মানুষে মানুষে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিভিন্ন দেশের মানুষে-মানুষে বিচ্ছেদ আসে। মানুষই নকশা এঁকে লাইন কেটে দেয়। মানুষই বলে—লাইনের এ-পাশে যে-মানুষ তারা আমাদের বন্ধু, আর তার ও-পাশে যারা তারা শত্রু। ওরা আর আমরা এক মানুষ নই।

হঠাৎ ও-পাশের ফুটপাথের দিকে নজর পড়তেই সদাব্রতর চোখ দুটো স্থির হয়ে এলো।

চেনা-চেনা মুখ যেন!

সদাব্রত আবার ভাল করে চেয়ে দেখলে। মন্মথ আর শৈল পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। ঠিক দেখছে তো সদাব্রত? না, ভুল নয়। কোনও ভুল নেই। সদাব্রতকে ওরা দেখতে পায় নি। দু'জনে গল্প করতে করতে চলেছে একমনে। পৃথিবীর অন্য কোনও দিকে খেয়াল নেই তাদের।

—মন্মথ, মন্মথ—

একবার ডাকতে চেষ্টাও করলে সদাব্রত। কিন্তু কী ভেবে আর ডাকলে না। হয়ত আজও ওষুধ কিনতে বেরিয়েছে। হয়ত কেদারবাবুর অসুখ আরো বেড়েছে। সেই সেদিন ডাক্তার ডেকে দিয়ে চলে আসার পর আর যাওয়া হয় নি। যাবার মত মানসিক অবস্থাও নেই তার। সত্যিই এমনি করে দিনে দিনে কত অন্যায় কত অবিচার জীবনে জমে ওঠে। অথচ এমন বিপদে একবার অন্ততঃ তার পরদিনই তার যাওয়া উচিত ছিল দেখতে। কিংবা হয়ত তার না-যাওয়াতে কারো কোনও অসুবিধেই হয় নি। অসুবিধে যে হয় নি তার প্রমাণ মন্মথ সঙ্গে রয়েছে। কেদারবাবুর ভাইঝি একলা কিছু করতে না-পারুক, তাকে সাহায্য করার একজন লোক আছে। সুতরাং সদাব্রতর আর না গেলেও চলে। মন্মথকে না ডেকে ভালোই করেছে সদাব্রত। গল্প করতে করতে যাচ্ছে ওরা, যাক! ওদের কেন বিরক্ত করবে সে!

পাশ ফিরতেই নজরে পড়লো, শম্ভু নেই। শম্ভু কখন চলে গেল? হয়ত যাবার সময়ে বলেই চলে গেছে! সদাব্রতর খেয়াল নেই। সদাব্রত গাড়িতে উঠে আবার স্টার্ট দিলে ইঞ্জিনে। আজকে সে দল-ছাড়া। আজকে সকলের উঁচুতে উঠে সকলের কাছ থেকে সে দূরে সরে এলো। আজকে সে একলা।

পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের সামনেই সেদিন হৈ-চৈ পড়ে গেল হঠাৎ। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের সামনেই বা বলি কেন! আসলে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের ভেতরেই হৈ-চৈটা শুরু হয়েছিল।

এমন হৈ-চৈ এ-পাড়ায় হামেশাই হয়। হয় মানুষ খুন হওয়া, নয় তো গালাগালি, মারপিট। এ লেগেই আছে। পদ্মরাণী জাঁহাবাজ মানুষ না হলে এতদিন কবে ব্যবসা-পত্র গুটিয়ে কাশীবাসী হয়ে যেতো।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, হয়ত মারামারি লেগে গেল। দু'দলেই ফুর্তি করতে এসেছে। দিনভর মাইফেল করবে বলেই মেয়েমানুষ ভাড়া করেছে। মদ আনিয়েছে, মাংস আনিয়েছে, গানের সঙ্গে তবলা বাজাবার জন্যে তবলচি আনিয়েছে। হঠাৎ ফুর্তি করতে করতেই মারামারি। শেষকালে আলমারি আয়না টেবিল চেয়ার ভাঙাভাঙি শুরু হলো। সোডার বোতল, কাচের গেলাস ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হলো। যখন মারামারি থামলো তখন মাইফেল ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকেছে। পুলিসকে দারোগাকে ঘুষ দিয়ে চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তখন পদ্মরাণীকে নগদ টাকা গুনোগার দিতে হয়। তখন হাজার হাজার টাকা একদিনেই উড়ে যায় কাপ্তেনবাবুদের।

এবার আর কাপ্তেনবাবু নয়। অন্য লোক।

কানপুর না বেনারস না এলাহাবাদ—কোন্ জায়গা থেকে এক ছোকরা এসেছিল কলকাতায়। উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা দেখবে। বাবার কারবার আছে রাইস মিলের। সি-পি থেকে রাইস কিনে নিজের মিলে ভাঙিয়ে গভর্মেন্টকে সাপ্লাই করে। ছোকরা মানুষ। নতুন পয়সা এসেছে হাতে। বোম্বাই দেখে এসেছে। দিল্লি দেখে এসেছে। শুধু কলকাতা দেখতে বাকি ছিল।

তার পর কেমন করে হঠাৎ কুন্তি গুহর সঙ্গে রাস্তায় মোলাকাত হয়ে গেছে। দুপুরবেলা বড়বাজারের ধরমশালা থেকে বেরিয়ে দু'জনে চিড়িয়াখানায় গেছে ট্যাক্সি চড়ে। বোটানিক্যাল গার্ডেনসে গেছে। সেখানে গিয়ে ঘুরেছে দু'জনে খুব। সেখান থেকে বেরিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গার দরকার হয়েছে।

ত্রিলোকনাথ বলেছে—চলো, কোনো হোটেলের ঘর ভাড়া করি—

কুন্তি বলেছিল—হোটেলে ঘর ভাড়া করতে হলে কিন্তু অনেক টাকা লাগবে—

তার উত্তরে ত্রিলোকনাথ বলেছিল—টাকা আমার কাছে অনেক আছে—

তা সেখান থেকেই একেবারে সোজা কুন্তি এইখানে এনে তুলেছিল ত্রিলোকনাথকে।

পদ্মরাণী অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—ও মা, টগর! তুই কোত্থেকে?

ট্যাক্সি চড়ে সারাদিন কোথায়-কোথায় ঘুরেছে। মুখচোখ একেবারে ঝলসে গেছে।

—তোর বোন কেমন আছে মা?

অত কথা বলবার সময়ই ছিল না তখন কুন্তির। কোথা থেকে কোন্ বাবুকে এনে ঘরে তুলেছে তাও খুলে বলবার সময় ছিল না। আর অত কথা জানবার আগ্রহও নেই পদ্মরাণীর। মেয়েরা কোথা থেকে কাকে ধরে আনে তা জেনে তার লাভ কী!

কুন্তি বললে—একটা বড় হুইস্কি আমার ঘরে পাঠিয়ে দিতে বোল মা, আর স্থফলের কাছ থেকে পরোটা আর ডিমের ঝাল-কারী—এই টাকা রইল—

বলে একটা একশো টাকার নোট পদ্মরাণীর হাতে তুলে দিয়েছিল। দিয়েই নিজের ঘরে বাবুকে নিয়ে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছিল। তার পর ঘরের ভেতর তারা দু'জনে কী করেছিল তা পদ্মরাণীর জানবার কথা নয়। শুধু ভেতর থেকে টগর যখন যা অর্ডার করেছে তা সাপ্লাই করে গেছে। কখনও সোডা, কখনও চা, কখনও পান-জর্দা সিগারেট। ঘণ্টায় ঘণ্টায় অর্ডারের বিরাম নেই। দুপুরবেলা এমনিতেই এ-বাড়ি ফাঁকা থাকে। তখন সবাই ঘরে-ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। কেউ-ই খবর রাখে নি টগর কত টাকা কামালো, কত টাকা হাতালো।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ টগর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা পদ্মরাণীর কাছে এসে দাঁড়ালো।

পদ্মরাণী জিজ্ঞেস করলে—কী মা টগর, আর কিছু চাই? আর একটা ছোট হুইস্কি দেবো?

কুন্তির তখন চূড়ান্ত অবস্থা। কলকাতায় যে-লোক ফুর্তি করতে এসেছে

সে কি আর ছেড়ে কথা কয় ? সে তখন কুন্তিকে চুষে চিবিয়ে ছোবড়া করে ছেড়ে দিয়েছে।

কুন্তি বললে—না না, আর কিছু চাই না, আমি চললুম—

—তা তুই চললি তো তোর বাবু কোথায় ?

—সে এখনও ঘুমোচ্ছে। তার নেশা এখনও কাটে নি, আমাকে এখন একবার হাসপাতালে যেতে হবে মা, আমি আর দেরি করতে পারবো না—

—তোর বাবু ঘুম থেকে উঠলে আমি কী বলবো ?

—তুমি আর কী বলবে ? তুমি বোলো আমি চলে গেছি। আমার বোনকে আজ রক্ত দেবার দিন, এই টাকা নিয়ে এখন গিয়ে জমা দেবো, তবে ইন্‌জেক্‌শান্ দেবে। ছ'টার মধ্যে টাকা না দিলে বন্ধ হয়ে যাবে—

কুন্তি চলেই যাচ্ছিল। পদ্মরাণী পেছন থেকে ডেকে বললে—বাকি টাকাটা নিবি না ?

কুন্তি বললে—পরে হিসেব করবো মা, এখন আর সময় নেই—

—ঘুম থেকে উঠে তোর বাবু যদি তোর খোঁজ করে ?

—বোলো আমি এখানে থাকি না। আমার নাম জিজ্ঞেস করলে বোলো না—

তার পরে আর দাঁড়ায় নি কুন্তি, কিন্তু বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময়েই ত্রিলোকনাথ উঠলো। উঠে দেখলে কেউ কোথাও নেই। জামার গলায় সোনার বোতামটা নেই, হাতের রিস্ট্-ওয়াচও নেই। পকেটের মনি-ব্যাগটাও ফাঁকা। শুধু কয়েকটা খুচরো টাকা ছাড়া একশো টাকার নোট-গুলো একটাও নেই। ততক্ষণে নেশা চটে গেছে। দামী খাঁটি হুইস্কির নেশা তখন ব্রহ্মতালুতে উঠেছে। হৈ-চৈ শুরু করে দিলে ত্রিলোকনাথ। ত্রিলোক-নাথের হৈ-চৈ শুনে গোলাপী, দুলারী, বাসন্তী, বিন্দু যে যেখানে ছিল দৌড়ে এসেছে।

পদ্মরাণী বললে—তোমার সোনার বোতাম হাত-ঘড়ি কোথায় গেল তা আমরা কেমন করে জানবো বাছা ?

ত্রিলোকনাথ নানা রকমে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলে যে তার সোনার বোতাম রিস্ট্-ওয়াচ্, দু' হাজার টাকা সঙ্গে ছিল, এখন সব নিয়ে ছুকরী পালিয়েছে।

পদ্মরাণী বললে—তা তুমি মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করতে এসেছিলে

একেবারে বেহুঁশ হয়ে বাবা? টাকা আছে বলে কি এত বেহুঁশ হওয়া ভালো?

তবু লোকটা হৈ-চৈ গোলমাল করতে লাগলো।

পদ্মরাণী বললে—তুমি বাবা এখানে হৈ-চৈ কোর না, এখানে আমার মেয়েরা থাকে, এখানে আমি তোমায় গোলমাল করতে দেবো না—কলকাতা শহরে থানা আছে, পুলিস আছে, সেখানে যাও না বাবা, সেখানে গিয়ে বলো না যে মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করতে এসে তোমার এই হাল হয়েছে, তারা তোমার বিহিত করবে। যাও না, সেখানে যাও—

দরোয়ান গোলমাল শুনে সামনে এসেছিল। তাকে দেখে বোধ হয় লোকটা একটু ভয় পেয়ে গেল। তার পর বাইরে গেল। বাইরে গিয়ে লোক জড়ো করবার চেষ্টা করলে। দল ভারী করবার চেষ্টা করলে।

কলকাতার লোক। বিশেষ করে চিৎপুর সোনাগাছির লোক। সবাই জড়ো হলো। জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মশাই?

ত্রিলোকনাথ যতটা সম্ভব গুছিয়ে বলতে গেল। সকলের সহানুভূতি আদায় করতে গেল। সবাই হেসে খুন।

—বেশ্যা-বাড়িতে ফূর্তি করতে এসে টাকা খুইয়েছেন বলে আবার বেহায়ার মত গলাবাজি করছেন? পৈতৃক প্রাণটা যে এখনো আছে এইটেই তো ঢের! আর লোক হাসাবেন না। মানে মানে সরে পড়ুন।

ত্রিলোকনাথও দেখলে এ এক আজব শহর। এ বেনারস দিল্লি কানপুর এলাহাবাদ বোম্বাই আমেদাবাদ নয়। এ কলকাতা। এমন আজব শহর ত্রিলোকনাথ জীবনে দেখে নি। রাস্তার লোকের হাসির সামনে আর সে দাঁড়াতে পারলে না। গা-ঢাকা দিয়ে বাঁচলো।

হাসপাতালের ওয়ার্ড তখন বন্ধ হয় হয়।

কুন্তি তাড়াতাড়ি হাসপাতালের ওয়ার্ড-মাস্টারের অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

ওয়ার্ড-মাস্টার ডিউটিতে ছিল। জিজ্ঞেস করলে—টাকা এনেছেন?

—হ্যাঁ—বলে কুন্তি গুহ ব্যাগ খুলে দুটো একশো টাকার নোট বার করে দিলে।

—এতে চলবে তো?

ওয়ার্ড-মাস্টার বললে—এখন এতেই চলুক, পরে যা লাগবে বলবো আপনাকে—

রসিদটা নিয়ে কুন্তি বললে—রোগী কেমন আছে বলতে পারেন?

—এখনও আন্‌কন্‌শাস হয়ে আছে, ব্লাড্ দিলেই মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে খুব উইক্ হয়ে পড়েছিল, সারতে একটু সময় লাগবে। আপনি দেখে আসুন না—

—আমাকে দেখতে দেবে?

—হ্যাঁ, যান না, ছ'টা এখনও বাজে নি তো—

কুন্তি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

তোমার কাজ তুমি করে যাবে আর আমার কাজ আমি করবো। সবাই কাজের ভাগাভাগি করে নিলেই আর কোনও বিপদ হয় না। মাস্টার মন দিয়ে ছাত্রদের পড়াবে, ছাত্ররাও মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। আর ছাত্রদের গার্জেনরা নিয়ম করে মাইনে দিয়ে যাবে। সমাজ একটা ইঞ্জিনের মত। ইঞ্জিনের একটা অংশের সঙ্গে আর একটা অংশ এমন ভাবে জড়ানো যে একটা অচল হয়ে গেলে আর একটা সঙ্গে সঙ্গে অকেজো হয়ে পড়বে। ইঞ্জিনটা আর চলবে না। থেমে যাবে।

কেদারবাবু বলতেন—সমাজটাও তো তাই রে—আমি যদি ছাত্রদের ভালো করে না-পড়াই তো আমার ছাত্ররা ফেল করবে। তারা মানুষ হতে পারবে না, তা হলে দেশটা যে রসাতলে যাবে—

মন্মথ বলতো—আপনার মত এমন করে আর ক'জন ভাবে মাস্টারমশাই, সবাই মাইনেটা নিয়েই খালাস, ছাত্র মানুষ হলো কি-না তা আর কেউ ভাবে না—

—তুমি থামো।

কেদারবাবু রেগে যেতেন। বলতেন—আমি ভাল মাস্টার, আর সবাই খারাপ বলতে চাও? খোসামোদ করবার আর জায়গা পেলে না তুমি? তুমি মনে করেছ আমি খোসামোদে ভুলবো? তুমি আমাকে তেমনি মানুষ পেয়েছ নাকি? আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছ?

রেগে রেগে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলতে শুরু করতেন কেদারবাবু।

বলতেন—তুমি বেরিয়ে যাও তো, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—

মন্মথ যত বোঝাতে চাইত—না মাস্টারমশাই, আমি তা বলি নি, আমি বলছিলুম সবাই ফাঁকি দেয়—

—সবাই ফাঁকি দেয় আর আমি সিন্‌সিয়ার্লি কাজ করি? আমি ফাঁকি দিই না? এই যে আমি অসুখে পড়ে আছি, ছেলেদের দেখতে পারছি? তোমার পড়াশুনো আমি ঠিকমত করাচ্ছি? সেদিন তোমার বাবা যে আমার মাইনে পাঠিয়ে দিলেন, আমি নিলুম না? আমি ফাঁকি দিয়ে টাকা নিলুম না?

মন্মথ বললে—কিন্তু আপনার অসুখ হলে আপনি কেমন করে পড়াবেন? আপনার যে এখন অসুখ—

—অসুখ না ছাই, অসুখ তো ভাল হয়ে গেছে।

—কিন্তু মাস্টারমশাই, আপনার শরীর এখনও দুর্বল, আপনার তো এখনও শুয়েই থাক্যই উচিত—

কেদারবাবু আর থাকতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। আর অবাক কাণ্ড, উঠে আল্‌না থেকে পাঞ্জাবিটা তুলে নিয়ে গায়ে দিলেন, পায়ে চটিটা গলিয়ে নিলেন, তার পর ছাতিটা নিতে ঘরের কোণের দিকে যাচ্ছিলেন—

মন্মথ তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ছাতাটা চেপে ধরলে। বললে—আপনি করছেন কী মাস্টারমশাই, আপনি কি পাগল হয়েছেন?

—পাগল আমি—না তোমরা? তোমরাই তো আমাকে জোর করে অসুখ বলে শুইয়ে রেখে দিয়েছ! আমি বুঝি না কিছু? তুমি চাও ছেলেগুলো গোল্লায় যাক্, না? গরীবের ছেলে বলে বুঝি মানুষ নয় তারা? ছাড়ো, ছাতা ছাড়ো—

মন্মথ আর কোনও উপায় না-পেয়ে হঠাৎ বাইরে গিয়ে ডাকলে—শৈল, শৈল, এই দেখে যাও মাস্টারমশাই বেরিয়ে যাচ্ছেন—

কেদারবাবু হয়ত মন্মথকে ঠেলে ফেলেই সেই ঝাঁ-ঝাঁ রোদের মধ্যে রাস্তায় বেরিয়েই যেতেন, কিন্তু শৈল ততক্ষণে এসে পড়েছে।

—কী হলো? কাকা? তুমি কোথায় যাচ্ছো?

কেদারবাবু শৈলকে দেখেই একটু যেন ঝিমিয়ে গেলেন। বললেন—এই মা, একটু পড়িয়ে আসি গুরুপদকে—

—গুরুপদ ?

—হ্যাঁ, গুরুপদ। জিওগ্রাফিতে একটু উইক্ ছিল গুরুপদ, আমি গুরুপদর মা'কে কথা দিয়েছিলুম গুরুপদকে আমি ঠিক পাস করিয়ে দেবো—এখন যদি না-যাই মা, তো কথার খেলাপ করা হবে যে—

শৈল কেদারবাবুর দিকে চেয়ে হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারলে না। এতদিন কাকাকে দেখেও যেন ভালো করে চিনতে পারে নি সে।

কেদারবাবু শৈলর দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন—তুই কিছু ভাবিস নে মা, আমি এখন বেশ ভাল আছি, আমি যাবো আর আসবো. নইলে বুঝতেই তো পারছিস, গুরুপদ একেবারে গাড্ডু মারবে, তাকে দেখবার কেউ নেই রে, সে বড় গরীব মা—

শৈল গম্ভীর হয়ে বললে—তা গুরুপদকে দেখবার লোক নেই, সে খুব গরীব, আর তোমাকে দেখবার লোক আছে, তুমি বুঝি খুব বড়লোক, না ?

—দূর, তুই ঠাট্টা করছিস, আমি বুঝতে পারছি !

শৈলর মুখের চেহারা কিন্তু বদ্‌লালো না। বললে—একবার আমি বাগ্-মারীতে জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলুম, সেদিন লোকে দেখতে পেয়ে আমাকে বাঁচিয়েছিল, এবার কিন্তু আমি এমন করে মরবো যে কেউ দেখতে পাবে না, কেউ জানতেই পারবে না, তা বলে রাখছি—

—অ্যাঁ ? তুই ইচ্ছে করে জলে ডুবে গিয়েছিলি নাকি ?

কেদারবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন এতদিনে।

—তুই তো আমাকে তা বলিস্ নি মা ? আমি তো কিছুই জানতুম না—কী গো মন্মথ, তুমি জানতে ?

মন্মথ সে-কথার উত্তর না-দিয়ে বললে—আমরা সব জানি মাস্টারমশাই, আপনি শুয়ে পড়ুন, আপনি এই শরীর নিয়ে আর বেরোবেন না—

—তা হলে গুরুপদর কী হবে ?

মন্মথ বললে—গুরুপদর কথা গুরুপদ ভাববে। তা বলে আপনি কি তার জন্যে ভেবে-ভেবে নিজের শরীর পাত করবেন বলতে চান ?

কেদারবাবু বললেন—তা হলে একবার একটুখানি গিয়ে চলে আসি,—কী বল্ মা ? একটুখানি ? এই আধ ঘণ্টার জন্যে ? কী রে কথা বলছিস্ না কেন ? যাবো ?

শৈল তবু উত্তর দিলে না। কেদারবাবু মন্মথর দিকে চেয়ে বললেন—

তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না শৈলকে বাবা, তুমি একটু বুঝিয়ে বললেই ও আমাকে যেতে দেবে—ও যেতে না বললে যে আমি যেতে পারছি না—

শৈল বললে—আমার নামে কেন দোষ দিচ্ছ কাকা? আমি কে? আমি মরে গেলেই বা তোমার কী আসে যায়? তুমি কি আমার কথা একটুও ভাবো? তুমি তোমার ছাত্রদের কথা যতটুকু ভাবো, আমার কথা কি তার একশো ভাগের এক ভাগও ভেবেছো কোনও দিন?

কেদারবাবু বললেন—ওই ছাখ মন্মথ, শৈলটা কী বলে ছাখ, আমি নাকি ওর কথা একটুও ভাবি না। শুনলে তো ওর কথা?

মন্মথ বললে—তা শৈল তো বাজে কথা বলে নি মাস্টারমশাই, আপনি তো আমাদের কথাই বেশি ভাবেন, আমি তো আপনার ছাত্র, আমি তো জানি।

—ওই ছাখ, তুমিও আমার ওপর রাগ করেছ, এখন তোমরা সবাই যদি রাগ করো তা হলে গরীব ছাত্ররা আমার যায় কোথায় বলো তো? তাদের পয়সা নেই বলে কি তারা বানের জলে ভেসে এসেছে? গভর্মেণ্ট তাদের দেখবে না, ইস্কুল-কলেজ তাদের দেখবে না, দেশের লোকও তাদের দেখবে না, তা হলে তারা যায় কোথায়, তাই বলো তোমরা!

শৈল মন্মথর দিকে চেয়ে বললে—তুমি পাগল-মানুষের সঙ্গে আর তর্ক কোর না মন্মথদা, আমার মাথাটা খারাপ হয়েই গেছে, এর পর তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যাবে—

কেদারবাবু ভাইঝির কথায় কোনও গুরুত্ব দিলেন না। বললেন—তা—তা হলে তোরা বলছিস্ আমি যাবো না? তোরা যা বলবি এখন থেকে আমি তাই-ই শুনবো—বল্ কী করবো? আমি যাবো না তো?

শৈল বললে—কেন যাবে না? আমাদের কথা কেন তুমি শুনবে? আমরা তো কেউ-ই না তোমার। তোমার ছাত্ররাই তো তোমার সব। তাদের ভালোটাই দেখ। আমার কথা তোমাকে কে ভাবতে বলেছে? কোত্থেকে কেমন করে সংসার চলছে, কী করে তোমার চিকিৎসা চলছে, তাও তোমার জানবার দরকার নেই। তুমি যাও না। তার পর যখন রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, তখন তো আমি আছি। আমি সারা রাত জেগে জেগে তোমার মাথায় বরফ দেবো, তোমার সেবা করবো—তুমি আমায় খেতে দিচ্ছ পরতে দিচ্ছ, সেটুকু আর করবো না? তুমি যাও, দাও মন্মথদা, ছাতাটা দিয়ে দাও, কাকা চলে যাক্—

কেদারবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করবেন ঠিক করতে পারলেন না। যেন হতাশ হয়ে শেষকালে বললেন—কিন্তু কী যে করি, আমার অসুখটা সারে না কেন মা! আমি সেই আগেকার মত জোর পাই না কেন? এ আমার কী হলো? আমার অসুখ সারাতে পারে না কেন ডাক্তাররা?

বলতে বলতে নিজের ভাবনাতে যেন নিজেই অস্থির হয়ে তক্তপোশটার ওপর বসে পড়লেন।

বলতে লাগলেন—আমার এ কী হলো? এ কী হলো আমার? আমার মাথা ঘোরে কেন রে? আমার পা দুটো টলে কেন রে?

মন্মথ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে গিয়ে কেদারবাবুকে ধরলে দুই হাতে।

শৈল কিন্তু থামলো না। সে বলতে লাগলো—কেন মাথা ঘুরবে না? কেন পা টলবে না? তোমাকে কি দুধ খেতে দিতে পারি? মাছ-মাংস-ডিম খেতে দিতে পারি আমি? ডাক্তার যা ওষুধ লিখে দেয় তাই-ই কি সব খাওয়াতে পারি ঠিকমত? তোমার অসুখ হবে না তো কার হবে?

—মাস্টারমশাই!

সদাব্রতর গলা শুনে তিনজনেই অবাক হয়ে গেছে। এ লোকটার আশা যেন তিনজনেই ছেড়ে দিয়েছিল এখানে।

—সদাব্রত, তুমি এসেছ?

সদাব্রত একেবারে কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কেমন আছেন মাস্টারমশাই?

কেদারবাবুর মুখে-চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললেন—আমি ভাল হয়ে গেছি সদাব্রত, তোমার দু' হাজার টাকা মাইনে হয়েছে শুনে আমার সব অসুখ ভাল হয়ে গেছে। জানো—আমি তখনই বলেছিলুম শশীপদবাবুকে, বলেছিলুম দেখে নেবেন আমার ছাত্রদের মধ্যে সদাব্রত একদিন উন্নতি করবেই—কী বলো মন্মথ, বলি নি তোমাদের? সদাব্রতকে আমি ছোট থেকেই পড়িয়ে আসছি তো, বরাবর দেখেছি ও ইন্‌টেলিজেন্ট—

সদাব্রত বললে—না মাস্টারমশাই, ইন্‌টেলিজেন্ট বলে চাকরি পাই নি—

—কী যে বলো তুমি সদাব্রত, দু' হাজার টাকা তো আর তোমার মুখ দেখে দিচ্ছে না তারা? নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন গুণ পেয়েছে যার জন্যে অত বড় চাকরি দিয়েছে। কই, কলকাতায় এত লোক রয়েছে, তাদের তো কেউ

পাঁচশো টাকার চাকরিও দেয় না, অথচ তোমায় দেয় কেন? বলো, কেন তোমাকে দেয়?

সদাব্রত চাইলে শৈলর দিকে। শৈল চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। মন্মথকেও আজ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে। সবাই যেন তার এখানে আসাটা পছন্দ করছে না মনে হলো। এতদিন ধরে সদাব্রত মাস্টারমশাইয়ের কাছে আসছে অথচ এমন করে কেউ তাকায় নি কখনও তার দিকে। সে কি এখানেও আজ অবাঞ্ছিত? এরাও কি তার খবরটা জানে? মাইনের খবরটা যখন জেনেছে, বাকি খবরটাও নিশ্চয় জানে তারা। এতদিন পরে এত মেলামেশার পরেও যেন তারা তাই তাকে পর ভাবছে।

শৈল আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল।

সদাব্রতও তার পেছন-পেছন ঘরের বাইরে এলো। বারান্দা পেরিয়েই নর্দমা। নর্দমাটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে একেবারে গলিটার মুখে এসে ধরলো। বললে—শোন—

শৈল পেছন ফিরে দাঁড়ালো। সদাব্রত বললে—আমি কী করেছি যার জন্যে আমার সঙ্গে কথা না-বলেই চলে যাচ্ছো?

শৈল অন্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল হয়ত। কিন্তু সেটা না বলে শুধু বললে—আমার রান্নাঘরে কাজ রয়েছে—

—এইটেই কি তোমার মনের কথা?

—হ্যাঁ।

—সত্যি কথা বলছো তো তুমি? না আমি দু' হাজার টাকা মাইনের চাকরি পাওয়াতেই হঠাৎ তোমাদের পর হয়ে গেলুম, বুঝতে পারছি না ঠিক। অনেকদিন ধরে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে আমি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, তাই আসতে পারি নি আর। তার জন্যেই কি রাগ করেছ তোমরা?

শৈল শুধু বললে—না।

—কিন্তু তা হলে আমি ঘরে ঢুকতেই তোমরা সব চুপ হয়ে গেলে কেন? আমি কী করেছি? মাস্টারমশাইয়ের অসুখের কথা যে ভুলে গেছি তা নয়, তোমার অবস্থার কথাও ভেবেছি, তার ওপর আমার নিজের অসহায় অবস্থার কথাও ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছি—তার পর যখন ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলুম না তখন তোমাদের এখানে চলে এলুম,

এখানে এসেও দেখছি তোমাদের মুখ ভার—এখন বলতে পারো আমি কী করবো ?

শৈল বললে—কাকার ওই অসুখ, সংসারের এই অবস্থা, এর পরেও মুখভার করা কি এতই অন্যায় হয়েছে আমার ?

—কিন্তু মন্মথ তো ছিল, ও তো অনেক সাহায্য করেছে তোমার !

শৈল মুখ তুললো। বললে—আমি কি বলেছি মন্মথদা সাহায্য করে নি ?

সদাব্রত এর পর কী বলবে বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—তা হলে ?

শৈল বললে—মন্মথদা আমাদের সাহায্য করেছে বলে আপনি কি অসন্তুষ্ট ?

—কী বলছো তুমি ?

—তা হলে সেদিন আমাদের রাস্তায় দেখতে পেয়েও কই ডাকলেন না তো ! আপনি এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়েও আপনি তো না-দেখবার ভান করলেন !

সদাব্রতর আর কোনও উত্তর দেবার রইল না এ-কথার পর।

কিন্তু শৈলই বাঁচিয়ে দিলে। বললে—আপনি কাকার কাছে গিয়ে বসুন, আমি আসছি, সেদিন কুড়িটা টাকা আপনি ধার দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে তবে যাবেন—

বলে সদাব্রতকে সেই অবস্থাতে ফেলেই শৈল ভেতর-বাড়ির উঠোনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘরের ভিতর ঢুকতেই কেদারবাবু কৌতূহলী হয়ে সদাব্রতর দিকে চাইলেন। বললেন—কী সদাব্রত ? শৈল তোমায় বাইরে ডেকে নিয়ে কী বলছিল গো ? আমার সম্বন্ধে নালিশ করছিল বুঝি খুব, না ?

সদাব্রতর ঘা তখনও শুকোয় নি। শুধু বললে—না—

—তবে ? এতক্ষণ ধরে কী বলছিল তোমাকে ? আমার ওপর খুব রাগ করেছে ? কী রকম দেখলে ? গুরুপদকে আমি পড়াতে যাচ্ছিলুম বলে আমার নামে যা-তা বললে তো ?

সদাব্রত বললে—না, তাও না—

কেদারবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তাও না? তা হলে?

তার পর মন্মথর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি তো দেখলে কী রকম চটে গেছে শৈল! চটে নি আমার ওপর?

মন্মথ কিছুই উত্তর দিলে না। কেদারবাবু নিজের মনেই যেন বলতে লাগলেন—ওর বাবাও ওই রকম রাগী মানুষ ছিল। জানো সদাব্রত, রাগ করে করেই শেষকালে মারা গেল মাথার শির ছিঁড়ে গিয়ে। আমি তো তাই বলি ওকে—অত কি রাগতে আছে মা! পৃথিবীতে তোমাকে রাগাবার জন্যে সবাই তো ওত্ পেতে বসেই রয়েছে, তা বলে তুমি কেন রাগবে মা! যে রাগলো সে-ই হেরে গেল। দেখছো না হিটলার রাগী লোক ছিল বলে কী কাণ্ডটাই না করে গেল! আর একটা রাগী লোক ছিল হিস্ট্রিতে লর্ড…

সদাব্রত কথার মাঝখানেই বললে—আপনি আজকাল কেমন আছেন বলুন?

—আমি ভাল হয়ে গেছি একেবারে সদাব্রত, আমার আর কোনও কষ্ট নেই, শুধু মাথাটা ঘোরে আর পা দুটো একটু টলে—তা ডাক্তার বলছে একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করলেই সেরে যাবে—আর বলছে একবার চেঞ্জে যেতে—

—চেঞ্জে?

—কিন্তু চেঞ্জে যে যাবো, যাবো কী করে? এই সামনেই সব এগ্জামিন আসছে, আমার মুখ চেয়ে সবাই বসে আছে, তাদের কী হবে সেটা তো ডাক্তার ভাবছে না!

মন্মথ বললে—বুঝলে সদাব্রতদা, আমি এই কথাটা বলেছি বলে এখুনি আমার ওপর রাগ করে মাস্টারমশাই পড়াতে যাচ্ছিলেন গুরুপদকে—

সদাব্রত বললে—আপনি চেঞ্জেই যান মাস্টারমশাই, যা খরচ লাগে সব আমি দেবো—

কেদারবাবু ঝুঁকে পড়লেন সদাব্রতর দিকে। বললেন—কেন? শৈল সেই জন্যে তোমার কাছে টাকা ধার চাইছিল নাকি? তুমি তাকে ধার দিয়ে দিয়েছ? কত টাকা দিলে?

সদাব্রত পকেট থেকে মনি-ব্যাগটা বার করে বললে—না, ধার আমি দিই নি শৈলকে, আপনাকে আমি দিচ্ছি, পরে বেশি দেবো, আজ সামান্য টাকা এনেছিলুম—এই দুশো টাকা আপনি রাখুন—

—তা শৈলর হাতেই টাকাটা দাও না, ও খুব খুশী হবে—ও-ই তো আমার সংসার চালায় কিনা!

—না, শৈল নিতে চাইবে না, আপনার কাছেই থাক্—

—তা ও যখন জিজ্ঞেস করবে তখন আমি কী বলবো?

—আপনার কিছু বলবার দরকার নেই।

—তা বললে তো শুনবে না ও। আমি যে কিছু লুকোতে পারি না। ও জানতে পারবেই—

সদাব্রত বললে—তা হলে বলবেন, গুরুদক্ষিণা। আপনি আমাকে ভাল করে পড়িয়েছেন বলেই তো আমি আজকে এত বড় চাকরি পেলাম মাস্টার-মশাই। আপনার আশীর্বাদেই তো সব হলো। একদিন পঞ্চাশ টাকা করে বাবা আপনাকে মাইনে দিতেন, আপনিই সেটা কমিয়ে চল্লিশ টাকা করে নিয়েছিলেন—সে আমার মনে আছে মাস্টারমশাই। চিরকাল মনে থাকবে। আমি আপনার অসুখে কিছুই করতে পারি নি—এখন এটা দিয়ে গেলাম, পরে আরো দেবো, আপনার চেঞ্জে যাবার সমস্ত খরচটা আমি একলাই দেবো—আমি এখন চলি মাস্টারমশাই—আপনি শৈলকে বুঝিয়ে বলবেন, সে যেন রাগ না করে—

বলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। তার পর আর কথা না-বলে সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে নর্দমাটা পার হয়ে একবারে চোখের আড়ালে চলে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকেছে শৈল। বললে—সদাব্রতবাবু কোথায় গেলেন?

মন্মথ বললে—এই তো বেরিয়ে গেল—

—চলে গেলেন?

কেদারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেন? তোর কিছু দরকার ছিল নাকি? বাইরে গিয়ে চুপি-চুপি টাকা চেয়েছিলি বুঝি তুই? এই দেখ্ না, তাই আমাকে টাকা দিয়ে গেল—

শৈলর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো।—আমি? আমি টাকা চেয়েছি? এই কথা তিনি বলে গেলেন নাকি?

কেদারবাবু বললেন—না না, তা বলবে কেন? সদাব্রত কি সেই রকম

ছেলে ? আমার অসুখ দেখে এই দুশো টাকা দিয়ে গেল। বলে গেল আরো দেবে। তুই তো বলছিলি ডিম-মাছ-মাংস-দুধ খেতে বলেছে ডাক্তার, তা এই টাকা নিয়ে যত ইচ্ছে খাওয়া আমাকে—তোর আর ভাবনা নেই এখন—টাকা-টাকা করছিলি তুই, এখন তো টাকা পেলি ! এই নে—

বলে দুটো একশো টাকার নোট কেদারবাবু এগিয়ে দিলেন শৈলর দিকে।

শৈলর সমস্ত শরীরটা তখন থর থর করে কাঁপছে। বললে—রাখো তোমার টাকা, ও-টাকা আমি ছুঁতে চাই না—

শৈলর ব্যাপার দেখে কেদারবাবুও অবাক হয়ে গেলেন। মন্মথও কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল।

কেদারবাবু বললেন—তা টাকাই তো তুই চাইছিলি, তুই-ই তো বলছিলি সংসার চালাতে পারছিস্ না—এখন এত রাগলে কী হবে !

শৈল বললে—খবরদার বলছি কাকা, ও-টাকা তুমি নিতে পারবে না—

—কেন রে ? টাকার কী দোষ হলো ?

শৈল বললে—সে তুমি বুঝবে না, আমি মরে গেলেও ও-টাকায় হাত দেবো না—

কেদারবাবু বললেন—কিন্তু এ তো ধার নয়, একেবারে দিয়ে দিয়েছে ! পরে আরো টাকা দেবে বলেছে। এ দান, গুরুদক্ষিণা—সদাব্রত নিজের মুখে আমাকে বলে গেল যে। এ-টাকার সুদ লাগবে না—। সদাব্রত তো মিথ্যে কথা বলবার ছেলে নয়—

শৈল বললে—তুমি ওই ধারণা নিয়েই থাকো কাকা ! আমার জানতে বাকি নেই তোমার ভাল ছাত্র কী !

—কেন ? সে খারাপ ছেলে নাকি রে ? তুই শুনেছিস্ কিছু ?

শৈল বললে—সে-সব কথা শুনে তোমার দরকার নেই। মন্মথদা, তুমি যাও, ও-টাকাটা দিয়ে এসো তুমি সদাব্রতবাবুকে। কাকা, ও-টাকা তুমি মন্মথদা'র হাতে দিয়ে দাও—তুমি কিছুতেই ও টাকা নিতে পারবে না। আমি ও-টাকা তোমায় নিতেই দেবো না—দিয়ে দাও—

কেদারবাবু শৈলর এই দৃঢ়তা দেখে আরো হতবাক হয়ে গেলেন। এমন তো করে না কখনও শৈল।

শৈল তখন বলে চলেছে—তোমার মনে না-থাকতে পারে কাকা, কিন্তু আমার সব মনে থাকে। একদিন আমাদের নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়িতে

তুলতে চেয়েছিল ওই সদাব্রতবাবু! আজ বুঝতে পারছি এর পেছনে কী মতলব ছিল?

মন্মথ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শৈল তাকে বাধা দিলে। বললে—তুমি আর কথা বোলো না, এখুনি যাও, ওর বাড়ি গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এসো টাকাটা,—আমার বেশি ভাবতেও খারাপ লাগছে—

কেদারবাবু বললেন—কিন্তু ও কী ভাববে বল্ দিকিনি—

শৈল বললে—তা ভাবুক, আর এই কুড়িটা টাকাও সঙ্গে নিয়ে যাও—এই দুশো কুড়ি টাকা দিয়ে আসবে, বলে এসো আর যেন তিনি কখনও টাকা দেবার ছল করেও এ বাড়িতে না আসেন—

মন্মথ টাকাগুলো নিলে। আর তার পর কেদারবাবুর বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দিয়েই সে বাইরে বেরিয়ে গেল। কেদারবাবু জীবনে কখনও বুঝি তাঁর ভাইঝিকে এমন করে রেগে উঠতে দেখেন নি। কিন্তু মন্মথ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শৈলও বাড়ির ভেতরে চলে গেছে। কেদারবাবু তখন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আকাশ-পাতাল তোলপাড় করতে লাগলেন। শৈলর কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না।
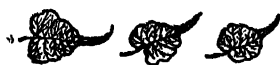
সদাব্রত নিজের বাবার অফিসে বসে দেখেছে, সে অন্য রকম। কিন্তু 'সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস'-এর নিয়ম-কানুন আলাদা। সে অফিস, আর এ ফ্যাক্টরি। সদাব্রতর নিজের আলাদা চেম্বার, আলাদা চাপরাসী। এয়ার-কণ্ডিশন-করা চেম্বারের ভেতর বসে বসে অবাক হয়ে যায় সদাব্রত। ইংরেজরা কবে চলে গেছে ইণ্ডিয়া ছেড়ে! বহাল তবিয়তে চলে গেছে সমুদ্র পেরিয়ে। কিন্তু তবু যেন তারা চলে গিয়েও আরো শেকড় গেড়ে বসেছে ভেতরে-ভেতরে! সেই ট্রাউজার-শার্ট-কোট-নেকটাই, সেই সামনে মানুষকে 'থ্যাঙ্কিউ' বলে ভেতরে ভেতরে গালাগালি দেওয়া, আর সেই পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স দিয়ে মানুষের মর্যাদা বিচার করা!

'সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্' খাঁটি বিলিতি ফার্ম। মালিকানা দিশী। সকাল থেকে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে কত লোককে যে উইশ্ করতে হয় তার ঠিক নেই।

—গুড্ মর্নিং স্যার।

সদাব্রত চেয়ে দেখলে। সামনের সুইং-ডোরটা ফাঁক করে কে একজন মুখ বাড়ালো। অচেনা মুখ। সদাব্রত ভেবেছিল কোনও কাজে হয়ত এসেছে লোকটা। কিন্তু না, গুড্ মর্নিং করেই চলে গেল বাইরে। এমনি পনেরো-বার কুড়ি-বার রোজ। সাজানো ফিটফাট্ ঘর। ঝকঝকে টেবিল। কলিংবেল। কোথাও কিছু খুঁত নেই। সামনে ঘরের বাইরে বোর্ডে লেখা আছে—এস. গুপ্ত, পারচেজিং অফিসার। ঘরের সামনে ইউনিফর্ম পরা চাপরাসী পালিশ-করা টুলের ওপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসে থাকে। প্রাইভেট-সেক্টরে সবাই শিরদাঁড়া সোজা করেই কাজ করে। সরকারী অফিসে এ-নিয়ম নেই। সেখানে খবরের কাগজ, আড্ডা, চা, পরচর্চার পর যদি কিছু হাতে সময় থাকে তো তখন কাজ হবে। আর এখানে টিপ্-টপ্ ডিসিপ্লিন। প্রত্যেকটা মিনিট দামী, প্রত্যেকটা সেকেণ্ড কস্ট্লি। মিস্টার বোস নিজে ডিসিপ্লিন ভালবাসেন ; তাই তাঁর স্টাফও ডিসিপ্লিন মানুক সেইটেই চান। গেটের দারোয়ান থেকে শুরু করে পিন্-কুশন্টি পর্যন্ত নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে। আউটপুট দেখে স্টাফের প্রমোশন হয়। সেখানে ফাঁকি দেন না। শুধু ফার্মের মাথায় কয়েকটা পোস্ট তৈরি করা আছে। সেগুলো অফিসের শোভা। অফিসের শোভা শুধু নয়—অত্যন্ত দরকারী অত্যাবশ্যক শোভা। যেমন ওয়েলফেয়ার অফিসার, কেয়ার-টেকার, বিল্ডিং-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, অর্গানাইজার—এমনি আরো অনেক। এরা কেউ চীফ্ মিনিস্টারের ভাগ্নে, কেউ গভর্নরের ছেলে, কেউ হোম্ মিনিস্টারের ভাই, কেউ আবার চীফ্ সেক্রেটারির প্রথম পক্ষের ছেলে। এরা কেউ কাজ করুক না-করুক তাতে ফ্যাক্টরির প্রোডাক্শনের কিছু আসে যায় না। এরা সবাই গ্যাবার্ডিন টেরিলিন পরে কার্ ড্রাইভ করে অফিসে আসে। এরা গাড়ি গ্যারেজে রেখে দিয়ে বাঁ-হাতে সিগারেটের টিন আর দেশলাই নিয়ে গট-গট করে সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে নিজেদের এয়ার-কন্ডিশনড চেম্বারে গিয়ে ঢোকে। এরা একটার সময় লাঞ্চ খায়। বেলা দুটোর সময় রেস-কোর্সের হ্যাণ্ডিক্যাপ-বই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে। বেলা তিনটের সময় আফটারনুন-কফি খায়। তার পর পাঁচটার সময় গাড়ি চালিয়ে সাউথ-ক্লাবে গিয়ে মেম্বারদের সঙ্গে তাস নিয়ে কিটি খেলে। তার পর তিন পেগ রাম্ খেয়ে বাড়িতে গিয়ে ডিনার খায়। এত খাটুনির পর মাস গেলে কেউ পায় দু' হাজার, কেউ দেড়, কেউ বা আড়াই। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের কাছে 'সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস'-এর ফ্যানের যে এত

ডিম্যাণ্ড, সে এই এদের এফিসিয়েন্সির জন্যেই। এদের কারো চাকরি যেতে নেই, তাই চাকরি এদের যায় না। এদের একজনের চাকরি গেলে গভর্মেণ্ট-অর্ডার ক্যান্সেল্‌ড হয়ে যাবে। নতুন কোনও গভর্মেণ্ট অর্ডার পেতে হলে নতুন একটা পোস্ট তৈরি করতে হবে। সেই পোস্টে কোনও মিনিস্টারের রিলেটিভ্‌কে চাকরি দিতে হবে। দু' হাজার টাকা মাইনে দিতে হবে তাকে মাসে-মাসে। এমনি করেই শেয়ার-হোল্ডাররা বেনিফিটেড হবে। তাদের ডিভিডেণ্ডও বাড়বে আর ইণ্ডিয়ার সেকেণ্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানও সাক্‌সেসফুল করতেই হবে।

ক'দিনের মধ্যেই সদাব্রত সমস্ত জিনিসটা বুঝে নিলে।

এতদিন সদাব্রত যে-জগতের সঙ্গে মেলামেশা করে এসেছিল, এখানে এসে দেখলে সেটার খবর এরা কেউ রাখে না। এরাই হলো আসলে রিয়্যাল ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়ে যদি কারো সত্যিকারের উপকার হয়ে থাকে তো সে এদের। এরাই খাঁটি ইণ্ডিয়ান, তাই ছাব্বিশে জানুয়ারী কিংবা পনেরোই আগস্ট তারিখে যখন রাজভবনে পার্টি হয় তখন এদেরই ডাক পড়ে। গভর্নরের যেদিন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ডিনার-লাঞ্চ খেতে ইচ্ছে হয় সেদিন এদের নামই লিস্টে ওঠে।

—গুড্‌ মর্নিং স্যার!

লোকটা সুইং-ডোর ঠেলে মাথা নিচু করেই চলে যাচ্ছিল সেদিন। কিন্তু সদাব্রত ডাকলে—শুনুন—

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লো। তার পর আস্তে আস্তে সামনে এলো। সদাব্রত ভালো করে লোকটার দিকে চেয়ে দেখলে। দাড়ি ভালো করে কামানো হয় নি। সাবান দিয়ে কাচা লংক্লথের পাঞ্জাবি। হাতে খাবারের কৌটো। রুমালে গেরো দিয়ে বাঁধা। ব্রাউন রঙের ক্যানভাসের জুতো।

—কে আপনি?

—আজ্ঞে আমি এখানকার রেকর্ড সেকশানের বড়বাবু।

—আপনি কত মাইনে পান?

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। আম্‌তা-আম্‌তা করে বললে—স্যার, একশো চল্লিশ টাকা—আর চল্লিশ টাকা ডিয়ারনেস্‌ অ্যালাউয়ান্স্‌—

লোকটার বেশ বয়েস হয়েছে। বোধ হয় মাস্টারমশাইয়ের বয়েসী। হয়ত

মাস্টারমশায়ের মতই অবস্থা। হয়ত বাড়িতে ছেলে-মেয়ে-বউ আছে। বাড়ি-ভাড়া দিতে হয় নিশ্চয়ই। লোকটার সঙ্গে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হলো সদাব্রতর। বাড়িতে ক'জন খেতে, কত বাড়ি-ভাড়া দেয়। কখনও টি-বি হয়েছিল কি-না। কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না।

—আপনারা সবাই রোজ আমাকে গুড-মর্নিং করেন কেন?

লোকটা ঘাবড়ে গেল।

—রোজ রোজ আমাকে গুড-মর্নিং করেন কী জন্যে?

লোকটা একটু দ্বিধা করে বললে—আজ্ঞে, অফিসের অর্ডার—

—অর্ডার? অর্ডার মানে?

—আজ্ঞে, আমাদের সকলকে বড় সাহেব অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন অফিসারদের গুড-মর্নিং করতে হবে অফিসে এসেই, এই আমরা যারা বড়বাবু।

সদাব্রত খানিক ভেবে নিলে। তার পর বললে—কাল থেকে আর করবেন না। বড় সাহেবের অর্ডারই হোক আর যারই অর্ডার হোক, আমি ওটা পছন্দ করি না—যান, যান আপনি, সবাইকে বলে দেবেন, যেন কেউ গুড-মর্নিং না করে—

লোকটা ছাড়া পেয়ে যেন বাঁচলো।

কিন্তু সেদিন মিস্টার বোস নিজেই ঘরে এলেন চুরোট টানতে টানতে। সেই প্রথম দিন এই ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। সকলকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছেন। এতদিন আর দেখা হয় নি। আর ক'দিন পরেই অফিসের ফাউণ্ডার্স ডে। সেইদিন সকলের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হবে। বিশেষ করে মিসেস বোস, মিস্ বোস, সকলের সঙ্গে।

—কেমন কাজ করছো? এনি ডিফিকাল্টি?

মিস্টার বোস ভালো করেই জানেন যে, কাউকে রেজিমেণ্টেশন্ করতে হলে ভয় পাইয়ে দিতে নেই। প্রথম-প্রথম হেসে কথা বলতে হয়। সব রকম ফেসিলিটি দিতে হয়। তার পর আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে চাপ দিতে হয়।

বললেন—এনিহাউ, তোমার সেই ক্লাবে ভর্তি হওয়ার কী হলো?

ক্লাব! ক্লাবের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল সদাব্রত। মিস্টার বোস কলকাতার ক্লাবগুলোর মেম্বর হতে বলেছিলেন কয়েকদিন আগে। এই ধরো থ্রি-হাণ্ড্রেড-ক্লাব, কি ক্যালকাটা-ক্লাব, কি বেঙ্গল-ক্লাব, কি সাউথ-ক্লাব। এই ক্লাব-হ্যাবিট আমাদের ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে নেই। ওগুলোর মেম্বর হওয়া

দরকার। ওর ইউটিলিটি তোমার বোঝা উচিত। এক-একটা ক্লাবে অ্যাড্‌-মিশন-ফি দেড় হাজার টাকা, দু' হাজার টাকা। এক-একটা ক্লাবের মেম্বর হতে দু' বছর তিন বছর ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হয়। তা হোক, কিন্তু একবার মেম্বর হতে পারলে তখন কত সুবিধে তা জানো? এই যে আমি, আমিই কী মেম্বর ছিলুম? এই ফার্মই আমার হতো না-কি যদি আমি থ্রি-হাণ্ড্রেড ক্লাবের মেম্বর না হতুম? ক্লাবে গিয়েই তো আমার সেলিব্রিটিদের সঙ্গে প্রথম আলাপ হলো। নইলে কে আমাকে চিনতো আর আমিই বা কাকে চিনতুম! ক্লাবের মেম্বর না হলে তুমি লাইফের ব্যাট্‌ল্‌ফিল্ডে উইনার হতে পারবে না। আন্‌নোন্‌ আন্‌অনার্ড হয়ে পড়ে থাকবে চিরকাল।

—ক'টা ক্লাবের মেম্বর হতে হবে আমাকে?

মিস্টার বোস—সবগুলোর। রোজ যাও আর না-যাও, মেম্বর হবে সব ক'টার। এই ক্লাবের ভেতর দিয়েই আলাপ-পরিচয়ের ল্যাডার ধরে ধরে সোসাইটির মাথায় ওঠবার চেষ্টা করতে হবে—

—কিন্তু বাবা তো কোনও ক্লাবের মেম্বর নন!

—মিস্টার গুপ্তের কথা আলাদা, তিনি তো পোলিটিক্যাল সাফারার, তাঁর ওইটেই ক্যাপিট্যাল, কিন্তু ও-ক্যাপিট্যাল যাদের নেই, তাদের ক্লাবে ঢোকা এসেনসিয়াল—আমার মনিলা সবগুলো ক্লাবের মেম্বর—

এর পর আর কোনও কথা চলে না।

মিস্টার বোস বললেন—আজকেই তুমি আমার সঙ্গে সাউথ-ক্লাবে চলো, অ্যাড্‌মিশন্‌-ফি-টা দিয়ে আসি, আমিই তোমাকে ইন্‌ট্রোডিউস্‌ করে দিয়ে আসবো—

—আজ?

—হ্যাঁ আজই, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, দু-তিন বছর ওয়েটিং-লিস্টে থাকতে হয় ইউজুয়্যালি, তবে আমি চেষ্টা করে দেখবো যত শিগ্‌গির-শিগ্‌গির তোমাকে ঢোকাতে পারি। আজকাল হয়েছে কি মারওয়াড়ীরা এই ফিল্ডে এসে গেছে তো, তাই সব জায়গাতেই তাদের ভিড়—আমি ফোরকাস্ট করছি একদিন ওরাই ক্লাব-লাইফে লীড্‌ করবে—

তুমি সদাব্রত গুপ্ত। তুমি তোমার পাস্ট্‌ লাইফ ভুলে যাও। এখন থেকে মিস্টার বোসই তোমার আদর্শ। মিস্টার বোস যা বলবেন তাই-ই তোমাকে মেনে চলতে হবে। তুমি তাঁর পায়ে দু' হাজার টাকার দাসখত লিখে দিয়ে

বসে আছো। এখন আর পেছোলে চলবে না। তুমি মিস্টার বোসের জামাই, মিস বোসের ভাবী হাজব্যাণ্ড্।

বিকেলবেলাই মিস্টার বোস রেডি হয়ে এলেন। বললেন—চলো, লেট্‌স্ গো নাউ, আমি টেলিফোন করে দিয়েছি—

সদাব্রতও টেবিল ছেড়ে উঠলো। কোটটা গায়ে গলিয়ে নিলে।

—কে ?

সুইং-ডোরের বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল। মিস্টার বোস দেখতে পেয়েছেন।—হু আর ইউ ?

—আমি মন্মথ, সদাব্রতদা আছেন ?

গলাটা শুনতে পেয়েছিল সদাব্রত। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললে—কী মন্মথ ? কী খবর ?

মন্মথ বললে—মাস্টারমশাইয়ের খুব অসুখ বেড়েছে আবার—

সদাব্রতর মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল যেন খবরটা শুনে। বললে—তা আমি কী করবো ? আমাকে কী করতে বলো তুমি ?

—না, এমনি খবরটা দিতে এলুম, এদিকে আসছিলুম, তাই—

—কিন্তু তোমরা তো আমার দেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে গেলে, আমি মাস্টার-মশাইকে কীভাবে সাহায্য করবো বুঝতে পারছি না। এর পরও কি আমার ও-বাড়িতে যাওয়ার অধিকার আছে ?

মন্মথ বললে—তা জানি না, মনে হলো খবরটা তোমাকে দেওয়া উচিত, তাই দিলুম—

তার পর একটু থেমে বললে—আচ্ছা আমি চলি—

মন্মথ চলে গেল। মিস্টার বোস এতক্ষণ সব শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—হু'জ দ্যাট হ্যাগার্ড বয় ? ছেলেটা কে ? তুমি চেনো ওকে ? কী বলে গেল ? কার অসুখ ?

এ আর এক দিক। এতদিন ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ছিল। তারা যেখানে গেছে সেখানকার মানুষকে শাসন করেছে। আদালতে, কাছারিতে, অফিসে তারা একচ্ছত্র। তারা রাজার জাত। প্রজাদের সঙ্গে মেশা তারা পছন্দ

করে নি। দূরে দূরে থাকতো তারা। কাছাকাছি থাকলে ভয় চলে যায় বলেই দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। সিপাই মিউটিনির সময় থেকেই এটা তারা বুঝে নিয়েছিল। তাই তখন থেকেই তারা যেখানে যখন থেকেছে নিজেদের মধ্যে মেলা-মেশার জন্যে ক্লাব তৈরি করে নিয়েছে। তার ভেতরে তারা মেমসাহেব নিয়ে ফুর্তি করেছে, নেচেছে, বেলেল্লাপনা করেছে। এমন কি সময়ে সময়ে পরের বউ নিয়ে খুনোখুনিও হয়ে গেছে। কিন্তু সে তাদের নিজেদের মধ্যেই। তা নিয়ে প্রজাদের মধ্যে কানাকানি হয় নি। কারণ তা হলে রাজার জাতের সম্মানহানি হয়। তা হতে দেওয়া উচিত নয়। ওতে রাজ্য-শাসনের বিঘ্ন ঘটে।

এখন তারা চলে গেছে। কিন্তু ক্লাব রেখে গেছে। ক্লাবের ভেতরে আগে যা-যা চলতো তাও এখন চলছে। এতে সম্মান বাড়ে, মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, মানুষ জাতে ওঠে।

আরো অনেকের সঙ্গে মনিলাও খেলতে বসেছিল। কিটি খেলা শুধুই খেলা। কিন্তু বাহান্নখানা তাসের মধ্যে যে এত জাদু আছে তা যারা খেলে নি তারা জানতেও পারে না। কিন্তু এক-একদিন মুশকিল এমনই পাকিয়ে ওঠে যে ঠিক সময়মত সব দিন পৌঁছোনো যায় না। অন্য পার্টনাররা রাগ করে।

পার্টনারের অভাবে যারা খেলা আরম্ভ করতে পারে না, তারাই রাগ করে বেশি। যদি সারাদিনের মধ্যে একটু তাস না খেলা গেল তো কিসের ক্লাব! শুধু তো মেয়ে নয়, ছেলেরাও আসে। একেবারে গাড়ি চালিয়ে সোজা চলে আসে। এসেই জিজ্ঞেস করে—মিস বোস আয়া বেয়ারা?

বেয়ারাগুলোই হলো ক্লাবের আসল মূলধন। এক-একটা বেয়ারা কুড়ি বছর তিরিশ বছর ধরে এই একই ক্লাবে চাকরি করে আসছে। কত রাজ্যের উত্থান কত রাজ্যের পতন তারা দেখেছে। কত সাহেব-মেমসাহেবের অসতর্ক মুহূর্তের তারা সাক্ষী হয়ে আছে। কিন্তু পাথরের যদি ভাষা না থাকে তো তাদেরও নেই। তাদের ইউনিফর্ম, তাদের পাগড়ির নীচে তাদের মুখের চেহারায় কোনও পরিবর্তন হতে নেই। সাহেব হাসলেও তাদের হাসতে নেই, সাহেব গালাগালি দিলেও তাদের রাগ করতে নেই। তাদের অভিধানে একটি শব্দই আছে। সেটা হলো—জী হাঁ! রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় সুখ—জীবনের সমস্ত অনুভূতি-গুলোর প্রকাশ ওই একটিমাত্র শব্দতে!

এখন এসেছে নেটিভ সাহেব-মেম। নেটিভ রাজা-রাণী। ওই রাজা-

য়ানীই যা বদলেছে, ক্লাবের আইন-কানুন বদলায় নি। বেয়ারা-খানসামা-চাপরাসীদের একমাত্র সম্বল ওই শব্দটিও বদলায় নি।

তা বদলাতেই কি চেয়েছিল কেউ ?

মিস্টার বোস অন্ততঃ তা চান নি। যেমন চলছে তেমনিই চলুক। এই যে সারাদিন অফিসে-ফ্যাক্টরিতে খাটুনির পর একটু স্লিপ-এ সই করে দিলেই সব চলে আসে, এর অনেক সুবিধে। সঙ্গে ক্যাশ-টাকা থাকবার দরকার নেই। মেয়েকেও তাই ক্লাবের মেম্বর করে দিয়েছিলেন মিস্টার বোস।

—মিসিবাবা আয়া ?

—জী হাঁ!

লম্বা স্যালিউট করলে দরোয়ান। গাড়ি গিয়ে ভেতরে ঢুকলো। লম্বা লাল সুরকির পথ। চারিদিকে বাগান। মিস্টার বোসের চেনা রাস্তা। এই রাস্তা দিয়েই তিনি উন্নতির স্বর্গে পৌঁছেছেন। এখন সদাব্রতকেও সেই পথটা চিনিয়ে দিতে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। সকলকে চিনিয়ে দিতে নেই এ-রাস্তা। শুধু বেছে বেছে এর অধিকার দেবে কয়েকজনকে। তারাই ওপরে উঠবে। তারাই ফিউচার মিস্টার বোস হবে। তারাই দেশ কন্ট্রোল করবে। তারাই ফিউচার গভর্মেণ্ট কন্ট্রোল করবে। এখানে ঢোকবার অধিকার শুধু তাদেরই।

গাড়িতে উঠেও মিস্টার বোস জিজ্ঞেস করেছিলেন—ও ছেলেটা কে ?

সদাব্রত উত্তর দিয়েছিল। কিন্তু তাতেও মিস্টার বোস নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তোমার বাবা নিজে পলিটিক্যাল সাফারার তাই তোমার এডুকেশনের দিকটা ঠিকমত দেখতে পারেন নি আর কি! ওইটেই হয়েছিল ওঁদের মুশকিল! নিজেরা কান্ট্রির জন্যে জেল খেটেছেন, পলিটিক্স্ করেছেন, কিন্তু নিজের ফ্যামিলি, নিজের ছেলে-মেয়েরা কী করছে সেদিকে আর নজর দেবার সময় পান নি।

—ক্লাস-ফ্রেণ্ড, না পাড়ার বন্ধু ?

সদাব্রত বললে—ভাল স্টুডেণ্ট খুব, আমাকে খুব ভালবাসে ওরা—

—তা হোক, ভাল স্টুডেণ্টের তো অভাব নেই দেশে, সেটা তো বড় কথা নয়, তাদের জন্যে স্কুল-মাস্টারি, প্রোফেসারি, ডাক্তারি সমস্ত খোলা আছে, কিন্তু যেটা আসল জিনিস সেটা আছে ওদের ?

সদাব্রত বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—সেটা কী ?

মিস্টার বোস চুরোট টেনে বললেন—ব্যাকগ্রাউণ্ড!

সদাব্রত তবু বুঝতে পারলে না।

—ব্যাকগ্রাউণ্ড মানে ?

—আসলে ব্যাকগ্রাউণ্ডই তো সব। কেউ ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরী করে নিজে, কারোর ব্যাকগ্রাউণ্ড থাকে। আমি মিস্টার বোস, তোমার ফাদার শিবপ্রসাদ গুপ্ত, আমরা দু'জনেই ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরী করেছি নিজের চেষ্টায়। আর তুমি কিংবা আমার মেয়ে মনিলা—তোমাদের পেছনে ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। তোমাদের পক্ষে উন্নতি করা সোজা। এটাকে নষ্ট কোর না। ওই যে ছেলেটা এসেছিল মন্মথ না কী যেন ওর নাম, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমার ব্যাকগ্রাউণ্ড নষ্ট হয়ে যাবে। ওদের ছেড়ে দাও। ভুলে যাও ওদের সঙ্গে একদিন তোমার ভাব ছিল।

—কিন্তু আমাকে যিনি পড়াতেন তিনি খুব অনেস্ট লোক।

মিস্টার বোস বললেন—ওই একটা কথা—অনেস্টি! আমার মতে তো ওই ওয়ার্ডটা ডিক্সনারি থেকে তুলে দেওয়া উচিত! অনেস্ট বলতে তুমি কী বোঝ ? সততা ? তা হলে আমি কি অনেস্ট নই ? মিস্টার গুপ্ত কি অনেস্ট নন ? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কি অনেস্ট নন ? সবাই আমার অনেস্ট। কিন্তু অনেস্টির মানে আজকাল বদলে গেছে, তা জানো ? আমি মনে করি ডিক্সনারিও আজ নতুন করে লিখতে হবে। সব জিনিসেরই যখন রিভ্যালুয়েশন হচ্ছে তখন ডিক্সনারিরই বা হবে না কেন ?

গাড়িটা ততক্ষণে ভেতরে পৌঁছে গিয়েছিল।

ওদিক থেকে হাসির আওয়াজ আসছে। বাগানটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ঢাকা বারান্দা একটা। মর্নিং গ্লোরি আর ঝোলানো অর্কিডে ঢাকা জায়গাটায় অনেক মেয়ে-পুরুষের ভিড়। অনেক শাড়ি, অনেক ব্রোকেড, অনেক ডেক্রন, অনেক টেরিলিন। পেট-কাটা ব্লাউজ, সিগ্রেট, রাম্, রুজ, লিপস্টিক, কিউটেক্স। খিল-খিল হাসি, কিল-বিল দেহ। সদাব্রত হতবাক হয়ে গেল। কলকাতা যেন আর এক চেহারা নিয়ে সামনে এসে হাজির হলো। এর নামও তো কলকাতা। চারদিকে এত ফুল, এত স্বাস্থ্য, এত হাসি, এত যৌবন, এত প্রাচুর্য। কোথায় সেই বাগমারী, সেই ফড়েপুকুর স্ট্রীট, সেই বাগবাজার। এখানে দাঁড়িয়ে সেই কলকাতার কথা ভাবা কি স্বপ্ন দেখাও যেন অপরাধ! ইণ্ডিয়া সত্যিই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়েছে!

—বাবা!

ভারি মিষ্টি গলা! সদাব্রতর মনে হলো একটা ঘুম-জড়ানো স্বপ্ন যেন শরীরী হয়ে এগিয়ে এলো সামনে। একটু জড়োসড়ো হয়ে পাশে সরে দাঁড়ালো সদাব্রত। বোধ হয় স্বপ্নটা হাত বাড়িয়ে দিলে তার দিকে। সমস্ত বাতাসটা ভুর-ভুর করে উঠলো কী একটা মিষ্টি গন্ধে।

—এই হলো সদাব্রত গুপ্ত, শি ইজ মনিলা।

আজও মনে আছে সদাব্রতর সেই মুহূর্তটার কথা। জীবনে অনেক মুহূর্ত আসে যা ভোলা যায় না। যা ভুলতে মন চায়ও না। ছোটবেলায় মধু গুপ্ত লেনের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে শুরু করে অনেক চোরা-গলি, অনেক বড় রাস্তা পেরিয়ে এমন করে এই ক্লাবে এসে পথ ভুল করবে তা যেন জানা ছিল না তার। অথচ একদিন গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় রাস্তায় সে হেঁটে বেড়িয়েছে শুধু মানুষ দেখবে বলেই। একদিন বিনয়ের কাছে কত বক্তৃতা দিয়েছে সদাব্রত। শম্ভুকেও কত উপদেশ দিয়েছে। এতদিন সদাব্রত ভেবেছিল মানুষ দেখা বুঝি তার শেষ হয়ে গিয়েছে। কলকাতা দেখতেও বুঝি তার বাকি নেই। একদিকে কুন্তি গুহরা আর একদিকে মাস্টারমশাই। আর সকলের ওপরে হিন্দুস্থান পার্কের সোসাইটির মানুষ শিবপ্রসাদ গুপ্ত। কিন্তু এখন দেখে অবাক হয়ে গেল আর একটা জগৎ! নিউ ক্লাস। মনে হলো এদেরই জন্যে সত্যি সত্যি বোধ হয় স্বাধীনতা এসেছিল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বুঝি এদের হাতেই ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতা তুলে দিয়ে গেছে।

মনিলা বললে—আপনি খেলবেন?

সদাব্রত বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করলে—কী?

—তাস!

মিস্টার বোস বাধা দিলেন মাঝখানে। বললেন—নো, নো মনিলা, তুমি সদাব্রতর সঙ্গে একটু গল্প কর, মাঠে গিয়ে তোমরা বোস না—ও নতুন এসেছে, তোমার সঙ্গে গল্প করলে অ্যাট হোম ফীল করবে—

—আসুন মিস্টার গুপ্ত—

বলে বাগানের অন্ধকারের দিকে পা বাড়ালো মনিলা।

সদাব্রত বোধ হয় একটু দ্বিধা করছিল। মিস্টার বোস উৎসাহ দিলেন—যাও, এন্‌জয় ইয়োরসেল্‌ফ—যাও—

—দেখছেন, কী কোয়ায়েট প্লেস! আমার বাবাকে দেখলেন তো! অমন লাভিং ফাদার আমি কারো দেখি নি।

বলতে বলতে বাগানের সরু পথটা দিয়ে আগে আগে চলতে লাগলো মনিলা। সদাব্রতও পেছন-পেছন চলছিল। মাঠময় সিজন-ফ্লাওয়ারের ভিড়।

—কোথায় বসা যায় বলুন তো ?

সদাব্রত কিছু কথা না বললে খারাপ দেখায়। বললে—আমার জন্যে আপনার খেলাটা নষ্ট হলো তো ?

মনিলার কাঁধের শাড়ি হাওয়ায় খসে খসে পড়ছিল। বললে—বা রে বা, খেলা তো রোজই আছে—

তার পর একটু থেমে বললে—তা ছাড়া বেলা তিনটে থেকে খেলছি, আর মনটাও আমার ভাল নেই—

—কেন ?

মনিলা বললে—বাবা আপনাকে কিছু বলে নি ? কাল হোল নাইট আমার ঘুম হয় নি, তিনটে পিল খেয়েছিলাম, তবু ঘুম এলো না—এখনও মাথাটা ধরে রয়েছে, বাবা বলেছিল একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে—আমি শুধু এক পেগ রাম্ খেয়েছি, তবু মাথাটা ছাড়ছে না—

—তা হলে তো এখন আপনার ঘুম পাচ্ছে খুব !

—না না, ঘুম পেলে কি আর আমি ক্লাবে আসতুম ?

—সত্যিই তো, কেন শরীর-খারাপ নিয়ে ক্লাবে এলেন ?

মনিলা বললে—ক্লাবে না এলে আরো মাথা ধরতো যে ! আজ সমস্ত দুপুর মাথা ধরে ছিল, এখন ক্লাবে এসে একটু কমলো তবু। যে-কোনও একটা ক্লাবে একদিন না-গেলে রাত্রে ঘুম আসে না—

—খুব আশ্চর্য তো ! আপনার তো ট্রিটমেণ্ট করানো উচিত।

—ট্রিটমেণ্ট করিয়েছি। ডক্টররা বলে ক্লাবে আসতে। বলে, প্রত্যেক দিন রুটিন করে ক্লাবে এলে আমার হেল্থ্ ভালো হয়ে যাবে। অথচ দেখুন, ক্যালকাটার কোনও ডক্টর দেখাতে আর বাকি নেই। মেজর সিনহা তো আমাদের হাউস-ফিজিসিয়ান, রিটায়ার্ড আই-এম-এস—খুব কোয়ালিফায়েড ডক্টর —আমার মান্থলি মেডিক্যাল-বিল হয় দুশো-তিনশো টাকা—জানেন !

তার পর বোধ হয় একটু সচেতন হয়ে উঠলো মনিলা। বললে—থাকগে, আমার কথা যাক, আপনার কথা বলুন—বাবাকে আমার কেমন লাগছে বলুন ? জানেন, আমার বাবা একজন জিনিয়াস। আমি অমন লাভিং ফাদার আর দেখি নি—

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সদাব্রত বললে—আপনি চেঞ্জে গিয়ে দেখেছেন ?

—চেঞ্জে গিয়ে কিছু হয় না আমার। চেঞ্জে গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারি না তো। সেবার বাবার সঙ্গে কন্টিনেন্টে গিয়েছিলুম, কিন্তু কলকাতার জন্যে মন-কেমন করতে লাগলো—

—কেন ? মন-কেমন করলো কেন ?

মনিলা বললে—পেগীর জন্যে।

—পেগী ? পেগী কে ?

—আমার ডগ। কী চমৎকার ডগ যে পেগী সে আপনাকে কী বলবো ! আপনি তার বুদ্ধি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। আপনি গ্লাসে করে জল দিন সে খাবে না, কিন্তু ফ্রিজের জল দিন, চুক চুক করে খেয়ে নেবে। মা বলে পেগী আর জন্মে তোর লাভার ছিল—আমি শুনে হাসি।—আর কী পাজি জানেন—

বলে শাড়িটা আবার কাঁধে তুলে দিলে। বললে—আর কী পাজি জানেন, রাত্রে আমি যেই আনড্রেস করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বো না, ওমনি চুপি-চুপি আমার পাশটিতে গিয়ে শোবে। একদিন বাবা পেগীকে খুব জব্দ করেছিল—

সদাব্রতর মনে হলো এ যেন রূপকথার গল্প শুনছে সে। কোথায় গেল রেফিউজী-প্রবলেম্, কোথায় গেল ইণ্ডিয়ার ফাইভ-ইয়ার-প্ল্যান, কোথায় গেল শম্ভুদের ড্রামাটিক-ক্লাব, এখানে এই মনিলা বোসের সঙ্গে কথা বললে সমস্ত যেন ভুলে যেতে হয়।

—বাবা এমন জব্দ করেছিল পেগীকে কী বলবো, পেগী সেদিন রাগ করে আমার সঙ্গে সারাদিন আর কথাই বললে না !

সদাব্রতর হাসি পেল—কথা বললে না মানে ?

মনিলা স্কাইক্রেপার খোঁপাটা তুলিয়ে বললে—হ্যাঁ সত্যি বলছি, মোটে কথা বললে না ! কিন্তু আমি কী করবো বলুন, বাবারই তো দোষ। বাবাই তো বললে পেগীকে অত আদর দেওয়া ভাল নয়। বিয়ে হলে তোর হাজব্যাণ্ড আপত্তি করতে পারে !—আচ্ছা বলুন তো, হাজব্যাণ্ডের আপত্তি হবে কেন ? পেগী কি তার রাইভ্যাল ?

সদাব্রত কী উত্তর দেবে তা ভাবার আগেই মনিলা বললে—আর পেগী আমাকে যতই ভালবাসুক, সে তো পুওর ডগ ছাড়া আর কিছু নয়, বলুন ?

সদাব্রত বললে—নিশ্চয়—

—কিন্তু বাবার যে কী খেয়াল কে জানে! বাবা বললে, এবার তোমার বিয়ে হবে মনিলা, এবার থেকে পেগীকে সেপারেট ঘরে শুতে হবে। ওটা অড্ দেখায়। বলে পেগীকে বাবা সারারাত তার রুমে বন্ধ করে রেখে দিলে—উঃ, সারারাত পেগীরও ঘুম নেই, আমারও ঘুম নেই—হু'জনেই জেগে বসে আছি, এত দিনের অভ্যেস ছাড়তে পারা যায়, আপনিই বলুন?

—আপনি দেখছি খুবই ভালবাসেন পেগীকে!

—পেগীকে যে না-ভালবেসে থাকা যায় না মিস্টার গুপ্ত! আপনি যদি দেখেন, আপনিও ভালবেসে ফেলবেন, এমন লাভ্লি ডগ। তা তার পর কী হলো শুনুন, তার পর ভোরবেলা বেড-রুম থেকে সেই অবস্থাতেই আমি পেগীর ঘরে গেলুম, গিয়ে দেখি বেচারির চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ছে। আমি আর থাকতে পারলুম না, হু'হাতে পেগীকে কোলে তুলে নিয়ে কিস্ করতে গেলুম। ও মা, কিছুতেই কিস্ করতে দেবে না আমাকে! যতবার পেগীকে কিস্ করতে যাই ততবার মুখ ঘুরিয়ে নেয়, রাগ করলে আর জ্ঞান থাকে না পেগীর—শেষকালে—

হঠাৎ ইউনিফর্ম-পরা বয় এসে হাজির। হাতে ট্রে। ট্রের ওপর হুটো ডিকেণ্টার। ডিকেণ্টার হুটো টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বয় চলে গেল।

—বাবা পাঠিয়ে দিয়েছে, খান—বলে একটা তুলে নিয়ে মনিলা ঠোঁটে ঠেকালে।

সদাব্রত বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—এটা কী?

—রাম্! আপনি রাম্ খান না?

—না।

—তাহলে হুইস্কি আনতে বললেই হতো। বাবা তো জানে না। বাবা জানে আমি রাম্ খাই তাই রাম্ অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। তা আপনার জন্মে হুইস্কি আনতে বলি—

বলে মনিলা বয়কে ডাকতে যাচ্ছিল। সদাব্রত বললে—না থাক—

মনিলা বললে—হুইস্কিটা কেন খান আপনি? সে-রকম স্কচ্ হুইস্কি তো আজকাল পাওয়াই যায় না। হুইস্কি মাতালদের ড্রিঙ্ক। বাবা কন্টিনেন্টে গিয়ে হুইস্কি খায়, এখানে রাম্। আমাদের ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটে রাম্টাই হেল্‌থের পক্ষে ভাল—আমার সঙ্গে পেগীও রাম্ ধরেছে এখন! কিন্তু কী

দুই জানেন, এখন কোল্ড্-রাম্ ছাড়া ছোঁবে না—ও কি, মুখে দিন ? দিশী রাম্ নয়, আমাদের ক্লাবে দিশী ড্রিঙ্কস্ আনতেই দিই না—

দূরে যেন খুব গোলমাল হচ্ছে কোথায়। অনেক মেয়ে-পুরুষের গলা।

—ও কিসের গোলমাল ?

মনিলা চুমুক দিয়ে বললে—খেলার। বোধ হয় রাবার হয়েছে। ওদের মধ্যে দু'জনে আছে—মিস্টার সানিয়াল আর মিসেস ভাদুড়ী—ওরা গোলমাল না করে খেলতে পারে না।

—আপনার মাথা ধরা সারলো ?

—সারবে কী করে ?

—এই যে বললেন রাম্ খেলে আপনার মাথা-ধরা সেরে যায় ?

—কিন্তু ওই যে বললুম, পেগীর শরীরটা খারাপ, সেই জন্যেই তো মাথাটা ধরেছিল—

—পেগীর অসুখ তা তো শুনি নি।

—তবে আর কী শুনলেন! পেগীর অসুখ হয়েই তো মুশকিল করেছে মিস্টার গুপ্ত! আজ সকালে তাকে জোর করে তিনটে বিস্কিট খাইয়েছি, খেতে কি চায় ? তার পর সুপ্ দিয়েছিলুম, স্যাণ্ডুইচ্ দিয়েছিলুম, মিল্ক দিয়েছিলুম, সব পড়ে আছে, কিচ্ছু মুখে দেয় নি। বাবাকে ফোন করলাম। বাবা বললে—না মনিলা, তুমি ক্লাবে যাও, ক্লাবে না গেলে তোমার মাথাধরা সারবে না। আর মা-ও বললে—আমি পেগীকে দেখবো, তুমি ক্লাবে যাও ম্যানিলা। আসবার সময় আমিও পেগীকে খুব আদর করে এসেছি, বলেছি —তুমি একটু কষ্ট করে থাকো লক্ষ্মীটি, আমি একটু ক্লাব থেকে ঘুরে আসি—কিন্তু এই তো এখন আপনার সঙ্গে কথা বলছি, রাম্ও খাচ্ছি, কিন্তু আমার মন পড়ে আছে সেই পেগীর কাছে···ও কি, আপনি খান! খাচ্ছেন না কেন ?

মিস্টার বোসের গলা শোনা গেল—মনিলা—

—ওই বাবা আসছে, আমি এখানে বাবা—

মিস্টার বোস কাছে এসে বললেন—হাউ ডিড্ ইউ এন্জয় সদাব্রত ? কেমন লাগছে এখন ?

মনিলা বললে—বাবা, তুমি মিস্টার গুপ্তর জন্যে রাম্ পাঠালে কেন ? উনি তো হুইস্কি খান···

সদাব্রত বললে—না না, রাম্ই ভালো, রাম্ ইজ্ অলরাইট—আপনি কিছু ভাববেন না—

—চলো মনিলা, চলো সদাব্রত, ওরা সব তোমাকে দেখবার জন্যে ভেরি ইগার। ওরা তো জানতো না। আমি বললুম, আমার পারচেজিং অফিসার মনিলার নিউ চয়েস্, আমার উড্ বি সান-ইন-ল। তোমার মেম্বারশিপ্ হয়ে গেছে—আর ভাবনা নেই—চলো—

ভেতরে সবাই অপেক্ষা করছিল। মিস্টার গুহা, মিস্টার সানিয়াল, মিসেস্ ভাদুড়ী, মিস্টার হন্স্রাজ, মিস্টার ভোপৎলাল, মিস্ আহুজা, আরো অনেকে। সদাব্রত আগে আগে চলছিল, পেছনে মনিলা, পাশে মিস্টার বোস। মিস্টার বোসও একটু খেয়েছিলেন। কিন্তু পুরোমাত্রায় সেন্স্ ছিল। লক্ষ্য করে দেখছিলেন রেজিমেন্টেশন কেমন হয়েছে। ইন্ডক্ট্রিনেশন কেমন হয়েছে! গড ব্লেস দেম! গ্রেসাস্ গড!

এরই উল্টোপিঠে তখন কলকাতা সবে ঘুম ভেঙে চোখ খুলেছে। সবে শুরু হয়েছে কেনাকাটা। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। সনাতন-রহিম-দালালেরা তখন গলির মোড়ে মোড়ে ওত্ পেতে দাঁড়িয়ে আছে। সাড়ে বত্রিশভাজার খদ্দের মাথায় কেরোসিনের ডিবে জ্বলে উঠেছে। আলুকাবলি-মটর পাঁঠার ঘুগনি বেরিয়ে পড়েছে সারা রাতের মত। একটু অন্ধকার হয়ে এলেই সকলের আশা হয়। এ-পাড়ার বাবুদের কেমন আনাগোনা হয় তা মা কালীও আগে বলতে পারে না। মাসকাবারের দিকটাতেই একটু যা বেচা-কেনা কম হয়ে যায়। তার পর আবার মাস পড়লেই রমারম্।

তাই পদ্মরাণী সকলকেই সাবধান করে দিয়েছে—

বলেছে—

ভাই বল ভাতার বল সম্পদের সাথী।
অসময়ে নিদেন কালে গোবিন্দ সারথি॥

—তা পদ্মরাণীরও সে এক দিন ছিল। এই তোরা যেমন এখন ছা-টাকা ঘো-টাকা করে মরিস, তখন কিন্তু বাছা এমন ছিল না। এক-একটা কাপ্তেনবাবু এসেছে আর দু' হাতে টাকা বিলিয়ে দিয়ে গেছে এখেনে। সে-সব আর

তোরা দেখলি কোথায়? আমিও দেশে এলাম আর দেশেও আকাল এলো।

হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে সনাতন এসে হাজির। একেবারে ঘরে ঢুকে পড়েছে।

—মা, শেঠ ঠগনলাল এসেছে—

পদ্মরাণী খাটের ওপর বসে বসেই মুখ খিঁচিয়ে উঠেছে।

—দূর মুখপোড়া, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? আমি তোর ইয়ার?

—না মা, মাইরি বলছি, কোন্ শালা তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করে, ঠগনলাল-বাবুর গাড়ি আমি নিজের চোখে দেখলুম, দেখেই তোমার এখেনে ডেকে এনেছি, সোনাগাছির পুরনো পাড়ার দিকে চলে যাচ্ছিল···

সুফলও দেখতে পেয়েছিল। বাইরে এসে বললে—সেলাম হুজুর—

ঠগনলাল একবার তার দিকে চেয়ে দেখলে—কী রে, খুব যে চেহারা ফিরিয়ে ফেলেছিস তুই, খুব দিশী খাচ্ছিস বুঝি?

বলতে বলতে সোজা উঠে এলো পদ্মরাণীর ঘরে।

—ওমা, বলি কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, তার মুখ রোজ-রোজ দেখবো লো। কী গো ঠগন, পথ ভুলে নাকি?

ঠগনলাল ততক্ষণে পদ্মরাণীর বিছানায় বসে পড়েছে।

—পথ ভুলবো না তো কী? যত পুরোনো মাল রেখেছ তোমার বাড়িতে, আসতে মন চায় না। এই সনাতন শালা টেনে নিয়ে এলো। বললে—পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে নতুন মাল নাকি এসেছে। আমি বলিছি ওকে, যদি নতুন মাল না আনতে পারিস তো জুতো মেরে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেবো—

সনাতন গালাগালি খেয়ে দাঁত বার করে হাসতে লাগলো।

পদ্মরাণী বললে—নতুন মাল থাকবে কোত্থেকে ঠগন? নতুন মাল কি এ-বাজারে পড়তে পায়? তুমি এ-বাজার চেনো না? তুমি নতুন লোক নাকি? তুমি দু' বছরে একবার আসবে আর নতুন মাল খুঁজবে—

ঠগনলাল সিগ্রেট ধরালে।

—মাইরি বলছি পদ্মরাণী, কাজের ঝঞ্ঝাটে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। ইমপোর্ট লাইসেন্স বন্ধ করে দিয়ে ঠগনলালের কোমর ভেঙে দিয়েছে গভর্মেণ্ট—কারবার দেখবো না ফুর্তি করবো!

তার পর একটু থেমে বললে—যাক্ গে, ও-সব বাজে কথা ছাড়ো, নতুন আমদানি কিছু আছে ?

পদ্মরাণী হাসতে লাগলো।

—নতুন আমদানি না থাকলে কারবার করছি মিছিমিছি ?

—তা হলে স্যাম্পল দেখাও। স্যাম্পল না দেখে ঠগনলাল লেন্-দেন্ করে না। সেবার মিছিমিছি ডেকে এনে আমায় হয়রানি করেছিলে।

পদ্মরাণী বললে—রেস্ত কত আছে সঙ্গে ?

—যা চাও, হাজার-দু হাজার-চার হাজার আগাম দেবো, কিন্তু বলে রাখছি এঁটো মাল ছোঁব না !

—তা হলে বার করো। বলে ঠগনলালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে পদ্মরাণী।

ঠগনলাল বললে—টাকা তো দেবো, তার পর ?

—বলি পদ্মরাণীকে তুমি বিশ্বাস করো না ? পদ্মরাণী কখনও তোমায় ঠকিয়েছে ? বুকে হাত দিয়ে কালীর দিব্যি করে বলো তো ?

ঠগনলাল যেন এবার একটু নরম হলো। বললে—বয়েস কত ?

—এই চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পড়েছে।

—ঠিক আছে। কী জাত ?

—তোমার কাছে মিছে কথা বলবো না। বাঙালী মেয়েকে সালোয়ার পাঞ্জাবি পরিয়ে রাজপুতানী বলে চালাবো আমি তেমন বাড়িওয়ালী নই। সে তুমি সোনাগাছির পুরোনো-পাড়ায় পাবে, ওই সনাতনকে জিজ্ঞেস করো, ও জানে। এ আসলে বাঙালী।

—দেখতে কেমন ?

—আমাকে কখনও ভুষি-মালের কারবার করতে দেখেছ ? পছন্দ না হলে তোমার টাকা ফেরত দেবো।

ঠগনলাল তখন বেশ খুশী।

—তা হলে কত লাগবে সবসুদ্ধ ?

পদ্মরাণী বললে—পঁচিশ হাজার টাকা ! এ-সব কাজে সকলের কাছ থেকে আমি পচিশ হাজার টাকাই নিই। ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর ? আমার কাছে বাপু এক রেট্ ! তোমার কাছে কম রেট্ নিয়ে আমি কি নাম খারাপ করবো !

—অ্যাড্‌ভান্স্‌ কত দিতে হবে ?

—পাঁচ হাজার।

চমকে উঠলো ঠগনলাল। পাঁচ হাজার রুপেয়া! পাঁচ হাজার টাকা দিলে যে হাতী কেনা যায় গো!

পদ্মরাণী বললে—তুমি তো অ্যাড্‌ভান্স্‌টা আমাকে দিচ্ছ না, যার মাল তাকেই দেবে, আমি জিম্মা থাকবো শুধু। যে-দিন হাতে মাল পাবে সেদিন পুরোটা দিয়ে দিও।

—তা বেশ। কার হাতে টাকা দেবো ?

পদ্মরাণী উঠলো। বললে—দাঁড়াও—আমি ডেকে আনছি, তুমি কিছু্ছু ভেবো না, আমি তোমার টাকার জিম্মা থাকবো—

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে সোজা সতেরো নম্বর ঘরে গিয়ে ডাকলো—টগর, ও মা টগর—

ভেতর থেকে দরজা-জানালা বন্ধ। পদ্মরাণী আবার ডাকলে—ও মা, টগর আছিস্—

অনেকক্ষণ পরে কুন্তি দরজা খুলে বেরোলো। বিকেল থেকেই আজ কুন্তি এসে ঘর সাজিয়ে বসেছিল। বেস্পতিবার। এ-দিনটায় অ্যামেচার-ক্লাবের প্লে থাকে না। বেস্পতিবার, শনিবার আর রবিবারগুলো এখানে এসে যা দুটো পয়সা হয়।

—একবার আমার সঙ্গে আয় তো মা! এক মিনিটের জন্যে।

কুন্তির ক'দিন থেকেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল। বুড়ির অসুখের জন্যে দেনাও হয়ে গেছে অনেকগুলো টাকা। অনেক কষ্টে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে তাকে। তার পর থেকেই ওষুধ-ডাক্তার লেগে আছে, দুপুর বেলাই দু' বেলার রান্না সেরে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে চলে এসেছে।

পদ্মরাণী আবার বললে—বেটাকে আজকে কাত করে তবে ছাড়বো, আয় মা, আয়—শিগ্‌গির—

তবু কুন্তি বুঝতে পারলে না। বললে—ঘরে বাবু রয়েছে যে—

—তা থাক্ না বাছা, টাকা নিইছিস তো আগাম ? তবে আর ভাবনা কি ? মালের দাম দিয়েছে তো—আয়—

বলতে বলতে আবার নিজের ঘরের দিকে এগোতে লাগলো পদ্মরাণী। কুন্তিও গায়ের শাড়ি গুছিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল পেছন পেছন।

—এই ভাখ, এনিছি, এই আমার মেয়ে টগর, একে চেনো তো? এর ঘরে বসেছ তো তুমি?

ঠগনলাল চেয়ে দেখলে কুন্তির দিকে। কুন্তি বললে—ইনি তো পুরোনো লোক—

পদ্মরাণী বললে—দাও, টাকা বার করে দাও, এই টগরেরই বোন—খাসা মেয়ে, তুমি দেখে খুশী হবে বাবা—

ঠগনলাল আগে অনেকবার দেখেছে কুন্তিকে। তবু আবার জহুরীর চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে বললে—এই রকমই দেখতে?

পদ্মরাণী বললে—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি কি যাচাই না-করে মাল নেবে? আর ভাবছো কেন, আমি তো তোমার টাকার জিম্মা রইলুম। আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না?

তবু ঠগনলাল কী যেন ভাবছিল। পদ্মরাণী বললে—পছন্দ না হলে তোমার টাকা ফেরত পাবে আমি তো বলছি—

ঠগনলাল—কবে মাল হাজির করবে?

—এই ধরো আসছে বেস্পতিবার!

—দূর্, বেস্পতিবার ড্রাই ডে, চাট্ না হলে মাল জমে?

—ঠিক আছে, শনিবার, শনিবার ভালো বার। পূর্ণিমে, পূর্ণিমের দিনটাও ভালো, তোমার গদিও সকাল-সকাল বন্ধ হবে, দুপুর থেকেই লাগিয়ে দিও—

এর পর আর ঠগনলাল দ্বিধা করলে না। পকেট থেকে পাঁচ হাজার টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিলে কুন্তির দিকে। কুন্তি এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পারছিল না। কেন, কিসের টাকা, তাও ঠিক করতে পারছিল না। পদ্মরাণী বললে—গুনে নে বাছা, কথা বলবি গুনে আর টাকা নিবি গুনে, মারোয়াড়ীদের টাকায় বিশ্বাস নেই—

টাকাটা হাতে নিয়ে বোকার মত কুন্তি পদ্মরাণীর মুখের দিকে চাইলে।

—এ কীসের টাকা মা!

পদ্মরাণী বললে—তোর বোনের নথ-খোলানি। এখন হাজার পাঁচেক দিলে অ্যাডভান্স, পরে পুরো পাবি। শনিবার দিন আনবি তাকে, ঠগনও আসবে তখন, বাকিটা হাতে-হাতে পেয়ে যাবি—আমার আর কি বাছা, তুই-ই বোন নিয়ে বিপাকে পড়েছিলি, কোথা থেকে কে এসে এঁটো করে দিয়ে যাবে, তার

চেয়ে ঠগন আমার জানা-শোনা লোক, চিরকালের মতএকটা হিল্লে হয়ে যাবে আর তার পর যদি তেমন বাবুর সুনজরে পড়ে যাস্, তখন···

আর যেন সহ্য করতে পারলে না কুন্তি। হাত থেকে তার টাকার বাণ্ডিলটা থপ্ করে মেঝের ওপর পড়ে গেল। সনাতন টাকাটা কুড়িয়ে তুলে নিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই কুন্তি লাথি মেরে সেটাকে দূরে ফেলে দিলে।

কাণ্ড দেখে পদ্মরাণী হতবাক।

—ওমা, তুই টাকার গায়ে লাথি মারলি টগর? টাকা যে লক্ষ্মী লা!

কুন্তি আর পারলে না। সে তখন থর-থর করে কাঁপছে। বললে—ও-টাকায় আমি হাজার বার লাথি মারবো—

—কী বললি?

—হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলিছি।

—তা বলে মা-লক্ষ্মীকে তোর এত হতচ্ছেদ্দা? তুই কি ভাবছিস তোর বয়েস চিরকাল থাকবে? তোর দাঁত পড়বে না? তোর চোখে ছানি পড়বে না? তোর গতরে ঘুণ ধরবে না? তুই ভেবেছিস বরাবর তোর কোমরের জোর থাকবে এই রকম?

কুন্তি বললে—তা না থাক, কিন্তু আমি না-হয় আমার নিজের গলায় দড়ি দিয়েছি, তা বলে আমার মায়ের পেটের বোনের গলায় দড়ি দিতে বলছো তুমি কোন্ আক্কেলে? আমি বেশ্যা হয়েছি বলে আমার বোনকেও বেশ্যা করবো? ও-টাকার আমার দরকার নেই মা, অমন টাকায় আমি পেচ্ছাব করে দিই—

বলে আর দাঁড়ালো না।

ঘর থেকে হনহন করে বেরিয়ে বারান্দার দিকে চলে গেল। ঠগনলাল, পদ্মরাণী, সনাতন সবাই টগরের এই ব্যবহারে খানিকক্ষণের জন্যে বিমূঢ় হয়ে রইল!

বাগবাজারের গলিতে তখন আরো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম কলকাতা পত্তনের সময় বুঝি এমনি অন্ধকারই ছিল। এমনি মশা-মাছির উৎপাতে ডিহি-কলকাতার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। এমনি নর্দমার গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসতো।

তবু সেই আবহাওয়ার মধ্যেই কেদারবাবু ময়লা তক্তপোশের ওপর শুয়ে ছিলেন নিশ্চিন্তে। তাঁর গুরুপদ, তাঁর মন্মথ, তাঁর বসন্ত, তাঁর সদাব্রত সবাই মানুষ হয়ে উঠুক। আজ যেন আর তাঁর কিছু কাম্য নেই। তিনি দেখে যেতে পারলেন না। হিস্ট্রিতে ১৭৫৭ সালে এমনি দুরবস্থা একবার হয়েছিল। তার পর হয়েছিল ১৮৫৭ সালে, তার পর ১৯৩৯। তার পর আবার এই অবস্থা চলেছে ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি থেকে। কেদারবাবু অসুখের মধ্যে বারে বারে কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন। কিছু মিলছে না। ভিন্‌সেন্ট্ স্মিথ, কার্ল মার্কস, টয়েন্‌বী, সকলের সব কথা যেন মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে…

শশীপদবাবু দেখতে এসেছিলেন। তিনি একবার করে আসেন দেখতে। ডাক্তারবাবুও এসে দেখে যান। ওষুধ লিখে দিয়ে যান।

কেদারবাবু জ্বরের ঘোরেই একবার যেন চেঁচিয়ে উঠলেন—সদাব্রত, সদাব্রত—

মন্মথ পাশে ছিল। সে একবার ঝুঁকে দেখলে। মাস্টারমশাই তখন আবার অচৈতন্য।

বাইরের রোয়াকে শৈল তখন ন্যাতা দিয়ে মেঝে মুছছিল। মন্মথ পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে—শুনলে তো?

শৈল নিজের মনেই কাজ করে যেতে লাগলো। কোনও উত্তর দিলে না।

—আমি কিন্তু একবার সদাব্রতদার কাছে যাবো।

শৈল কাজ করতে করতেই বললে—না, যেতে হবে না—

—কিন্তু আমি একদিন গিয়েছিলুম।

শৈল এবার মুখ তুললো হঠাৎ—গিয়েছিলে মানে?

—তুমি যেতে বারণ করেছিলে, তবু গিয়েছিলাম। তুমি রাগ করো আর যা-ই করো, আমি না-গিয়ে পারি নি—

শৈল উঠে দাঁড়ালো। বললে—কেন গিয়েছিলে তুমি? আমি এত করে যেতে বারণ করা সত্ত্বেও তুমি গেলে কেন?

মন্মথ একটু ভয় পেয়ে গেল। বললে—তুমি কিছু মনে কোর না, মাস্টার-মশাইয়ের কথা ভেবেই আমি না-গিয়ে পারি নি, শুধু খবরটা দিয়েছিলুম, আর কিছু বলি নি—

শৈল বললে—এবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনও যেও না। কাকা যদি মরেও যায় তবু কিছু খবর দিতে হবে না—কাকা সবাইকে

বিশ্বাস করে, কিন্তু সে-বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবার লোক তোমার সদাব্রতদা নয়—

বলে আবার নিজের কাজ করতে লাগলো শৈল।

'আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন' দিয়ে নতুন বছর আরম্ভ হয়েছিল। এই পৃথিবীর আর একটা নতুন বছর। আর একদিন বয়েস বাড়লো পৃথিবীর। পৃথিবী আর একদিন বুড়ো হলো। এবার মিড্‌ল ইস্টের কোনও দেশ যদি কেউ আক্রমণ করে তা হলে আর্মি দিয়ে টাকা দিয়ে সব কিছু দিয়ে সাহায্য করবে আমেরিকা। সোভিয়েট ব্লক্ তৈরি হয়ে রয়েছে ইজিপ্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে। ইংরেজ চলে এসেছে সুয়েজ ক্যানেল ছেড়ে, ফ্রান্সও চলে এসেছে। এ-সুযোগ সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়বে না। তার আগেই নুন খাইয়ে দিতে হবে আরবকে। ইজিপ্টকে দিয়ে আমেরিকার গুণ গাওয়াতে গেলে সাত তাড়াতাড়ি নুন না খাওয়ালে উপায় নেই। সুতরাং আরো টাকা ছড়াও। চাঁদির বন্যায় ইজিপ্ট, ইরাক, সিরিয়া ভাসিয়ে দাও। টাকা দিলে পৃথিবীতে কী না কেনা যায়। আমরা তোমাদের বন্ধু। আমরা অনাথের নাথ, পতিতের ভগবান। তোমরা সোভিয়েট রাশিয়াকে ছেড়ে আমাদের স্মরণ করো।

শিবপ্রসাদ গুপ্ত এই নিয়েই ক'দিন ব্যস্ত ছিলেন। পণ্ডিত নেহরু সবে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন। সবাই তাঁর কাছে শুনতে চায় আই-সেনহাওয়ার কী বললে। আমাদেরও কিছু দেবে নাকি? আমেরিকা একটু ইচ্ছে করলেই তো আমাদের বড়লোক করে দিতে পারে। চায়না তো আমাদেরও অ্যাটাক করতে পারে। আসলে তো চায়না রাশিয়ারই বন্ধু হে! আমাদের সামান্য টাকা দিলেই আমরা আমাদের ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সাক্‌সেস্‌ফুল করতে পারি।

অবিনাশবাবুরা বুড়োর দল। সন্ধ্যেবেলা এসে একবার করে খবর নেন।

গোবিন্দ দরজা খুলে দিতেই জিজ্ঞেস করেন—কী, তোমার বাবু ফিরে এসেছেন নাকি?

আসেন নি শুনে আবার ফিরে যান সকলে। গিয়ে আবার পার্কের বেঞ্চিতে বসেন। কার্তিক মাস থেকেই গলায় মাথায় কম্ফর্টার। একটু শীত পড়লেই বুড়ো পেন্‌সন্‌-হোল্ডারদের দল সাবধানে থাকেন। সারাজীবন গভর্মেন্ট অফিসে মোটা-মাইনের চাকরি করেছেন। তখন অফিসের বাবুরা খাতির করতো, ভয় করতো। উঠতে বসতে সেলাম করতো। এখন আর কেউ ফিরেও তাকায় না। বাড়িতে ছেলে, ছেলের বউরাও আর তেমন সেবা-যত্ন করে না। তাই বুড়োরা সবাই দল বেঁধে পরস্পরের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে আলোচনা করেন, আর সময় পেলেই চলে আসেন শিবপ্রসাদবাবুর বৈঠকখানায়। এবার অনেক দিন দেখা হয় নি। ইন্দোরে গেছেন তিনি।

অবিনাশবাবু বলেন—আজকের স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ দেখেছেন অনিলবাবু? কী টাকাটাই না ছড়াচ্ছে মশাই চারদিকে—

অনিলবাবু বলেন—আমেরিকার কথা বলছেন তো? দেখিছি—এত কোটি-কোটি টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে কেন বলুন তো মশাই?

হৃষীকেশবাবু বলেন—তা আমাদের তো কিছু দিলে পারে—আমরাও দুটো খেতে পাই—আমাদের অবস্থা কি ওদের চেয়ে কিছু ভালো?

তার পর এই নিয়ে কথা শুরু হয়ে আলোচনা আরো অনেক দূর গড়িয়ে চলে। আমেরিকা কেন টাকা দেয়, কাদের দেয়। সে-টাকা কী ভাবে খরচ হয়, কারা খরচ করে। সে-টাকায় উপকার কী হয় তারও আলোচনা চলে। অনুমানের ওপর নির্ভর করে তর্কও হয় দু-দলে।

অখিলবাবু বলেন—শুনছি নাকি আমাদের দেশেও টাকা ছড়ায় ওরা—

—তাই নাকি?

সবাই চম্‌কে ওঠে। কাকে দেয়? কী জন্যে দেয়?

বিকেল বেলা। ওপাশে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েরা। সঙ্গে ছোট ছেলে-মেয়েরাও আছে।

—শুনিছি তো ইণ্ডিয়াতেও নাকি প্রচুর টাকা দিচ্ছে, কিন্তু কারা যে পায় তা জানি না। ওসব তো কন্‌ফিডেনশিয়াল্‌ ব্যাপার—

ষষ্ঠীবাবু বললেন—না মশাই, আমাদের ব্রজেন পেতো—এখন আর পায় না—

—ব্রজেন কে?

—আমার অ্যাসিস্টেণ্ট ছিল অফিসে। হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে

দিলে। দিয়ে গাড়ি কিনলে একটা। দামী সিগারেট খেতে লাগলো। কোথা থেকে যে টাকা আসতো বুঝতে পারতুম না।

—এত লোক থাকতে তাকে টাকা দিতো কেন?

ষষ্ঠীবাবু বললেন—কে জানে মশাই কেন দিতো। হয়ত কোনও সোর্স ছিল, তার পর একদিন হঠাৎ দেখা রাস্তায়। দেখি আর গাড়ি নেই, আবার পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে—বুঝলাম টাকা বন্ধ হয়ে গেছে—

সবাই গল্পটা উপভোগ করছিলেন। বললেন—কেন? বন্ধ হলো কেন?

—ওই যে, বুলগানিন আর ক্রুশ্চেভের মীটিং-এ খুব ভিড় হয়েছিল, অমন ভিড় তো আর ভূ-ভারতে কখনও হয় নি। তাই দেখেই তো আমেরিকা খুব রেগে গেছে, অনেকের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে—

অবিনাশবাবু বললেন—তা মশাই একলা আমেরিকাকেই বা দোষ দিলে হবে কেন? রাশিয়া কি টাকা দিচ্ছে না ভাবছেন? তারাও তো টাকা ছড়াচ্ছে ভেতরে ভেতরে—

অখিলবাবু বললেন—তা বটে, টাকা না দিলে কমিউনিস্টরাই বা চালাচ্ছে কী করে বলুন? কমিউনিস্টরা তো আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে না!

সত্যিই, টাকা দিলে কারোরই আপত্তি নেই। টাকা নিলেও আপত্তি নেই কারো। কিন্তু আমাদের কথা তো কেউ ভাবছে না। এই আমরা, যারা পেনসন্-হোল্ডার। আমরা কি কেউই নই মশায়! আমরা আজ বুড়ো হয়েছি, যারা রিটায়ার করেছি। আমাদের কথা কেউই শোনে না। না-শোনে গভর্মেণ্ট, না শোনে পাবলিক! আমরা যাই কোথায়?

সদাব্রতও তা জানে। শুধু তো এই ক্লাবই ইণ্ডিয়া নয়। যাদবপুর, কালীঘাট, ফড়েপুকুর স্ট্রীট যেমন ইণ্ডিয়া, বাগবাজারের সেই অন্ধকার গলিটাও তো ইণ্ডিয়া। এই কলকাতাটাও তো ইণ্ডিয়া। একদিন সদাব্রত মধু গুপ্ত লেনের মধ্যে মানুষ হয়েছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সেখানে থাকলে সে-ও শম্ভুদের মত ড্রামাটিক ক্লাব নিয়েই মেতে থাকতো। কেদারবাবুর কাছে থাকলে হয়ত সেই বাগবাজারের গলিটার মধ্যেই সকলের ভবিষ্যৎ-মুক্তির স্বপ্ন দেখতো। কিংবা নেতাজী সুভাষ রোডে তাদের নিজেদের অফিসে বসলে হয়ত বাবার ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফিসটা নিয়েই সময় কাটিয়ে দিতো। তা হলে আর এই ক্লাব দেখা হতো না। এ মানুষগুলোকেও চেনা হতো না।

প্রতিদিন অফিসে যাবার সময় এক ঘণ্টা সময় লাগে সদাব্রতর। এটাও মিস্টার বোসের ইন্‌স্‌ট্রাকশান্। উপদেশ। লোকে যেমন করে স্টুডেন্টদের উপদেশ দেয়, মিস্টার বোসও তেমনি উপদেশ দেন সদাব্রতকে। তিনি বলে দিয়েছেন—রাস্তায় কখনও পায়ে হেঁটে বেড়াবে না। পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেড়ানোটা ডেমোক্র্যাটিক। সব সময় মুখে সিগারেট জ্বালিয়ে রাখবে। ধোঁয়া টানো আর না-টানো সিগারেটটা ঠোঁটে আটকে থাকা চাই। এতে পার্সোন্যালিটি-কাল্ট্ বাড়ে। যারা বলে সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয়, তারা অ্যান্টি-সোশ্যাল। তুমি জানো, কত কোটি-কোটি ডলার এই সিগারেট-ইণ্ডাস্ট্রিতে খাটছে। কত কোটি-কোটি লোক এই টোব্যাকো ফ্যাক্টরিতে চাকরি করছে। তাদের কথা একবার ভাবো। তুমি যদি সিগারেট না খাও তো যারা সিগারেট কোম্পানীর শেয়ার কিনেছে তাদের কী হবে? এই দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সব জিনিসকে দেখতে হবে। আর একটা কথা, যারা পুওর, যারা গরীব, যারা মধ্যবিত্ত তাদের সঙ্গে মিশবে না। মেক্ ইট্ এ পয়েন্ট—তাদের সঙ্গে দেখা হলেও তাদের চিনতে পেরো না। কতকগুলো কথা আমরা ছোটবেলায় টেক্স্ট্-বুকে পড়েছিলাম। যেমন—জীবে দয়া। আত্মোৎসর্গ। কখনও মিথ্যা কথা বলিও না। সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। নিঃস্বার্থপরতা। অনেস্টি। এই ধরনের যত কথা শিখেছ সমস্ত ভুলে যাবে। এগুলো মিথ্যে। স্কুলে ওগুলো পড়তে হয় তাই পড়েছ। এগ্‌জামিনেশন পেপারে ওগুলোর দরকার হয়। লাইফে এদের কোনও ইউটিলিটি নেই। তুমি আর রাস্তার অর্ডিনারি লোক যদি একই ড্রেস পরো, একই সঙ্গে এক রাস্তায় হাঁটো তা হলে তারা তোমায় ভয়-ভক্তি করবে কেন? তোমাকে মানবে কেন? সেই জন্যেই তো ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে তিনটে ক্লাস আছে, ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড। এই দেখ না, আজ যদি প্লেনের ভাড়া সস্তা করে দেয় তো আমিই প্রথম আপত্তি করবো। দেখ না, আমার বাড়িতেও রেডিও আছে, আবার আমার ফার্মের একটা ক্লার্কের বাড়িতেও রেডিও সেট আছে। দিস্ ইজ রং। এটা অন্যায়। তা হলে আর আমার সঙ্গে তার তফাৎ রইল কোথায়? আমার মতে রেডিও সেট্ এত সস্তা করা উচিত হয় নি। রেডিওগ্রামও যেদিন এমনি সস্তা করে দেবে, রেফ্রিজারেটারও যেদিন সস্তা করে দেবে, সেদিন আমিই প্রথম আপত্তি করবো। এ হয় না, এ হতে পারে না। রাশিয়া এ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছিল।

করে ফেল করেছে। তাই এখন সব বদলে ফেলে আমেরিকাকে ফলো করছে। দু'দিন পরে দেখবে আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনই সাকসেস্‌ফুল হয়েছে। দেখবে সমস্ত ওয়ার্ল্ড আমেরিকানাইজড্‌ হয়ে উঠেছে। অ্যাণ্ড আই ওয়ান্ট ইট্‌।

দু' হাজার টাকা। টু-থাউজ্যাণ্ড রুপীজ। মাসে দু-হাজার টাকা দিয়ে মিস্টার বোস সদাব্রতকে কিনে নিয়েছেন। শুধু দু-হাজার টাকাই নয়, মিস্‌ মনিলা বোসকেও দিয়েছেন। মিস্‌ মনিলা বোসের কুকুর পেগীকেও দিয়েছেন। সাচ্‌ এ নাইস ডগ! এতখানি স্বার্থত্যাগ করেছেন শুধু একজন ভালো জামাই পাবার জন্যে!

প্রথম দিনই জিজ্ঞেস করেছিলেন মিস্টার বোস—কেমন দেখলে মনিলা, তোমার ফিউচার হাজব্যাণ্ডকে?

—ও, মিস্টার গুপ্ত?

—ডিড্‌ ইউ লাইক্‌ হিম? তোমার পছন্দ হয়েছে?

অন্ধকার নির্জন রাস্তা দিয়ে মিস্টার বোসের গাড়ি চলেছে। শিখ ড্রাইভার। মিস্টার বোস বেশি খান নি। তিন পেগ খেয়েই বয়কে বলেছিলেন—বাস্‌, খতম! মনিলাও দু' পেগ রাম্‌ খেয়েছিল। কোনও অশান্তি নেই দু'জনের মনে। দু'জনেই হ্যাপি আজ।

মনিলা মাথার খোঁপাটা ঠিক করে নিয়ে বললে—আমি পছন্দ করলে তো চলবে না বাবা—

—কেন? তোমার লাইফের পার্টনার, তুমি পছন্দ করবে না তো কে পছন্দ করবে? আমি তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে চাই না—আমরা তো আর স্টোন-এজ-এ বাস করছি না—তুমি ফ্র্যাঙ্কলি বলো—আমি তাকে রিজেক্ট্‌ করবো! কী নিয়ে কথা হলো তোমাদের আজ?

মনিলা বললে—সাইকোলজি—

—সাইকোলজি? ভেরি গুড্‌ সাবজেক্ট্‌! বি-এ তে আমার সাইকোলজি ছিল, ভেরি ইণ্টারেস্টিং সাব্‌জেক্ট! সদাব্রত কি সাইকোলজি জানে নাকি?

—না, ডগ্‌-সাইকোলজি! আমি পেগীর কথা বলছিলুম।

মিস্টার বোস বললেন—আই সী! তা সিনেমা নিয়ে কথা বললে না কেন? তুমি তো ও-সাব্‌জেক্টে অথরিটি—সদাব্রত কি সিনেমা দেখে? লেটেস্ট ফিল্মস্‌ দেখেছে?

—তা জিজ্ঞেস করি নি, কালই ওই সাবজেক্টটা তুলবো।

—হ্যাঁ তুলো। একসঙ্গে সারা জীবন কাটাতে হবে তোমাদের, দু'জনের টেস্ট্ একরকম হওয়া চাই, তা না হলে ম্যারেড্ লাইফে হার্মনি থাকবে না। দেখছো না তোমার মার সঙ্গে আমার কিছু মতে মেলে না—

মনিলা বললে—সে তো জানি বাবা, তাই তো তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়, আই রিয়্যালি ফীল সরি ফর ইউ—

মিস্টার বোসের মাঝে মাঝে এই-রকম আত্মগ্লানি হয়। নিজে যা ভুগেছেন, মেয়েকে যেন তা ভুগতে না হয়। সমস্ত পৃথিবীতে যুদ্ধ জয় করে নিজের বাড়িতে এসে যেন তিনি হেরে গেছেন।

গাড়ি চলেছে গড়িয়ে-গড়িয়ে। তিনি বললেন—এই দেখ না, তুমি সেদিন টার্ফ ক্লাবে গিয়েছিলে তো?

—গিয়েছিলুম তো। তোমার কথামত আমি 'লেডী ডায়না' উইন্ ধরে তিন শো টাকা খেলেছিলুম—

মিস্টার বোস বললেন—তোমাকে বলেছিলুম 'লেডী ডায়না' ধরতে, তুমি ধরেছিলে। পনেরো হাজার টাকাও পেয়ে গেলে! আর তোমার মাকেও ওই একই কথা বলেছিলুম—তোমার মা কি খেললে জানো?

মনিলা বললে—মা খেলেছিল 'ব্ল্যাক প্রিন্স'—

মিস্টার বোস বললেন—ড্যাম্ লস! 'ব্ল্যাক প্রিন্স' কখনও ক্যালকাটা টার্ফে জিততে পারে? 'ব্ল্যাক প্রিন্স'-এর সাধ্যি কি ক্যালকাটার এই সফট্ টার্ফে বাজি জিতবে? আমি অত করে বললুম তবু তোমার মা শুনলে না—

—তুমি কী খেলেছিলে বাবা?

মিস্টার বোস বললেন—আমি ট্রিপল্ খেলেছিলুম, তাই মেলে নি। কিন্তু আমার ক্যালকুলেশন তো মিথ্যে হয় নি। আমার ঘোড়ায় উইন্ খেললে তোমার মা-ও আজ পনেরো হাজার টাকা পেয়ে যেত—

তার পর যেন বিরক্ত হয়ে বললেন—থাক্ গে মনিলা, এ-সব কথা থাক,... এখন সদাব্রতকে তোমার পছন্দ হয়েছে কি-না তাই বলো, তোমার পছন্দ হলে আই ক্যান্ প্রোসীড ফারদার—

—কিন্তু আমি কী করে ফাইন্যাল কথা দিই বলো? পেগী যদি মিস্টার গুপ্তকে ডিস্‌লাইক্ করে—

—তা পেগীর লাইকিং-ডিস্‌লাইকিং-এ কী এসে যায়?

মনিলা বললে—বা রে, পেগী যদি রাগ করে, তখন? পেগী যদি মিস্টার গুপ্তকে আমার বেতে না শুতে দেয়, তখন? এমনিতেই দেখ না, কোনও ইয়াং ম্যান্ আমার সঙ্গে কথা বলুক এটাই পেগী পছন্দ করে না—মিস্টার জয়সোয়ালের ওপর পেগীর কী-রকম রাগ দেখনি? রেগে আমার সঙ্গে কথাই বলে না যে—

এলগিন রোড এসে গিয়েছিল।

মনিলার গাড়িটা ঢুকতেই পেগী দৌড়তে দৌড়তে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো মনিলার বুকের ওপর। আঁচড়ে কামড়ে যেন মনিলাকে খেয়ে শেষ করে দেবে, এত আনন্দ! মনিলা পেগীকে ছুই হাতে জড়িয়ে মুখময় চুমু খেতে লাগলো। ও মাই ডার্লিং, ও মাই…

কালীঘাটের নতুন পাড়াটাও পুরোনো হতে চললো। এখন আর এ-পাড়ায় কেউ কুন্তি গুহকে দেখে ভুরু কুঁচকোয় না। দিনে-ছুপুরেই দামী শাড়ি-ব্লাউজ পরে বেড়ালে আর কেউ তেমন নজর দেয় না। এরা জানে। এই পাড়ায় ছেলেরা সবই জানে। কুন্তি গুহ এদের পাড়ারই গর্ব। স্কুলে-কলেজে এ-পাড়ার ছেলেরা গল্প করে। বলে—জানিস্ আমাদের পাড়াতেও একজন আর্টিস্ট্ থাকে—

—কী নাম রে তার?

এরা বলে—কুন্তি গুহ—

নামটা তত পপুলার নয়। এমন নাম নয় যে উচ্চারণ করলেই লোকে চমকে উঠবে। কাগজে-কাগজে ছবিও ছাপা হয় না কুন্তি গুহর। ট্রামে-বাসে চড়লেও আশে-পাশে ভিড় জমে যায় না। তবু মেয়ে তো! মেয়ে-আর্টিস্ট্ তো! আর এমন মেয়ে যার বয়েসটা কুড়ি-বাইশের মধ্যে। যার মাথার ওপর কোনও পুরুষ-গার্জেন নেই। একেবারে বেওয়ারিশ।

—আর কে আছে তার?

—আর একটা মাত্তর বোন আছে, সে ইস্কুলে পড়ে। ছু'জনেরই বিয়ে হয় নি—

এই ছু'জনকে নিয়ে অনেক তর্ক-আলোচনা চলে পাড়ার উঠ্‌তি-ছেলেদের

রকের আড্ডায়। প্রথম প্রথম কুন্তিকে যেতে-আসতে দেখলে রকের ছেলেরা একটু-একটু আড়চোখে চেয়ে দেখতো। দু-একজন দূর থেকে শিস দিয়েছিল। কিন্তু এমন ধমক দিয়েছিল কুন্তি যে আর কোনও দিন কোনও রকম ইয়ার্কি দিতে সাহস করে নি তারা।

কুন্তি একেবারে সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল—কে শিস দিলে? কে শিস দিলে বলুন?

যারা বসে ছিল সেখানে, তারা সবাই তো হতভম্ব।

—আপনাদের মা-বোন নেই? মা-বোনের দিকে চেয়ে শিস দিতে পারেন না?

তার পর চলে আসবার সময় শাসিয়ে এসেছিল—ফের যদি কখনও শিস দিতে শুনি তো থানায় গিয়ে আমি খবর দেবো, এই বলে রাখছি—

বোধ হয় কুন্তি গুহর চেহারার মধ্যে কোথায় একটা কী ছিল, যার জন্যে আর ঘাঁটাতে সাহস করে নি কেউ। নিরুপদ্রব দিন কাটছিল কুন্তি গুহর। নতুন পাড়ায় এসে যতখানি জানাজানি হবে আশা করেছিল, তা-ও হয় নি। আশে-পাশের বাড়ির বউ-ঝি'রা সময় পেলেই আসতো। তারা সকলে রান্না করে, স্বামীদের খাইয়ে-দাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে দেয়। আর এক বছর কি দু' বছর অন্তর ছেলে-মেয়ের জন্ম দেয়। তারা হিংসে করে।

বলে—তুমি বেশ আছো ভাই—

তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাজ-গোজ দেখে। কেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শাড়ি পরে। কেমন চমৎকার চুল বাঁধে, কেমন জুতো পায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়। কারোর পরোয়া করে না। নিজেই টাকা উপায় করে, নিজেই খরচ করে। কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না তাদের মত। একটা টাকার এদিক-ওদিক হলে বরেরা হিসেব চায়।

তাই কুন্তি গুহকে বলে—সত্যি ভাই তুমি বেশ আছো—মরে গেলেও কখ্খনো বিয়ে কোর না ভাই—

এক-একজন জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা থিয়েটার করে তুমি কত টাকা পাও ভাই?

শুধু কি তাই? কেউ আবার থিয়েটারের টিকিট চায়। বিনা-পয়সায় থিয়েটার দেখবার কার্ড। নিমন্ত্রণপত্র। কেউ কেউ আবার থিয়েটারের পার্ট চায়। কুন্তির মতই থিয়েটার করে টাকা উপায় করতে চায়।

বলে—আমাকে একবার থিয়েটারে নামিয়ে দাও না ভাই তুমি—

কুন্তি বলে—না না বৌদি, আপনার বিয়ে হয়ে গেছে, আপনি ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিব্যি সংসারধর্ম করছেন, আপনি কেন এই সব ঝামেলার মধ্যে আসবেন—

—ওমা, ঝামেলা আবার কী? তোমার তো কোনও ঝামেলা দেখছি না—তুমি তো বেশ খাচ্ছ-দাচ্ছ থিয়েটার করে বেড়াচ্ছ!

কুন্তি বলে—বাইরে থেকে তো তাই-ই সকলকে মনে হয় বৌদি, আমিও তো দেখি আপনি বেশ আছেন, দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন আর ঘুমোচ্ছেন, কোত্থেকে টাকা আসছে তার খবরও রাখতে হচ্ছে না আপনাকে—

বৌদি হেসে বলে—তা তো হচ্ছে না জানি, কিন্তু যে ভাত দিচ্ছে সে বুঝি সুদে-আসলে উসুল করে নিচ্ছে না মনে করো?

কুন্তি বুঝতে পারলে না। বললে—তার মানে?

বৌদি বলে—তার মানে এখন বুঝতে পারবে না ভাই, বিয়ে হলে তখন বুঝতে পারতে—

কথাটা বলে বৌদি এক-রকম বিচিত্র হাসি হাসে। যারা বিয়ে-হওয়া মেয়ে তারাও হাসে। কুন্তি বুঝতে পারে না। অনেকদিন কুন্তি ভেবেছে ওদের মতন একটা সংসার হলে হয়ত সে সুখীই হতো। সে-ও ওদের মতো রান্না-বান্না করতো, সন্তানের জন্ম দিতো আর ওদের মতোই এ-বাড়ি ও-বাড়ি গল্প করে বেড়াতো দুপুরবেলা। এর চেয়ে সেই-ই ভালো হতো।

বুড়ি আবার স্কুলে ঢুকেছিল। রান্না-বান্না সেরে তালা চাবি দিয়ে জ্যাঠাই-মার কাছে চাবিটা রেখে যায় কুন্তি। ভাত ঢাকা থাকে ঘরে। বুড়ি বাড়িতে এসে চাবি খুলে সেই ভাত খেয়ে সংসারের কাজ-কর্ম করে। তার পর পড়তে বসে।

জ্যাঠাইমা বলে—আজও রাত্তির হবে নাকি মা ফিরতে?

—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, আজও রাত হবে ফিরতে, আপনি একটু নজর রাখবেন বুড়ির দিকে। আমার ঘরে ভাত ঢাকা রইল, খেতে বলবেন, দেখবেন একটু যেন কারো সঙ্গে গল্প না করে, সামনে এগ্‌জামিন আসছে তো—

প্রতিদিনই এমনি করে জ্যাঠাইমাকে দেখতে বলে দিয়ে যায় কুন্তি। প্রতিদিনই স্কুল থেকে বাড়িতে এসে বুড়ি পড়তে বসে। সন্ধ্যেবেলা পড়াবার জন্যে মাস্টারনী রেখে দিয়েছে। সে-ই পড়ায়।

জ্যাঠাইমা বলে—ধন্যি মেয়ে তুমি মা, আমার পুঁটিকে তাই বলি। বলি তোর কুন্তিদিকে একবার ছাখ বাছা, একটু দেখেও শেখ্। কী কষ্ট করে মায়ের পেটের বোনকে মানুষ করছে, নিজের মায়ের পেটের ভাইও এমন করে না।

কুন্তি বলে—সাধ করে কি করি জ্যাঠাইমা, মরে মরেই করি—কদ্দিন পারবো জানি না, যদ্দিন পারছি করছি, এর পর বুড়ির কপাল—

—তুমি মা অসাধ্য-সাধন করছো, পাড়ার লোকের কারো জানতে তো আর বাকি নেই, সবাই জানে—একেবাক্যে তোমার সুখ্যাতি করে!

—তা দেখুন, আপনার আশীর্বাদে জ্যাঠাইমা—বুড়িটা যদি মানুষ হয় তো আমার খাটুনি বৃথা যায় নি মনে করবো—

—খুব মানুষ হবে, তুমি যে-করে বোনকে বাঁচালে তা তো সবাই দেখেছে। দিন নেই রাত নেই—কী সেবাটা করলে—আর কী টাকাটাই না খরচ করলে—সব তো আমি দেখলুম—

তার পর কুন্তির দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে জ্যাঠাইমা বললে—আচ্ছা, তোমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তুমি এসো মা—তোমার কিছ্ছু ভয় নেই, আমি বুড়িকে দেখবো—

ব্যাগটা হাতে নিয়ে কুন্তি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। এত সকাল-সকাল বেরোবার কোনও দরকার ছিল না। তবু ভাল লাগে না বাড়িতে থাকতে। ছোটবেলা থেকে রাস্তায় বেরিয়ে বেরিয়ে কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন আর না-বেরোলে খারাপ লাগে। না-বেরোলে মনে হয় সে হেরে গেছে। মনে হয় কলকাতা শহর যেন তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। সে দৌড়ে নাগাল পাচ্ছে না তার। রাস্তার হিন্দুস্থানীটার দোকানের সামনে গিয়ে একটা পান কিনে নিলে কুন্তি। সামনেই আয়নাটা ঝুলছে। নিজের মুখের ছায়াটা পড়লো তাতে। খানিকক্ষণ দেখেই ব্যাগ থেকে পয়সা বার করলে। পানেরও দাম বাড়ছে।

কুন্তি বললে—চুন দাও, আর সুপুরি—

চেনা দোকানদার। এক-টাকার নোটটা ভালো করে দেখতে লাগলো। অচল নাকি?

দোকানী নোটটা হাত বাড়িয়ে ফেরত দিয়ে বললে—এটা বদ্‌লে দিন দিদি—এটা খারাপ—

—খারাপ মানে ?

নোটটা নিয়ে ভালো করে দেখেও কিছু বুঝতে পারলে না। তার পর অনেকক্ষণ দেখার পর বোঝা গেল সত্যিই অচল। কী আশ্চর্য! তাকেও ঠকিয়েছে ? কে ঠকালো ? কুন্তির মনে হলো যেন সমস্ত কলকাতাটা তাকে ঠকাবার জন্যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল এতদিন! এতদিন ধরে ষড়যন্ত্র করে করে যেন আজ তাকে পেয়েছে। একটা টাকা! কত সামান্য একটা টাকা। সেই একটা টাকা যেন এক লক্ষ টাকা হয়ে তার সামনে হাঁ করে রইল। জলে আঁকা ত্রি-সিংহমূর্তি যেন হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে তাকে কামড়াতে এলো।

প্রথমেই বাধা পড়তে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল কুন্তির। সেই অক্ল্যাণ্ড হাউসের বড়বাবুর সঙ্গে প্রথম যেদিন বাইরে বেরোতে শুরু করেছিল সে, সেইদিন থেকেই ঠিক করেছিল এই পৃথিবীর কাছে সে হারবে না। তার রূপ তার যৌবনের ন্যায্য দাম সে পৃথিবীর কাছ থেকে আদায় করে তবে ছাড়বে। তবে ? তবে কেন সে ঠকলো ? কে তাকে ঠকালো ?

সামনের বাস থেকে অনেক-জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে ছিল। তার মধ্যে এক-জোড়া চোখ যেন তাকে গিলছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার যেন গিলে খাচ্ছে লোকটা। ও-সব লোককে কেমন করে কুপোকাৎ করতে হয় সে আর্ট কুন্তি জানে।

একটু ইঙ্গিত করতেই লোকটা টপ্ করে বাস থেকে নেমে পড়েছে। আর নেমে সোজা এসে পানের দোকানে পান কিনতে লাগলো। লোকটা হয়ত যাচ্ছিল কোর্টে, মোকদ্দমা আছে। আজকেই হয়ত মামলার শুনানি। কিংবা হাসপাতালে নিজের বউকে দেখতে যাচ্ছে। মরো-মরো অসুখ। এ-ধরনের লোকদের কাজ অনেকবার পণ্ড করে দিয়েছে কুন্তি। কাজ-কর্ম তাদের শিকেয় উঠিয়ে ছেড়েছে।

লোকটা পান নিচ্ছিল হাত বাড়িয়ে।

কুন্তি বললে—আচ্ছা দেখুন তো, এ নোটটা কি অচল ? দোকানদার বলছে চলবে না—

লোকটা বোধ হয় কথা বলবার সুযোগই খুঁজছিল।

বললে—দেখি, দেখি—কই—

নোটটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার দেখে লোকটা বললে—না,

এ নোট তো ঠিক আছে। কে আপনাকে বললে অচল? এ যদি অচল হয় তো ইণ্ডিয়া-গভর্মেণ্টই অচল—

কুন্তি বললে—এই দেখুন না, দোকানদার বলছে নেবে না—

—নেবে না মানে? আলবৎ নেবে। কী হে, এ নোটটার কী খারাপ শুনি? মিছিমিছি ভদ্রমহিলাকে বিপদে ফেলতে চাও তোমরা? নেবে না বললেই হলো?

দোকানদার পুরোনো ব্যবসাদার। বললে—না বাবু, ও-নোট জাল আছে—

—জাল আছে মানে? জাল বললেই জাল? তুমি জাল বললেই আমি মেনে নেবো? জানো, আমি ব্যাঙ্কে চাকরি করি? আমাকে নোট চেনাচ্ছ তুমি? তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারি, তা জানো?

রীতিমত ঝগড়া বেধে গেল। গোলমাল শুনে আরো দু-একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল আশে-পাশে।

ভদ্রলোক বললে—ঠিক আছে, এটা আমার কাছে থাক, আপনি আর একটা নোট নিন—

বলে নিজের পকেট থেকে আর একটা ভালো এক-টাকার নোট বার করে কুন্তির হাতে দিলে।

বললে—এই সমস্ত দোকানদারদের গা-জুয়ারী দেখে আমার আক্কেল হয়ে গেছে জানেন, আমি অনেকবার ঠকেছি এ-বেটাদের কাছে, এবার একটা হেস্ত-নেস্ত করে তবে ছাড়বো। তোম এ-নোট লেগা কি নেই লেগা, বাতাও—

কিন্তু ততক্ষণে ওদিকে আর একটা বাস এসে গেছে। কুন্তি আর দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি নোটটা ব্যাগের মধ্যে পুরে বাসে উঠতেই বাসটা ছেড়ে দিলে। আর কোথায় রইল সেই পানের দোকান আর কোথায় রইল সেই লোকটা! বাসটা তখন হু-হু করে কলকাতার বুক মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

সকাল বেলাটা মিস্টার বোসের সেক্রেটারি আসে দু' ঘণ্টার জন্যে। পৃথিবীর সমস্ত খবর তাঁকে পড়িয়ে শোনাতে হয়। বিজনেস্‌ম্যানদের বিজনেস্ করতে হলে আজকাল ওয়ার্লড্-পলিটিক্‌স্ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। ইণ্ডিয়া শুধু ইণ্ডিয়ার ভাগ্যবিধাতা নয়। ভারত-ভাগ্যবিধাতা আজ ওয়াল-স্ট্রীট।

সেখান থেকে শেয়ার-মার্কেটের হাল-চালের খবর রাখাটাও বিজনেস্‌ম্যানদের পক্ষে দরকারী। একটা কিছু খবর পাবার সঙ্গে-সঙ্গে বম্বেতে ট্রাঙ্ক-কল্ করতে হয়। মিস্টার বোসের উকীল-অ্যাডভোকেট-অ্যাটর্নী সবাই সামনে টেলিফোন নিয়ে বসে থাকে। তারই মধ্যে আছে নিজের পার্সোন্যাল ব্যাপার। আছে রেস, আছে ক্লাব, আছে মিসেস, আছে মনিলা।

বাড়ির ভেতর থেকেই অনেক সময় মনিলা টেলিফোন করে।

—বাবা, দেখ না, পেগী ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে না!

—তা তুমি অত আদর দিচ্ছ কেন ওকে?

তার পর বললেন—তোমার মা কোথায়? ঘুম থেকে উঠেছে?

—মা টয়লেট করছে।

—এখনও টয়লেট? ব্রেকফাস্ট হয় নি? এত দেরি করে ব্রেকফাস্ট খেলে শরীর খারাপ হবে না?

মনিলা বললে—সে আমি বলতে পারবো না, তুমি এসে বলে যাও—

মিস্টার বোস নিজে ভোরবেলা ওঠেন। নিজের অফিস-ঘরেই নানান কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন। টেলিফোন আসে, লোকজন আসে, সেক্রেটারি আসে। কিন্তু অনেকখানি মন পড়ে থাকে বাড়ির ভেতর। মিসেস টয়লেটে গেছে কিনা, মনিলা ঘুম থেকে উঠলো কিনা সব তাঁকেই ভাবতে হয়। খবরের কাগজ শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যান। তার পর আবার সেক্রেটারির দিকে চেয়ে বলেন—তার পর?

সেক্রেটারি আবার খবরের কাগজ পড়তে শুরু করে দেয়।

ক্রেমলিনে লেকচার দিয়েছে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি নিকিতা এস. ক্রুশ্চেভ—'Stalin was a great Marxist. I grew up under Stalin. Stalin made mistakes but we should share responsibility for those mistakes because we were associated with him. We take pride at having fought at Stalin's side against class enemies. The Imperialists call us Stalinists. Well, when it comes to fighting imperialism we are all Stalinists.'

মিস্টার বোস এই পর্যন্ত শুনেই বললেন—থামুন—

তার পর টেলিফোন-রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে লাগলেন—হ্যালো

—মিস্টার গুপ্ত আছেন?

ওপারে হিমাংশুবাবু টেলিফোন ধরেছিলেন। বললেন—মিস্টার গুপ্ত তো এখনও ফেরেন নি।

—সে কি? ইন্দোর থেকে এখনও ফেরেন নি?

শিবপ্রসাদ গুপ্ত ইন্দোরে গিয়েছিলেন। এ-আই-সি-সি'র বিশেষ নেমন্তন্ন পেয়ে। পণ্ডিত নেহরু আমেরিকা থেকে ফিরে কংগ্রেসের মেম্বারদের ডেকেছেন ইন্দোরে। শিবপ্রসাদ গুপ্তকেও ডেকেছিলেন। এত দিন তো চলে আসবার কথা! ইজিপ্ট থেকে অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ আর্মি চলে যাবার পর মিডল ইস্টের অবস্থাটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সোভিয়েট রাশিয়া না আমেরিকা কে ওখানে রাজত্ব করবে? ডলার না রুবল?

মিস্টার বোস টেলিফোনটা রেখে দিয়ে বললেন—পড়ুন, আপনি পড়ুন—ইন্দোরের কোনও খবর আছে?

সেক্রেটারি বললে—আছে স্যার—এই যে—

বলে পড়তে লাগলো—নেহরু বলেছেন—If there is a power vacuum in West Asia it has to be filled by a country in that region. Events in Egypt and Hungary had shown that neither colonial aggression nor communist aggression were easy anymore···

মিস্টার বোস হঠাৎ বাধা দিলেন—দাঁড়ান—

বলে উঠলেন। মনে পড়ে গেল বাড়ির ভেতরের কথা। মিসেসের কথা। মেজর সিনহা অত করে বলে গেছে ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠতে হবে, ঠিক সময়ে টয়লেট করতে হবে, ঠিক সময়ে ব্রেকফাস্ট করতে হবে।

কোরিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেকেণ্ড ফ্লোরে মিসেস বোসের বেড-রুমের সঙ্গে লাগোয়া টয়লেট। ভেতরে জলের শব্দ হচ্ছে।

বাইরে গিয়ে ডাকলেন—কই, বেবি—

মিসেস বোসের ডাকনাম বেবি।

—কই, বেবি—তুমি এত দেরি করছো কেন? জানো ক'টা বেজেছে!

টয়লেটের ভেতরে বেবি ছিল, তার আয়াও ছিল।

মিস্টার বোস বললেন—আর কত দেরি তোমার?

বাথরুমের দরজাটা খুলে দিলে আয়া। খুলে বাইরে চলে গেল।

মিস্টার বোস ভেতরে গিয়ে দেখলেন মিসেস বোস টবের মধ্যে এক-গলা জলে শরীর ডুবিয়ে বই পড়ছেন।

—একি, তুমি এত দেরি করে ঘুম থেকে উঠে আবার এখন ও কী পড়ছো ?

ভেতরে অন্ধকার বলে প্রথমে দেখতে পান নি মিস্টার বোস। এতক্ষণে দেখতে পেলেন। একমনে বেবি হ্যাণ্ডিক্যাপ পড়ছে। রেসের হ্যাণ্ডিক্যাপ বই !

—একি, তুমি হ্যাণ্ডিক্যাপ পড়ছো নাকি এখানে ?

মিসেস বোস যেন বিরক্ত হলেন মনে মনে। বললেন—তুমি আবার এখানে এলে কেন ? দেখছো আমি ভাবছি—

—ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই তো ভাবলে পারো ? এখন কেন ?

মিসেস বোস বই পড়তে পড়তেই বললেন—দেখ, তুমি আমাকে 'ব্ল্যাক প্রিন্স' খেলতে বারণ করেছিলে, কিন্তু সেই 'ব্ল্যাক প্রিন্স' ম্যাড্রাসে একবার আপসেট করেছিল—নাইনটিন্ ফিফটিতে—

মিস্টার বোসের রাগ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকাশ করলেন না। বললেন—কিন্তু আপসেট নিতে তোমার অত দরকার কি ? 'ব্ল্যাক প্রিন্স'ই যদি খেলবে তো প্লেস খেললে না কেন ?

বলে আর সেখানে দাঁড়ালেন না মিস্টার বোস। সোজা ফার্স্ট ফ্লোরে নেমে এসে কোরিডোর পেরিয়ে নিজের ড্রয়িং-রুমে আবার ঢুকলেন।

সেক্রেটারি চুপ করে বসে ছিল। মিস্টার বোস চুরোট ধরিয়ে বললেন—পড়ুন, আপনি পড়ুন, এডিটোরিয়াল্‌টা পড়ুন—

সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের টিফিন-রুমে সেদিনও রিহার্সাল বসেছে। শ্যামলী চক্রবর্তী অনেকক্ষণ এসে বসে আছে। বন্দনাও এসেছে। ফাউণ্ডার্স ডে'র ফাংশান যত এগিয়ে আসছে ততই উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছে স্টাফের। চারদিকে দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ফ্রেমে আঁটা বাণী লেখা টাঙানো রয়েছে—'WASTE NOT WANT NOT', 'TIME IS MONEY' এমনি আরো সব মূল্যবান বাণী স্টাফের চোখের সামনে সব সময়ে ঝোলে। যাতে কেউ ফাঁকি না দেয়, কেউ কাজে অবহেলা না করে।

হঠাৎ কুন্তি গুহ ঘরে ঢুকলো।

সেক্রেটারি বলে উঠলেন—একি, এত দেরি আপনার ?

কুন্তি গুহ হাতের ব্যাগটা রেখে বসলো। বললে—আপনারা মশাই বড় বিপদে ফেলেছিলেন আমাকে—

—কেন ? কী বিপদ ?

কুন্তি বললে—কাল তিরিশটা টাকা দিলেন আমাকে, আমি ভাল করে দেখে নিই নি, আজ দেখি তার মধ্যে একটা টাকা অচল—

—তাই নাকি ? কই দেখি টাকাটা ?

কুন্তি বললে—সেই একটা টাকা সম্বল করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম, বাসে উঠে টিকিটের জন্যে টাকাটা দিতেই মুশ্‌কিলে পড়লুম, কণ্ডাক্টার বললে—এ-টাকা চলবে না। শেষে আবার বাড়িতে গিয়ে সেটার বদলে অন্য টাকা নিয়ে আসি। আমাদের দেখে-শুনে টাকা দিতে হয় তো ? আমরা আপনাদের বিশ্বাস করে টাকা নিই বলে আপনারা এইরকম ঠকাবেন ?

সত্যিই লজ্জায় পড়লো সেক্রেটারি ভদ্রলোক। পকেট থেকে ব্যাগ বার করে একটা টাকা নিয়ে বললে—এই নিন, আমরা তো দেখে-শুনেই দিই, তবে হয়ত কোন্ ফাঁকে চলে গেছে—ছি ছি—

টাকাটা নিয়ে কুন্তি গুহ ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেললে। তার পর মিষ্টি করে হাসলো। বললে—তা তো বটেই, আপনারা কি আর ইচ্ছে করে আমাকে ঠকিয়েছেন ? তা তো বলি নি—

এমনি করেই প্রতিদিন এ-কলকাতার ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে জেগে উঠেও এ-কলকাতা ঘুমিয়ে থাকে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজের মুখরোচক উপদেশ পড়ে। আরো কম খাবার উপদেশ, আরো বেশি পরিশ্রম করবার উপদেশ, আরো সঞ্চয় করবার উপদেশ। এই উপদেশ দিয়েই শুরু হয় এখানকার দিন, কিন্তু রাত শুরু হয় পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে, হোটেলের নাচে আর ক্লাবের রাম্ জিন্ হুইস্কিতে। কেউ একে বলে—সিটি অব প্রোসেশন্‌স্, মিছিলের শহর। কেউ বলে—সিটি অব দি ডেড, মড়ার শহর। আবার কেউ কেউ বলে—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শহর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শহর, স্বামী বিবেকানন্দের শহর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শহর, সি-আর-দাশ, সুভাষ বোসের শহর।

যারই শহর হোক, ১৯৪৭-এর পর থেকেই এখানকার মানুষ ইজিপ্টের মমি

হয়ে গেছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ার এ-মমিরা কবরের তলায় চুপ করে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে না। এরা হেঁটে বেড়ায়, গাড়ি চড়ে, ভাত খায়, পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে যায়, ক্লাবের মেম্বর হয়, রেস খেলে! এরাই আবার ট্রাম পোড়ায়, মীটিং করে, খদ্দর পরে, কম্যিউনিজম্ করে।

মৃত্যু এখানে সস্তা বলেই জীবন এখানে এত মূল্যহীন। দারিদ্র্য এখানে নির্লজ্জ বলেই অর্থ এখানে এত দৃষ্টিকটু। প্রেম এখানে পণ্য বলেই ঘৃণা এখানে এত তুচ্ছ। পাপ এখানে প্রচুর বলেই পুণ্য এখানে এত সুলভ। এ শুধু কুন্তি গুহর ইতিহাস নয়, বিনয় শম্ভু মন্মথ সদাব্রতর ইতিহাস নয়, কেদারবাবু শৈল মিস্টার বোস আর মিস মনিলা বোসেরও ইতিহাস নয়। এ একক দশক শতকের ইতিহাস।

বাগবাজারে গলির মধ্যে যখন কেদারবাবু রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেন, তখন মিস্টার বোসের ক্লাবের ভেতরে হুল্লোড়ের মধ্যে তাস খেলার রাবার হয়। সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে বুড়ি যখন স্কুলে যায়, স্কুল তখন ছুটি হয়ে যায় মিনিস্টারের মৃত্যুর জন্যে।

প্রথমে কুন্তি সন্দেহ করে নি। নিয়ম করে স্কুলের মাইনে দিয়েছে। ফ্রক্ ছেড়ে শাড়ি ধরিয়েছে বুড়িকে। যে-দিদিমণি পড়াতে আসতো তাকে জেরা করেছে। চল্লিশ টাকা করে মাইনে দিয়েছে কুন্তি সেই দিদিমণিকে।

কুন্তি জিজ্ঞেস করতো—বুড়ির লেখাপড়া কেমন হচ্ছে?

দিদিমণি বলতো—খুব ভাল মেয়ে আপনার বোন, পাস ঠিক করবে, দেখবেন—

জ্যাঠাইমাকেও বলে যেতো বাড়ি থেকে বেরোবার সময়। যেন ঠিক সময়ে পড়তে বসে বুড়ি, যেন কারো সঙ্গে গল্প না করে। সে-ও তো একদিন ফ্রক্ ছেড়ে শাড়ি পরেছিল। সেও তো একদিন ওই বয়সেই অক্ল্যাণ্ড প্রেসের অফিসের বড়বাবুর হাতে গিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে বুড়ির দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চেয়ে দেখে কুন্তি। একটু-একটু করে বড় হচ্ছে সে। একটু-একটু করে তার গায়ে মাংস লাগছে। গোলগাল হয়ে উঠছে শরীরটা। বড় ভয় করে কুন্তির। বড় ভাবনা হয়। এই-ই তো বয়েস। এই-ই তো ভয়ের বয়েস। এই বয়েসেই তো সে প্রথম নিজে চারিদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই বয়েসেই তো পৃথিবীর আয়নায় নিজের চেহারাখানার স্পষ্ট ছায়া পড়তে দেখেছিল। এই বয়েসেই তো সে পুরুষের চোখে তার নিজের সর্বনাশ দেখতে পেয়েছিল। এই বয়েসেই তো কলকাতা তাকে লুফে নিয়েছিল।

—এ কি ? বাড়ি ফিরে এলি যে ! ছুটি হয়ে গেল ?

সকালবেলা এগারোটার সময় স্কুল বসে। বিকেল চারটের আগে আর বুড়ি বাড়ি আসতে পারে না। তখন ছুটি হয়। আজ হঠাৎ ছুটি হতেই কুন্তি অবাক হয়ে গেল।

—আজ আবার কে মরলো ?

—একজন মিনিস্টার মরে গেছে।

বুড়ি দিদির সামনে কথা বলতেও আজকাল ভয় পায়।

কুন্তি তৈরী হয়ে নিয়ে তখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল। হঠাৎ বুড়ির কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। মিনিস্টার মরলো তো তোদের ইস্কুল ছুটি হলো কেন ?

জ্যাঠাইমা তখন ভাত খেয়ে আঁচিয়ে সবে ঘরে ঢুকছে। কুন্তির বকুনি শুনে সেখান থেকেই বললে—তুমি আর ওকে অমন করে বোক না মা, এই সেদিন সবে ও হাসপাতাল থেকে এলো—

—এই দেখুন না জ্যাঠাইমা, ইস্কুলের হেড-মিস্ট্রেস যেমন হয়েছে হতচ্ছাড়া, তেমনি হয়েছে ইস্কুল। কথায়-কথায় ছুটি ! আজ দপ্তুরি মরলো তার ছুটি, কাল সেক্রেটারি মরল তার ছুটি, পরশু মিনিস্টার মরল তার ছুটি ! পোড়ারমুখোরা মরেছে বেশ হয়েছে, তা ইস্কুলের ছুটি দিলি কেন ? মাইনে নিস না মাসে মাসে ? গুনে গুনে মুখের রক্ত-ওঠা বারোটা টাকা যে মাসে মাসে মাইনে দিই তোদের, সে কি ছুটি দেবার জন্যে ?

জ্যাঠাইমা বললে—কে মরেছে ? কে ? কোথাকার ?

কুন্তি বললে—কোথাকার কোন্ চুলোর মন্ত্রী না কে !

—আহা গো, কত বয়েস হয়েছিল ?

কুন্তি সে-কথার উত্তর দিলে না। বুড়ির দিকে চেয়ে বললে—এখন ছুটি তো হলো, সারাদিন কী করবি শুনি ? খেলবি ? পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াবি তো ?

বুড়ি মাথা নিচু করে বললে—আমি পড়বো—

—পড়বে না ছাই, তোমার যদি অত পড়ার চাড় হতো তো আমার ভাবনা ? তুমি মানুষ হলে আমি দিন-রাত এই ভূতের মত খেটে-খেটে মরি ? না আমার খাটতেই এত ভালো লাগে !

তার পর হঠাৎ যেন মনে পড়লো। সায়াটা ছিঁড়ে গিয়েছিল অনেক দিন ধরে।

ছেঁড়া সায়াটা আল্‌না থেকে বার করে দিয়ে বললে—এইটে বসে বসে সেলাই কর্‌ দিকিনি—সংসারের একটা কাজই না-হয় কর্‌! আমি একলা খেটে খেটে মরবো আর তুমি কেবল খাবে? তোমার দ্বারা কি একটা কাজও হতে নেই আমার?—আর এই যে কাল রেশনের দোকান থেকে চাল এসেছে, সবই কাঁকর, সেগুলোও না-হয় বেছে রাখ্‌, আমি একলা কত দিক দেখবো বল্‌ তো?

জ্যাঠাইমা দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—এই তো সবে ও অসুখ থেকে উঠলো মা, এখন কি অত পারে? বয়েস হলে সব পারবে মা, কাঁধে জোয়াল পড়লে তখন আপনিই সব শিখবে, কাউকে শেখাতে হবে না···

এমনি করেই প্রতিদিন বোনকে পাখী-পড়ানো করে কুন্তি। এমনি করেই বলে বলে বুড়িকে মানুষ করে তুলতে চায়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক-একদিন তার ভাবতে ভাল লাগে যে বুড়ি আরো বড় হয়েছে, তার বিয়ে দিয়েছে। তার বর এসেছে। টোপর মাথায় দিয়ে, গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে শুভ-দৃষ্টি হচ্ছে। উলু দিচ্ছে মেয়েরা। শাঁখ বাজাচ্ছে। কলকাতার চারদিকের এত কুৎসিত-কদর্যতার মধ্যেও কুন্তির এই স্বপ্নটা দেখতে ভালো লাগে। বাসে ট্রামে যেতে যেতে ট্যাক্সির ভেতর নতুন কোনও বর দেখলেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার পর চোখের সামনে সেই দুপুরবেলার কলকাতা শহরই হয়ত কখন আবার রাতের কলকাতায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। সে-কলকাতায় তখন আর পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট থাকে না, থিয়েটারের ক্লাব থাকে না, হুইস্কি থাকে না, চপ-কাটলেট কিছু থাকে না। তখন শুধু চারদিকে শাঁখের আওয়াজ, চারদিকে উলুধ্বনি, চারদিকে সবাই চেঁচাচ্ছে—বর এসেছে—বর এসেছে—

যিনি সন্ধ্যেবেলা পড়াতে আসেন, তিনি রোজকার মত সেদিনও এলেন।

হাতে একটা ছাতা, পায়ে চটি। এ-পাড়া ও-পাড়া সব পাড়ায় পড়িয়ে দু-পয়সা রোজগার করতে হয় তাঁকে। সন্ধ্যেবেলা পড়াতে এলেই বুড়ি আলোটা জেলে দেয়। তার পর মেজের ওপর মাদুর পাতে একটা। বইগুলো পাড়ে। তার পর পড়তে বসে বুড়ি।

অন্য বাড়িতে পড়াতে গেলে ছাত্রীর মা-বাবা-পিসিমা, কেউ-না-কেউ আশে-পাশে থাকে। কেমন পড়ানো হচ্ছে তার খোঁজখবর রাখে। কিন্তু এ-বাড়ির ব্যাপার আলাদা। প্রথম দিন থেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোমার দিদি কোথায়? বাড়ি নেই?

বুড়ি বলেছিল—দিদি তো থিয়েটারে—

—রোজ-রোজ বুঝি থিয়েটার থাকে তাঁর?

—হ্যাঁ রোজ।

বি-এ পাস করা মহিলা। অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখে ভাই-বোনদের মানুষ করেছে, নিজের খরচ নিজে চালাচ্ছে। তার পর ইচ্ছে আছে একদিন ছোট একটা বাড়ি করবে কোথাও। কলকাতার কোনও কোণে। তার পর যদি কখনও সুযোগ হয় তো হয়ত বিয়েও করবে। কিন্তু তবু এখানে এসে এ-বাড়িটাকে দেখে কেমন যেন বড় কৌতূহল হয়। কত টাকা উপায় করে এর দিদি! সে বি-এ পাস করে যা উপায় করে তার চেয়েও কি বেশী? একশো, দুশো তিনশো? একদিন মাত্র দেখেছিল কুন্তি গুহকে। কিন্তু আর একবার যেন দেখতে ইচ্ছে করে। কেমন চমৎকার সুখে আছে এরা। এই থিয়েটার-করা মেয়েরা। সিনেমার কাগজে এদের ছবি দেখেছে। এদের অনেকের জীবনী পড়েছে। কত বৈচিত্র্য আছে এদের জীবনে। আর সে? খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে এই বোনটাকে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা যথারীতি এসেই ডাকলে—শান্তি—

শান্তি বলে ডাকলেই উঠোনের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দেয় ছাত্রী। কিন্তু আজ কেউ সাড়া দিলে না।

দিদিমণি আবার জোরে ডাকলে—শান্তি—

জ্যাঠাইমা শুনতে পেয়েছে।

—কে গা?

বুড়ো-মানুষ আস্তে আস্তে উঠোন পেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে।

—ওমা! তুমি? বুড়ি কোথায় গেল? বুড়ি নেই? এই তো দুপুরবেলা ঘরে বসে সেলাই করছিল দেখলুম। কোথায় গেল আবার? তা তুমি একটু বোস না মা, এই এখুনি বোধ হয় এসে পড়বে—

শুধু একটা বাড়িতে তো টিউশ্যানি নয় দিদিমণির। সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে সব সময়েই কাজ। বেশি বসলে লোকসান হয়।

দিদিমণি বলেন—তা হলে থাক, আজকে বোধ হয় কোথাও গেছে। কালকে আবার আমি আসবো—

কী আর বলবে জ্যাঠাইমা! কী-ই বা বলবার আছে! যাদের মেয়ে,

যাদের টাকা তারাই বুঝবে। তার পর হঠাৎ হয়ত যখন বাড়ি ফেরে শাস্তি, তখন দিদিমণি চলে গেছেন। তখন বেশ পান চিবোতে-চিবোতে এসে হাজির।

জ্যাঠাইমা জিজ্ঞেস করলে—কোথায় গিয়েছিলি রে বুড়ি! তোর মাস্টারনী এসে ফিরে গেল যে!

ফিরে যাবার জন্যে বুড়ি বিশেষ চিন্তিত নয়। চলে গেছে ভালোই হয়েছে। ছুটি পাওয়া গেছে। দিদির এতগুলো টাকা নষ্ট হচ্ছে, সেদিকে যেন তার খেয়ালই নেই। সেও দিদির মত যাদবপুর দেখেছে, বেহালা সখের বাজার দেখেছে, এখন আবার কালীঘাট দেখছে। যত বড় হচ্ছে ততই যেন চোখ খুলে যাচ্ছে তার। দেখছে—সব পাড়ার মানুষ এক। সব পুরুষ-মানুষের একই চোখ। সত্তর বছরের বুড়ো থেকে শুরু করে ষোল বছরের ছেলেরা পর্যন্ত তার কাছে একটি জিনিসই চায়। সে বুঝে গেছে যে, দিদির কথামত স্কুলে লেখাপড়া তার চলবে না। লেখাপড়া না-শিখেও মানুষ কলকাতা শহরে বড় হতে পারে। গাড়ি-বাড়ি সব কিছু পাওয়া যায়। ওদিকে শ্যামবাজার, মাঝখানে ধর্মতলা, আর দক্ষিণে বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জ পর্যন্ত সব জায়গা তার দেখা হয়ে গিয়েছে। সিনেমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে অনেক সময় নিজের পয়সায় টিকিট না-কিনলেও চলে। পয়সা না-থাকলেও রেস্টুরেণ্টে ঢুকে চা খেতে পাওয়া যায়। পয়সা না-থাকলেও বাসে চড়ে সারা কলকাতা ঘুরে আসা যায়। এই ছোট-বয়েসেই সেই আর্টটা সে শিখে নিয়েছে। কলকাতা শহরে তাদের বয়েসী মেয়েকে খুশী করবার মত পয়সাওয়ালা বড়লোকের অভাব নেই।

—জ্যাঠাইমা, তা হলে আমি একটু ঘুরে আসি, আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন—

—আবার কোথায় যাবি তুই?

—আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছি—

বলে আর দাঁড়ালো না। তখন কালীঘাটের বস্তিটা বিষ হয়ে উঠেছে বুড়ির চোখে। এই সব সন্ধ্যেগুলোতেই বুড়ির পিঠে যেন পাখা গজায়, তখন আর মনে থাকে না দিদির কথা। মনে থাকে না পড়ার কথা। মনে থাকে না এই ক'দিন আগেই বঁটি দিয়ে মাথায় মেরেছিল দিদি। মনে থাকে না এই ক'দিন আগেই দিদি তাকে হাসপাতালে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিল। তখন সমস্ত একাকার।

—টিকিট ? আপনার টিকিট ?

বাস তখন প্রায় ধর্মতলায় এসে গেছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি বললে—টালিগঞ্জ—

—টালিগঞ্জ, তা এ-বাসে কেন এলেন ? এ তো দু-নম্বর বাস, শ্যামবাজার যাবে—

—তা হলে কী হবে ?

—আপনি নেমে গিয়ে উল্টো ফুটপাথে চার নম্বর বাস ধরুন।

বুড়ি উঠলো। বাসসুদ্ধ লোক তখন তাকে সাহায্য করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। নতুন এসেছে মেয়েটি কলকাতায়, বুড়িও একেবারে মুখ-চোখের ভঙ্গিতে আনাড়ি সাজতে পারে। এমন মুখ-চোখের ভঙ্গি করলে যেন সত্যিই সে পথ হারিয়ে ভুল-বাসে উঠে পড়েছে।

কিন্তু ওদিকে তখন হৈ-চৈ পড়ে গেছে। আমার মানিব্যাগ্ ? মানিব্যাগ্ কোথায় গেল মশাই ?

আরো প্যাসেঞ্জার যারা ভেতরে ছিল তারাও যে-যার পকেট দেখতে লাগলো। কত টাকা ছিল মশাই ব্যাগে ? দশ টাকা ? খুব কমের ওপর দিয়ে গেছে আপনার বলতে হবে। আমার সেদিন তিন শো টাকা গেছে। কিন্তু মশাই, আমাদের সকলের পকেট সার্চ করে দেখুন। যে নিয়েছে সে এখনও ভেতরই আছে। সকলের পকেট সার্চ করুন। লজ্জা-ভদ্রতা করলে চলবে না মশাই, এ লজ্জার যুগ নয়—

ততক্ষণে বুড়ি এস্‌প্ল্যানেডের কাছে নেমে আস্তে আস্তে উল্টোদিকের ফুটপাথে গেল। বাসটার ভেতরে তখনও বোধ হয় হৈ-চৈ-গোলমাল চলছে। শুধু সেই একটা বাসই বা কেন ? দু' দিক থেকে অসংখ্য বাস আসা-যাওয়া করছে। রাস্তা পার হওয়াই দুর্ঘট। ওপারে গিয়েই একটা রেস্টুরেন্ট। সেখানেই ঢুকে পড়লো। আর কেউ তাকে দেখতে পাবে না। তার বাসের লোকেরা।

একজন ওয়েটার এসে সামনে হাজির হলো। সে-ই ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। এরা তাকে সন্দেহ করছে নাকি ? কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। তার পর একটা ঘেরা-ঘরের মধ্যে ঢুকেও ভয়টা গেল না। যদি ব্যাগটা খুলে দেখে ভেতরে একটাও পয়সা নেই ? বয়টা চলে যেতেই তাড়াতাড়ি ব্লাউজের ভেতর থেকে মানি-ব্যাগটা বার করলে। কী সব কাগজ-

পত্র রয়েছে ভাঁজে-ভাঁজে। আর তারই ভেতরে কয়েকটা খুচরো নোট। সব-সুদ্ধ ন'টা। পুরো দশটা নয়। লোকটা কী মিথ্যেবাদী!

চা দিয়ে গিয়েছিল। একটু ঠোঁটে সবে ঠেকিয়েছে, হঠাৎ মনে হলো পাশের ঘর থেকে যেন দিদির গলা শোনা গেল! সত্যিই দিদির গলা। এই সন্ধ্যেবেলা দিদি এখানে? মাঝে মাঝে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠছে। আবার কথা বলছে একজন লোকের সঙ্গে। লোকটাও হাসছে। বোধ হয় চা খাচ্ছে দু'জনে।

বুড়ির সমস্ত শরীরটা থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। যদি এখনি তাকে দেখে ফেলে দিদি!

আধ-কাপ খেয়েই উঠে পড়লো বুড়ি। তার পর বাইরে এসে দামটা দিয়ে দিলে। দিয়ে রাস্তায় এসে আবার বাসে উঠে পড়লো। এখনি হয়ত দিদি বাড়ি ফিরে যাবে!

কেদারবাবু তক্তপোশটার ওপরেই তেমনি করে শুয়ে ছিলেন। শশীপদবাবু সকালে এসে দেখে গেছেন। ছেলের মাস্টার। শুধু ছেলের মাস্টার বলেই নয়। এক-একজন মানুষ থাকে সংসারে, যারা মানুষের সহানুভূতি স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা সমস্ত কিছুই পায়, কিন্তু পায় না সেই জিনিসটাই যেটা দিয়ে তার পেট চলে। লোকে তাকে আশ্রয় দেয়, তার বিপদে আপদে তাকে দেখেও, কিন্তু তার ভার নিতে গেলেই যত বিরোধ বাধে।

অথচ কেদারবাবুর তো সে বালাই-ই ছিল না। তাঁর কাছে তো সকলেই আপন-জন। কেউ তাঁর পর নয় বলেই পরের কাছে হাত পাততে তাঁর দ্বিধা ছিল না। সে দ্বিধা ছিল শৈলর। যার তার কাছে সাহায্য চাইতেও যেন তার বাধতো। কেন, কাকা কি ভিখিরি? কাকা কি প্রাণ দিয়ে ছাত্রদের লেখাপড়া শেখায় নি? তবে? তবে কেন সে হাত পাততে যাবে ছাত্রদের কাছে?

এক-একটা পয়সা হিসেব করে শৈল সংসার চালিয়েছে বরাবর। জ্ঞান হওয়ার শুরু থেকে সে দেখে এসেছে জেনে এসেছে শুধু তার কাকাকেই। অথচ তারই বয়েসের অন্য মেয়েদের সে দেখেছে। ফড়েপুকুর স্ট্রীটের বাড়ির

জানালা দিয়ে রাস্তায় উঁকি মেরে সে দেখেছে। নতুন নতুন শাড়ি গয়না পরে পাড়ার মেয়েরাই সিনেমায় যাচ্ছে দুপুরবেলা। কই, তার তো কোনও সঙ্গী নেই, কোনও বন্ধু নেই! কাকা তো তার জন্যে ওই রকম শাড়ি কিনে আনে না! তাকে তো কই কোনও দিন অন্য মেয়েদের মত সিনেমায় যেতে বলে না!

তবে কি সে আলাদা?

এই কলকাতার সমাজের মধ্যে মানুষ হয়েও সে কি একজন বিচ্ছিন্ন মানুষ! কাকা তো মানুষের ভাল চেয়েছে। কাকা তো দেশের লোকের কল্যাণ সুখ-সুবিধে সব কিছুই চেয়েছে। হিষ্ট্রির পাতায় মানুষের আদি ইতিহাস আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছে। অথচ তার বাড়িতেই যে একটা জলজ্যান্ত মানুষ সমস্ত সুখ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত হয়ে অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত-অবাঞ্ছিত জীবন কাটাচ্ছে তা তো চোখ মেলে দেখতে পায় নি কখনও। অথবা হয়ত কাকা দেখতে চায়ও নি তা। কে জানে!

কাকা বলতো—দূর, ওসবে বিলাসিতা—এই বিলাসিতাই হলো পাপ—ওই পাপে দেশ ছারখার হয়ে যাবে—

অথচ পাপ কে না করছে! অন্যায়ের পাপ, অপব্যয়ের পাপ, বিলাসিতার পাপ। পাপ তো সর্বত্র। কিন্তু তারা তো কই শাস্তি ভোগ করে না! তাদের অসুখ হলে তারা তো ওষুধ কিনতে পারে! ডিম-মাছ-মাংস কেনবার পয়সা থাকে তাদের! কাকার তবে সে সামর্থ্য কেন থাকবে না? কাকা কার কাছে কোন্ অপরাধে অপরাধী?

আর দেশ যদি তাতে ছারখারই হয়ে যায় তো কবে যাবে! কোনও লক্ষণই তো নেই তার। বেশ তো চলছে সব-কিছুই। ধর্মতলার দোকানে এ ক'দিন ওষুধ কিনতে গিয়ে তো দেখেছে সে। চারিদিকে জাঁকজমক, চারিদিকে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। রাস্তায়-বাসে-ট্রামে কারো কোনও দুঃখই তো নেই। সবাই তো বেশ আরামে আছে। ছোটবেলায় যে-কলকাতা সে দেখেছিল সে-কলকাতার তো আরো উন্নতি হয়েছে। কলকাতার বুকের ওপর বড় বড় বাড়ি হয়েছে আরো। আরো নতুন-নতুন গাড়ি বেরিয়েছে রাস্তায়। এত পাপে কই, একটা বাড়িও তো ধসে পড়ে নি, একটা সংসারও তো ধ্বংস হয়ে যায় নি তাদের মত! এত লোক থাকতে কাকাই বা কী দোষ করেছিল?

যখন সমস্ত দিন বাড়িতে কেউ থাকতো না, যখন কাকাও জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে পড়ে থাকতো, যখন পাশে মন্মথও থাকতো না, সেই সব অবসরে আকাশ-পাতাল নানান্ ভাবনা ভাবতো শৈল। তার পর কাকার ভাবটা কেটে রাখতো। ঘরটা পরিষ্কার করতো, বইগুলো গুছিয়ে রাখতো আগেকার মত। আগেকার মতই ছোট সংসারের ছোট কাজগুলো নেশার ঘোরে করে যেতো। তার পর আবার গয়লা আসতো, কলে জল আসতো, আবার দুপুরের নিঝুম কলকাতা মুখর হয়ে উঠতো।

তার পর একবার চুপি চুপি এসে দাঁড়াতো মন্মথ।

মন্মথ ভয়ে ভয়ে সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো—আজ কেমন আছেন মাস্টারমশাই?

প্রতিদিনের সেই একই প্রশ্ন, আর প্রতিদিনের সেই একই উত্তর।

হঠাৎ আবার তারই মধ্যে একদিন মন্মথ প্রশ্ন করে বসে—সদাব্রতদা এসেছিল আর?

শৈল যেন এ-কথা শুনতেই পায় না।

—তাঁকে খবরটা দিয়ে আসবো?

এ-কথার উত্তর দেয় না শৈল।

মন্মথ এক-একদিন বলে ফেলে—তোমার জন্যে নয়, মাস্টারমশাইয়ের জন্যে বলছি, কারণ একবার যদি তুমি আসতে বলতে তা হলেই আসতো এখানে। তোমার জন্যেই কিন্তু আসতে পারছে না।

এ-কথারও উত্তর যেন দিতে নেই শৈলর।

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সে শুধু বলে—টনিকটা ফুরিয়ে গিয়েছে, ওটা আনতে হবে—

—সে আমি নিয়ে আসবো।

—আর ওই পিল্‌গুলোও পরশু আনতে হবে।

—কালকেই সব নিয়ে আসবো। কিন্তু আমার কথার উত্তর তো দিচ্ছ না—

পাছে কথার উত্তর দিতে হয় সেই জন্যেই হয়ত শৈল কোনও কাজের অছিলায় ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো।

এমনি করেই চলছিল। এমনি করেই কেদারবাবু আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছিলেন। কোথাও পাঠাবারও সামর্থ্য নেই। এর চিকিৎসা বাড়িতে

হয়ও না। হয় টি-বি হস্‌পিটালে। হয় স্যানাটোরিয়ামে। ডাক্তারবাবু সেই কথাই বার বার বলে গিয়েছেন। শশীপদবাবুও সেই কথাই বলেছেন। কিন্তু শুধু বললে হয় না। সেখানে দরখাস্ত করতে হয়, এবং সেখান থেকে যথারীতি স্থানাভাবের কথা জানিয়ে উত্তর আসে। এই-ই ইণ্ডিয়ার নিয়ম। জানাশোনা না-থাকলে যেমন কারো চাকরি হতে নেই, হস্‌পিটালেও তেমনি বেড্ পেতে নেই। পাওয়া বে-আইনী। চেষ্টা কি আর হচ্ছে না? যথেষ্ট হচ্ছে। বহুদিন থেকেই চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু যে চেষ্টা করলে এখুনি এই মুহূর্তে সব কিছু হয়ে যায় সে সদাব্রত। পোলিটিক্যাল সাফারার শিবপ্রসাদ গুপ্তর ছেলে। আর একজন মুখের কথা খসালেই এখনি বেড্ পাওয়া যায়।

শৈল জিজ্ঞেস করলে—কে? কে মুখের কথা খসালে বেড্ পাওয়া যায়?

মন্মথ বললে—সে মিস্টার বোস। যার মেয়ের সঙ্গে সদাব্রতদার বিয়ে হবে—

এর পরেও শৈলর কোনও উত্তর দিতে নেই।

কিন্তু শশীপদবাবু সেদিন সকালেই এলেন। মন্মথও এলো। দুঃসংবাদই নিয়ে এলেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন তাঁর অফিসের থ দিয়ে। অফিসের বড়-বড় কর্তারা অনেক সময়ে চেষ্টা করলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারেন। কেউ কেউ কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও শেষ পর্যন্ত কিছু হয় নি। কারণ একটা মাত্র হাসপাতাল কলকাতায়, আর রোগী ঘরে ঘরে। সুতরাং তিন-চার মাসের আগে বেড্ পাওয়ার আর কোনও আশা নেই। এই তিন-চার মাসই বা কী করে বাঁচানো যায়? তিনটে দিনই যে কাটছে না।

শশীপদবাবু বললেন—তুমি নিজেও একটু সাবধানে থাকবে মা—এ রোগ বড় পাজী—

শৈল মুখ নীচু করে সব শুনছিল। তেমনি করেই বললে—তা হলে কাকার কী হবে?

শশীপদবাবু বললেন—আমার শেষ চেষ্টা তো আমি করে দেখলুম মা, এখন ডাক্তারবাবুও তো চেষ্টা করছিলেন, তিনি কী বলেন দেখা যাক্—

শৈলর চোখের সামনে যেটুকু আলো ছিল তাও যেন নিভে এলো। এই একটি মানুষের ওপরেই ভরসা রেখে এসেছিল শৈল। পৃথিবীতে এই একটি লোককেই মনে-প্রাণে বোধ হয় এতদিন শ্রদ্ধা করে এসেছিল। সেই তিনিও আজ চরম জবাব দিয়ে দিলেন।

—মানুষ শুধু চেষ্টাই করতে পারে মা, তার বেশী ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। নইলে বেড্ কি আর পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় এখুনি। তেমন কোনও লোকের চিঠি পেলেই এখুনি বেড্ দিয়ে দেবে।

শৈল মুখ তুললে এবার। জিজ্ঞেস করলে—বেড্ না থাকলে কোথা থেকে তারা দেবে?

শশীপদবাবু বললেন—ভগবান জানে কোথা থেকে দেবে, কিন্তু দেবে। তখন আর এ-কথা উঠবে না যে বেড্ খালি নেই—বেড্ তখন খালি করেই দেবে। এইটেই নিয়ম—

ডাক্তারবাবু এসে পড়েছিলেন। তিনি সেদিনও যথারীতি পরীক্ষা করলেন। তিনিও সেই কথাই বললেন।

বললেন—আমি নিজেই গিয়েছিলাম আজ দেখতে, ওদের খাতাপত্র সব দেখে এলাম, তিন-চার মাসের আগে খালি হবে বলে তো মনে হচ্ছে না—

এতক্ষণ বুঝি এইটুকুর জন্যেই সবাই অপেক্ষা করছিল। শেষ আশাটুকু মুছে দিয়ে তিনি যেন সকলকে নিশ্চিন্ত করে দিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আর কিছু আশা করবার রইল না, আকাঙ্ক্ষা করবারও রইল না। তিনি যেন সকলকে আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শৈলর মনে হলো এতদিন কাকার জন্যে যা-কিছু করেছে সে, সমস্ত পণ্ডশ্রমই করেছে, তাতে কেবল অনর্থপাতই হয়েছে। সেই সকালবেলার বাগবাজারের গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীকে ধিক্কার দিতেও সে ভুলে গেল অন্য দিনকার মত। তার মনে হলো তার নিজেরই বুঝি পরিসমাপ্তি ঘটলো এতদিনে। যেটা ছিল তার সচেতনতা, সেটা যেন তার অহংকার ছাড়া আর কিছু নয়। সংসারে বেঁচে থাকতে গেলে যা-কিছু অপরিহার্য তার কিছুই ঈশ্বর তাকে দেন নি। দিয়েছিলেন শুধু একটি জিনিস। সে তার আত্ম-সচেতনতা। সেইটুকুর ওপর নির্ভর করেই সে যাত্রা শুরু করেছিল এই সংসারে। কিন্তু তারই ভাগ্যদোষে সেই আত্ম-সচেতনতাই আজ অহংকার হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। আর সত্যি সত্যি তা যদি অহংকারই হয় তো সেটুকু এমন করে কেড়েই বা নেওয়া কেন? তা হলে আর তার রইল কী?

—মাস্টারমশাই!

ডাকটা কানে যেতেই এই বাড়িটা, এই গলিটা, এই বাগবাজার পাড়াটা সুদ্ধু সবাই যেন পেছন ফিরে তাকালো। এ-বাড়িতে এসে এমন করে ডাকলে যে-

মানুষটি সকলের চেয়ে বেশী খুশী হতেন সেই কেদারবাবুই শুধু নিথর নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলেন। তার সব চেয়ে মিষ্টি ডাকটাও আজ আর তাঁর কানে গেল না।

মন্মথ শৈল দু'জনেই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। না-ডাকতেও যে এসেছে, আসতে বারণ করা সত্ত্বেও যে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে অভ্যর্থনা করার কি প্রত্যাখ্যান করার ভাষাও যেন তারা ভুলে গেছে।

—মাস্টারমশাই কেমন আছেন?

লম্বা-চওড়া চেহারাখানা নিয়ে সদাব্রত যেন আজ সকলের মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা নিচের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। এ-প্রশ্নের উত্তর তোমরা দাও। আমাকে অস্বীকার করে তোমরা আমার মাস্টারমশাইকে সুস্থ করে তুলতে চেয়েছিলে। এখন বলো—তিনি সুস্থ হয়েছেন কি-না। আর সুস্থ যদি না-হয়েই থাকেন তো তার কৈফিয়ৎ দাও।

—কী হলো, কেউ কথা বলছো না যে?

তার পর আর কোনদিকে না-চেয়ে সোজা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো। কেদারবাবু যেখানে শুয়ে ছিলেন, সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালো। পেছনে পেছনে মন্মথও গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সদাব্রতর মুখ দিয়ে তখন কোন কথাই বেরোচ্ছে না।

অনেকক্ষণ পরে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়লো সদাব্রতর। তার পর পাশের দিকে চেয়ে বললে—শেষকালে মানুষটাকে তোমরা মেরে ফেললে মন্মথ! তোমাদের শরীরে কি একটু দয়া-মায়াও নেই?

মন্মথ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে।

—টাকা পয়সা সকলের থাকে না, কিন্তু হস্‌পিটালে পাঠাবার ব্যবস্থা-টুকুও কি তোমরা করতে পারতে না? তার জন্যেও কি টাকার দরকার হতো?

মন্মথ বললে—কিন্তু বাবা অনেক চেষ্টা করেছেন, বেড্ পাওয়া গেল না যে—

—থামো তুমি! বেড্ পাওয়া না-গেলে মানুষ মারা যাবে নাকি? তুমি বলতে চাও হস্‌পিটালে বেড্ নেই? এ কখনও হতে পারে? এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

—সত্যি বিশ্বাস করো সদাব্রতদা, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছি, বাবা

চেষ্টা করেছেন, ডাক্তারবাবু চেষ্টা করেছেন, তিন মাসের আগে বেড্ খালি হবে না, তারা জানিয়ে দিয়েছে।

সদাব্রত তেমনি সুরেই বললে—আর তোমরা সেই কথায় বিশ্বাস করে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছো!

তার পর একটু থেমে বললে—জানো, এর পর মাস্টারমশাইয়ের যদি চরম সর্বনাশ হয় তো আমি তার জন্যে তোমাদের কাউকে ক্ষমা করবো না—

—কিন্তু সদাব্রতদা…

মন্মথকে থামিয়ে দিলে সদাব্রত। বললে—তুমি থামো, আর কথা বলো না—আর দেরি করাও উচিত নয়, তুমি নিচের দিকটা ধরো, আমি মাথার দিকটা ধরছি, আমার গাড়ি আছে, আমি এখনি হস্‌পিটালে নিয়ে যাবো—

মন্মথ তবু দ্বিধা করতে লাগলো। বললে—দাঁড়াও সদাব্রতদা, শৈলকে একবার জিজ্ঞেস করি—

—না, জিজ্ঞেস করতে হবে না—যা বলছি করো—

মন্মথর আর প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা হলো না। দু'জনে রুগ্ন কেদারবাবুকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে তুললো সদাব্রতর গাড়িতে। মন্মথও ভেতরে গিয়ে বসলো। সদাব্রত গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে শৈল একটা কথা বলবারও অবকাশ পেলে না আজ। তাকে যেন সবাই অস্বীকারই করে চলে গেল। সবাই মিলে যেন তাকে অপমানই করে গেল। কাকার জন্যে চোখে জল এসেছিল তার, কিন্তু অপমানের আঘাতে সব জল শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল।

আশে-পাশের বাড়ি থেকে অনেক ভাড়াটেই উঁকি মেরে দেখতে এসেছিল ঘটনাটা। লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল গলির মোড়ে। গাড়িটা চলে যাবার পর সবাই সান্ত্বনা দিতে এসেছিল শৈলকে। কিন্তু তার শুকনো চোখের দিকে চেয়ে সবাই নির্বাক হয়ে গেল।

মন্মথ যখন ফিরে এলো তখন সন্ধ্যে উত্‌রে গেছে। মন্মথ আসতেই শৈল মুখ তুলে চাইল। আজ ঘরটা বড় ফাঁকা-ফাঁকা। একজন মানুষ চলে গিয়েই সমস্ত নির্জন হয়ে গেছে। সমস্ত নিথর নিশ্চল হয়ে গেছে।

—অ্যাড্‌মিশন্ হয়ে গেছে শৈল! উঃ, তারা নিতে কি চায়!

শৈলর মুখে কথা নেই তবু।

মন্মথ তবু বলে চলেছে—শেষকালে সদাব্রতদা খুব জোর দিলে। বললে—নিতেই হবে আপনাদের। এখন যদি গভর্নরের টি-বি হয় তখন আপনারা বেড্ দেবেন কী করে? যদি চীফ্ মিনিস্টারের টি-বি হয় তখন আপনারা বেড্ পাবেন কোত্থেকে? তাদের তো আপনারা তিন মাস ওয়েট্ করতে বলতে পারবেন না! তাদের তো আপনারা রিফিউজ্ করতে পারবেন না!

তার পর আবার থেমে বললে—তাতেও কি নিতে চায়? শেষকালে সদাব্রতদা নিজের বাবার নাম করলে। বললে—আমি শিবপ্রসাদ গুপ্তর ছেলে—তখন যেন ম্যাজিকের মত কাজ হলো, কোথায় যে বেড্ ছিল কে জানে, তখনই টাকা জমা দিয়ে দিলে সদাব্রতদা, আর তখনই টিকিট হয়ে গেল—

—তা এত দেরি হলো কেন ফিরতে?

মন্মথ বললে—সদাব্রতদা তখনই দোকানে গিয়ে বিছানার চাদর, কম্বল, কাচের গ্লাস নানারকম সব জিনিস কিনে দিয়ে এলো। তার পর ওষুধের ব্যবস্থাও করে দিলে। ডাক্তার এলো, তার সঙ্গেও দেখা করে সব বলে এলো। প্রায় সাত শো টাকা খরচ হয়ে গেল সদাব্রতদার এরই মধ্যে—

ফাউণ্ডার্স-ডে আসলে একটা উপলক্ষ। কিন্তু এই উপলক্ষেই মিস্টার বোস স্টাফের জন্যে কিছু টাকা খরচ করেন প্রতি বছর। এটা ঘুষ। এই ঘুষ দিয়ে স্টাফ্‌কে মিস্টার বোস খুশী রাখেন। মিস্টার বোসের ফ্যাক্টরিতে স্ট্রাইক যে হয় না, এ-ও তার একটা কারণ। এই দিন তাদের বোনাস দেওয়া হয়। অপর্যাপ্ত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া থিয়েটার, স্পোর্টস্, গান-বাজনা আছে। এই দিন 'সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং'-এর স্টাফের সঙ্গে অকাতরে মেশেন মিস্টার বোস।

এবার 'ফাউণ্ডার্স-ডে' আরো ঘটা করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বলতে গেলে মিস্টার বোস এবার মুক্তহস্ত। স্টাফের থিয়েটার হবে, তার জন্যে অন্যবার বারো শো টাকা দেন, এবার দিয়েছেন আঠারো শো। এবার বলেছেন—খরচের জন্যে তোমরা ভেবো না, কিন্তু প্লে ভাল হওয়া চাই।

বিরাট প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। যারা বিশিষ্ট গেস্ট তাঁদের জন্যে আয়োজন প্রচুর। সেই সব অতিথিদের জন্যে ফ্যাক্টরির মীটিং-রুমে স্পেশ্যাল ব্যবস্থা হয়েছে। ককটেল, শ্যাম্পেন, হুইস্কি সব-কিছুর বন্দোবস্ত মজুত। বিশেষ করে গভর্নমেন্ট অফিসারদের জন্যে। তাঁদের হাতেই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অর্থাৎ যাদের হাতে পারমিট, যাদের হাতে প্রোটেক্শন্। ইণ্ডিয়ার বাইরে থেকে যদি হুড়-হুড় করে ফ্যান্ আসতে থাকে তা হলে সুভেনির-ফ্যানের দাম কমে যাবে। 'সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্' উঠে যাবে। তাতে ইণ্ডাস্ট্রির ক্ষতি। সুতরাং গভর্নমেন্ট-অফিসারদের হাতে রাখেন মিস্টার বোস। বিশেষ করে যে-মিনিস্ট্রির হাতে ইন্ডাস্ট্রির পোর্টফোলিও থাকে তাদের অফিসারদের।

শিবপ্রসাদ গুপ্ত ইন্দোর থেকে সোজা এসে একবার বাড়িতে গিয়েই চলে এসেছিলেন।

মন্দাকিনীর বোধ হয় একটু আসবার ইচ্ছে ছিল। শিবপ্রসাদবাবু বলেছিলেন —না না, তুমি আবার তার মধ্যে গিয়ে কী করবে—

মন্দাকিনী জীবনে কখনও সংসারের বাইরে যায় নি। শিবপ্রসাদবাবুর জীবনে যদি কেউ উন্নতির একনিষ্ঠ সহায় হয়ে থাকে তো সে এই মন্দাকিনী। স্বামী কোথায়-কোথায় সারা জীবন নিজের উন্নতি, নিজের প্রতিষ্ঠা নিয়ে উন্মত্ত হয়ে কাটিয়েছেন। কিন্তু বহুদিন বাড়িতে ফিরে এসে দেখেছেন সেখানে তাঁর জন্যে আরাম শান্তি আশ্বাস সমস্ত কিছু প্রস্তুত করে বসে আছে তাঁর স্ত্রী। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মন্দাকিনীরও যে প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা থাকতে পারে সে-দিকটার কল্পনাও কখনও করেন নি শিবপ্রসাদবাবু। কল্পনা করবার সময়ই বা জীবনে পেলেন কই ?

এই তো মিস্টার বোসের এখানে আজ ফাউণ্ডার্স-ডে, কাল আছে রাজভবনে টি-পার্টির নেমন্তন্ন, পরশু এডুকেশন-মিনিস্টারের মেয়ের বিয়ে, তার পরদিন আসানসোলে আদিবাসীদের উন্নয়ন সভার সভাপতিত্ব। ডায়েরী খুললে এই রকম একটার পর একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ছকা আছে। এর হাত থেকে কে তাঁকে মুক্তি দেবে ? আর মুক্তি চাইতেই বা যাবেন কোন্ দুঃখে ?

মিস্টার বোস চারদিকেই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। তাঁর হাজারটা লোক হাজার দিকে দেখছে। দেখবার লোকের অভাব নেই তাঁর। কিন্তু যাঁরা স্পেশ্যাল গেস্ট্ তাঁদের দিকে নিজে না-দেখলে হয় না। একবার যাচ্ছেন

ভেতরে, যেখানে ড্রিক্‌স্‌-এর ব্যবস্থা হয়েছে সেই ঘরে। আর একবার বাইরে যেখানে খদ্দর-পরা স্বদেশী গণ্যমান্য লোকের ভিড়। ওদিকে স্টেজ্‌ বাঁধা হয়েছে। যারা প্লে করবে তারা ওর ভেতরে মেক্‌-আপ্‌ করছে।

ক্রমে সবাই তৈরী হলো।

ড্রামাটিক ক্লাবের সেক্রেটারি ছনিবাবু আবার নিজেই ডাইরেক্টর। নিজেই পরিচালনা করবেন প্লে। ভেতরকার কাজগুলো সব গুছিয়ে বাইরে এলেন। মিস্টার বোস পারমিশন্‌ না দিলে প্লে আরম্ভ করা যায় না।

ওয়েলফেয়ার অফিসার দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করলেন—কী ছনিবাবু, আর কত দেরি?

ছনিবাবু বললেন—আমরা তো রেডি স্যার, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি আরম্ভ করবো কি-না—

ওয়েলফেয়ার অফিসার স্টাফের বেনিফিট্‌ দেখেন। তবু সব কাজেই মিস্টার বোসের অনুমতি নিতে হয়। বললেন—দাঁড়ান, মিস্টার বোসকে জিজ্ঞেস করে আসি—

মিস্টার বোস তখন বড় ব্যস্ত। বাড়ি থেকে মিসেস বোস এসেছেন, মিস্‌ বোস এসেছে। মেয়ের দিকে চাইলেন মিসেস বোস। বললেন—বড় লেট্‌ হয়ে যাচ্ছে তো, কখন আরম্ভ করবে ফাংশান—

পেগী মনিলার কোলের ওপর বসে ছিল।

—দেখ না, তুমি পেগীকে আনতে বারণ করেছিলে, কিন্তু কী রকম শান্তশিষ্ট হয়ে বসে আছে দেখেছো—

মিস্টার বোসও পেগীকে এখানে আনতে বারণ করেছিলেন। আফ্‌টার অল্‌ পেগী ইজ্‌ এ ডগ্‌। আজকে সমাজের এলিট্‌রা আসবে। বিরক্ত করতে পারে। তা ছাড়া জল-তেষ্টা পেতে পারে পেগীর। কত রকম সিলি ব্যাপার করতে পারে সে। কিন্তু মনিলা রাজী হয় নি।

—এই যে মিস্‌ বোস, মিস্টার বোস কোথায়?

ওয়েলফেয়ার অফিসার ঘরে ঢুকে দেখলেন চারিদিকে। মনিলা বললে—মিস্টার ভাদুড়ি, এক গ্লাস জল পাঠিয়ে দেবেন কাইণ্ডলি—

ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার ভাদুড়ি কৃতার্থ হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি নিজেই গিয়ে একটা কোল্ড্‌ ড্রিঙ্ক এনে হাজির করলেন।

মনিলা বললে—কোল্ড্‌ ড্রিঙ্ক তো বলি নি—শুধু বললাম ওয়াটার—পেগী

খাবে—দেখবেন, ফ্রিজের জল নিয়ে আসবেন কিন্তু, আমার পেগী হট্ ওয়াটার খায় না—

মিসেস বোসের মনটা আজ ভাল নেই। সকালবেলাই মিস্টার বোসের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে। তিনি আসতেই চান নি। মনিলাই মা'কে জোর করে নিয়ে এসেছে।

মনিলা বলেছিল—মা, তোমারই তো দোষ, তুমি কেন বাবার কথা শুনে চলো না—বাবা তোমাকেই বারবার বলেছে হেল্‌থের দিকে নজর রাখতে—

মিসেস বোস রেগে গেলেন—তা আমার হেল্‌থ আমি বুঝি না?

—তা হলে তুমি কোল্ড্-বাথ কেন নিলে?

—বেশ করবো, এই হট্-ওয়েদারে কেউ হট্-বাথ্ নিতে পারে? আমার কোনও জিনিসই তোর ফাদারের পছন্দ হয় না! অথচ এই যে ফ্যাক্টরি হলো এ কার লাকে হলো বল দিকিন? তোর ফাদারের লাকে?

সকালবেলাই এই নিয়ে বেশ একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে বাড়িতে। বয়-খানসামা-বাবুর্চিদের সামনেই ঝগড়া হয়েছে। তারা জানে সাহেব-মেম-সাহেবের মধ্যে এ স্বাভাবিক। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই হলো। হয় হট্-বাথ নিয়ে, নয় কোল্ড্-বাথ নিয়ে। কিংবা চিকেন্ স্যাণ্ডুইচ নিয়ে, নয়তো টার্ফ-ক্লাবের ঘোড়া নিয়ে। মিস্টার বোস যে ঘোড়া খেলতে বলবেন, মিসেস বোস সে-ঘোড়া খেলবেন না। মিস্টার বোস যে-শাড়ি কিনবেন, মিসেস বোস সে-শাড়ি পরবেন না। বিয়ের পর থেকেই এমনি চলে আসছে। কেন যে চলছে তার কারণ কেউ বুঝতে পারে না। মিসেস বোস বলেন, তাঁর জন্যেই মিস্টার বোসের লাইফে উন্নতি হয়েছে। বিয়ের সময় মিস্টার বোস এত বড়লোক ছিলেন না। পরে বড়লোক হয়েছেন। কিন্তু মিস্টার বোস তা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন—তোমার মাদারের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে মনিলা—

মনিলা বলে—কিন্তু বাবা, তুমি মা'কে অমন করে বকো কেন?

মিস্টার বোস বলেন—বারে, তুমি আমায় কখন মা'কে বকতে দেখলে?

এ-ও বোধ হয় অভিশাপ। সংসারের আরো অনেক ঘটনার মত এ-ঘটনারও কোনও কারণ খুঁজে পান না মিস্টার বোস। ভাগ্য তাঁকে অনেক ফেভার করেছে। তিনি ছিলেন সামান্য, হয়েছেন অসামান্য। মিস্টার বোসের নাম করলে আজ রাইটার্স বিল্ডিংসে-ও সাড়া পড়ে যায়, মিস্টার

বোসের নাম করলে আজ হস্‌পিটালে বেড্‌ পাওয়া যায়। মিস্টার বোসের নাম করলে আজ দিল্লীর মিনিস্টাররা পর্যন্ত পার্লামেণ্টে বসে ঘুমোতে-ঘুমোতে জেগে ওঠে। মিস্টার বোস আজ ওয়েস্ট-বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রির একজন বড় ম্যাগ্‌নেট।

আজ 'স্নুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্‌'এর একটা স্মরণীয় দিন। ধাপে ধাপে কোম্পানী উঠছে। আরো উঠবে। তবু এই দিনে মন-খারাপ করা উচিত নয়। উচিত নয় বলেই মিস্টার বোস মন-খারাপ করেন নি। সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেছেন। সকলকে অভ্যর্থনা করেছেন। এর পর শিবপ্রসাদবাবু আসবেন, সদাব্রত আসবে। আজকেই দু' পক্ষের একটা পাকা কথা হবে। আজকেই প্রথম শিবপ্রসাদবাবু মনিলাকে দেখবেন। অবশ্য দেখাটা নমিন্যাল। সে-দেখার ওপর বিয়ে হওয়া না-হওয়া নির্ভর করছে না। কারণ তার আগেই সদাব্রত নিজেই চাকরি অ্যাক্‌সেপ্ট করে নিয়েছে। দু' হাজার টাকার চাকরি নিয়ে বসে আছে। এর পরে আর বিয়ে করবে না বলতে পারবে না।

এখানে আসবার সময় মিস্টার বোস বলেছিলেন—যেন পেগীকে সঙ্গে নিয়ে যেও না তুমি মনিলা—

কিন্তু সঙ্গে নিয়ে আসবে বলেই পেগীকে সকাল থেকে তোয়াজ করেছে মনিলা। সকাল থেকে সাবান মাখিয়ে পাউডার দিয়ে তোয়াজ করানো হয়েছে। না আনলে চলবে কেন?

মনিলা বলেছিল—না নিয়ে গেলে পেগী বুঝবে কী করে?

—কী বুঝবে?

—মিস্টার গুপ্ত কী রকম মানুষ! পেগীরও তো পছন্দ-অপছন্দ আছে বাবা, পেগী পুওর ডগ্‌ বলে কি ওর কিছু বুদ্ধি নেই মনে করো?

—কিন্তু যদি পেগীর পছন্দ না-হয় সদাব্রতকে?

—তা পেগীর পছন্দ না-হলে আমি কী করতে পারি বলো?

—তা বলে পেগীই তোমার কাছে বড় হলো?

মনিলা বললে—ডোণ্ট্‌ বি সিলি বাবা! তুমি কী বলছো? নেহাত পেগী কথা বলতে পারে না তাই, নইলে শুনতে পাচ্ছে তো সব—তোমার আমার মত ওরও তো কান আছে দুটো—

এর পর আর বেশী কথা বলেন নি মিস্টার বোস। এর পর মনিলা গাড়ি

নিয়ে পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছিল খোঁপা বাঁধতে। আগে ছিল স্বাইক্রেপার খোঁপার দাম পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু সব জিনিসেরই আজকাল দাম বাড়ছে। হেয়ার-লোশন্ হেয়ার-ক্রীম। সবই আজকাল কস্ট্‌লি। চুলেরও দাম বাড়ছে। নাইলনের চুল মধ্যবিত্ত-মেয়েরা পরে। ওটা ডেমোক্রেটিক। আসল খাঁটি মানুষের মাথার চুল দিয়ে যে-খোঁপা সেইটেই পরে মনিলা বরাবর। ওতে মাথা ভাল থাকে, চুলও ভাল থাকে। আজকে চার্জ করেছিল পঁচাত্তর টাকা।

আর সেখান থেকে বাড়িতে এসে একটা স্পঞ্জ্-বাথ্ নিয়েই এখানে চলে এসেছে। মা-ও সঙ্গে এসেছে। এখানে তাদের অধিকার আছে আসার। এখানে তারা দু'জন গেস্ট্ নয়, হোস্ট্। নিমন্ত্রিত নয়, নিমন্ত্রণকারী। তাই সকলের আগে তারাই এসে এয়ার-কন্‌ডিশন্‌ড্ ঘরে বসেছিল।

মিস্টার ভাদুড়ি নিজের হাতে ট্রে করে ফ্রিজ-ওয়াটার নিয়ে এলেন।

—আপনি নিজে নিয়ে এলেন কেন মিস্টার ভাদুড়ি?—বলে গ্লাসটা নিয়ে মনিলা পেগীকে জল খাওয়াতে লাগলো।

মিসেস বোস বললেন—মিস্টার বোস ওদিকে কী করছেন মিস্টার ভাদুড়ি?

মিস্টার ভাদুড়ি বললেন—আমি তো তাঁকেই খুঁজছি—

মিসেস বোস বললেন—আপনাদের মিস্টার বোসের কোনও পাঙ্-চুয়্যালিটি-সেন্স নেই, আমরা তখন থেকে বসে আছি, আর আপনারাই বা কী করছেন? এত বড় ফ্যাক্টরি, ক'টা বাজলো সে-হুঁশ আছে?

বলে রিস্ট্‌ওয়াচটা দেখালেন ঘুরিয়ে—

আমি দেখছি—বলে মিস্টার ভাদুড়ি গ্লাস নিয়ে বাইরে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলেন।

কিন্তু বাইরে গিয়েও মিস্টার বোসের খোঁজ পাওয়া গেল না। আজকে তাঁকে পাওয়া ভার। সকলেরই খোঁজ মিস্টার বোসকে। তিনি এখানকার প্রধান। শিবপ্রসাদ গুপ্ত আসতেই তিনি ধরলেন। কুঞ্জ গাড়ি ব্যাক্ করে নিয়ে গিয়ে লাইন দিয়ে পার্ক করে রাখলে।

—এই যে, সদাব্রত কোথায়?

—কেন? সে তো সকালবেলাই বেরিয়েছে শুনলুম, আসে নি আপনার এখানে?

—না তো !···আর মিসেস গুপ্ত ? তিনি এলেন না ?

—তাঁর কথা ছেড়ে দিন, তিনি কোথাও যান না—

মিস্টার বোস কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়লেন—কিন্তু সদাব্রত এলো না কেন ?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—আসবে নিশ্চয়ই, হয়ত কোথাও গেছে—

—কিন্তু আজ ফাউণ্ডার্স-ডে, সবাই এসেছে, মিসেস বোস এসেছে, মনিলা এসেছে, তারা সবাই সদাব্রতর জন্যে ওয়েট্ করছে—আর আজকেই দেরি করতে হয় !

সার সার চেয়ার পাতা রয়েছে স্টেজের সামনের শামিয়ানার তলায়। প্রথম সারিতে ভাল ভাল চেয়ার। দামী দামী মানুষদের বসবার জন্যে দামী দামী সীট। সেখানে স্টাফ্‌রা বসতে পারবে না। সব পেট্রন্। পেট্রন্‌রা বসবার পর যদি জায়গা থাকে তখন বসবে তোমরা। তোমরা আমাদের সমান হবার চেষ্টা কোর না। সব মানুষ সকলের সমান হতে পারে না। হতে নেই। এই লাইন দেওয়া রয়েছে। এই লাইনের ও-পারে থাকবে তোমরা, এ-পারে আমরা। ও-পারে তোমাদের দল, এ-পারে আমাদের।

শিবপ্রসাদ গুপ্ত মাঝখানের চেয়ারে বসলেন। পাশে বসলেন মিস্টার বোস। তার পর একে একে সবাই এসে হাজির হলেন। সকলের নাম লেখা জায়গা। মিস্টার সানিয়াল্, মিস্টার আহুজা, মিস্টার ভোপৎকার, আরো অনেকে। কোন্ পারমিট আর কোন্ লাইসেন্সের যোগসূত্র দিয়ে তারা সবাই বাঁধা তা বাইরে থেকে কারো জানবার উপায় নেই। সামনে বেশ নিরীহ ভদ্র সুট্-ট্রাউজার-টাই। একমাত্র শিবপ্রসাদবাবু খদ্দর-পরা। তিনি বললেন—অনেক দেরি হবে নাকি মিস্টার বোস ?

—কেন ? আপনার কোন কাজ আছে নাকি ?

—না, আমার আবার পুজো করবার টাইম আছে তো, বেশি রাত হলে একটু—

মিসেস বোস এসে পড়লেন। তাঁর জন্যে নাম লেখা জায়গা ছিল। সেখানে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হলো। তিনি আসতেই সবাই উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার করলেন। তিনি বসতে সবাই বসলেন। পেছনে মনিলাও আসছিল। তার কোলে পেগী। মনিলাও বসে পড়লো।

মিস্টার বোস আলাপ করিয়ে দিলেন—ইনিই মিস্টার গুপ্ত, আর মিসেস বোস, আর আমার মেয়ে মিস্ বোস—

পেগীর বোধ হয় ভালো লাগে নি শিবপ্রসাদ গুপ্তকে। চারিদিকের স্থুট-পরা লোকের মধ্যে হঠাৎ এই খদ্দর-পরা লোকটাকে দেখে হয়ত ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। শিবপ্রসাদ গুপ্তকে দেখেই মনিলার কোলে বসে আওয়াজ করে উঠলো—ভেউ-ভেউ—

—ডোণ্ট্ বি সিলি পেগী—বলে আদর করে মনিলা চাঁটি মারলে পেগীর মাথায়।

তার পর মিস্টার গুপ্তর দিকে চেয়ে মনিলা বললে—ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোক দেখে নি কিনা পেগী তাই অমনি করছে! আপনার মিসেস এলেন না কেন মিস্টার গুপ্ত?

মিস্টার ভাদুড়ি মিস্টার বোসের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—এবার আমরা প্লে আরম্ভ করতে পারি স্যার!

মিস্টার বোস চারদিকে চাইলেন।

—কিন্তু পারচেজিং অফিসার মিস্টার গুপ্ত কই, তিনি এখনও তো এলেন না—কই মিস্টার গুপ্ত, সদাব্রত তো এখনও এলো না?

মিস্টার বোস বললেন—আরম্ভ করে দাও, হি মে বি লেট্—

চারিদিকে আলোগুলো নিভে গেল। শুধ্ স্টেজের ফুটলাইট জ্বলছে। আর তার পরেই ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজলো। মিসেস বোস চুপ করলেন। মনিলা বোস পেগীকে কোলের মধ্যে আরো জোরে আঁকড়ে ধরলো। মিস্টার ভোপৎকার একটা চুরোট ধরালেন। হুইস্কির পর স্মোক করলে মৌজ হয়। শিবপ্রসাদ গুপ্ত খদ্দরের চাদরটা কাঁধে তুলে দিলেন বাঁ হাত দিয়ে। অনেক টাকা খরচ হয়েছে স্থভেনির ইঞ্জিয়ানীরিং ওয়ার্কস-এর। অনেকের অনেক সময় নষ্ট হয়েছে এই একটি দিনকে সার্থক করে তোলবার জন্যে। মিসেস বোসের কষ্ট হয়েছে, মিস্ বোসেরও আজকে ক্লাবে যাওয়া হয় নি। পেগীরও এত লোকের ভিড় ভাল লাগছে না।

আস্তে আস্তে কার্টেন্ উঠতে লাগলো। স্টেজের ভেতরে সমস্তটা এখন দেখা যাচ্ছে। সামনে নদী, সেই নদীর সামনে আকাশের ওপরে লাল একটা সূর্য উঠছে। অল্প-অল্প ভোর হচ্ছে। আর একটু আলো হলে বোঝা গেল স্টেজের এক কোণে কর্ণাট-রাজকুমারী লাজবন্তী সূর্যের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে প্রার্থনা করছে। স্টেজের ওপর থেকে মুখের প্রোফিলের ওপর ফোকাস্

পড়লো। লাজবন্তী সংস্কৃত স্তব পাঠ করতে লাগলো। পেছনে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিক। ভায়োলিনটা জৌন্‌পুরীর পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্যাড্‌ এফেক্ট আনবার চেষ্টা করতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং……

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা খস্‌-খস্‌ আওয়াজ হলো। মিস্টার বোস বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকালেন, হোয়াই নয়েজ্‌ দেয়ার? তার পরে সদাব্রতকে দেখতে পেয়েছেন। সদাব্রত নিঃশব্দেই আসছিল। তার নিজের রিজার্ভড সীটে গিয়ে সে বসবে। সেই রকম ব্যবস্থাই হয়ে আছে।

মনিলাও দেখতে পেয়েছিল। সদাব্রতকে দেখতে পেয়েই মুক্তোর মত দাঁত-গুলো বার করে হাসলো।

—দিস্‌ ইজ্‌ মাই পেগী!

সদাব্রত বোধ হয় আদর করবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিল। কিন্তু সদাব্রতকে দেখেই পেগী ক্ষেপে উঠেছে—ভেউ ভেউ—

মনিলা বোস এক চাঁটি মারলো পেগীকে—ডোণ্ট্‌ বি সিলি পেগী, বিহেভ প্রপারলি—

সদাব্রত ভয়ে হাত টেনে নিলে। কামড়ে দেবে নাকি!

ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্‌……

গ্রীনরুমের ভেতরে দুনিবাবুরই ভাবনা বেশি। ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার ভাদুড়ি তো বলেই খালাস। মাসে মাসে দেড় হাজার টাকা মাইনে গুনে নিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ালেই চলে যায়। কিন্তু বদ্‌নাম হলে দুনিবাবুরই হবে। নাটকটাও নতুন, অ্যাক্টররাও নতুন। একমাস ধরে রিহার্সাল দেওয়া হয়েছে দিনের পর দিন। তার পর আজকালকার অ্যাক্‌ট্রেসরা যা হয়েছে—কথায়-কথায় আবদার। আবদার লেগেই আছে তাদের। তিনজন ফিমেল-আর্টিস্ট নিয়ে এতদিন কাজ চালাতে হয়েছে। রোজ তাদের গাড়ি করে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হয়েছে, আবার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে হয়েছে। মুহুর্মুহুঃ চা-চপ-কাটলেট খাওয়াতে হয়েছে। আর্টিস্ট্‌ হোক আর যাই হোক, আসলে

মেয়েমানুষ ছাড়া তো আর কিছু নয়। তবু হুনিবাবু বলেই সামলাতে পেরেছে এতদিন। নইলে কাপড় ছেড়ে পালাতে হতো!

আসলে কুন্তি গুহকে নিয়েই যত জ্বালা। ভয়ও ছিল কুন্তি গুহকে নিয়ে।

মেয়েটা পার্ট ভালো করে বলেই এত খোসামোদ। অথচ মিস্টার ভাদুড়ির নজরে পড়তে গেলে খোসামোদ না-করেও উপায় নেই। সামনেই একটা প্রোমোশনের চান্স্ আছে, সেটা আটকে যাবে। সকালবেলা উঠেই সোজা কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিল হুনিবাবু। সেই পুজোর প্রসাদ এনে সকলকে খাইয়েছে। শালপাতায় করে সিঁদুর এনেছিল, তাও সকলের কপালে লাগিয়ে দিয়েছিল।

হুনিবাবু বার-বার করে আগের দিন বলে দিয়েছিল—ঠিক সময়মত আসবেন কুন্তি দেবি!

শুধু কুন্তি গুহই নয়, বন্দনা, শ্যামলী সকলকেই ওই একই অনুরোধ করেছিল। প্রথম সীনেই কুন্তির অ্যাপিয়ারেন্স্। একটু দেরি হলেই সব মাটি।

—তা আপনারা যখন গাড়ি পাঠাবেন তখনই আসবো, আমাদের আসতে কী? আমাদের তো এটা পেশা হুনিবাবু—

তা গাড়ি ঠিক সময়েই গিয়েছিল সকলের বাড়িতে। ঠিক সময়েই সবাই এসে মেক্-আপ্ করতে বসেছিল। ঠিক সময়েই সবাই তৈরী। সন্ধ্যে ছ'টা বাজলো, সাড়ে ছ'টা বাজলো। মেক্-আপ্ কমপ্লিট। তবু ড্রপ ওঠে না। আরম্ভ হবার নামই নেই।

—কই হুনিবাবু, এত দেরি কিসের?

হুনিবাবুও তৈরী। বললে—এই যে আর একটু দেরি হবে, মিসেস বোস এখনো এসে পৌঁছোন নি—

তার পর আবার সেই একই তাগাদা।

—আর একটু দাঁড়ান, মিস্টার ভোপৎকার এখনো এসে পৌঁছোন নি।

আস্তে আস্তে খবর আসতে লাগলো সবাই এসে গেছে। মিসেস বোস এসেছে, মিস বোস এসেছে। মিস্টার ভোপৎকার এসেছে। মিস্টার বোসের আরও অগুন্তি বন্ধু-বান্ধব এসেছে। শেষকালে খবর এলো শিবপ্রসাদ গুপ্ত এসে গেছেন।

—কে এসেছে বললেন?

—শিবপ্রসাদ গুপ্ত, চেনেন না? পোলিটিক্যাল সাফারার, যাঁর ছেলে সদাব্রত গুপ্ত—আমাদের পারচেজিং অফিসার—

কুন্তি কিছু উত্তর দিলে না। আজ তাকে লাজবন্তীর অভিনয় করতে হবে। মাথায় কানাড়া ছাঁদে খোঁপা বেঁধেছে। মুখে ম্যাক্স্ ফ্যাক্টর মেখেছে। সমস্ত শরীরে ফুলের সাজ। ফুলের মালা খোঁপায় জড়িয়েছে। ফুলের হার, ফুলের গয়না। মেক্-আপ্ করে বসে-বসে কেমন ঘামছে!

তুনিবাবু তখনও ছোটাছুটি করছে। ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার ভাদুড়ি না বললে প্লে আরম্ভ হতে পারবে না।

—কী হলো তুনিবাবু, আর কতক্ষণ?

—এইবার হয়েছে, সবাই এসে অডিটোরিয়ামে বসেছে, মিসেস বোস, মিস বোস সবাই এসে গেছেন।

কুন্তি বললে—তা আপনারা না-হয় মিস বোসের মাইনে-করা লোক, আমরাও কী তাই?

কথাটা আশে-পাশে যারা ছিল সকলেই শুনলো। সকলের কানে গিয়েই খট্ করে লাগলো। কিন্তু সামলে নিলে তুনিবাবু, বললে—বুঝতেই তো পারছেন, অফিসের থিয়েটার, আমার নিজের তো কোনও ভয়েস্ নেই, মনিব যা বলবে তা-ই করতে হবে—

—তা মনিবের বউ, মনিবের মেয়ে, মনিবের মেয়ের কুকুরও কি আপনাদের মনিব?

হেসে ফেললে তুনিবাবু। আর এ-কথার উত্তরে না-হেসেই বা উপায় কি!

কুন্তি গুহ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—আপনারা না-হয় মনিবের কুকুরকে খাতির করতে পারেন, কিন্তু আমাদের তো তা করলে চলবে না! আমাদের খেটে খেতে হবে। না খাটলে কেউ আমাদের পয়সা দেবে না। মুখ দেখতে কি আপনারা আমাদের ডেকেছেন? বলুন, মুখ দেখতে ডেকেছেন? আজকে যদি আমি স্টেজে উঠে খারাপ প্লে করি তো আপনি আমাদের আর কখনও ডাকবেন?

বন্দনা শ্যামলী তারাও কেমন যেন লজ্জায় পড়লো। এমন ঝাল-ঝাল কথা মুখের সামনে বলা ঠিক হচ্ছে না।

বন্দনা জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের বড়-সাহেবের মেয়ে থিয়েটার শুনতে এসেছে, তা কুকুর নিয়ে কেন?

ভুনিবাবু বললে—খুব শখের কুকুর কিনা—

—তা নিজের বাড়ির ভেতর বসে শখ দেখালেই হয়। এখানে সকলকে দেখিয়ে আদিখ্যেতা করা কেন ?

শ্যামলী বললে—কী চমৎকার খোঁপাটা দেখেছিস ভাই ? কত দাম হবে ওর বল্ তো ?

কেউ জানে না কত দাম। তবু তাই নিয়েই আলোচনা করতে ভাল লাগছিল বন্দনা আর শ্যামলীর। শুধু খোঁপা নয়, শুধু কুকুরই নয়। উইংস্-এর পাশ দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখে এসেছে তারা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত চেহারাখানার আগা-পাশ-তলা দেখে এসেছে। কী শাড়ি পরেছে, কী গয়না পরেছে, কী লিপস্টিক মেখেছে, কী রকম করে কপালের ভুরু এঁকেছে, কী রকম নখ রেখেছে আঙুলে, কী শেডের কিউটেক্স মেখেছে, সব কিছু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে এসেছে। কোনও পুরুষ-মানুষও কোনও মেয়ের দিকে এমন করে দেখে না। দেখেছে আর মনে-মনে তারিফ করেছে—বাঃ—

সত্যিই এমন চমৎকার দেখাচ্ছিল মনিলাকে যেন মোম দিয়ে গড়া !

—আর যাঁর সঙ্গে বিয়ে হবে তিনি আসেন নি ? তাঁকে কী রকম দেখতে ?

ভুনিবাবু বললে—তিনিই তো আমাদের পারচেজিং অফিসার, মিস্টার গুপ্ত। তিনি এখনও আসেন নি। ওই তো মিস্ বোসের পাশে বসবার জন্যেই ওঁর জায়গা খালি পড়ে রয়েছে। তিনি এসে ওইখানেই বসবেন। মিস্টার গুপ্তর বাবা এসেছেন, শিবপ্রসাদ গুপ্ত—পোলিটিক্যাল সাফারার……

—কই ? বন্দনা আর শ্যামলী দু'জনেই জিজ্ঞেস করলে।

—ওই যে খদ্দর-পরা। গলায় চাদর। খুব আপ-রাইট মানুষ। নিজে ইচ্ছে করলে কংগ্রেসে ঢুকতে পারতেন, ঢুকলে এতদিনে ইউনিয়ন মিনিস্টারও হতে পারতেন, কিন্তু ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চান না বলেই এখনও সোস্যাল ওয়ার্ক করে যাচ্ছেন—

এমনি করেই ভুনিবাবু সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার ভাদুড়ি এসে ডাকলেন—ভুনিবাবু—

—ইয়েস স্যার !

ভুনিবাবু কাছে আসতেই মিস্টার ভাদুড়ি বললেন—স্টার্ট ! স্টার্ট নাউ—মিস্টার গুপ্ত এসে গেছেন—

এতক্ষণ এইটুকুর জন্যেই সবাই অপেক্ষা করছিল। অর্ডার পাওয়া মাত্র তুনিবাবু ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে বললে। হাতের হুইস্‌লটা মুখে দিয়ে বাজিয়ে দিলে জোরে। ওদিক থেকে শিফটার কার্টেন তুলে দিলে স্টেজের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে ফোকাস!

আর লাজবন্তী তৈরীই ছিল। তারই প্রথম অ্যাপিয়ারেন্স।

সামনে নদী বয়ে চলেছে দূর থেকে। পুব দিকে লাল সূর্য উঠছে আকাশে। পেছনে ভায়োলিনটা জৌনপুরীর পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটা স্যাড্ এফেক্ট আনবার চেষ্টা করতে লাগলো।

আর কর্ণাট-রাজকুমারী লাজবন্তী সেই উদীয়মান সূর্যের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে আবৃত্তি করতে লাগলো—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

নাটকের নাম 'কর্ণাট-রাজকুমারী'। তুনিবাবু আসলে লোহা-লক্কড় নিয়ে কাজ করলে কী হবে, খেটে-খুটে নাটকখানা লিখে ফেলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা যে এত ভাল হয়ে যাবে তা তুনিবাবু নিজেই জানতো না। সবসুদ্ধ পাঁচবার ক্ল্যাপ্ পড়েছিল। রাত যখন সাড়ে দশটা—তখন প্লে ভাঙলো। লাজবন্তীর পার্টটাই সব চেয়ে ভালো হয়েছিল। যেমন ডেলিভারি তেমনি অ্যাক্‌শান্, তেমনি পস্‌চার—

শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল কুন্তির। আর যেন দাঁড়াতে পারছিল না সে। অনেক কেঁদেছে, অনেক হেসেছে, অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে।

মেয়েরা চলেই যাচ্ছিল। মেক্-আপ্ তুলে সবাই চলে যাবার জন্যে তৈরী। হঠাৎ তুনিবাবু দৌড়তে দৌড়তে এলো।

—দাঁড়ান কুন্তি দেবী, একটা মেডেল অ্যানাউন্স্ করা হয়েছে আপনার নামে—

বলে আর দাঁড়াবার অবসর দিলে না তুনিবাবু। একেবারে স্টেজে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো।

আবার কার্টেন উঠলো। মিস্টার ভাদুড়ি, ওয়েলফেয়ার অফিসার মাইক্রো-

ফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন—আজকের শ্রদ্ধেয় অতিথি শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত 'কর্ণাট-রাজকুমারী'র অভিনয় দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে লাজবন্তীর ভূমিকার জন্যে কুমারী কুন্তি গুহকে একটা স্বর্ণ-খচিত মেডেল দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

একবার বাংলায় একবার ইংরিজিতে ঘোষণা করতেই সারা অডিটোরিয়াম হাততালিতে ফেটে পড়লো।

কুন্তি এতক্ষণ বুঝতে পারে নি। কিন্তু শিবপ্রসাদ গুপ্তর নামটা কানে যেতেই যেন আচম্কা বিদ্যুতের ছোঁয়াচ লাগলো সারা শরীরে। নজরে পড়লো সামনেই বসে আছে সদাব্রত গুপ্ত, পাশেই বিরাট খোঁপা মাথায় মনিলা বোস। তার কোলে কুকুর। সেই কুকুরটাকেই আদর করবার চেষ্টা করছিল সদাব্রত গুপ্ত। মেয়েটার মোমের মত সাদা মুখটায় যেন কুষ্ঠ হয়েছে। শ্বেত-কুষ্ঠ। কুন্তির মনে হলো আলকাতরা দিয়ে মেয়েটার সমস্ত মুখখানাকে কালো করে দিলেই যেন তার ভেতরকার জ্বালা জুড়োয়। ওরা বাপ ছেলে বউ মিলে সুখে শান্তিতে বাস করবে। অথচ ওদের শাস্তি দেবার কেউ নেই। ওদের সমস্ত পাপের শাস্তি মাথা পেতে নেবার জন্যেই যেন জন্মেছে কুন্তিরা, বন্দনারা, শ্যামলীরা···

কুন্তি হঠাৎ মাইক্রোফোনের সামনে মুখটা নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বললে —এ মেডেল আমি নিতে অস্বীকার করছি। শিবপ্রসাদ গুপ্তর মেডেল দেবার যেমন অধিকার আছে, সে মেডেল নিতে তেমনি আমার অস্বীকার করবারও অধিকার আছে। যে আমার বাবাকে খুন করেছে, তার কাছ থেকে মেডেল নিতে আমি ঘৃণা বোধ করি—আমি খুনীকেও ঘৃণা করি, খুনীর মেডেলকেও ঘৃণা করি—

অনেক রাত্রে বুড়ির ঘুম ভেঙে গেল। ধড়-ফড় করে উঠে পড়েছে বিছানা থেকে। দরজাটা তখনও ঠেলছে দিদি।

—কী রে? ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?

অন্য দিন দিদি যখন ঘরে ঢোকে তখন মুখটা কেমন গম্ভীর দেখায়। দিদিকে ভয় করে। দিদির দিকে চাইতেই ভয় করে তার। দিন রাত

যতক্ষণ সামনে থাকে ততক্ষণ কেবল বকে দিদি। কেবল মন দিয়ে লেখাপড়া করতে বলে।

এ-সংসারে জন্মে পর্যন্ত বুড়ি শুধু দারিদ্র্যই দেখেছে। কুন্তির মতন শুধু ঐশ্বর্যের আশে-পাশেই ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনও ঐশ্বর্যের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হবার সৌভাগ্য হয় নি। দেখেছে কলকাতা এত বড় শহর, এখানে এত বড় বড় বাড়ি। বাড়ির ভেতরের ঐশ্বর্যের আভাস কিছু কিছু বাইরের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েও দেখতে পেয়েছে। কিন্তু কখনও ভেতরে ঢুকতে অধিকার পায় নি। পাবার আশাও কখনও করে নি।

দিদি তাই বার-বার কেবল উপদেশ দিতো—ভাল করে লেখাপড়া করলে তোরও ভাল জায়গায় বিয়ে হবে, তখন তোরও বাড়ি হবে, গাড়ি হবে—

কিন্তু বুড়ি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে দেখেছে তার দিদিমণিরা যারা তাদের স্কুলে পড়ায়, যে দিদিমণি তাকে মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে নিয়ে বাড়িতে রোজ পড়াতে আসে, তাদের বাড়ি হয় নি, গাড়ি হয় নি। অনেকের বিয়েই হয় নি। অথচ সবাই তো বি-এ এম-এ পাস করেছে। দিদিমণিরা তো সবাই গরীব। শুধু টাকার জন্যে স্কুলে পড়াতে আসে। তা হলে লেখাপড়া শিখে কী হলো? এত পরিশ্রম করে লেখাপড়া শিখে যদি শেষ পর্যন্ত স্কুলমাস্টারিই করতে হয় তো লেখাপড়া শেখবার দরকারটা কী? অথচ দিদি তো লেখাপড়া শেখে নি। দিদি তো তার বই পড়েও কিছু বুঝতে পারে না। তা হলে দিদি এত টাকা উপায় করে কী করে? দিদি কী করে তার জন্যে চল্লিশ টাকা দিয়ে মাস্টার রাখে! লেখাপড়া না শিখেও দিদি তো অনেক টাকা উপায় করে। তাদের বাড়ি-ভাড়া, তাদের খাওয়া-খরচ, কত কী আছে। তার অসুখের সময় হাসপাতালেই তো পাঁচ শো টাকা খরচ হয়ে গেছে। সে-সব টাকা এলো কোত্থেকে?

ঘরের ভেতর ঢুকেই কিন্তু দিদি কেমন যেন হঠাৎ বড় ভাল ব্যবহার করতে লাগলো।

—কী রে, খেয়েছিস?

এমন গলায় কখনও কথা বলে না দিদি। দিদির বোধ হয় খুব পরিশ্রম হয়েছে। মুখে গালে তখনও সামান্য-সামান্য রং লেগে আছে। দিদি আস্তে আস্তে মাথার ফল্‌স্‌-খোঁপাটা খুলে ফেললে। আগে অনেক চুল ছিল দিদির। এখন আর সে-চুলে কুলোয় না। এখন দোকান থেকে নাইলনের চুল কিনে

খোঁপা তৈরী করতে হয়। দিদির চেহারাটাও যেন আগের চেয়ে অনেক রোগা রোগা হয়ে গেছে। বুড়ি দেখতে লাগলো চেয়ে চেয়ে।

—তুই শো না, তুই কেন জেগে আছিস?

তার পর শাড়ি-ব্লাউজ বদলে খেতে বসবার আগে আবার বুড়ির কাছে এলো।

—আজ দিদিমণি এসেছিল তোর?

—হ্যাঁ।

—পড়লি?

—হ্যাঁ পড়েছি। ভূগোল আর অঙ্ক করলুম।

—তা ইংরিজিটা ভাল করে পড়লি না কেন? ইংরিজিটাই আসল, জানিস! আমি যদি একটু ভাল ইংরিজি বলতে পারতুম তা হলে আরো অনেক টাকা উপায় করতে পারতুম। তোকে এত লেখাপড়া শেখাচ্ছি কেন? কত টাকা খরচ করছি তোর জন্যে, দেখছিস্ তো! তুই বড় হয়ে আমার মত যাতে কষ্টে না পড়িস, সেই জন্যেই। খুব ভালো করে পড়বি—

বুড়ি বললে—আমি তো ভালো করেই পড়ি—

কুন্তি আবার বলতে লাগলো—খারাপ মেয়েদের সঙ্গে মোটে মিশবি না। বাসে ট্রামে অনেক খারাপ-খারাপ মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের কথা মোটে শুনবি না, বুঝলি? কলকাতা বড় খারাপ জায়গা রে! আগে এত খারাপ ছিল না, যত দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হয়ে যাচ্ছে—সবাই কেবল টাকা-টাকা করে মরছে।

—কিন্তু দিদি—

—কী বলছিস্, বল্—

—আমার দিদিমণিরা তো সবাই লেখাপড়া শিখেছে, বি-এ এম-এ পাস করেছে, তাদের তো কই টাকা হয় নি? তারাও খুব গরীব—

কুন্তি এ-কথার কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। তার পর হঠাৎ যা কখনও করে না তাই-ই করে ফেললে। একেবারে বুড়িকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে। তার পর বুড়ির মাথাটা বুকের কাছে নিয়ে এসে চেপে ধরলে। বুড়ি দিদির কাছ থেকে হঠাৎ এই আদর পেয়ে যেন বর্তে গেল। এমন করে কোনও দিন তো আদর করে না দিদি! আজ হঠাৎ কী হলো দিদির?

দিদি বলতে লাগলো—ওরে, তুইও দেখছি আমার মতন! তুইও দেখছি

টাকা দিয়েই সব জিনিস বিচার করিস ! জানিস, কত বড় বড় লোক কলকাতায় আছে, টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছে, অথচ তাদেরও যা অবস্থা আমাদেরও সেই অবস্থা। তারা হয়ত বড় বড় বাড়িতে বাস করে, আর আমরা ভাড়াটে বাড়িতে থাকি— কিন্তু আসলে কোনই তফাৎ নেই—

এ যেন বুড়ির কাছে নতুন কথা সব। এমন কথা আগে কখনও শোনে নি কারো কাছে। যদি টাকাটাই আসল লক্ষ্য না হয় তা হলে এত কষ্ট করে লেখা-পড়া করার দরকার কী ?

কুন্তি বললে—বড় হলে তখন বুঝতে পারবি কেন তোকে এত লেখাপড়া শেখাচ্ছি। তখন বুঝতে পারবি আমরা কেন গরীব লোক, আর বড়লোকেরা কেন বড়লোক। পৃথিবীতে গরীব লোক না থাকলে বড়লোকেরা কাদের ওপর হুকুম চালাবে ? কাদের চাকর রাখবে বাড়িতে ? কারা তাদের বাসন মেজে দেবে, রান্না করে দেবে, ঘর ঝাঁট দিয়ে দেবে ?

—কিন্তু তুমিও তো বড়লোক দিদি, তুমিও তো লেখাপড়া না শিখে অনেক টাকা উপায় করো।

—দূর আমি আর কত টাকা উপায় করি, দিন-রাত্তির মুখের রক্ত উঠিয়ে তবে আমাকে সংসার চালাতে হয়, তোর ইস্কুলের মাইনে, তোর মাস্টারের মাইনে যোগাতে হয়। কিন্তু চিরকাল তো এমন পারবো না। তখন তো তোকেই সব দেখতে হবে ; তোর বিয়ে হবে, ছেলে-মেয়ে হবে, সংসার হবে—

তার পর খেতে বসে কুন্তি আপন মনেই বলতে লাগলো—অথচ জানিস, আমার বয়েসী অনেক মেয়েকে কিছুই করতে হয় না, বাবার টাকায় তারা গাড়ি চড়ে, ক্লাবে যায়, কুকুর পোষে, আর ঠিক সময়ে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে তাদের বিয়েও হয়ে যায়—

সত্যি, দিদি তার সঙ্গে কখনও এমন করে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলে না। আজ যেন বড় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো দুই বোনে। খেয়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার পরেও যেন কথা ফুরোয় না দিদির।

—জানিস, বড়লোকরা মনে করে আমরা যেন মানুষই নয়। আমাদের টাকা নেই বলে তারা আমাদের ভাবে গরু ভেড়া জানোয়ার। অথচ এই যে আমরা জানোয়ার হয়েছি, এ আমাদের কারা করেছে বল্ তো ?

—কারা দিদি ?

—ওই ওরাই তো করেছে। ওদের জন্যেই তো আমরা গরীব রে ? ওরাই

তো আমাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। আমাদের বাবাকে খুন করেছে, আর এখন বেশ খদ্দরের চাদর-পাঞ্জাবি পরে দেশ-উদ্ধার করছে। ওরাই হচ্ছে আসল কমিউনিস্ট্—

—কমিউনিস্ট্? তার মানে কি দিদি?

—সে তুই বড় হয়ে লেখাপড়া শিখলে বুঝতে পারবি। কমিউনিস্ট্ মানে যারা গরীবদের কথা ভাবে না, গরীবদের ঘেন্না করে, যারা চায় তারা নিজেরা বড়লোক হবে আর অন্য লোকেরা তাদের গোলামী করবে।

তার পর একটু থেমে বললে—তাই তো বলছিলুম, খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করবি ভাই! আমি নিজে লেখাপড়া করি নি, আমাকে লেখাপড়া শেখাবার মত পয়সা ছিল না বাবার, কিন্তু তোর তো সে-রকম অবস্থা নয়—তুই লেখাপড়া শিখে বড়লোক হয়ে ওদের মুখে জুতো মারতে পারবি না?

অন্ধকারে দিদির মুখখানা দেখা যায় না। তবু মনে হলো দিদি যেন কোথাও অপমান হয়ে আজ বাড়িতে ফিরে এসেছে। আজকেই তো বুড়ি সেই বড়-লোকটার পকেট থেকে মানিব্যাগটা তুলে নিয়ে এসেছে। বলবে নাকি দিদিকে? বলবে নাকি যে, চায়ের দোকানে ঢুকে সে দিদির গলা শুনতে পেয়েছিল! দিদি যে-চায়ের-দোকানে গিয়েছিল, বুড়িও ঠিক সেই দোকানে গিয়ে পাশের ঘরটাতেই বসেছিল? বলবে নাকি সব?

—ঘুমুলি নাকি বুড়ি?

—না, শুনছি—।

—আর নয়, অনেক রাত হয়ে গেল, এবার ঘুমো। দিদিমণি কতক্ষণ পড়ালো?

বুড়ি বললে—সন্ধ্যে থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত।

—খুব ভালো, খুব ভালো। খালি লেখাপড়া নিয়ে থাকবে তুমি। আর কোনও বাজে চিন্তা করবে না, পরে আড্ডা দেবার বায়োস্কোপ দেখবার অনেক সময় পাবে। কিন্তু এই বয়েসটাই বড় খারাপ, এই বয়েসটাতেই যদি সাবধান হয়ে চলতে পারো তো আর কোনও ভয় নেই। কেবল এই কথাটি মনে রাখবে এ-পৃথিবীতে তোমার ক্ষতি করবার লোকের কখনও অভাব হবে না, সবাই তোমার খারাপ হোক এইটেই চাইবে—তার মধ্যে থেকে তোমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে নিজের চেষ্টায়, কেউ তোমায় সাহায্য করতে আসবে না। তুমি মরলে কি বাঁচলে তার জন্যে পৃথিবীর কারো মাথাব্যথা নেই...

বুড়ি বোধ হয় ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে, তার একটানা নিঃশ্বাস পড়বার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তার অনেকক্ষণ পরেও কুন্তির ঘুম এলো না। সব নিস্তব্ধ, নিঝুম। সমস্ত কালীঘাটই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লো বুড়ির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কুন্তিরা অত সহজে ঘুমোতে পারে না। কলকাতায় কুন্তিদের যে অনেক জ্বালা! কুন্তিদের ঘুম কেড়ে নেবার জন্যে যে বিংশ-শতাব্দীর মানুষ অনেক কলকাঠি করেছে। অনেক শিবপ্রসাদ গুপ্ত যে অনেক সোনার মেডেল দিয়ে মহাপুরুষ সাজবার চেষ্টা করেছে। অনেক পদ্মরাণী যে অনেক ফ্ল্যাট্-বাড়ি খুলে কুন্তিদের টগর বানিয়েছে। কলকাতার মানুষ যে অনেক কায়দা করে কুন্তিদের লজ্জা হরণ করে কলিকালের লজ্জাহারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ তো একদিনে হয় নি। এক যুগেও হয় নি। ইংরেজরা চলে যাবার পর থেকেই এর সূত্রপাত। তার পর যত দিন যাচ্ছে ততই লোভের অঙ্ক বেড়ে বেড়ে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। আজ ধরা দিয়েছে কুন্তি, কাল ধরা দেবে বুড়ি। তার পর ধরা দেবে কলকাতার সব কুমারী মেয়ে। একবার যখন জাল ফেলেছে ওরা তখন আর মুক্তি নেই। সকলকে ডাঙায় তুলে তবে নিশ্চিন্ত হবে পদ্মরাণীরা। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে শোবে।

কুন্তিও বিছানার ওপর পাশ ফিরলো।

মিস্টার বোস পরদিন অফিসে গিয়ে ছনিবাবুকে ডেকে পাঠালেন।

ছনিবাবু ফ্যাক্টরিতে কাজ করলে কী হবে, নাটক নিয়ে বাতিক আছে ছোটবেলা থেকে। বহুদিনের শখ ছিল থিয়েটারে প্লে করবার, থিয়েটারের নাটক লেখবার। সে-আশা মেটে নি। পেটের দায়ে সুযোগ পেয়েই ঢুকে পড়েছিল সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এ। লোহা-লক্কড় নিয়ে নাড়াচাড়া করতো বটে কিন্তু মন পড়ে থাকতো থিয়েটার সিনেমায়। ছনিবাবুর মনে হতো ফ্যাক্টরিতে ঢুকেই তার সব ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাড়িতে বসে রাত জেগে একখানা নাটক লিখে ফেলেছিল। সেই নাটকই—'কর্ণাট-রাজকুমারী', অন্যান্য বছরে থিয়েটারের দল ভাড়া করে আনা হতো। তারাই টাকা নিয়ে থিয়েটার করে যেতো। কিন্তু এবার ওয়েল-ফেয়ার অফিসার মিস্টার ভাদুড়িকে বলে-কয়ে এই নাটকখানাই নামাবার

ব্যবস্থা করেছিল। কোম্পানীও দেখেছিল যদি তাই-ই হয় তো মন্দ কী! স্টাফ্-রিক্রিয়েশন্ ক্লাবও হাতে থাকবে, অথচ পয়সাটাও বাইরের লোক খাবে না।

ভুনিবাবু সামনে আসতেই মিস্টার বোস ধমক দিয়ে উঠলেন।

তা অন্যায় কিছু বলেন নি মিস্টার বোস। যে-ঘটনা ঘটেছে কালকে তা স্থভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের লাইফে ঘটে নি। অমন মাননীয় গেস্ট্‌কে অমন ভাবে মুখের ওপর অপমান করা, এ কল্পনারও বাইরে ছিল। মিস্টার গুপ্ত অবশ্য রেস্‌পেক্টেবল্ লোক। কিছু বলেন নি তিনি সামনা-সামনি। হাসিমুখেই সব সহ্য করে গেছেন। কিন্তু পাশেই ছেলে বসে ছিল—সে-ই বা কী ভাবলে! তা ছাড়া মিস্টার বোসকে তো অনেক কথাই ভাবতে হয়। আজকে না হয় মিস্টার গুপ্ত কিছু বললেন না, সমস্ত হাসিমুখে হজম করে গেলেন। কিন্তু কালকেই তো আবার মিস্টার বোসকে মিস্টার গুপ্তর কাছে যেতে হবে। একটা নতুন কোনও লাইসেন্স্ বা পারমিট পেতে গেলে মিস্টার শিবপ্রসাদ গুপ্তই তো ভরসা।

ভুনিবাবু সামনে দাঁড়িয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছিল।

—ও মেয়েটা কে?

—আজ্ঞে স্যার, ও একজন আর্টিস্ট্।

—ওর নাম কী?

—কুন্তি গুহ—

—কোথায় বাড়ি?

ভুনিবাবু বললে—আগে যাদবপুরে থাকতো, সেখান থেকে বেহালা সরকার-হাটে গিয়ে কিছুদিন থাকে, তার পর এখন আছে কালীঘাটে বাড়ি ভাড়া করে—

—রেফিউজি মেয়ে?

—আজ্ঞে, বোধ হয় তাই।

—কমিউনিস্ট?

ভুনিবাবু বললেন—তা জানি না—উনি তো নানা জায়গায় ক্লাবে ক্লাবে প্লে করে বেড়ান—খুব নাম-করা আর্টিস্ট বলেই ওঁকে ডেকে এনেছিলুম—

—আপনি জানতেন না উনি কমিউনিস্ট কি-না?

—আজ্ঞে না স্যার, আমি কিছুই জানি না।

—কমিউনিস্ট যদি না হবে তো একজন রেস্‌পেক্টেবল্ লোকের নামে অমন করে সভায় দাঁড়িয়ে ও-কথা বললে কেন ? ও জানে না যে শিবপ্রসাদ গুপ্ত কলকাতার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ? শুধু কলকাতার কেন, সারা ইণ্ডিয়ার একজন ওয়েল-নোন্ লীডার। তিনি তেরো বছর জেল খেটেছেন, ইচ্ছে করলে এতদিন কবে ক্যাবিনেট-মিনিস্টার হতে পারতেন—। আর তা ছাড়া আমার গেস্ট্ তিনি, আমার ফ্যাক্টরির মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁকে অপমান করা ? জানেন, আমি তাকে পুলিস দিয়ে অ্যারেস্ট্ করাতে পারতুম ? পুলিস-কমিশনারকে বলে আমি তাকে লক্‌আপে পুরতে পারতুম ?

ভুনিবাবু সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু উত্তর দিলে না।

—জানেন কত রেস্‌পেক্টেবল্ লোক কালকে প্রেজেণ্ট্ ছিল! মিস্টার গুপ্তকে অপমান করা মানে তো তাদের সকলকে অপমান করা। আর মিস্টার গুপ্ত যখন আমার গেস্ট্ তখন তাঁকে অপমান করা মানে আমাকেও অপমান করা।

এরও কোনও জবাব দিলে না ভুনিবাবু।

—ওকে পেমেণ্ট করা হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ স্যার, হাণ্ড্রেড্ রুপীজ ওর চার্জ, সব টাকাটাই দেওয়া হয়ে গেছে।

—বেশ করেছেন! এখন আপনাকে একটা কাজ করতে হবে, আপনি তার বাড়িতে যান, গিয়ে তার কাছ থেকে রিট্‌ন্ অ্যাপলজি চেয়ে নিয়ে আসুন। আই ওয়াণ্ট্ ইট্ ইন হার ওন হ্যাণ্ড-রাইটিং—যান।

ভুনিবাবু ছাড়া পেয়ে বাঁচলো যেন। চাকরিটা যায় নি তার এই-ই রক্ষে! খোদ্ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এমন করে কখনও ডাকে না। তার হাত থেকে যে ছাড়া পাওয়া গিয়েছে এই-ই ভাগ্য।

মিস্টার বোস টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিলেন। তার পর ডায়াল করতে লাগলেন।

তার পর—হ্যালো—

ওপাশ থেকে শিবপ্রসাদ গুপ্ত রিসিভারটা তুলতেই খানিকটা শুনে বললেন —হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন—

—আমি খবর নিয়েছি মিস্টার গুপ্ত, আমাদের স্টাফ-ইউনিয়নের সেক্রেটারিরই কাজ, আর যে মেয়েটা কালকে ও-রকম আন্-হোলি ব্যবহার করেছিল সে একজন রেফিউজী কমিউনিস্ট···

শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও-পাশ থেকে অমায়িক হাসি হাসলেন।

—আপনি কি এখনও ওই নিয়ে ভাবছেন নাকি? আমি তো ভুলেই গিয়েছি!

মিস্টার বোস বললেন—না না মিস্টার গুপ্ত, এটা অর্ডিনারি ব্যাপার নয়। হোল্ ক্যালকাটাতে এখন এই রকম প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা ছড়িয়ে যাচ্ছে। যারা সাক্‌সেসফুল লোক তাদের এগেন্‌স্টে সবাই অ্যান্টি-প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা চালাচ্ছে। দিস্ হ্যাজ গট্ টু বি স্টপ্‌ড্! এ-রকম চলতে দিলে তো কলকাতা শহরে আমাদের থাকা চলবে না। গাড়ি করতে পারবো না, বাড়ি করতে পারবো না, টাকা ইনকাম করতে পারবো না, আর তা করলেই ক্যাপিট্যালিস্ট হয়ে যাবো—হোয়াট্ ইজ্ দিস্? আপনি দিল্লীতে গিয়ে নেহরুকে এবার বলবেন, এই হচ্ছে বেঙ্গলের ট্রেণ্ড্—

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—ও-রকম কত বলবে মিস্টার বোস, ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। ও আগেও বলছে, এখনও বলছে, পরেও বলবে! গান্ধী নেহরু সকলের এগেন্‌স্টেই তারা বলে! রাস্তায় ঘাটে কত লোক নেহরুকে গালাগালি দেয়, দেখেন নি? তাতে নেহরুর কিছু আসে যায়? পাবলিক ওয়ার্ক করতে গেলে ওসব সহ্য করতে হবেই। আপনি ও-নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—

শিবপ্রসাদ গুপ্ত কথাটা গায়েই মাখলেন না সত্যি সত্যি। এর চেয়েও অনেক মিথ্যে প্রচার তাঁর নামে করা হয়েছে, পার্টি-পলিটিক্‌স্ যেখানে থাকবে সেইখানেই এ-রকম হবে। আজ পর্যন্ত কোনও পাবলিক ম্যান এ থেকে মুক্তি পায় নি।

—আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা কী বলছেন?

মিস্টার বোস বললেন—তারা সবাই বুঝেছে এটা ভিলিফিকেশন্ ছাড়া আর কিছু নয়। জানে তো আপনি পলিটিক্‌স্ নিয়ে আছেন, তাই কোনও অপোনেণ্ট পার্টির লোক ওকে দিয়ে ওই কথা বলিয়েছে—

—যা হোক, আমি চলে আসার পরে তার পর আর কী হলো?

মিস্টার বোস বললেন—আপনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন তাই, নইলে আমি অন্ দি স্পট্ মেয়েটাকে ডেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়াতুম। তবে আজকে আমি ওর রিট্‌ন্-অ্যাপলজি আনতে পাঠিয়েছি—আই মাস্ট্ হ্যাভ ইট্—

এর পর আর বেশিক্ষণ থাকা হলো না। মিস্টার বোস রিসিভারটা রেখে দিলেন। শিবপ্রসাদ গুপ্ত রেগে যান নি তা হলে। মিস্টার গুপ্তর রাগা-না-রাগার ওপর তাঁর কোম্পানী নির্ভর করছে অনেকখানি। মিস্টার গুপ্তকে দিয়ে আরো অনেক কাজ তাঁর করাবার বাকি আছে।

হঠাৎ কলিং-বেল টিপলেন মিস্টার বোস। চাপরাসী আসতেই তাকে গুপ্ত সাহেবকে ডেকে দিতে বললেন।

সদাব্রত এলো।

মিস্টার বোস বললেন—বোসো সদাব্রত—

তার পর ঠোঁটটা একটা বিচিত্র হাসি দিয়ে ভিজিয়ে নিলেন।

—আমি তোমার ফাদারকে এক্ষুনি ফোন করেছিলাম। কালকে যে কাণ্ডটা ঘটলো তার পর আমার সাইড থেকে যা অ্যাক্‌শান্ নিয়েছি তা বললাম তোমার ফাদারকে। আমার তো মনে হয় মেয়েটা কমিউনিস্ট—তোমার কী মত?

সদাব্রত কিছু উত্তর দিলে না।

তার আগেই মিস্টার বোস বললেন—আমি জানি না, তোমার এ-সম্বন্ধে কী মত, কিন্তু আমি জানি আমাদের মিডল্-ক্লাস সোসাইটিতে এই স্লোগ্যানটা খুব স্প্রেড করেছে। এখন থেকেই আমাদের কেয়ারফুল হওয়া দরকার। ওরা মনে করে বড়লোক হলেই যেন সবাই ক্যাপিট্যালিস্ট! সাক্‌সেস্‌ফুল ম্যানদের ওরা সহ্য করতে পারে না। অথচ আমাদের ডেমোক্র্যাটিক্ কান্ট্রি, এখানে সকলকেই তো ফ্রি-স্কোপ দেওয়া হয়, ওপ্‌ন্ কমপিটিশন, কেউ তো কাউকে বাধা দিচ্ছে না। তুমি যদি কোয়ালিফায়েড্ হও তো তুমিও সাইন্ করবে। সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট! কিন্তু এরা মনে করে আমরা বুঝি কাউকে ধরে খোসামোদ করে বড়লোক হয়েছি। আমাদের এখানে স্কুল রয়েছে কলেজ রয়েছে, সেখানে তোমরাও পড়তে পারো। তা পড়বো না, কিন্তু যারা লেখাপড়া করে মেরিট্ দেখাবে তারা যদি বড় হয় তো তাদের আমরা ক্যাপিট্যালিস্ট্ বলবো—সিলি—! এই জন্যেই তো বাঙালীরা সব ব্যাপারে পিছিয়ে পড়ছে, হোয়ারঅ্যাজ অন্য সব স্টেটের লোক এগিয়ে যাচ্ছে বাই লিপস্ এণ্ড বাউণ্ডস্—কী বলো? তোমার কী মত?

মিস্টার বোস প্রত্যেকটা কথাতেই সদাব্রতর মত চান, কিন্তু সদাব্রত মত দেবার আগেই নিজের মতটা জাহির করেন। এ-ক'দিনেই সদাব্রত

মিস্টার বোসের চরিত্রটা বুঝে নিয়েছে। দিনের পর দিন মিস্টার বোসের বক্তৃতা শুনে শুনে এখন আর তাকে অবাক হতে হয় না। কী উত্তর দিলে মিস্টার বোস খুশী হন, তাও সদাব্রত জেনে গেছে। চুপ করে থাকলে যে মিস্টার বোস আরো খুশী হন, তাও সদাব্রত জেনে গেছে। বোধ হয় মিস্টার বোস জীবনে সাক্সেস্ফুল লোক বলেই এটা হয়েছে। তাঁরা প্রতিবাদ সহ্য করেন না। যারা প্রতিবাদ করে তাদের তাঁরা আশে-পাশে ঘেঁষতেও দেন না। তাঁরা চারপাশে এমন এক পরিবেশ রচনা করে রাখেন যাতে সবাই তাঁদের কথায় শুধু 'ইয়েস' বলবে। 'না' বললে তাঁরা আঘাত পান। মিস্টার বোস সেই জাতের মানুষ।

—জানো সদাব্রত, কালকে যে-ঘটনা ঘটেছে সেটা একটা আইসোলেটেড ঘটনা নয়। এর পর এমন একদিন আসবে যেদিন আমরা গাড়ি চড়ে বেড়ালে আমাদের দিকে লোকে ঢিল ছুঁড়ে মারবে, আমরা দামী জামা-কাপড় পর্যন্ত পরতে পারবো না, আমাদের গায়ে তারা পানের পিচ ফেলবে। কোনও সুন্দর লোক রাস্তা দিয়ে গেলে লোকে তার মুখে অ্যাসিড্-বালব্ ছুঁড়ে মারবে। এরই নাম কমিউনিজম্, ইণ্ডিয়ার কিছু লোক এই কমিউনিজম্ই আনতে চাইছে এ-দেশে। এখন থেকে যদি আমরা কেয়ারফুল না হই তো কাল তোমার ফাদারকে মেয়েটা যা করেছে, একদিন তোমাকে আমাকে সবাইকেই ওই রকম করবে। আমি মিস্টার গুপ্তকে এই কথাই বুঝিয়ে বললুম। আমি ঠিক বলি নি? তোমার কী মত?

এতদিন কাজ করছে সদাব্রত, এটাও তার জানা। কিছুই তার জানতে বাকি নেই। টি-বি হসপিট্যালে গিয়ে যা দেখে এসেছে, সেখানেও তাই। বাগবাজারে কেদারবাবুর বাড়ি গিয়ে যা দেখে এসেছে, সেও তাই। মধু গুপ্ত লেন থেকে শুরু করে সারা কলকাতার সবাই-ই তো কমিউনিস্ট্! বাকি রইল কারা? বাকি রইল শুধু মিস্টার বোস, মিসেস বোস, আর তাদের ক্লাবের মেম্বররা। আর বাকি রইল যারা এই সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্-এর অফিসার।

একদিন ইংরেজরা চলে গিয়েছিল নিরুপায় হয়ে। চলে না গেলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব রসাতলে যেতো। এখন যেটুকু বাণিজ্য চলেছে সেটুকুও চলে যেতো। কিন্তু যাদের হাতে তারা শাসন-ভার দিয়ে গেল তারা বুঝি ইণ্ডিয়ার আরো অনেক বড় ব্যবসাদার। ইংরেজ-কোম্পানীর চেয়েও বড়।

এরা শুধু ব্যবসাই করে না, ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের বিবেকের ওপরেও শাসন চালাতে চায়। তাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার ওপরেও খবরদারি করতে চায়।

—তোমাকে আজ যে-সব বললাম সমস্ত তোমার ফাদারকে গিয়ে বলো। বলো আমি কী অ্যাক্‌শান্ নিয়েছি। বলো, আমি ও-সব কিছুই বিশ্বাস করি নি।

—কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছি।

—বিশ্বাস করেছ মানে? মেয়েটা যা বলেছিল কালকে সব সত্যি বলতে চাও?

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ—

—তার মানে মিস্টার গুপ্ত খুন করেছেন? মার্ডারার? অ্যাম্ আই টু বিলিভ্ ছাট?

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ, সমস্ত সত্যি কথা।

—বলছো কী তুমি?

সদাব্রত আবার বললে—শুধু আমার বাবা নয়, আপনি আমি. আমরা সবাই মানুষ খুন করেছি। এখনও করছি—

—হোয়াট ননসেন্স্ !!!

বোমার মত ফেটে পড়লেন মিস্টার বোস!—হোয়াট ডু ইউ মীন?

সদাব্রত বলতে লাগলো—ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট যেমন করে ক্ষুদিরামকে খুন করেছে, গোপীনাথ সাহাকে খুন করেছে, দিনেশ, বাদল, বিনয়কে খুন করেছে, আজ আমরাও ওই মেয়েদের ঠিক তেমনি করে খুন করছি। তারা লেখাপড়া করতে চায়, আর আমরা তাদের স্কুলে ঢুকতে দিই না। তারা যাতে লেখা-পড়া করতে না পারে সেজন্যে আমরা তাদের হাতে টাকাই দিই না। তারা পাছে ভাত খেয়ে বেঁচে থাকে তাই আমরা তাদের ভাত কেনবার পয়সাই দিই না, ভাতের সঙ্গে কাঁকর মিশিয়ে দিই। তারা যাতে ম্যালেরিয়া-কলেরা-টাইফয়েড্ হয়ে মরে যায়, তাই আমরা তাদের বাড়ির সামনের নর্দমা পরিষ্কারও করি না। একে খুন বলবো না তো কাকে খুন বলবো! টি-বি হলে পাছে ওষুধ খেয়ে তারা বেঁচে ওঠে তাই আমরা ওষুধ লুকিয়ে ফেলি—গরীব লোকদের বেচি না—! মেয়েটা তো কাল সত্যি কথাই বলেছে, এতটুকু মিথ্যে নয়।

—সদাব্রত !!! আর ইউ অফ্ ইওর হেড ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

সদাব্রত উঠে দাঁড়ালো।

বললে—আরো প্রমাণ চান ? তা হলে আজকে আপনি ক্লাবে না গিয়ে কলকাতার টি-বি হসপিট্যালে চলুন, সেখানে আমি আর একজন মানুষকে দেখাবো, মানুষের মত মানুষ, যাকে আমরা সবাই মিলে খুন করতে বসেছি—আর দু-একদিনের মধ্যে তিনিও খুন হয়ে যাবেন—

তার পর মিস্টার বোসের দিকে চেয়ে বললে—যাবেন আমার সঙ্গে ? দেখবেন ? দেখতে চান ?

নির্বাক হয়ে মিস্টার বোস সদাব্রতর দিকে চেয়ে রইলেন।

সদাব্রত আর সময় নষ্ট না করে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পর নিচেয় নেমে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে সোজা রাস্তায় গিয়ে পড়লো। গেটের দরোয়ান হাত তুলে লম্বা স্যালিউট্ করলে।

হাসপাতালে বিছানায় কেদারবাবু অসাড়ে শুয়ে ছিলেন। নার্স ছিল ঘরে। সদাব্রত যেতেই নার্স উঠে দাঁড়ালো। খানিকক্ষণ কেদারবাবুর দিকে চেয়ে নার্সকে জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছেন পেশেণ্ট ?

নার্স বললে—টেম্পারেচার সেই রকমই, একশো চার—

—ভিজিটিং ডক্টর এসেছিলেন ? কী বললেন ?

—প্রেসক্রিপশন বদলে দিয়ে গেছেন।

—রাত্রে ঘুম হয়েছিল ?

—ডিসটার্বড্ স্লিপ, ঘুমের মধ্যে 'শৈল' 'শৈল' বলে কয়েকবার চীৎকার করে

সদাব্রত টেম্পারেচার চার্টটা একবার দেখলে। দেখে বললে—প্রেসক্রিপশনটা দিন, আমি ওষুধগুলো কিনে নিয়ে আসি—

বলে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলে সামনে মন্মথ আর শৈল। দু'জনেই কেবিনের ভেতর ঢুকছিল। মন্মথকে দেখে সদাব্রত বললে—তোমরা বসো, আমি আসছি—

তার পর করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখেই হঠাৎ পেছন থেকে শৈলর গলা শোনা গেল। সদাব্রত পেছন ফিরে দেখলে।

শৈলর মুখ-চোখ ফোলা ফোলা। বললে—একটা কথা শুনুন—

সদাব্রত সিঁড়ি দিয়ে নেমেই গিয়েছিল, সেখান থেকে আবার ওপরে উঠে এলো। শৈলর কাছাকাছি দাঁড়ালো। বললে—তাড়াতাড়ি বলো কী বলবে, আমি ওষুধটা কিনে আনতে যাচ্ছি—

শৈল সদাব্রতকে ডেকে ফেলে যেন নিজের মনেই অনুতাপ করছিল। কেনই বা সে ডাকতে গেল? কী কথা তার বলবার ছিল? মন্মথই তাকে ডেকে নিয়ে এসেছে কাকাকে দেখতে। আসবার আগেও আশা করে নি এখানে এমন ভাবে সদাব্রতর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আর দেখা হওয়া মাত্রই তাকে ডেকে ফেলবে, তাও কল্পনা করে নি। এখন যেন বড় বিব্রত হয়ে পড়লো।

সদাব্রতই আবার কথা বললে।

—মাস্টার মশাইয়ের জন্যে তুমি বেশী ভেবো না, যা করবার আমি করছি, তুমি করতে না-বললেও করবো। আর হস্‌পিট্যালের পক্ষেও ওরা ওদের যত-দূর সাধ্য তা করবে। আমি নিজে আজ সকালে বাড়ি থেকে টেলিফোনে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। যা কিছু করা মানুষের পক্ষে পসিবল্ সবই করে যাবো। তুমি অত ভেঙে পড়ো না—

শৈল কী বলবে বুঝতে পারলে না ঠিক।

একটু থেমে বললে—আমি আপনার সঙ্গে যাবো?

—আমার সঙ্গে? কিন্তু মাস্টার মশাইকে দেখতে যাবে না?

শৈল বললে—আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—

সদাব্রতও কী বলবে বুঝতে পারলে না। এক মিনিট ভেবে নিয়ে বললে—চলো—

তার পর সোজা বাইরে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। শৈল উঠেছে আগে। শৈল বললে—গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বললে আপনার অসুবিধে হবে না তো?

গাড়ি তখন চলছে। সামনের দিকে একটা গাড়ি আসছিল, সেটাকে পাশ কাটিয়ে নিয়ে সদাব্রত আবার সোজা চালাতে লাগলো। অনেকক্ষণ পরে সদাব্রত পাশ ফিরে বললে—আমাকে কী বলবে তুমি বলছিলে?

শৈল বুঝলো আগের কথাটা সদাব্রতর কানে যায় নি। বললে—আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

—রাগ? রাগ করবার আমার সময় কোথায় বলো? একে নিজের চাকরি আছে, তার ওপর মাস্টার মশাইয়ের এই অসুখ, তার ওপর আরো এমন সব ব্যাপার আছে, যা বললেও তুমি বুঝবে না—আর তা ছাড়া রাগ করবো কার ওপর? তোমার ওপর? নিজেই যদি নিজের ওপর রাগ করে কষ্ট পাও তো আমি কী করতে পারি?

শৈল বললে—একটা কথা বলবেন?

—কী?

—সেই মেয়েটা কে?

—কোন্ মেয়েটা? সদাব্রত আকাশ থেকে পড়লো।

শৈল বললে—সত্যিই কি আপনি কেবল মেয়েদের সঙ্গে মিশে তাদের সর্বনাশ করে বেড়ান? আমার সঙ্গে কি আপনি সেইজন্যেই নিজে থেকে যেচে পরিচয় করেছিলেন? আমি অনেক ভেবে ভেবেও এর কোনও কূল-কিনারা পাই না। যেদিন প্রথম বাড়িওয়ালা আমাদের জলের কল কেটে দিয়েছিল, আপনি এসে পড়ে রাস্তার কল থেকে জল এনে দিয়েছিলেন, সেদিন কিন্তু আমি কিছুতেই সন্দেহ করতে পারি নি আপনি এমন—আপনাকে দেখে সেকথা কল্পনাও করা যায় না—

—তুমি কি এই কথা বলতেই আমার সঙ্গে এলে?

শৈল বললে—এ-কথার উত্তর না পেলে যে আমি পাগল হয়ে যাবো। আপনার জন্যে আমি কাকার সঙ্গে ঝগড়া করেছি, মন্মথর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। যারা এতদিন দেখে আসছে তারা আমার আজকের ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে গেছে। অভাব আমাদের সংসারে ছিল, অভাব হয়ত আমাদের সংসারে চিরকাল থাকবেও, সে আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আমি তো কাউকে ঠকাই নি যে আমাকেও অন্য লোকে ঠকাবে! আমি আপনার কাছে কী দোষ করেছিলুম যে আপনি আমাকে এই রকম করে ঠকালেন?

—মাস্টার মশাই এ-সব কথা শুনেছেন?

শৈল বললে—আপনার মাস্টার মশাইকে আপনি এখনও চেনেন নি? কাকা যে আমার চেয়ে আপনাকেই বেশি ভালবাসে, তা জানেন না?

—আর মন্মথ? সে?

শৈল বললে—সেও অবাক হয়ে গেছে আমার ব্যবহার দেখে। সে বলে—আমি তো এমন ছিলুম না। তা আমিও তো জানি আমি এমন ছিলুম না আগে। কিন্তু কেন এমন হলুম? কেন আপনি আমাকে এমন করলেন? আমি আপনার এমন কী ক্ষতি করেছিলুম?

সদাব্রত বললে—এ-সব কথার কি এইভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে উত্তর দেওয়া যায়?

—তা ছাড়া আর তো উপায় নেই। আপনি শুধু বলুন সেদিন যে মেয়েটা রাস্তায় আপনাকে অপমান করে গেল, তার সব কথা মিথ্যে! আপনি শুধু বলুন তাকে আপনি চেনেন না, তার সঙ্গে আপনার কোনও দিন কোনও সম্পর্কই ছিল না, আপনি নিজের মুখে সেইটুকুই শুধু বলুন, আমি তাই-ই বিশ্বাস করবো—

সদাব্রত বললে—না, আমি তাকে চিনি—

—কিন্তু সেইটেই তো আমি কল্পনা করতে পারি না ওদের মত মেয়েকে কেন আপনি চিনবেন? কেন আপনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন? আপনি যে অনেক উঁচুতে—

সদাব্রত যেন একটু বিরক্ত হলো।

—আশ্চর্য, তোমার মনে এই অবস্থার মধ্যেও ওই সব চিন্তা কেমন করে আসছে! তুমি এখনও এই সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো? তুমি কি মনে করো পৃথিবী এতই ছোট? শুধু কি আমরা নিজের-নিজের ছোট-ছোট সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না নিয়েই মেতে থাকবো? আর কিছু নেই ভাববার? তোমার কাকার অসুখ! সারা জীবন সৎপথে থেকে কেন এই মানুষটা আজ এমন করে অসুখে মরো-মরো হয়ে পড়ে থাকে? কেন তোমরা তিরিশ টাকার বেশি বাড়িভাড়া দিতে পারো না আর কেনই বা আর একজন দিনে তিনশো টাকা হাত-খরচ করেও ফুরিয়ে উঠতে পারে না? এ-কথা কি কখনও ভেবেছ তুমি?

কথা বলতে বলতে সদাব্রতর মুখ যেন লাল হয়ে উঠলো।

—তুমি জানো আজকে আমি দু-হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছি, আর হাত পেতে আমি তাই নিচ্ছি! অথচ আমার চেয়ে কি ভালো ছেলে কলকাতা শহরে নেই? বেছে বেছে একমাত্র আমাকেই বার করেছে মিস্টার বোস? আর শুধু আমিই বা কেন? আমার মতন আর কেউ কি নেই? আরো

অনেক আছে, যারা বলে পৃথিবীতে বেঁচে সুখ আছে, পৃথিবীতে সুবিচার আছে, পৃথিবীতে ন্যায়ের মর্যাদা আছে, অন্যায়ের শাস্তি আছে—

কী কথা বলতে বলতে কী কথা উঠে গেল! শৈল কী কথা বলতে এসেছিল আর কী কথা তুলে ফেললে সদাব্রত! বহুদিন থেকেই শৈল এ-মানুষটাকে দেখে আসছে। কাকার কাছে আসতো, কাকার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতো। তখন থেকেই আড়ালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনেছে আর সদাব্রতর সম্বন্ধে একটা মন-গড়া ধারণা করে নিয়েছিল। কিন্তু তার পর ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটাকে যেন ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। অথচ এ যেন ঠিক ঘৃণাও নয়। ঘৃণা মেশানো একটা অদ্ভুত আকর্ষণ। এই আকর্ষণের জন্যেই আজ শৈল নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সদাব্রতর সঙ্গে চলে এসেছে। কেমন যেন এ-মানুষটা ঠিক সাধারণ নয় তার কাছে। আর যারা তার কাকার কাছে আসে, সেই মন্মথ, গুরুপদ, শশীপদবাবু, তাদের সকলকেই দেখেছে শৈল। সকলের সম্বন্ধেই একটা বাঁধা ধারণা করে নিয়েছে মনে মনে। ও লোকটা সৎ, সে লোকটা পরোপকারী, এই লোকটা স্বার্থপর—এমনি একটা মোটামুটি ধারণাই তার বদ্ধমূল হয়েছে সকলের সম্বন্ধে। তাদের বাড়িওয়ালা, তাদের প্রতিবেশী, সবার সম্বন্ধেই একটা মূল্যায়ন হয়ে গিয়েছে একে একে। কিন্তু শুধু এই সদাব্রতর সম্বন্ধেই কোন সিদ্ধান্তে এসে এখনো পৌঁছোনো যায় নি। একবার মনে হয় এ-লোকটা যেন তাকে কাছাকাছি পেতে চায়, আর একবার মনে হয় লোকটা যেন তার কথা ভাবেই না। সে যে তার সঙ্গে একই গাড়িতে একসঙ্গে আসতে চাইল তাতে তো খুশী হলো না সদাব্রত! সদাব্রত তো আপন মনেই গাড়ি চালাচ্ছে আর যত আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে!

অন্ধকার হয়ে এসেছে কলকাতা। রাস্তায় রাস্তায় বাতি জ্বলে উঠেছে। পাশাপাশি বসে চলেছে শৈল। একেবারে সদাব্রতর পাশে।

—আচ্ছা, আপনি কি সারাদিন এই সবই ভাবেন?

—কী সব?

—ওই যে-সব কথা বলছেন! নাকি কথা বলতে হবে বলেই বলছেন?

সদাব্রত এতক্ষণ ধরে যে-সব কথা বলছিল তার মধ্যে হঠাৎ বাধা পড়ায় কেমন যেন চমকে উঠলো।

বললে—তার মানে?

—তার মানে ও-সব কথা তো খবরের কাগজে লেখা থাকে। ও-সব

তাদের লিখতে হয় বলেই তারা লেখে, কিন্তু কোনও মানুষ যে সে-সব কথা ভাবে তা তো জানতাম না।

—সে কি? কে বললে কেউ ভাবে না?

শৈল বললে—আমি যাদের দেখেছি তারা কেউ ভাবে না। সবাই অফিসে যায়, অফিস থেকে এসে পার্কে গিয়ে মীটিং শোনে, বাড়িতে এসে তাস খেলে কিংবা ছেলে পড়ায় আর তার পর ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—

—তোমার কাকাকেও দেখ নি তুমি? মাস্টার মশাইও কি তাদের দলে?

শৈল বললে—কাকার কথা ছেড়ে দিন, লোকে কাকাকে তো পাগল বলে। কিন্তু আপনি কেন ভাবেন? আপনি ভাল চাকরি করেন, দু'হাজার টাকা মাইনে পান, দু'দিন বাদে বিয়ে করবেন, আপনি কেন আমাদের মত গরীব লোকদের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে মাথা ঘামান? এও কি আপনার বিলাসিতা? খবরের কাগজের লোকদের কিছু বলছি না, কারণ সেটাই তাদের চাকরি, কিন্তু আপনার কিসের দায়?

এবার রসা রোডে এসে পড়লো সদাব্রতর গাড়ি।

সদাব্রত বললে—ও-সব কথা থাক, তুমি আমাকে কী বলবে বলছিলে, বলো। শুনি—

শৈল বললে—আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছিলেন আপনার টাকা ফেরত দিয়েছি বলে? আমাদের হাজার অভাব থাকতে পারে, কিন্তু তার ওপর যদি মানুষ বলে আমার আত্ম-অভিমান থাকে তো তাতে কি কিছু অন্যায় আছে, বলুন?

—কিন্তু আমি তো তোমার কাছে তার জন্যে কখনও কৈফিয়ৎ চাই নি!

—কৈফিয়ৎ না-ই বা চাইলেন, কিন্তু নিজের তরফ থেকেও তো আমার কিছু জবাবদিহি থাকতে পারে।

—জবাবদিহি যারা চাইবে তাদের কাছে তুমি জবাবদিহি করো, আমার ওতে দরকার নেই। তা ছাড়া, এই সামান্য জবাবদিহির জন্যে তোমার কাকাকে না দেখে আমার সঙ্গে আসা উচিত হয় নি। তুমি মনে করো না তুমি জবাবদিহি করলে তোমার কাকাকে আমি আরো বেশি করে দেখাশোনা করবো। মাস্টার মশাইয়ের জন্যে আমি যতটুকু করছি, তোমার অসুখ হলেও আমি ততটুকুই করবো।

শৈল বললে—আচ্ছা সত্যি বলুন তো, কাকার জন্যে আপনি কেন এত

করেন ? আসল কারণটা কী ? আপনি সেদিন কুড়িটা টাকা নেবার জন্তেও অপেক্ষা করলেন না, আবার তার ওপর আরো দু'শো টাকা দিয়ে গেলেন। আবার কালকে শুনলাম এখানে কাকাকে ভর্তি করবার জন্তে আপনার সাতশো টাকার মত খরচ হয়েছে—

—কেন, এমন ঘটনা তুমি আগে কখনও দেখ নি ? কানেও শোন নি কখনও ?

শৈল বললে—বইতে পড়েছি, সত্যযুগে এমন ঘটনা ঘটতো—আর কানে শুনেছি মারোয়াড়ীদের কথা। সত্যি-মিথ্যে জানি না, তারা নাকি সারা জীবন পাপ করে—সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্তে তীর্থক্ষেত্রে ধর্মশালা তৈরি করে দেয়।

—ধরে নাও আমিও কিছু পাপ করেছি—

—কী পাপ ?

সদাব্রত কোনও উত্তর দিলে না। হাসতে লাগলো সামনের দিকে চেয়ে।

—সেদিন যে-মেয়েটা ধর্মতলার রাস্তায় যে-অভিযোগ করলে আমার সামনে, সত্যিই কি আপনি সেই পাপ করেছেন ? সত্যি বলুন, সে যা বললে, সমস্ত তা হলে সত্যি ?

সদাব্রত এবারও কোনও উত্তর করলে না।

—আপনি বলুন, চুপ করে থাকবেন না, আমি আজ সেই কথাটা জিজ্ঞেস করবার জন্তেই আপনার সঙ্গে এসেছি। আপনার মত লোক মেয়েদের নিয়ে বাগানবাড়িতে গিয়ে ফুর্তি করে বেড়িয়েছে, এ যে আমার কল্পনারও অতীত। আমি যে এই সব লোকদেরই বরাবর ঘেন্না করে এসেছি, আমি যে তাদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না! সত্যিই আপনি তাই ? আপনি এত নীচ কাজ করতে পারেন ?

সদাব্রত তেমনি সামনের দিকে চেয়েই বললে—তার চেয়েও নীচ কাজ আমি করেছি—

—সে কি ? আপনি সত্যি বলছেন ?

—হ্যাঁ বিশ্বাস করো, আমি তার চেয়েও নীচ কাজ করেছি—

শৈল স্তম্ভিত হয়ে গেল সদাব্রতর কথা শুনে। সদাব্রতর মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। সে-মুখে তখন কোনও ভাবান্তর নেই। সদাব্রত আর হাসছে না। মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে গেছে।

—তা সেদিন সে যা-যা বললে সবই সত্যি ? সত্যিই আপনারা সেই মেয়েটার বাবাকে খুন করেছেন ?

সদাব্রত তেমনি ভাবেই মাথা নাড়লো।

বললে—হ্যাঁ—

—আপনি বলছেন কী ?

—হ্যাঁ, সত্যিই বলছি শৈল, আমরা সেই মেয়েটার বাবাকে সবাই মিলে খুন করেছি। সে সেদিন যা-যা বলেছিল, সবই সত্যি কথা, একটাও মিথ্যে কথা বলে নি সে !

—কিন্তু আশ্চর্য, আপনাদের পুলিসে ধরলো না ? আপনাদের ফাঁসি হলো না ?

—সব সময় তো মানুষ খুন করলেও ফাঁসি হয় না ! বেশির ভাগ তো ধরাই পড়ে না, তার ফাঁসি হবে কি ? আর শুধু যে ওই মেয়েটার বাবাকেই খুন করেছি তা-ই নয়, আরো কত লোককে যে খুন করেছি তার কি ঠিক আছে ! অথচ কেউ-ই এতদিন টের পায় নি। কেউ সন্দেহও করে না আমাদের, আমরা সবাই বুক ফুলিয়ে বেড়াই—

—কিন্তু আমার কাকা জানে এ-সব ?

—মাস্টার মশাই ? তিনি ভালো মানুষ, আমাকে ভালবাসেন, তিনি জানলেও বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস করলে আজকে আর এমন করে তাঁর অসুখ হতো না—

শৈল একটু এ-পাশে সরে এলো।

—কিন্তু কেন খুন করতে গেলেন ? টাকার জন্যে ?

—হ্যাঁ।

—সামান্য টাকা, আর কিছু নয় ? সামান্য টাকার জন্যে আপনারা এমন করে এককালে মানুষ খুন করেছেন ?

—টাকাকে তুমি সামান্য বলছো ? টাকাই তো সব ! এই যে আজকে তোমার কাকার অসুখের জন্যে এত টাকা খরচ হলো, এ কোথা থেকে আসতো শুনি, যদি আমি না দিতুম ? যদি আমি দু'হাজার টাকা মাইনে না পেতুম ? তখন কেমন করে তোমার কাকার চিকিৎসা হতো ? এই যে গাড়ি চড়ছি, এও তো টাকা দিয়ে কেনা, এই যে ওষুধ কিনতে যাচ্ছি, তাতেও তো টাকা লাগবে। লাগবে না ? টাকা এত তুচ্ছ !

শৈল আর ভাবতে পারলে না এত কথা। বললে—কিন্তু তা বলে আপনি মানুষ খুন করবেন?

—টাকার জন্যে শুধু মানুষ খুন কেন, পৃথিবীতে এমন কোনও পাপ নেই, যা আমি করতে পারি না!

—কিন্তু কী করে করেন? আপনার বিবেক বলে কিছু নেই?

সদাব্রত বললে—বিবেকের কথা ভাবলে তো আর বড়লোক হওয়া যায় না!

—তা হলে নিশ্চয়ই আপনি মদ খান। মদ খেলে শুনেছি বিবেক বলে নাকি কিছু থাকে না, মদ খেলে নাকি মানুষ পশু হয়ে যায়।

সদাব্রত বললে—তার দরকার হয় না, মদ না-খেয়েও আমরা খুন করতে পারি, খুন করে করে আমরা এখন এত পাকা হয়ে গেছি যে এখন আর মদের দরকার হয় না—

—আচ্ছা, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

শৈল ঘাড় ফিরিয়ে সদাব্রতর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে গেল। কিন্তু সদাব্রত ততক্ষণে গাড়িটা একটা জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। তার পর গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে বললে—তুমি একটু বসো, আমি ওষুধটা নিয়ে আসি—

শৈল চারদিকে চেয়ে দেখলে। এদিকটা বোধ হয় সাহেব-পাড়া। রাস্তায় ফুটপাথে বেশি ভিড় নেই। দু-একখানা দামী দামী গাড়ি রাস্তা দিয়ে হু-হু করে চলেছে।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। ও-পাশে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। বিরাট গাড়ি একটা। গাড়ির ভেতর একটা ছোট লোমওয়ালা কুকুর। পাগড়ি-পরা ড্রাইভার গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে গাড়িটা ঝাড়া-মোছা করছে। হঠাৎ সামনের একটা দোকান থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। সিল্কের কাঁধ-কাটা বডিস, তার ওপর ফিনফিনে পাতলা শাড়িটা বার-বার খসে পড়ে যাচ্ছে। এসেই সামনে সদাব্রতর দিকে চেয়ে ডাকলে—মিস্টার গুপ্ত, মিস্টার গুপ্ত—

সদাব্রত ওষুধের দোকানের মধ্যে ঢুকছিল। পেছন থেকে ডাক শুনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। তার পর মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল। শৈল অবাক হয়ে গেছে। এ মেয়েটাও কি সদাব্রতর চেনা! দু'জনের হাসি-কথা-ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হলো যেন দু'জনের অনেক দিনের চেনাশোনা! অনেক দিনের আলাপ-পরিচয়! বড় ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা! কি আশ্চর্য, সদাব্রতর কি মেয়েদের সঙ্গে এতই ভাব? সেদিন যে-মেয়েটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে

অপমান করেছিল সদাব্রতকে, সে বোধ হয় গরীব ছিল। সাজ-পোশাকের অত বাহার ছিল না তার। কিন্তু একে তো বড়লোক বলেই মনে হয়। নিজের গাড়ি, নিজের ড্রাইভার, নিজের কুকুর। কুকুরটা গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছটফট করছিল। মেয়েটা তাই দেখে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে নিলে।

তার পর কী হলো কে জানে! সদাব্রত মেয়েটাকে নিয়ে শৈলর কাছে এলো।

সদাব্রত কাছে এসে বললে—এই তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই শৈল, ইনি হচ্ছেন মিস্ বোস, আর ইনি······

মিস্ বোসের দিকে চেয়ে সদাব্রত বললে—ইনি মিস্ রায়—

—হাউ ডু ইউ ডু—

বলে একগাল হেসে মিস্ বোস শৈলর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলে। ফর্সা হাত। আঙুলের নখগুলো বড় বড়। নখের মাথায় কী চমৎকার রং করা! শৈলর নিজের হাতটা বার করতেও লজ্জা করতে লাগলো। নিজের নখগুলোর কথাও তার মনে পড়লো। বাটনা-বাটা, রান্না-করা, বাসন-মাজা আঙুলগুলো মেয়েটার সামনে বার করতে সংকোচ হতে লাগলো। সমস্ত গায়ে ভুর ভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে। কেন সে মরতে এলো সদাব্রতর সঙ্গে? সে হাসপাতালে গিয়েছিল কাকাকে দেখতে, সেখানেই সে থাকতে পারতো।

মেয়েটার কোলের মধ্যে বসে-থাকা কুকুরটা তখন বেশ আরামে বুকের সঙ্গে মিশে আছে। মেয়েটা হাত বাড়িয়ে দিতেই একবার জল-জল করে তাকালো শৈলর দিকে। তার পর শৈল তার হাতখানা বাড়াতেই কুকুরটা একবার ভেউ ভেউ করে উঠলো।

—ডোণ্ট বি সিলি পেগী!

বলে মেয়েটি আদর করে কুকুরটার মাথায় আলতো চাটি মারলে।

মেয়েটা বললে—আপনি ভয় করবেন না, পেগী নতুন লোক দেখলেই একটু চেঁচায়, তার পর আর কিছু বলে না, মিস্টার গুপ্তকেও প্রথম দিন দেখে বার্ক করেছিল—

শৈল কী করবে, কী বলবে, কী রকম ব্যবহার তার করা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছিল না। সমস্ত শরীরটা ঘেমে নেয়ে উঠেছে তার। জীবনে অনেক রকম মেয়েমানুষ দেখেছে। নিজেও মেয়েমানুষ। কিন্তু এমন

মেয়েমানুষ, এমন সাজ-পোশাক, এমন গয়না, এমন খোঁপা কখনও দেখে নি এর আগে।

সদাব্রত বললে—মনিলা, তুমি একটু ওয়েট্ করো, আমি ওষুধ কিনে নিয়ে আসছি—

আর মিস্ বোস সদাব্রতর গাড়ির দরজা খুলে একেবারে শৈলর পাশে এসে বসলো।

—সো, আপনার ফাদারের অসুখ! জানেন, অসুখের কথা শুনলে আমার ভারি কষ্ট হয়। আমার এই পেগীর একবার অসুখ হয়েছিল, কিছ্ছু খেতো না, আমার এত কষ্ট হতো, কী বলবো!

মিস্ বোস গড়-গড় করে কথা বলে যেতে লাগলো। মুখের হাতের ঠোঁটের খোঁপার ভঙ্গী করতে লাগলো। মাঝে মাঝে হ্যাণ্ড-ব্যাগ খুলে ঠোঁটের রং ঠিক করে নিতে লাগলো। শৈল অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেই দিকে। এর সঙ্গে সদাব্রতর পরিচয় হলো কী করে? কে এ?

—ছোটবেলায় আমার একবার অসুখ হয়েছিল জানেন, আমি সে-ক'দিন আয়নাতে আমার মুখই দেখি নি। মুখখানা এত বিচ্ছিরি দেখায় যে সেদিকে চাওয়াই যায় না। সেই জন্যে আমি কখ্খনো হস্পিটালে যাই না। আমার বাবার যখন ফ্লু হয়েছিল, আমি একদিনও বাবাকে দেখতে হস্পিটালে যাই নি। আমি বাবাকে বলেছিলাম—না বাবা, আমি হস্পিটালে যাবো না, তোমাকে বড় আগ্লি দেখাবে—

শৈল এতক্ষণ অনেক কষ্টে নিজের কৌতূহল চেপে রেখেছিল। এবার আর চাপতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—সদাব্রতবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ হলো কী করে?

—হু! মিস্টার গুপ্ত? মিস্টার গুপ্ত যে আমার বাবার ফার্মের পারচেজিং অফিসার! বাবা মিস্টার গুপ্তকে মান্থলি টু-থাউজ্যাণ্ড চীপ্স্ দেয়। আপনি জানতেন না?

বলে কাজল-পরা চোখ দুটো বড় বড় করে শৈলর দিকে চাইলে।

—চলুন না, ক্লাবে যাবেন? তিনজনে গিয়ে তাস খেলবো! আপনি কিটি খেলতে জানেন?

শৈল অবাক হয়ে গেল।

—ক্লাবে? সদাব্রতবাবু কি এখন ক্লাবে যাবেন—?

—আপনি যদি যেতে চান যেতে পারেন !

তার পর নিজের হাতের ঘড়িটা দেখে বললে—অলরেডি লেট হয়ে গেছে আমার, মিস্টার ভোপৎকার এতক্ষণ আমার জন্যে ওয়েট্ করছেন হয়ত। আজকে আমি এখানকার সেলুনে ড্রেস করতে এসেছিলাম—আমার খোঁপাটা কী রকম করেছে বলুন তো ? খুব বিউটিফুল !

শৈল খোঁপার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ, ভালো—

—বড্ড কস্ট্লি মিস্ রায়, এরা বড়লোক পেয়ে আমাদের কাছ থেকে বড্ড দাম নিয়ে নেয়। কিন্তু কী করবো, এতো ভালো হেয়ার-ড্রেসিং ক্যালকাটাতে আর তো কেউ করতে পারে না—

শৈল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো—সদাব্রতবাবুর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ ?

—হু ? মিস্টার গুপ্ত ? এই তিন মাস হবে—

—মোটে তিন মাস ?

মিস্ বোস বললে—মিস্টার গুপ্ত একজন নাইস জেণ্ট্ল্ম্যান—জানেন, ওর বাবা সিনিয়র মিস্টার গুপ্ত নেহরুর পার্সোন্যাল ফ্রেণ্ড ! আপনি জানেন তা ? থার্টিন ইয়ার্স তিনি ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের জেল খেটেছেন। নট্ এ ম্যাটার অব্ জোক্ ! একজন বোনাফায়েড্ পলিটিক্যাল সাফারার—

শৈল হঠাৎ আবার একটা প্রশ্ন করে বসলো—আপনাদের বুঝি রোজ দেখা হয় দু'জনের ?

—অল্‌মোস্ট রোজ !

—রোজ ?

মিস্ বোস বললে—হ্যাঁ, মিস্টার গুপ্তও আমাদের ক্লাবের মেম্বর যে। কিন্তু কী সিলি দেখুন, মিস্টার গুপ্ত হুইস্কি খেতে খুব ভালবাসেন। আচ্ছা আপনি বলুন তো, আমাদের এই ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে হুইস্কি খাওয়া কি ভালো ? আমি তো মিস্টার গুপ্তকে রাম্ খেতে বলি ! আপনি কী বলেন ?

শৈল চমকে উঠছে।

—সদাব্রতবাবু মদ খান ?

মিস্ বোস বললে—মদ নয় রাম্—মাইল্ড্ ড্রিঙ্ক—

—রাম্ মানে ?

শৈল বুঝতে পারলে না।

মিস্ বোস বললে—আমার এই পেগীও তো রাম খায়। কিন্তু হট্ রাম্ খাবে না, এত পাজি জানেন! আপনি শুধু ওয়াটার দিন পেগীকে, কিছুতেই খাবে না, কিন্তু ফ্রিজের জল দিন, চুক চুক করে খেয়ে নেবে—

বলে আদর করে আবার পেগীর মাথায় আলতো চাঁটি মারলে।

শৈল তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। মনে হলো এখনি সে গাড়ির দরজা খুলে বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, সদাব্রতবাবু কি রোজ-রোজ মদ খান?

মিস্ বোস বললে—রোজ খায় না, মাঝে মাঝে খায়। অথচ দেখুন আমি বলেছি রোজ এক পেগ খাওয়া ভাল, ওতে নার্ভটা ভাল থাকে—জানেন তো আমরা এন্‌গেজ্‌ড্—

—এনগেজ্‌ড্ মানে?

মিস্ বোস বললে—ইউ ডোণ্ট্ নো? আপনি স্টেট্স্‌ম্যান পড়েন না? আমাদের এন্‌গেজমেণ্ট তো অ্যানাউন্স্‌ড্ হয়ে গেছে—আমাদের যে বিয়ে হবে ভেরি স্থন—

শৈলর মনে হলো বাইরের সমস্ত হাওয়া বুঝি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আর ঠিক সেই সময়ে সদাব্রত এসে হাজির হলো। হাতে একটা ওষুধের প্যাকেট। এসেই বললে—চলো, চলো, দেরি হয়ে গেল খুব, হস্‌পিট্যালের ভিজিটিং-আওয়ার্স বন্ধ হয়ে এলো—চলো—

মিস্ বোস বাইরে বেরিয়ে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে—তুমি ক্লাবে আসছো? হস্‌পিট্যাল থেকে সোজা ক্লাবে চলে এসো না, মিস্টার ভোপৎকার বোধ হয় এখনও ওয়েট্ করছে আমার জন্যে—আমি তোমার জন্যে ওয়েট্ করবো—টা-টা—

মিস্টার বোসকে সাকসেস্‌ফুল লোক না-বলে উপায় নেই। পৃথিবীতে যা-কিছু হলে লোককে মহাপুরুষ বলা যায় তিনি তাই-ই। আবার কী হতে পারে মানুষ? বাড়ি-গাড়ি ফ্যাক্টরি-টাকা-ইনফ্লুয়েন্স দিয়েই তো মানুষের বিচার। দেখতে হবে দশজনে তোমায় মান্য করে কি-না, দেখতে হবে তোমার এক মিলিয়ন টাকা আছে কি-না। এক মিলিয়ন টাকার কম থাকলে তোমাকে আর আমরা সাকসেস্‌ফুল

লোক বলবো না। অবশ্য টাকা না থেকেও সাকসেস্‌ফুল লোক হতে পারো। তা হলে তোমাকে ফেমাস হতে হবে। হয় আর্টিস্ট হিসেবে, নয় তো সায়েন্টিস্ট হিসেবে। নয় তো কবি সাহিত্যিক হিসেবে। আজকাল আবার ওই একটা হয়েছে। দুটো কবিতা কি একখানা উপন্যাস লিখে একটু নাম হলেই মনে করে সে-ও বুঝি ফেমাস্ হয়ে গেছে, তাদের নাম আবার নিউজপেপারে ছাপাও হয়। সেক্রেটারি যখন খবরের কাগজ পড়িয়ে শোনায় তখন এক-একবার এক-একটা অচেনা নাম কানে আসে।

—হু ইজ দ্যাট ? লোকটা কে ?

—আজ্ঞে, এবার একে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে—

—কেন, লোকটা কী করেছিল ?

—সিনেমার একজন বিখ্যাত স্টার, খুব ফেমাস্ স্টার—

তবু সন্দেহ যায় না মিস্টার বোসের। বলেন—টাকা আছে খুব ?

সেক্রেটারি বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আজকাল তো সিনেমা-থিয়েটারে খুব পয়সা আছে—

—কত টাকা করেছে ? এক মিলিয়ন হবে ?

এক মিলিয়নের নিচে সাধারণত মিস্টার বোসের মন সায় দেয় না।

বলেন—তা হলে কত ? পাঁচ লক্ষ টাকা ?

সেক্রেটারি বলে—আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারি না—

পাঁচ লাখ টাকার নিচেয় হলে মিস্টার বোসের মতে সে পুওর লোক। রাস্তায় যেতে যেতে বাইরের দিকে চেয়ে দেখেছেন মিস্টার বোস। এক এক সময় অবাক হয়ে গেছেন ভেবে ভেবে। রেস্টুরেন্টের ভেতরে চেয়ে দেখেছেন ভিড়ে ভিড়। সবাই খাচ্ছে। কী করে অ্যাফোর্ড করে ওরা ? কী করে চালায় ? তিনিও তো নিজে স্টাফের মাইনে দেন। যা দেন তাতে তাদের সংসার চলা উচিত নয়। তবু তারই মধ্যে তারা কী করে রেসের মাঠে যায়, সিনেমা দেখে, চপ-কাটলেট খায়, আরো কী-কী করে ভগবান জানে।

একবার বহুদিন আগে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন পেপারে। দেশের ইক-নমিক অবস্থার ওপর। তাতে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, দেশ যে গরীব তার অনেক কারণ আছে। একটা প্রধান কারণ বাঙালীরা বড্ড টাকা ওড়ায়। ওরা যা ইন্‌কাম করে তার অর্ধেক চলে যায় রেসের মাঠে, নয় তো রেস্টুরেন্টে, অথবা সিনেমা-থিয়েটারে। নইলে সিনেমা-স্টাররা পদ্মশ্রী পায় কী করে ?

নিশ্চয়ই তাদের টাকা হচ্ছে! টাকা না হলে তো গভর্ণমেণ্ট তাদের রেকগ্নিশন দেবে না। সত্যিই এটা মিস্টার বোসের ভাবতে ভাল লাগে না যে সকলের টাকা থাকবে। সেকালে যেমন ব্রাহ্মণরা ছিল মাথার ওপর। তারা বিধান দিতো, সেই বিধান অনুযায়ী সমাজ চলতো এবং বেশ ভালো ভাবেই চলতো। এখনকার মত রোজই স্ট্রাইক, রোজই লক-আপ, রোজই মীটিং, রোজই মিছিল ছিল না তখন। বেশ নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন চলতো। আজ তা হয় না কেন? হওয়া সম্ভব নয়—কারণ সকলের হাতে টাকা এসেছে। আগে যে জীবনে কখনও গুড় খেতে পেতো না, এখন সে চিনি না দিয়ে চা খেতে পারে না। দিস্ ইজ ব্যাড্! এখন সবাই মিলিওনেয়ার হতে চায়। দিস্ ইজ্ ব্যাড্! দেশে বড়লোক যদি খুব কম থাকে তাহলে অন্য লোকেরা জব্দ থাকে সেকালের মতো। মিস্টার বোসের মত হচ্ছে—স্টাফের হাতে বেশী টাকা দিও না, দিলেই তারা টাকা ওড়াবে। টাকাগুলো ফুরোলেই আরো চাইবে। টাকা না পেলেই তখন স্ট্রাইক করবে, হরতাল করবে, গভর্মেণ্টকে অস্থির করে তুলবে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো।

রিসিভারটা তুলে বললেন—হ্যাঁ, টেলিফোন করেছিলাম আপনাকে, আপনি মাইনিং মিনিস্টারকে একবার ফোন করেছিলেন নাকি? আমি তিন টন কোল-টার চেয়েছিলুম, এখনও দিলে না—

ওপাশ থেকে মিস্টার গুপ্ত বললেন—দিল্লীর ব্যাপার বড় ন্যাস্টি হয়ে উঠেছে মিস্টার বোস—

মিস্টার বোস বললেন—কেন?

—শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মারা যাবার পর অপোজিশানে একটা কথা বলবার মতো লোক তো কেউ নেই, এখন নেহরুর সামনে সবাই ভয়ে জুজু হয়ে থাকে, এরই নাম ডেমোক্রেসী—

মিস্টার বোস বললেন—সেই জন্যেই তো বলছি এবার আপনি ইলেক্শানে নামলে ভালো করতেন, অন্তত ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভয়েস্টা ফোকাস করা যেতো—

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—না মশাই, আমার এই বুড়ো বয়সে আর মুখে চুন-কালি মাখতে ইচ্ছে হয় না। আমরা যখন পলিটিক্স্ করেছি, তখন তো কোনও মতলব নিয়ে করি নি, আমরা করেছি দেশকে স্বাধীন করতে। এখন দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এখন ছেলে-ছোকরারা চালাক সব, ভুল-টুল হলে আমরা শুধরে দেবার চেষ্টা করবো এই পর্যন্ত—

তার পর হঠাৎ যেন কী একটা কথা মনে পড়ে গেল।

—ক'দিন থেকে দেখছি সদাব্রত খুব দেরি করে বাড়ি আসছে, ব্যাপার কী? আপনার ফ্যাক্টরিতে খুব কাজ পড়েছে নাকি?

মিস্টার বোস অবাক হয়ে গেলেন।

—কই না তো, সে তো চারটের সময়ই চলে যাচ্ছে আজকাল রোজ। ফ্যাক্টরি ক্লোজ হবার আগেই চলে যাচ্ছে—

—কেন? কোথায় যাচ্ছে? আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম বাড়িতে আসছে অনেক রাত করে—

—সদাব্রত তো বলে টি-বি-হস্‌পিট্যালে তার কে একজন রিলেটিভ্‌ আছে, সেখানেই যায়!

—কে রিলেটিভ্‌?

—তা তো জানি না মিস্টার গুপ্ত। আমি কারো কোনও পার্সোন্যাল ব্যাপারে ইন্‌টারফিয়ার করি না, ছাট্‌ ইজ নট্‌ মাই হ্যাবিট্‌—আমি মনিলার ব্যাপারেও কিছু বলি না। আমার ওয়াইফ সম্বন্ধেও তাই—আমি আমার ওয়াইফকে পর্যন্ত বলি না সে কোন্‌ হর্স বেটিং করবে। যার-যার নিজের নিজের লাইক্‌স এণ্ড ডিস্‌লাইক্‌স থাকতে পারে তো!

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—আপনি ওকে একটু জিজ্ঞেস করবেন তো—কাকে দেখতে হস্‌পিট্যালে যায়? কে সে? তার সঙ্গে ওর কী রিলেশন্‌স—

—কিন্তু আমার পক্ষে কি এত কথা জিজ্ঞেস করা ভাল হবে?

—কেন ভাল হবে না? আপনি যদি না জিজ্ঞেস করেন তো মনিলাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করাবেন—

—হ্যাঁ, মনিলা বলছিল, একদিন একটা মেয়ের সঙ্গে নাকি দেখেছে সদাব্রতকে। তাকে নিয়ে নিজের গাড়িতে ড্রাইভ্‌ করে যাচ্ছে!

অনেকক্ষণ ধরেই কথা হলো টেলিফোনে। শেষকালে মিস্টার বোস বললেন—আজকাল দু'জনে তো রোজ ক্লাবেই যায়, আমি মনিলাকে বলেছি, যখন তোমরা দু'জনে এনগেজ্‌ড্‌ হয়েছ তখন ইউ মাস্ট্‌ মীট! আমি তো নিজে আর কিছু বলি না সদাব্রতকে, সদাব্রত বেরোবার আগেই মনিলা গাড়ি নিয়ে এসে এখানে হাজির হয়—এমনি করেই মনিলা আস্তে আস্তে সদাব্রতকে রেজিমেণ্টেশন্‌ করে নেবে—আপনি কিছু ভাববেন না—

শিবপ্রসাদবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

এই শতাব্দীর পঞ্চাশের পর থেকেই এমনি। আর সেই আগেকার মতো নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুঁজে থাকবার যুগ নেই। একদিন ছেলে জন্মালো, বড় হলো—তার লেখাপড়া শেষ হলো, তার পর একদিন গুরুজনরা বিয়ের সম্বন্ধ করে একটি সুলক্ষণাকে পুত্রবধূ করে ঘরে এনে ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন। সে আর নেই। এখন মানুষের সুখ-সুবিধে-আরাম-বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে অশান্তি-যন্ত্রণা-ক্ষোভ-আকাঙ্ক্ষা বেড়ে বেড়ে চলেছে। এখন প্রতি পদে ভয়। মেয়ে এত রাত করে বাড়ি ফেরে কেন? ছেলে কার সঙ্গে মিশছে? কংগ্রেসী না কমিউনিস্ট? সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় সব দিকে। রাস্তা পার হতে যতখানি সতর্কতা, সংসার-যাত্রাপথেও ঠিক ততখানিই সতর্কতা দরকার। একটু বেহিসেবী হলে সব বানচাল হয়ে যাবে। তোমার এতদিনের কষ্ট করে উপার্জন-করা সম্পত্তি সব লোপাট হয়ে যাবে। একদিন হয়ত তোমারই ছেলে আর একজনকে সঙ্গে করে বাড়িতে এনে হাজির হবে। এসে বলবে—এই-ই আমার স্ত্রী—

এ-রকম অনেক হয়েছে। এই সব দেখেই ভয় হয়ে গিয়েছিল মিস্টার বোসের, ভয় হয়ে গিয়েছিল শিবপ্রসাদ গুপ্তর। এবার তারা দু'জনেই নিশ্চিন্ত খানিকটা। স্টেট্‌স্‌ম্যানে সদাব্রত-মনিলার এন্‌গেজ্‌মেন্ট-এর খবর ছাপা হয়ে গিয়েছে। ক্লাবের মেম্বাররা, অফিসের ব্রাদার-অফিসাররা সবাই জেনে গেছে এখন। এতে আনন্দই হয়েছে সকলের। আফটার-অল্ সদাব্রত ছেলেটি ভাল। ক্লাবে কেউ কোনও দিন তাকে মাতাল হতে দেখে নি। কেউ কোনও দিন তাকে তাস খেলতেও দেখে নি। সদাব্রত মনিলার সঙ্গে এসেছে আর পাশে বসে থেকেছে। মিস্টার বোস বলে দিয়েছিলেন—মিস্টার গুপ্তকে সঙ্গে সঙ্গে রাখবে সব সময়, ওকে ছাড়বে না—

প্রথম প্রথম খেলার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে সবাই। কিন্তু এখন আর করে না। মনিলা যখন খেলায় মশগুল তখন সদাব্রত এক পাশে বসে বসে বই পড়ে—

মিস্টার ভোপৎকার একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—আগাথা ক্রিস্টি বুঝি?

প্রতিদিন এমনি করে তাস খেলতে এদের ভালোও লাগে! সদাব্রত অবাক হয়ে যেতো দেখে। সমস্ত কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা যেন নিজেদের

নিরাপদ দূরত্বে রেখে বেঁচে যাবে। তার পর যখন আর পড়তে ভালো লাগতো না তখন বাগানে ঘাসের ওপর গিয়ে বেড়াতো। ফুলগাছগুলোর চারপাশে হাঁটতো। বাগানের এক কোণে মালীদের ঘর। অন্ধকারের মধ্যে কেরাসিনের আলো জ্বেলে তারা সংসার করে সেখানে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে সদাব্রতর। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—কী দিয়ে আজ ভাত খেয়েছে তারা। কী রাঁধলে আজকে।

সদাব্রত তাদের কাছে সাহেব। সদাব্রত আসছে দেখলে তারা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। এই মদ, এই জুয়া, এই টেরিলিন, এই গ্যাবার্ডিনের পাশে তাদের ছেঁড়া শাড়ি ময়লা ফতুয়া যেন ঠাট্টার মতো ঠেকে। সবাই সমস্ত সন্ধ্যেটা হুল্লোড় করে যখন চলে যায়, তখন তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। দামী সিগারেটের খালি টিনের কৌটোগুলো কুড়িয়ে নেয়। সেই টিনের কৌটো-গুলো কে নেবে তাই নিয়েই আবার তাদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি শুরু হয়ে যায়। সাহেবের এঁটো কেক-পাঁউরুটির টুকরো প্লেটে পড়ে থাকলে তাই নিয়েই ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তার পর যখন আরো রাত হয় তখন এক-একজন মেম্বর আর উঠতে চায় না। তখন সে-সাহেব মদের নেশায় একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। তখন চেয়ার থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজা বেরোয়। ইংরিজীতে যাকে সামনে পায় তাকেই গালাগালি দেয়। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারবে না তার জন্যে। বমি করে ভাসিয়ে দিলেও কারো কিছু বলবার এক্তিয়ার নেই ক্লাবে। তখন ম্যানেজার এসে মালীদের ডাকে, বয়দের ডাকে। তাদেরও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দেয় সাহেব, ম্যানেজারকেও গালাগালি দেয়। সবাই পাঁজাকোলা করে সাহেবকে গাড়িতে তুলে বাড়ি পৌঁছে দেয়। তবু কারো কিছু বলবার হুকুম নেই। সাহেব নাকি কোন গভর্মেণ্ট অফিসের ক্লাস-ওয়ান অফিসার। মাসে মাইনে পায় পাঁচ হাজার টাকা।

একদিন সদাব্রতর সামনেই এই ঘটনা ঘটলো। সদাব্রতর পা থেকে মাথা পর্যন্ত রি-রি করে উঠলো। অন্য সবাই মিস্টার মালিকের কাণ্ড দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। মনিলাও হাসছে।

সদাব্রত আর থাকতে পারলে না। বললে—হোয়াই ডু ইউ লাফ? আপনারা হাসছেন কেন? ব্রুটটাকে চাবুক মারতে পারছেন না?

সবাই-ই তখন পুরোদস্তুর নেশায় মশগুল।

মিস্টার ভোপৎকার বললে—জানেন গুপ্ত উনি কে? হি ইজ্ নো লেসার এ পার্সোনেজ্ দ্যান মিস্টার মালিক—মিস্টার মালিকও যা ওয়েস্ট-বেঙ্গল-গভর্মেণ্টও তা!

এ-খবর শুনে অন্য লোকের চমকে যাবার কথা। কিন্তু সদাব্রত তবু নড়লো না। বললে—তাতে আমার কী? আর আপনারই বা কী?

এর পর রসভঙ্গ হয়ে যায়। খেলা তখন ভেঙে গেছে। পেগীকে কোলে নিয়ে মনিলাও উঠলো। তার পর সদাব্রতও গিয়ে উঠলো সে-গাড়িতে।

উঠেই বললে—আমাকে এবার থেকে তুমি আর ক্লাবে আসতে বলো না মনিলা—

মনিলা ভ্রূ বেঁকিয়ে তাকালো—কেন?

—দে আর স্কাউণ্ড্রেল্স, পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পায় তা আমার কী? আমি তার কাছে লোন নিতে যাবো না! আমি তার কাছে ভিক্ষে করতেও যাবো না! মিস্টার মালিক বড়লোক হতে পারে কিন্তু এ-রকম আমাদের সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে প্যারেড্ করবে, এ সহ্য করা উচিত নয়—

মনিলা বললে—না না তা নয়, মিস্টার মালিকেরই যে ভুল, হুইস্কির সঙ্গে কখনও জিন পাঞ্চ করে কেউ খায়? পাঞ্চ করলে তো নেশা হবেই—আমি কতদিন মিস্টার মালিককে বলেছি—আপনি ও-রকম পাঞ্চ করে খাবেন না মিস্টার মালিক, ওতে টিপসী হয়ে পড়বেন—কিন্তু কিছুতেই শুনবেন না—

সদাব্রত বললে—না, তুমি বোঝ না, উনি নেশা করে দেখাতে চান যে উনি বড়লোক, বেশী মদ খাবার পয়সা আছে ওঁর—

—তা তো আছেই, উনি অ্যাফোর্ড করতে পারেন বৈ কি!

—কিন্তু সকলকে ন্যাস্টি ভাষায় গালাগালি দেবারও রাইট আছে নাকি ওঁর?

মনিলা বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হলো। বললে—তুমি দেখছি ড্রিঙ্ক করা পছন্দই করো না সদাব্রত—

সদাব্রত বললে—না, করি না—

—তা হলে বিয়ের পর তুমি আমাকেও ড্রিঙ্ক করতে দেবে না নাকি?

সদাব্রত বললে—ড্রিঙ্ক করা ভাল নয়—

—সে কি? বিয়ে করবো বলে কি ড্রিঙ্ক করতেও পাবো না, তাস খেলতেও পাবো না?

—সে তোমার ইচ্ছে, কিন্তু যে-ভাবে তুমি চলছো সে-ভাবে চলা উচিত নয় বলে আমি মনে করি—

—কিন্তু প্রত্যেক কালচার্ড লেডী আর প্রত্যেক কালচার্ড জেন্টলম্যান তো ড্রিঙ্ক করে, তাস খেলে। মিসেস্ আহুজা, মিস্ ভোপৎকার, মিসেস্ ম্যানিয়েল, মিস্ ক্রেনী তালিয়ার খান, সবাই তো ড্রিঙ্ক করে, সবাই তো রেসের ঘোড়ার বেটিং করে—

সদাব্রত বললে—আমার মা তো করে না। মা মদও খায় না, রেসও খেলে না—

—কিন্তু আমার মা ড্রিঙ্ক করে, আমার মা খাঁটি বিলিতি রাম খায়, রেসে বেটিং ধরে—

—তোমার মা একসেপ্শান্ মনিলা, ব্যতিক্রম। আমার জানাশোনা কোনও মেয়েই ড্রিঙ্ক করে না, রেস খেলে না—

মনিলা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলো কথাটা শুনে। বললে—তুমি ক'টা কালচার্ড মেয়ে দেখেছ? ক'জনকে তুমি চেনো?

সদাব্রত বললে—আমি অনেককে চিনি—

—তারা কি কালচার্ড? তারা কন্টিনেণ্টে গেছে? সেদিন যাকে দেখলুম তোমার গাড়িতে, ও কে? হু ইজ শি? দ্যাট হ্যাগাড গার্ল! একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারলে না আমার সঙ্গে, কালচার্ড লেডীর সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয়, তাই-ই জানে না। তুমি তাকে কালচার্ড বলো?

সদাব্রত গম্ভীর ভাবে বললে—তুমি যাকে চেনো না তার সম্বন্ধে অমন করে কথা বলো না মনিলা—সে গরীব হতে পারে, সে দেখতে খারাপ হতে পারে, কিন্তু সে যদি কালচার্ড না-হয় তা হলে তুমিও কালচার্ড নও—

—হোয়াট্ ডু ইউ মীন সদাব্রত! তুমি আমাকে এত মীন এত ছোট মনে করো?

সদাব্রত বললে—তোমাকে ছোট মনে করি নি, কিন্তু তাকেই বা তুমি না জেনে-শুনে অত ছোট করলে কেন? জানো, তারও তো সেলফ্ রেসপেক্ট্ বলে একটা জিনিস থাকতে পারে! ঘটনাচক্রে সে গরীব হয়েছে, কারণ তাকে আমরাই গরীব করে রেখেছি, কিন্তু তারও গাড়ি চড়তে ইচ্ছে করে, তারও সিল্কের শাড়ি পরতে ইচ্ছে করে, পয়সা থাকলে তোমার মতো সেও স্কাই-ক্রেপার

খোঁপা বাঁধতে পারে—তার কাকার পয়সা থাকলে সে-ও কন্টিনেণ্টে যেতে পারতো—

মনিলা গাড়ির অন্ধকারে খানিকক্ষণ ধরে যেন ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

বললে—আমার সম্বন্ধে এই-ই কি তোমার ওপিনিয়ন্? আমি আন্-কালচার্ড?

সদাব্রত দু' হাজার টাকার ঘুঁষ খেয়ে এতক্ষণে যেন সচেতন হলো।

বললে—তুমি রাগ করো না মনিলা, আমি তা বলি নি—

মনিলা যেন নিজের মনেই বলতে লাগলো—আমি জানতুম তুমি একদিন এই কথাই বলবে। এই জন্যেই তো আমি পেগীকে এত ভালবাসি, পেগী কখনও আমাকে এমন রুড্ কথা বলতে পারতো না—তুমি জানো না পেগী আমাকে কী ভালবাসে, তোমার চেয়েও বেশি ভালবাসে—মা তো তাই বলে পেগী আর জন্মে আমার লাভার ছিল—

অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। কিন্তু রাস্তার আলোয় সদাব্রত দেখতে পেলে মনিলার গালের ম্যাক্স্ ফ্যাক্টরের ওপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

সদাব্রত মনিলার হাতটা ধরলে।

—তুমি কেঁদো না, ছিঃ—

—আমি কাঁদবো না? তুমি বলছো কী? আমি এমন কি করেছি তোমার কাছে যে আমায় এমনি করে তুমি কাঁদালে? তুমি জানো না, একদিন আমি কেঁদেছিলুম বলে আমার বাবা আমার আয়াকে ডিস্‌চার্জ করে দিয়েছিল। তুমি জানো না আজ যদি আমি বাবাকে গিয়ে বলি যে আমি কেঁদেছি তা হলে বাবার আজ রাত্রে ঘুম আসবে না, স্লিপিং-পিল্ খেতে হবে—

সদাব্রত বললে—তুমি এত ছেলেমানুষ!

—ছেলেমানুষিটাই তুমি দেখলে আমার? আর তোমার বুঝি কিছু দোষ নেই? তোমার বাবার সঙ্গে নেহরুর ভাব আছে বলে তুমি নিজেকে এত সুপিরিয়র মনে করো? নিজেকে এত বড় মনে করো? এই তো মিস্টার ভোপৎকারের সঙ্গেও তো ডাক্তার বিধান রায়ের এত ফ্রেণ্ডশিপ্, কই, সেজন্যে তো তার কোনও অহংকার নেই! তবে তোমার এত ভ্যানিটি কেন?

গাড়ি চলছিল এলগিন রোডের দিকে। মনিলা আরো অনেক কথা বলে যেতে লাগলো। কথাগুলো রূঢ়। সদাব্রত সবগুলো কথাই মন দিয়ে ধৈর্য

ধরে শুনতে লাগলো। শুধু এখন শুনছে, তাই-ই নয়, সারা জীবনই এমনি শুনে যেতে হবে। সারা জীবনই পেগীর সঙ্গে এমনি করে তার তুলনা করা হবে। সারা জীবনই দু হাত পেতে তাকে দু'হাজার টাকা মাইনে নিতে হবে মিস্টার বোসের কাছ থেকে। এমনি করেই সকালবেলা চাকরিতে আসতে হবে। বিকেলবেলা এমনি করে মনিলা এসে তাকে ক্লাবে নিয়ে যাবে। তার পর ক্লাব থেকে অকারণে ঝগড়া করতে করতে বাড়ি ফিরবে। এই-ই তার জীবন। এই জীবনেরই দাসখত সে লিখে দিয়ে বসে আছে মনিলার কাছে।

অথচ চাকরি যখন নিয়েছিল তখন কি জানতো না এই হবে? সদাব্রত তো নিজে পছন্দ করেই বেছে নিয়েছে মনিলাকে। জেনেশুনেই বেছেছিল। সে ভালো করেই জানতো মনিলা জুয়া খেলে, মনিলা কুকুর পোষে, মনিলা ড্রিঙ্ক করে। আসলে সে তো মনিলাকে বিয়ে করে নি, বিয়ে করেছে মিস্টার বোসের টাকাকে। এই টাকা হাতে না পেলে মাস্টার মশাইয়ের হাসপাতালের খরচ কী করে চলবে?'

এই সামনের সপ্তাহেই আরো তিন শো টাকা দরকার। তার পর মাস্টার মশাই একটু সেরে উঠলেই তাঁকে চেঞ্জে পাঠাতে হবে। হয় পুরীতে, নয় ওয়াল-টেয়ারে, নয়তো হাজারিবাগে, কিংবা আর কোথাও। সেখানে ঘর-ভাড়া দিতে হবে, দুধ-ঘি-মাংস-ডিমের খরচ দিতে হবে। তা ছাড়া আছে ওষুধ। ওষুধেরই কি আজকাল কম দাম! সে-খরচ কে দেবে?

সদাব্রত হঠাৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল।

—যা বলেছি তা বলেছি, আমায় তুমি ক্ষমা করো মনিলা!

মনিলা বললে—আমি জানতুম তুমি নিজের ভুল বুঝতে পারবে! তাই যদি হতো তা হলে আমরা কেন ক্লাবে যাই? কেন রেস খেলি? তা হলে তো আনকালচার্ড মেয়েদের মত রান্না আর সেলাই নিয়েই থাকতে পারতুম! সেইটেই তুমি চাও? চাও কিনা বলো?

সদাব্রত বললে—না, তা চাই না—

—তা হলে এখন যা করছি বিয়ের পরও কিন্তু আমি তাই-ই করবো বলে রাখছি—আমি তখনও ক্লাবে আসবো, কিটি খেলবো, রাম্ খাবো—

—তাই কোরো!

—তোমায় মাদার কি ফাদার যদি আপত্তি করে তা হলেও কিন্তু শুনবো না। আই মাস্ট্ হ্যাভ্ মাই ওন্ ওয়ে—তুমি আমায় কথা দাও—

সদাব্রত বললে—আমি কথা দিচ্ছি—

—আমি পেগীকেও ছাড়তে পারবো না। আমার বেড্-রুমেই কিন্তু পেগী শোবে, তুমি আপত্তি করতে পারবে না—

—আপত্তি করবো কেন ?

—বছরে কিন্তু একটা সিজন্ আমি কন্টিনেণ্টে যাবো—

—তা যেও, যদি ডলার এক্সচেঞ্জ পাই তা হলে যাবে !

মনিলার চোখ তখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে। বললে—কেন ডলার পাবে না ? তোমার ফাদারের সঙ্গে তো মিস্টার নেহরুর জানাশোনা আছে—

সদাব্রতর মনে পড়লো মাস্টার মশাইয়ের কথা। ডাক্তার যে-বিল দিয়েছে সে অনেক টাকার। টি-বি'র ট্রিট্‌মেণ্টের খরচ তেমন কিছু নেই, যা কিছু খরচ সমস্ত পরে। পরের খরচটাই মস্ত। পেশেণ্ট্‌কে কম্‌প্লিট রেস্ট দিতে হবে। ভালো খাওয়া, ভালো থাকা, মনের শান্তি, সবগুলোই খরচের ব্যাপার—

—সেবার 'এয়ার ইণ্ডিয়া'তে গিয়েছিলাম, এবার কিন্তু 'প্যান্-অ্যাম্'-এ যাবো, বুঝলে ?

আশ্চর্য যে-লোক এই ক'দিন আগেও লোক চিনতে পারতো না, সেই লোকই এখন বাড়ি যেতে চায় ! ক'দিন থেকেই কেদারবাবু ধরেছেন—বাড়ি যাবো। কিন্তু বাড়ি যে যাবেন মাস্টার মশাই কোন্ বাড়িতে যাবেন ? যে-বাড়িতে আলো ঢোকে না, রোদ ঢোকে না, যে বাড়ির চারদিকে পচা নর্দমার গন্ধ, সেখানে গিয়ে থাকবেন কী করে ? সেখানে থাকলে তো আবার রোগ হবে ! আগে মাস্টার মশাইয়ের হয়েছিল, এবার শৈলরও হবে। শৈলও ভুগবে। শৈলকেও আর বাঁচাতে পারা যাবে না।

মন্মথকেও সে-কথা বলেছিল সদাব্রত।

মন্মথ বলেছিল—হ্যাঁ সদাব্রতদা, ওখানে নিয়ে গেলে আর বাঁচানো যাবে না—

—আর কোনও ভাল বাড়ি আছে তোমার সন্ধানে ?

মন্মথ বলেছিল—খুঁজলে হয়ত বাড়ি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভাড়া অনেক চায়, তাই আর খুঁজি নি—

—কত ভাড়া চায় ?

—দু-শো টাকার কমে ফ্ল্যাট্ পাওয়া যাবে না।

সদাব্রত বললে—ঠিক আছে, দু-শো টাকাই আমি দেবো, কিন্তু বাড়িতে হাওয়া-রোদ-জল প্রচুর থাকা চাই—টাকা দিতে আমি রেডি, তুমি দেখো—

হঠাৎ মনিলার কথাতে যেন ধ্যান ভাঙলো।

—প্যান্-অ্যাম্-এর পাঁচ কোর্সের ডিনার কখনো খেয়েছ তুমি? হোয়াট এ লাভ্লি ডিনার—ফরটি থাউজ্যাণ্ড্ ফীট ওপরে অ্যাপল্-টার্ট, হাউ লাভ্লি······

সদাব্রত শুধু বললে—হ্যাঁ, প্যান্-অ্যাম্-এই যেও—

আর তার পরেই মিস্টার বোসের বাড়ির পোর্টিকোর তলায় গিয়ে গাড়ি থামলো। বেয়ারা এসে গাড়ির দরজা খুলে দিলে।

হিন্দুস্থান পার্কের রিটায়ার্ড বুড়োরা সেদিনও এসেছিল।

—কই, মিস্টার গুপ্ত আছেন নাকি?

কলিং বেল টিপে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, তার পর গোবিন্দ বেরিয়ে আসে। বলে—আজ্ঞে, বাবু তো নেই—

বুড়োরা জিজ্ঞেস করে—এবার কোথায়? এলাহাবাদ, না ইন্দোরে?

—আজ্ঞে, বাবু আরামবাগে গেছেন, মীটিং আছে।

—বাবা! বুড়ো বয়সে এত মীটিংও করতে পারে মানুষ! আমরা তো মশাই এখান থেকে শ্যামবাজার গিয়েই হাঁফিয়ে উঠি। আমার মেয়ে-জামাই আছে বরানগরে, তাদের সঙ্গেই দেখা করতে পারি না।

আবার কলিং বেল।

—কে?

গোবিন্দ এসে সোজাসুজি বলে দেয়—না, বাবু নেই, আরামবাগ গেছেন—

—বাবু নয়, ছোটবাবু আছেন? সদাব্রতবাবু?

সদাব্রত বাড়িতেই ছিল। সারাদিন অফিসে কেটেছে, তার পর মনিলার সঙ্গে ক্লাবে, সেও এক যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতা, তার পর হস্‌পিটাল, হস্‌পিটাল থেকে এই-ই সবে বাড়িতে এসেছিল।

—আরে তুই? বিনয়?

সেই বিনয়। ভেতরে এসে বসলো। স্যুট-পরা চেহারা। সেই দেড়শো টাকা দিয়ে ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে স্যুট করিয়েছিল।

—তোর কাছে একটা কাজে এসেছি ভাই!

—তুই কী করছিস আজকাল ?

—চাকরি করছি, কিন্তু বলবার মতো নয় সেটা কিছু। আড়াইশো টাকা হাতে পাই—শুনলুম তোর বাবা মিস্টার গুপ্ত নাকি একটা খবরের কাগজ বার করছেন !

—খবরের কাগজ ? নিউজ পেপার ?

—হ্যাঁ, শুনলুম পেছনে বড়-বড় ক্যাপিটালিস্ট্ আছে, এক কোটি টাকার ক্যাপিট্যাল নিয়ে আরম্ভ হবে। খবরের কাগজ তো আর একশো দুশো লোক নিয়ে চলবে না, অনেক লোক লাগবে। তা তোর বাবাকে বলে আমাকে একটা চাকরি করিয়ে দে না, শুনলুম মিস্টার বোসও নাকি একজন পার্টনার—

সদাব্রত অবাক হয়ে গেল।

—কই, আমি তো কিছু শুনি নি ভাই! কিন্তু তুই খবরের কাগজের অফিসের চাকরি নিয়ে কী করবি ? এখনও তোর লেখার শখ আছে নাকি ?

এককালে সত্যিই লেখার শখ ছিল বিনয়ের, কলেজের 'এসে-কম্‌পিটিশনে' ফার্স্ট হয়েছিল সে। কলেজ ম্যাগাজিনেও গল্প লিখেছিল। শেষে এডিটর পর্যন্ত হয়েছিল। সেই বিনয় এখন আড়াই শো টাকার চাকরি করছে আর সদাব্রত মাইনে পাচ্ছে দু'হাজার টাকা। আকাশ-পাতালের তুলনাটা বড় সেকেলে। তবু সেই পুরোনো তুলনাটাই মনে পড়লো তার। সেই বিনয় আজকে চাকরির খোঁজে এসেছে সদাব্রতর কাছে। এই সেদিনও বিনয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। পাছে কেউ বেকার বলে তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় টো টো করে ঘুরেছে। বিনয়ের মুখখানার দিকে চেয়ে দেখলে সদাব্রত। দামী স্যুট পরেছে সত্যি কথা, নিখুঁত করে দাড়ি কামিয়েছে, তাও ভুল নয়। কিন্তু বড় ফাঁপা ফ্যাকাসে ঠেকলো আজ বিনয়কে। এর থেকে চাকরি যখন ছিল না তার তখন বেশী ব্রাইট ছিল বিনয়ের মুখটা। তখন বেশী উজ্জ্বল ছিল ওর চোখ দুটো। আজ আড়াই শো টাকার পায়ে দাসখত লিখে দিয়ে বিনয় যেন বড় ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। আড়াই শো টাকার চাকরি নিয়ে বিনয় শুধু নিজেরই মুখ পোড়ায় নি, সমস্ত বাঙালী জাতের মুখ পুড়িয়েছে। অন্তত সদাব্রতর সেই কথাই মনে হলো। সদাব্রত নিজে যেমন শ্বশুরের ফার্মে চাকরি নিয়ে নিজের সর্বনাশ করেছে, বিনয়ও তা-ই। বিনয় হয়ত মনে মনে সদাব্রতকে হিংসেই করছে। কিন্তু বিনয় জানে না যে দু'জনেই তারা এক, দু'জনেই তারা এই শতাব্দীর অর্থ-কৌলীন্যের বলি। ইণ্ডিয়ার এই নতুন বর্ণাশ্রম ধর্মের হাড়িকাঠে

তারা দু'জনেই আত্মবলি দিয়েছে। কেন, বিনয় বিদ্রোহ করতে পারলো না? যেমন করে মানুষ আগে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, ক্ষিধে, ঘুম, সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে? বিনয়কে তো তার মতো কাউকে প্রতিপালন করতে হয় না! বিনয়কে তো টি-বি-হসপিটালে রোগীর খরচ চালাতে হয় না! তা হলে? কিন্তু আড়াই শো টাকার বিনিময়ে কী পেয়েছে বিনয়? একটা দেড়শো টাকা দামের টেরিলিন কিংবা গ্যাবার্ডিনের স্যুট? আর লোকের কাছে দেখাবার মতো একটা কর্মব্যস্ততা? ওইটুকুতেই বিনয় ভুলে গেল? অত সস্তায় নিজেকে বিক্রী করে দিলে সে?

—জানিস এবার আর একটা স্যুট করতে দিয়েছি, মহম্মদ আলীর দোকানে, তোকে পরে দেখাবোখ'ন একদিন, একটা নতুন ধরনের কোটিং, চল্লিশ টাকা করে গজ নিলে—

তার পর একটু থেমে বললে—তুই যা-ই বলিস ভাই, মুসলমান দর্জিদের মতো কেউ অত ভাল স্যুট করতে পারে না—

হঠাৎ ভেতর থেকে গোবিন্দ এসে হাজির। বললে—দাদাবাবু, আপনার টেলিফোন—

—আমার টেলিফোন? কে রে?

বিনয় বললে—তা হলে আমি উঠি ভাই, আমার কথাটা মনে রাখিস ভাই—

তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে টেলিফোন ধরতেই অবাক হয়ে গেল সদাব্রত। মিস্টার বোস!

—তুমি একবার এখুনি চলে এসো সদাব্রত, মনিলা খুব কান্নাকাটি করছে। একটা সিরিয়াস্ ব্যাপার ঘটে গেছে।

—কী হয়েছে?

—সে তুমি এলেই জানতে পারবে। মনিলার নামে একটা চিঠি এসেছে, তোমার এগেন্স্টে অনেক কিছু অ্যালিগেশন আছে তাতে—ভেরি সিরিয়াস্ অ্যালিগেশনস্—

—আমার বিরুদ্ধে? কে লিখেছে?

—নাম নেই, তবে মনে হচ্ছে এমন একজন লিখেছে যে তোমাকে খুব ভাল করে চেনে। আমার মনে হচ্ছে সব ফ্যাক্ট। একটা কথাও মিথ্যে লেখে নি, আর মনিলাও করোবোরেট করছে—

সদাব্রত বললে—কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কী এমন লিখতে পারে ? আর কে-ই বা লিখবে ? আর সমস্ত সত্যি বলে আপনি বিশ্বাস করছেনই বা কী করে ? কী রকম হাতের লেখা ? ছেলের হাতের লেখা, না মেয়ের ?

—আমার মনে হচ্ছে কোন মেয়ের লেখা। ইট্ ইজ্ এ লং লেটার। খুব লম্বা চিঠি। মনিলা পেয়েই আমাকে দেখালে। আমাকে দেখিয়েছে ভালোই করেছে। তুমি এখ্খুনি চলে এসো—মনিলা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, তুমি জানো মনিলা কাঁদলে আমি কত কষ্ট পাই, আমার মনে হচ্ছে আজকেও আমাকে স্লিপিং-পিল খেতে হবে—

—আচ্ছা, আমি এখুনি যাচ্ছি—

বলে সদাব্রত টেলিফোন রেখে দিয়ে নিচেয় গিয়ে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করলো।

সদাব্রতর মনে আছে সেই তখনই সে গিয়েছিল এলগিন রোডে। মিস্টার বোসের নিজের ব্যাপার হলে হয়ত দেরি করা চলতো। কিন্তু এ মিস্ বোস। মিস্টার বোসের একমাত্র মেয়ে। মিস্টার বোসেরা বাঘ হয়ে জন্মালেও কিন্তু তাদের ব্যবহারে কোনও তারতম্য হতো না। বোধ হয় বাঘ তৈরি করতে গিয়েই ভুল করে তাঁকে মানুষ তৈরি করে ফেলেছিলেন ব্রহ্মা। আর তার পর থেকেই পৃথিবীটাকে একটা জঙ্গল মনে করে নিয়েছিলেন মিস্টার বোস। বিশেষ করে ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়ার জঙ্গলে মিস্টার বোসেরা বেশ নিশ্চিন্তে শিকার করে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন এ-ইণ্ডিয়ার ইজারাদার যারা আছে তারা থাকুক, তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না। যতক্ষণ তিনি বেঁচে আছেন, ততক্ষণ রাজত্ব করবার অধিকারটা তাঁরই। আর কারু নয়। একটা স্বভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ করেছেন, কালে আরো হবে। একটা থেকে একদিন বহু হবে। তার পর আরো অনেক। তার পর বেছে বেছে যাদের অফিসারের চাকরি দিয়েছেন, তাদের রেফারেন্সের জোরে আরো উঁচুতে উঠবেন। উঠতে উঠতে সমস্ত জঙ্গলটারই একদিন ইজারাদার হয়ে বসবেন। তার পর একেবারে মালিক। তখন মাথার ওপর আর কেউ নেই।

কেউ মিস্টার বোসের মাথার ওপরে থাকুক এটা তিনি পছন্দ করতেন না।

তিনি চাইতেন তিনি এখন যেমন নিজের ফার্মের মালিক, একদিন এই গোটা ইণ্ডিয়াটারও তেমনি মালিক হয়ে বসবেন। অন্ততঃ যারা মালিক হবে তাদের তিনি কণ্ট্রোল করবেন। তিনি চাইতেন তিনি দিল্লীতে টেলিফোনে

প্রেসিডেন্টকে যা করতে বলবেন প্রেসিডেন্ট তাই-ই করবে। কিংবা কিছু করবার দরকার হলে মিস্টার বোসের কাছে পরামর্শ নিয়ে তবে করবে। ওই একই কথা। প্রেসিডেন্টের নাকে দড়ি দিয়ে ওঠাবেন, আবার প্রয়োজন হলে নামাবেন।

আর তাই-ই যদি না হলো তো সামান্য একটা ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টার হয়ে লাভ কী!

এই যে ইণ্ডিয়া, এই যে ভাস্ট্ একটা কাণ্ট্রি, একে রুল করা ওদের কাজ? ওই যারা আছে এখন ক্যাবিনেটে? খবরের কাগজ পড়ে হাসেন আর ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের বুদ্ধির বহর দেখে তাজ্জব হয়ে যান। বলেন—নাঃ, এবার ইণ্ডিয়া যাবে—ইণ্ডিয়া উইল গো টু ডগ্স্—

ইণ্ডিয়া যেন মিস্টার বোসের পৈতৃক সম্পত্তি। পৈতৃক সম্পত্তির এ লোকসান যেন তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। ইণ্ডিয়ার লোকসান হতে দেখলেই টেলিফোনটা তুলে ধরেন। ট্রাঙ্ক-কলে দিল্লীর সঙ্গে কথা বলেন—হ্যালো মিস্টার ভোজরাজ, পার্লামেণ্টে কি আপনারা ছেলেখেলা করছেন আজকাল?

মিস্টার ভোজরাজ এম. পি.। বলেন—কেন? কী হলো মিস্টার বোস?

মিস্টার বোস বললেন—আজকের কাগজে আপনাদের প্রাইম মিনিস্টারের আর্গুমেণ্ট্টা পড়লুম—আপনারা একটু শেখাতে পারেন না! কাণ্ট্ ইউ টীচ্ হিম্ হাউ টু টক্ সেন্স? লোকে হাসছে যে! আইসেনহাওয়ার ডালেস ম্যাক-মিলান ওরা সব কী ভাবে বলুন তো—

মিস্টার বোসকে চেনা হয়ে গিয়েছিল সদাব্রতর। তবু গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে ভেবেছিল এমন কী জরুরী চিঠি, যার জন্যে মিস্ বোস একেবারে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে! যার জন্যে মিস্টার বোস এত রাত্রেও ডেকে পাঠিয়েছে! কে লিখতে পারে চিঠি? সদাব্রতর বিরুদ্ধে মিস্ বোসের কাছে কে লিখতে যাবে? শৈল? শৈলর সঙ্গে সামান্য কিছুক্ষণের মাত্র আলাপ মনিলার। তাদের দু'জনকে গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে ওষুধ কিনতে গিয়েছিল দোকানের ভেতরে। তার মধ্যেই এমন কিছু ঘটেছে নাকি? আর তার বিরুদ্ধে কী-ই বা লেখবার আছে?

মনে আছে ওষুধ কিনে আবার হস্পিটালে একই গাড়িতে ফিরে আসার সময় শৈল একটা কথাও বলে নি। সমস্ত রাস্তাটাই চুপ করে কাটিয়েছিল

ছ'জনে। তা ছাড়া কথা বলবার ছিলও না কিছু। কী কথাই বা বলবে? মাস্টার মশাইয়ের অসুখ। এক-একবার চোখ খোলেন আর বলেন—আমি ভাল হয়ে গেছি—আর এখানে থাকবো না—

আবার চোখ বুজিয়ে ফেলেন।

নার্স-ডাক্তার সবাই পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। দিন-রাত নার্স সেবা করে। তারা বলে—অদ্ভুত পেশেন্ট—

অদ্ভুত পেশেন্টই বটে! যারা এখানে আসে তারা ডাক্তার-নার্স সকলকে বড় কষ্ট দেয়। এ রোগী নার্সের কষ্ট হবে বলে বেশি উদ্বিগ্ন। নার্সকে বলে—তোমার আর কষ্ট করতে হবে না মা, তুমি একটু ঘুমোও গে যাও—

কেদারবাবু জিজ্ঞেস করেন—কত টাকা পাও তুমি?

যে শোনে সে-ই অবাক হয়।

—আহা মা, তোমার তো বড় কষ্ট! আমার জন্যে তোমায় মা অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে—

নার্স বলে—আপনাকে সে-সব কথা ভাবতে হবে না, আপনি সেরে উঠলেই আমরা সবাই খুশী হবো—

কেদারবাবু বলেন—আমারই কি শুয়ে থাকলে চলে নাকি মা! আমার এক ভাইঝি আছে বাড়িতে, সে একলা বাড়িতে থাকে, এখানে এই রকম শুয়ে পড়ে থাকলে তো আমার চলবে না—। আর আমার কত কাজ জানো মা, আমি যদি এখানে বেশি দিন পড়ে থাকি তো আমার ছাত্ররা সব গাড্ডু মারবে—কেউ পড়বে না।

তার পর আবার থেমে বলেন—আর ওই যে, যে-ছেলেটি আমাকে সকালে বিকালে দেখতে আসে, ও হচ্ছে আমার সব চেয়ে ভাল ছাত্র, বুঝলে মা, দু-হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। তা লেখাপড়া করেছে ভাল করে, মাইনে পাবে না? দু-হাজার টাকা মাইনে কি সোজা কথা নাকি, বলো? ওই যে আর একটি ছেলে আসে আমার ভাইঝির সঙ্গে, ওর বাবাও এক হাজার টাকা মাইনে পায়—

নার্স বলে—আপনি বেশি কথা বলবেন না, আপনি ঘুমোন—

কেদারবাবু বলেন—আমার ঘুম আসবে না মা, ছাত্রদের কথা ভেবে ভেবে আমার ঘুম আসে না—

যখন কিছুতেই ঘুমোতে চান না কেদারবাবু তখন ঘুমের ওষুধ খাইয়ে

দেয় নার্স। তখন কেদারবাবু ঘুমিয়ে পড়েন। মাথার ওপর ছাত্রদের ভাবনার বোঝা নিয়ে মানুষটা তখন শিশুর মত হয়ে যায়। আর কথা বলে না।

সদাব্রত এলে নার্স বলে—উনি বড় কথা বলেন—এত কথা বললে ঘুম আসে কারো ?

সদাব্রত বললে—উনি চিরকালই একটু বেশি কথা বলেন—

—আপনার কথাই খুব বেশি বলেন, বলেন আপনিই ওর সব চেয়ে ভাল ছাত্র—আচ্ছা, ওঁর স্ত্রী নেই ?

—না, উনি বিয়ে করেন নি। এ-ধরনের মানুষ সংসারে ক্রমেই কমে আসছে, স্যার পি. সি. রায়কে দেখেছিলুম আর এই একজন—একটু ভাল করে দেখবেন এঁকে, এঁর কোনও ক্ষতি হলে আমি আমার নিজের ক্ষতি বলে মনে করবো—

সেদিন ওষুধ নিয়ে ফেরবার পথে সদাব্রত ভেবেছিল শৈল সেই সব কথাই তুলবে। কিন্তু কেমন যেন সারা রাস্তা চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। একটা কথাও বলে নি। যে-সদাব্রত দিন-রাতে নানা সমস্যায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল, তাকে বোধ হয় আর বিরক্ত করতে চায় নি বলেই কথা বলে নি। এমন কি যখন ফিরে গিয়েছিল হস্‌পিটালে তখনও কিছু কথা হয় নি।

কেদারবাবুর তখন জ্ঞান ছিল বেশ। সদাব্রতকে দেখেই বললেন—সদাব্রত, আমি অনেকটা ভাল আছি বাবা—

সদাব্রত বলেছিল—ভাল আপনাকে থাকতেই হবে মাস্টারমশাই, আপনি ভাল না-থাকলে পৃথিবী চলবে কী করে ? আপনাকে আমি যেমন করে পারি ভালো করে তুলবোই—

যেন ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো কেদারবাবুর মুখে। বললেন—ঠিক বলেছ সদাব্রত, নইলে সব্বাই ফেল করবে হে এগ্‌জামিনে—

—না মাস্টার মশাই, সে-জন্যে নয়—যে-বনে সিংহ নেই সে-বন বনই নয়—চারদিকে এত জানোয়ার, তার মধ্যে একটি পশুরাজ না থাকলে সবাই যে যা-ইচ্ছে-তাই করবে—

কেদারবাবু যেন আবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন—তাই নাকি ? আজকাল সবাই যা-ইচ্ছে-তাই করছে নাকি ?

সদাব্রত বললে—স্যার পি. সি. রায় চলে যাবার পর আপনি ছাড়া দেশে আর কে আছে বলুন ?

—কিন্তু আমার কথা যে কেউ শোনে না সদাব্রত! আমি যে শুধু-শুধু বকে বকে মরি। আমি কি আর পি. সি. রায়?

সদাব্রত বললে—পি. সি. রায়ের কথাও কেউ শোনে নি মাস্টার মশাই, তিনি বেঁচে থাকতে কেউ তাঁর কথা শোনে নি—কিন্তু তিনি ছিলেন বলে পৃথিবীটা তবু তো একটু এগিয়ে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দর কথাই বা তখন কে শুনেছিল বলুন? এখন তো সেই বিবেকানন্দ, পি. সি. রায়, এঁদের কথাই মুখে বলি। তাঁদের জীবনী তবু তো পড়া হয় স্কুলে—

কেদারবাবু নার্সের দিকে চাইলেন। বললেন—দেখছো তো মা, সদাব্রত আমাকে কত ভালবাসে। আমার জন্যে কত টাকা খরচ করছে, তোমায় কাল রাত্তিরে বলছিলুম, মনে আছে?

এত কথা হলো, এত আলোচনা হলো, এর মধ্যে শৈল একটাও কথা বলে নি। মন্মথও কথা বলে নি। তার পর ওষুধটা নার্সের হাতে দিয়ে যথারীতি সদাব্রত চলে এসেছিল। আর শুধু কি সেই দিন? প্রত্যেক দিনই বিকেলবেলা মন্মথর সঙ্গে শৈল গিয়েছে হস্‌পিটালে আর প্রত্যেক দিনই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে; অথচ একদিনও তো কিছু বলে নি শৈল! একদিনও তো কোনও অভিযোগ-অনুযোগ করে নি! কেদারবাবু আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠছিলেন। সুতরাং আশা সকলেরই হয়েছিল। সদাব্রতকে সকলেই একটা শ্রদ্ধা-মেশানো অনুরাগের দৃষ্টি দিয়ে দেখতো। সদাব্রত রোজ নিজের গাড়ি চালিয়ে আসতো। এসে জ্বরের চার্টটা দেখতো, মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতো, নার্সকে দু-একটা প্রশ্ন করতো, তার পর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে আবার চলে যেতো ক্লাবে। সেই সকাল থেকে অফিসের কাজ, তার পর হস্‌পিটাল আর তার পর ক্লাব। এমনি করেই এতদিন কাটছিল। এতদিনের মধ্যেও তো শৈল একবারও কিছু বলে নি?

সদাব্রতর মনে হতো হয়ত সে এত টাকা খরচ করছে বলে শৈলর মতো তেজী মেয়েও কিছুটা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শৈল কি জানে না যে, কেদারবাবুর অসুখ না হলে এ-চাকরিটাই সে ছেড়ে দিত। নইলে কেমন করে খরচ চালাতো সে? কেমন করে কেদারবাবুর চিকিৎসা হতো? বাগবাজারের বাড়ি থেকে সে নিজের দায়িত্বে এখানে এনে তুলেছিল, সুতরাং তারও তো একটা ভয় ছিল মনে মনে! যদি কোনও বিপদ হতো তা হলে সদাব্রত কি মুখ দেখাতে পারতো শৈলর কাছে?

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। এলগিন রোডের কাছে এসে হর্ন বাজাতেই দরোয়ান গেট খুলে দিলে। সদাব্রত গাড়িটা ভেতরের পোর্টিকোর নিচেয় রেখে তর-তর করে ওপরে উঠে গেল।

সেদিনও আবার বাসের মধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। বাসটা যখন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন হঠাৎ এক ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠলেন—ও মশাই, আমার মানিব্যাগটা কোথায় গেল?

দেখতে দেখতে চলন্ত বাসের মধ্যে একশোটা মানুষ একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠেছে। সবাই নিজের-নিজের পকেট দেখে নিলে। সবাই সাপের মতো হঠাৎ ফণা তুলে সতর্ক হয়ে চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিলে। চোর-গাঁটকাটা-পকেটমার কাছাকাছি কোথাও আছে।

—কত টাকা ছিল মশাই ব্যাগে?

—সত্যি সত্যি খোয়া গেছে নাকি? ভালো করে সব পকেট-টকেট দেখুন—

এ-পকেট ও-পকেট সমস্ত দেখতে লাগলো ভদ্রলোক। একেবারে পাগলের মতন অবস্থা।

—কী হবে মশাই? আমার যে ব্যাগের ভেতরে সাতাশি টাকা ছিল!

পেছন থেকে এক ভদ্রলোক বললেন—একটু আগে যে মেয়েটা নেমে গেল, ও আপনার কে?

—মেয়ে? আমার সঙ্গে আবার মেয়ে কোথায় থাকবে মশাই? আমি তো একলা—

—তা হলে মেয়েটা আপনার পকেটে হাত দিচ্ছিল যে, আমি দেখলুম।

তাজ্জব ব্যাপার! সবাই অবাক হয়ে উঠলো। উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো। সত্যিই একটি মেয়ে লেডিজ্ সীটে বসে ছিল। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিল ওপরের রড্ ধরে, আর ঠিক তার পাশেই বসে ছিল মেয়েটি। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের চেহারা। মোটামুটি সকলেরই নজরে পড়েছে। ভেবেছিল মেয়েটি ভদ্রলোকেরই কোনও আত্মীয়া-টাত্মীয়া হবে। প্রথমে তাই কেউ কিছু সন্দেহই করে নি। একজন শুধু দেখেছে মেয়েটিকে ভদ্রলোকের পকেটে হাত

দিতে। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু দুটো স্টপেজ আগেই নেমে গেছে মেয়েটি। মেয়েটি একলা নেমে যাওয়াতে কেমন যেন একটু অবাক লেগেছে ভদ্রলোকের। কিন্তু কিছু বলে নি।

যার মনিব্যাগ হারিয়েছে সে-ভদ্রলোক নেমে যাচ্ছিল।

—কিন্তু আর কি তাকে পাবেন মশাই, এতক্ষণ কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছে তার কি ঠিক আছে?

তবু ভদ্রলোক নেমে পড়েন। সাতাশি টাকাটাই কি কম! সাতাশি টাকায় দু-মণ চাল কেনা যায়। ছেলে-মেয়েদের পেট ভরে দুধ খেতে দেওয়া যায়। অনেক কিছুই করা যায়। বাসসুদ্ধ লোক সেই কথাই আলোচনা করতে লাগলো। কিন্তু বাস কারো জন্যে অপেক্ষা করে থাকে না—বাস ভদ্রলোককে নামিয়ে দিয়ে তখন চলতে শুরু করেছে।

বুড়ি যখন বাড়ি ফিরলো তখন বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। কোথায় কলেজ স্ট্রীট, কোথায় বৌবাজার—কত দিক ঘুরতে ঘুরতে এসে বাড়ি পৌঁছে হাঁপিয়ে পড়েছে। নিজের পাড়ার কাছে এসে পিঠের কাপড়টা ভালো করে টেনে দিলে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই অবাক হয়ে গেছে। দিদি বাড়িতে?

কুন্তি বিছানায় শুয়ে ছিল।

—কী রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? হাতে কী দেখি?

বুড়ির হাতে তখনও প্যাকেটটা রয়েছে। সত্যি কথাটা বলতে কেমন ভয় করতে লাগলো।

—ওতে কী আছে? দেখি? খোল্—

প্যাকেটটা হাত থেকে নিলে কুন্তি। ভেতরে একটা লিপস্টিক, একটা পাউডার-কেস, একটা সেণ্ট। সাবান, আরো কত কি টুকিটাকি।

কুন্তি জিজ্ঞেস করলে—এগুলো কোথা থেকে কিনলি? টাকা পেলি কোত্থেকে?

বুড়ি বললে—কিনি নি, একজন দিয়েছে—

—কে দিলে?

—আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে।

—ক্লাসের একটা মেয়ে তোকে দিলে আর তুই নিলি? সে তোকে দিতে গেল কেন? নাম কী তার?

—বাসন্তী!

—তোকে সে দিলে কেন? খুব বড়লোক তারা?

বুড়ি তখনও দিদির সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে ভয়ে কাঁপছে, বললে—হ্যাঁ দিদি, তারা খুব বড়লোক, দোকানে গিয়ে নিজের জন্যেও কিনলে, আমাকেও কিনে দিলে। আমি নিতে চাই নি, আমি পরের দেওয়া জিনিস নিতে যাবো কেন? সে জোর করে আমার হাতে গুঁজে দিলে—

কুন্তি বুড়ির মুখের দিকে মুখ তুলে চাইল। নিজের মায়ের পেটের ছোট বোন। ভাল করে খেতেও দিতে পারে না ছোট বোনকে। অথচ একদিন এই বোনকেই মাথায় বঁটি দিয়ে মেরেছিল। কপালের সামনেটায় এখনও দাগ রয়েছে তার। বিয়ের সময় যারা দেখতে আসবে তারা হয়ত জিজ্ঞেস করবে—কপালে ও দাগটা কিসের?

কুন্তি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে, তোর কপালে এখন আর কোনও ব্যথা-ট্যথা নেই তো?

বুড়ি কাপড়-চোপড় বদলে তখন পড়তে বসার আয়োজন করছিল। বললে—না, আর ব্যথা করে না—

—হ্যাঁরে মা'র কথা তোর মনে পড়ে?

—মা?

হঠাৎ এতদিন পরে মা'র কথা যে কেন তুললে দিদি, বুড়ি তা বুঝতে পারলে না। পৃথিবীতে আজকাল এত দেখবার, এত ভাববার, এত ভোগ করবার জিনিস রয়েছে, এর মধ্যে বাবা-মা'র কথা কে মনে রাখে? মনে রাখবার মত সময়ই বা কোথায়?

—জানিস, আমি যখন ছোট ছিলুম, বাইরে বাইরে টো টো করে ঘুরে বেড়াতুম, তখন বাড়িতে বসে মা আমার জন্যে খুব ভাবতো, তখন আমি মার কথা মোটে ভাবতুম না। এখন প্রায়ই আমার মা'র কথা মনে পড়ে, জানিস—

বুড়ি শুনতে লাগলো শুধু।

—এক এক সময় মনে হয়, মা বেঁচে থাকলে বেশ ভাল হতো রে! আজকে মা বেঁচে থাকলে আর তোর জন্যে ভাবতুম না। আমি টাকা উপায় করতুম আর তুইও সারাদিন লেখাপড়া নিয়ে থাকতে পারতিস, তোকে আর রান্নার কাজ করতে হতো না। তা হলে খুব ভালো হতো, না রে?

বুড়ি কিছু বললে না। শুধু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো। দিদির আজ হলো কী? এমন করে তো অনেক দিন তার সঙ্গে কথা বলে নি।

হঠাৎ মুখ তুলে বুড়ি জিজ্ঞেস করলে—আজ যে তুমি বেরোও নি দিদি! আজ বুঝি তোমার প্লে নেই?

কুন্তি ততক্ষণে চোখ বুঁজিয়ে ফেলেছে। চোখ বুঁজে যেন কী-সব ভাবছে। বুড়ি চেয়ে দেখলে আর একবার। সাজলে গুজলে দিদিকে সত্যিই খুব ভালো দেখায়। আজ সাজে নি কেন? আজ গা ধোয় নি, চুল বাঁধে নি, শাড়িটা পর্যন্তও বদলায় নি! হঠাৎ এতদিন পরে দিদির পুরোনো কথা মনে পড়লোই বা কেন? দিদির কী হলো?

—শান্তি!

বাইরে থেকে দিদিমণির গলার আওয়াজ পেয়েই বুড়ি উঠলো। ওই, পড়াতে এসেছে দিদিমণি!

দিদিমণি ভেতরে এসেই অবাক হয়ে গেছে।

—এ কি? আপনি আজকে বেরোন নি? আজকে বুঝি প্লে নেই আপনার?

কুন্তি যেমন শুয়ে ছিল তেমনি শুয়েই রইল। বললে—শরীরটা ভাল নেই তেমন। বুড়ির পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? আপনার ওপরেই ওকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি, আপনি একটু ভালো করে দেখবেন—

চল্লিশ টাকা মাইনের দিদিমণি। মাসের প্রথম দিনেই নিয়ে যায় ছাত্রীর হাত থেকে। অর্ধেক দিনই ছাত্রী বাড়ি থাকে না। পড়া না-পারলেও স্কুলের পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিয়ে, আগে থেকে কোশ্চেন বলে দিয়ে চাকরি রাখতে হয়। এর পর যদি পরীক্ষায় ফেল করে তো দিদিমণির চাকরিটাই চলে যাবে। কিংবা হয়ত কোচিং ক্লাসে ভর্তি হবে। তখন? তখন কে মাইনে যোগাবে? এমনি করেই কবে বুড়ি ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস ফাইভে উঠেছে, ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে। তার পর আস্তে আস্তে ক্লাস টেন-এ। পরীক্ষার আগে সব কোশ্চেন বলে দিয়েছে দিদিমণি, পরীক্ষার রেজাল্টে জিরোর আগে চার বসিয়ে দিয়েছে, আবার কখনও বা পাঁচ। সেই রেজাল্ট এনে বুড়ি দিদিকে দেখিয়েছে।

দিদি বলেছে—বাঃ, খুব ভাল, খুব ভাল, এমনি করে ভাল করে মন দিয়ে লেখাপড়া করবি—

তার পর বলতো—জানিস বুড়ি, আমার তো কিছু হলো না, তাই তোর যদি কিছু হয় তো তাতেই আমি খুশী হবো রে, তোর জন্যেই তো আমি এত খেটে মরি, নইলে গালে-ঠোঁটে রং মেখে আমারই কি আর নাচতে-কুঁদতে ভাল লাগে—

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই মিস্টার বোসের পার্লার। সেই পার্লারে বসেই সাধারণতঃ তিনি সকালবেলা খবরের কাগজ শোনেন। ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করেন। দিল্লীতে ট্রাঙ্ক-কল করেন। সে-ঘরেও উঁকি দিয়ে দেখলে সদাব্রত। সেখান থেকে কোরিডোর পেরিয়ে ভেতরে ইনডোরে যেতে হয়। সেখানেই মিস্টার বোস থাকেন আফ্‌টার ডিনার। দুটো ইলেকট্রিক আলোর ঝাড় ঝুলছে মাথায়। এক-একটা ঝাড়ে ষোলটা করে বাল্‌ব, আর দুটো চারটে কাট গ্লাসের ওয়াল-ল্যাম্প। ফ্লোরের ওপর কাশ্মীরী কার্পেট। ছ'টা সোফা, ছ'টা কোচ, আর উত্তর দিকের দেয়ালে একটা ট্যান-করা ভাল্লুকের চামড়া ঝুলছে। ভাল্লুকটা অমরকণ্টকের জঙ্গলের। মিস্টার বোস বারো বোরের রাইফেল দিয়ে ওটাকে শিকার করেছিলেন নাইনটিন ফর্টিফাইভে। সে-কথা চামড়াটার তলায় ফ্রেমে লিখে এঁটে দেওয়া আছে। যদি কেউ কৌতুহলী হয় তো তার কৌতুহল নিবৃত্তি হবে।

এইখানে এই হলের ভেতরেই ডিনারের পর মিস্টার বোস, মিসেস বোস, মিস্‌ বোস, রোজ একটুখানি বসেন। ইচ্ছে হলে একটু ড্রিঙ্ক করেন। কখনও 'ইভ্‌স উইকলি' পড়েন, কখনও বা 'রিডার্স ডাইজেস্ট'। সোসাইটির গল্প হয়, ক্লাবের আলোচনা হয়, টার্ফ-ক্লাবের ঘোড়ার কথাও ওঠে। আর ওঠে পলিটিক্‌স্‌। অর্থাৎ নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃষ্ণ মেনন, জগজীবন রাম, কিংবা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। মিসেস বোসের পলিটিক্‌স্‌-এর দৌড় ওই পর্যন্তই।

এই ঘরে বসে বহুদিন সদাব্রত এই সব আলোচনা শুনেছে। অর্থাৎ তাকে শুনতে হয়েছে। আলোচনায় যোগ দিতে হয়েছে। মিসেস বোস খেয়ালী মানুষ। পরের শনিবার কোন্‌ ঘোড়ার ওপর বেটিং করবে সেই সাজেশানও চেয়েছে। কিন্তু সদাব্রত কোনও সাহায্যই করতে পারে নি মিসেস বোসকে।

মিসেস বোস প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল—কেন ? লাইফে কখনও রেস খেলো নি ?

সদাব্রত বলেছিল—না—

—হাউ স্ট্রেঞ্জ ! তুমি জানো না ছোটবেলায় টেক্স্ট বুকে পড়েছিলাম : 'হর্স ইজ এ নোব্‌ল অ্যানিম্যাল !' আর 'রেসিং হর্স ইজ এ নোব্‌লার অ্যানিম্যাল—'

মনিলা বলতো—জানো সদাব্রত, আমার মা হর্সে খুব আনলাকি—শুধু ক্রিটিতে লাকি—

মায়েতে মেয়েতে বাবাতে এই নিয়েই তর্ক বেধে যেতো। কে কোন্ হর্স খেলেছে, কোন্ হর্স ট্রিপল্-টোট পেয়েছে, কবে কোন্ হর্স আপসেট করেছে, তার ইতিহাস বাপ-মা-মেয়ের মুখস্থ। এর মধ্যে সদাব্রতর চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। যখন সময় হয়ে যেতো তখন সদাব্রত উঠতো। মনিলাও উঠতো। কোরিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত এসে মনিলা হঠাৎ সদাব্রতর মুখটা দুই হাতে ধরে চুমু খেতো। তার পর সদাব্রতর দিকে দুটো শব্দ ছুঁড়ে দিতো—বাই-বাই—

এরই নাম এন্‌গেজমেণ্ট। এরই নাম কোর্টশিপ। সদাব্রত এমনি করেই কাটাচ্ছিল এই ক'টা মাস। কিন্তু হঠাৎ যেন পুকুরে ঢিল পড়লো।

সদাব্রত হল-ঘরে ঢুকে দেখলে সেদিনও মিস্টার বোস, মিসেস বোস, মিস্ বোস বসে আছে যার-যথা-স্থানে। সবাই যেন একটু উত্তেজিত। মিস্টার বোস ঘন-ঘন চুরোট টানছেন।

হঠাৎ সদাব্রতকে দেখেই সোজা হয়ে বসলেন।

—হিয়ার ইজ হি !

সদাব্রত মিস্ বোসের দিকেও চেয়ে দেখলে। কেঁদে কেঁদে মুখ-চোখ-ভ্রূর কস্‌মেটিক্‌স্ ধুয়ে-মুছে গেছে। মিসেস বোসও উত্তেজিত। বললে—কাম হিয়ার সদাব্রত—

মিস্টার বোসের সামনে ট্রের ওপরই পড়ে ছিল একখানা চিঠি। চিঠিখানা নিয়ে সামনে ধরে মিস্টার বোস বললেন—এই দেখ সদাব্রত, দিস ইজ দি লেটার—

একখানা খামের চিঠি। খামের ওপর মনিলা বোসের নাম ঠিকানা বাংলায় লেখা। বাঁকা-চোরা হাতের লেখা। লাইনগুলোও সমান করতে

পারে নি। তার ভেতরেই এক্সারসাইজ-বুকের পাতায় দু-পাতা ভর্তি একটা চিঠি! সেটাও বাঁকা-চোরা। বানান ব্যাকরণ কিছুরই ঠিক নেই। অজস্র ভুলে ভরা।

—তুমি বলতে পারো এ কার লেখা চিঠি? কেন লিখেছে?

সদাব্রত একমনে চিঠিটা পড়ছিল।

—আর তোমার এগেন্স্টে যা-কিছু লিখেছে, আর দীজ ফ্যাক্ট্স্?

সদাব্রত মুখ তুললো এবার। সদাব্রতরও রাগ হয়। এ-চিঠি পড়ার পর রাগ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু যে চিঠি লিখেছে রাগটা তার ওপর ততটা নয়, যতটা রাগ মিস্টার বোসের ওপর।

মিসেস বোস বললেন—আমিও পড়েছি, ইট ইজ এ ড্যাম্ সিলি লেটার—রিয়্যালি সিলি—

মনিলা বোস বোধ হয় আর একটু হলেই আবার কেঁদে ভাসিয়ে দিতো। মনিলা বললে—কিন্তু আমাকে বিট্রে করলে কেন সদাব্রত! আমি তোমার কী করেছি? হোয়াট হ্যাভ আই ডান টু ইউ?

মিস্টার বোস বললেন—তুমি একটা কথার উত্তর দাও সদাব্রত, এ-চিঠির পেছনে কোনও ট্রুথ্ আছে কি-না—

সদাব্রত বললে—আপনি কি এ-চিঠি বিশ্বাস করেছেন?

মিস্টার বোস বললেন—বাট হু ইজ দি রাইটার? হুম ডু ইউ সাসপেক্ট? কাকে তুমি সন্দেহ করো, বলো? উত্তর দাও—

মনিলা বোস বললে—বাবা, আমি তোমাকে বলেছিলাম, সদাব্রত ড্রিঙ্ক করে না, কিটি খেলে না, ও কখনও নর্ম্যাল লোক হতে পারে না—

মিসেস বোস বললেন—কিন্তু সদাব্রত, তোমাকে দেখে তো মনে হয় না তুমি স্কাউণ্ড্রেল—ইউ লুক কোয়াইট এ জেণ্ট্ল্ম্যান—

মিস্টার বোস বললেন—কাকে তুমি সন্দেহ করো? উত্তর দাও—

সদাব্রত বললে—আমি কাউকেই সন্দেহ করি না—

—সন্দেহ করো না? তা হলে কে চিঠি লিখলো? গোস্ট? ভূতে লিখেছে? বলো, উত্তর দাও—

সদাব্রত বললে—আপনি কি আমার কৈফিয়ত নেবার জন্যেই ডেকেছেন আমাকে এখানে?

—কৈফিয়ত নেবার জন্যে ডাকি নি তো কিসের জন্যে ডেকেছি? তুমি

মনিলাকে বিয়ে করবে, তার ভাল-মন্দের কথা আমাকে ভাবতে হবে না? আমার কোনও রেসপন্‌সিবিলিটি নেই?

—আপনি তো আমাকে টেস্ট করেই নিয়েছেন! আমি কমিউনিস্ট, না কংগ্রেসাইট সব তো দেখেই বেছে নিয়েছেন—

—কিন্তু তোমার মর‍্যাল ক্যারেকটার?

সদাব্রতও আর স্থির থাকতে পারলে না। বললে—আপনার সান্‌-ইন্‌-ল হতে গেলে কি আমার ক্যারেকটার সার্টিফিকেটও সাবমিট করতে হবে? আমাকে আপনি দু'হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছেন আমার কাজের জন্যে, না আমার মর‍্যাল-ক্যারেকটারের জন্যে? কী জন্যে বলুন?

—কিন্তু তুমি সারা জীবন মেয়েদের সঙ্গে মিশছো, তাদের নিয়ে বাগানবাড়িতে গিয়েছ, তাদের সঙ্গে অ্যাডালট্রি করেছ, এর পরেও তোমাকে বিশ্বাস করা যায়?

সদাব্রত বললে—তাই যদি বিশ্বাস না করতে পারেন তো আমাকে ডিসচার্জ করে দিন—

—কিন্তু এ-সব কথা তুমি আগে জানাও নি কেন?

মনিলা বোস বললে—আমি দেখেছি বাবা, সদাব্রত হ্যাগার্ড পুওর আন-কালচার্ড লেডীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে—

সদাব্রতর বোধ হয় আগেই চরম কথা বলা হয়ে গিয়েছিল। তখন আর তার যেন এ-সম্বন্ধে কিছু বলার ছিল না। এখান থেকে চলে গিয়েই সে শান্তি খুঁজছিল।

—কী হলো, উত্তর দাও?

সদাব্রত বললে—আমি উত্তর দেবো না—

—তা হলে চিঠিতে যা লেখা আছে সব সত্যি? এভরিথিং ট্রু?

—তাও আমি বলবো না। এর চেয়ে যে অনেক বেশি অপরাধ করে সে আপনাদের সোসাইটিতে মাথা উঁচু করে বেড়ায়, তাকে আপনারা রেসপেক্ট দেখান, সম্মান করেন। যে-অফেন্স আপনারা সবাই করছেন, আজকে সেই অফেন্সের জন্যেই আমাকে কৈফিয়ত দিতে ডেকেছেন, এইটে ভাবতেই আমার অবাক লাগছে—

—তার মানে?

সদাব্রত বললে—এখন আমিই মনিলাকে বিয়ে করবো কি-না সেইটে আগে ভাবি—

মিস্টার বোসের এবার যেন নেশা কেটে গেল। সদাব্রত কথাটা বলে চলেই যাচ্ছিল।

মিস্টার বোস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি বসো সদাব্রত, টেক ইওর সীট—তুমি এক্‌সাইটেড হয়ে পড়েছ, শোন, সামান্য ব্যাপারে এত এক্‌সাইটেড হয়ে পড়লে কেন? বসো, বসো—

জোর করে সদাব্রতকে বসিয়ে দিলেন মিস্টার বোস।

বললেন—আমি তো তোমার কাছে কৈফিয়ত চাই নি। মনিলা জানে, মনিলা কান্নাকাটি করছে বলেই আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি, তুমি জানো মনিলা কাঁদলে আমার রাত্রে ঘুম আসে না, আমাকে স্লীপিং-পিল খেতে হয়—

তার পর একটু থেমে বললেন—মিস্টার গুপ্ত কান্ট্রির কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আমি ফ্যাক্টরি নিয়ে বিজি, তোমার ফাদারের সব প্রপার্টি, আমার সমস্ত প্রপার্টি, সব-কিছুই তো একদিন তুমি ইনহেরিট করবে—তখন? তখন যদি তোমার ইনটেগ্রিটি না থাকে তো কী করে হ্যাণ্ডেল করবে এ-সব?

আবার চুরোট টানলেন। ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলতে লাগলেন—আর যতদিন মিস্টার গুপ্ত আছেন, যতদিন আমি আছি, ততদিন তোমার কিছু ভাববার নেই, কিন্তু চারদিকে যে-রকম কমিউনিস্টিক এলিমেণ্ট আস্তে আস্তে ফোর্স গ্যাদার করছে, তাতে কি তুমি মনে করো তুমি এখনকার মত তখন নিশ্চিন্তে বিজনেস চালাতে পারবে? তাই তোমাকে এই সমস্ত লেসন্ দেবার জন্যেই তো আমি মাঝে-মাঝে তোমাকে ডাকি, মাঝে-মাঝে তোমাকে বকি, ইট ইজ ফর ইওর গুড্, তোমারও ভালোর জন্যে, মনিলারও ভালোর জন্যে—! তাতে তুমি অত রাগ করো কেন?

মনে হলো সদাব্রতর মনের ভেতরের ঝড়টা যেন একটু থেমে এসেছে।

মিস্টার বোস বললেন—একটু রাম্ খাবে? কিংবা এক পেগ জীন?

সদাব্রত উঠে দাঁড়ালো। বললে—আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার বোস, আমি কাল থেকে আর অফিসে যাবো না—আমি কালকে আপনাকে রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দেবো—

বলে আর দাঁড়ালো না। সোজা দাঁড়িয়ে বাইরে কোরিডোরের দিকে পা বাড়ালো।

উনিশ শ' সালের পর থেকে গোটা পঞ্চাশটা বছর কেটে গেলেও কলকাতার অর্ধেক মানুষ তখনও বুঝতে পারে নি দেশের রাজা কে, কী তাঁর নাম, কোন্ রাজত্বে তারা বাস করছে। ইতিহাস যারা পড়ে নি তাদের বোঝানো শক্ত যে—ওগো এটা ইণ্ডিয়ান রাজত্ব! যারা জানে তারা জানে। তাদের সংখ্যা বড় কম। অন্যরা কিছুই তফাৎ বুঝতে পারে না। যদি কেউ বলে ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেণ্ট এখন লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো, তাতেও তারা অবিশ্বাস করবে না। যদি জিজ্ঞেস করো এটা বৌদ্ধ যুগ না মোগল যুগ না ব্রিটিশ যুগ, তারও সঠিক উত্তর তারা দিতে পারবে না। রাজা যে-ই হোক তাতে আমাদের কী আসে যায়? আমরা মশাই আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবর নিয়ে কী লাভ? রাজারা কি আমাদের রাজা করে দেবে? আমাদের দুঃখ আমাদেরই, রাজারা তো আমাদের দুঃখ বুঝবে না। যে রাজা সে তো থাকে রাজপ্রাসাদে। বৌদ্ধ যুগে রাজা রাম পাল তা-ই করেছে, মোগল যুগে নবাব আলীবর্দী খাঁ তা-ই করেছে। ব্রিটিশ যুগে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোও তা-ই করেছে, এখন যারা রাজা হয়েছে, তারাও তাই-ই করছে, আর করবেও তা-ই। তারা বলে এইটেই নিয়ম। চিরকাল ধরে এই নিয়মই চলে আসছে। শিশু চিরকাল যেমন দুধ খায়, গরু যেমন চিরকাল ঘাস খায়, রাজাও তেমনি চিরকাল ঘুঁষ খায়। কেউবা টাকার ঘুঁষ খায়, কেউ ক্ষমতার ঘুঁষ। ও দুটো একই কথা। আমরা ভোট দিয়ে তোমাকে রাজা করবো, তুমি রাজা হয়ে আমাদের চোখ রাঙাবে। আর দরকার হলে রোজ সকালবেলা খবরের কাগজের পাতায় দু'পাতা করে উপদেশ দেবে। তোমার ডিউটি ওই পর্যন্ত!

শিবপ্রসাদবাবু বলেন—মানুষ এডুকেটেড না হলে কিছুই হবে না—

বুড়ো অবিনাশবাবু বলেন—ঠিক কথা বলেছেন—

শিবপ্রসাদবাবু বলেন—আমি ঠিক কথা বললে তো চলবে না। কথা তো অনেক বলা হয়েছে, এবার কাজে করে দেখাতে হবে—আমি তো ডাক্তার রায়কে সেই কথাই সেদিন বললুম। বললুম—আগে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যায় বেঙ্গল ছিল ফার্স্ট, সে ব্রিটিশ আমলের কথা, তার পরে পোজিশন ছিল থার্ড—আর এখন পোজিশন কত জানেন?

যারা বুড়োর দল তারা সবাই হাজির ছিল সেদিন।

জিজ্ঞেস করলে—কী জানি মশাই কত, কে অত খবর রাখছে মশাই, নিজেদের ঝঞ্ঝাট কে দেখে তার ঠিক নেই, তার ওপর দেশের কথা ভাববার সময় কখন—

—এখন পোজিশন সেভেন্থ—

—সে কী!

—আপনারা আছেন কোথায়? হয়ত আসছে সেন্‌সাসে দেখবেন বেঙ্গলের পোজিশন টেনথ্‌ হয়ে গেছে। এককালে এই বাংলা দেশ থেকেই আগে সব প্রভিন্‌সে জজ ম্যাজিস্ট্রেট ডাক্তার উকিল মায় ক্লার্ক পর্যন্ত আমরা সাপ্লাই করেছি। আরও আগে তো আমরাই চাল সাপ্লাই করেছি অন্য প্রভিন্‌সে, আর এখন আমাদের ছেলেরাই অল্‌-ইণ্ডিয়া-সার্ভিসে স্ট্যাণ্ড করতে পারে না। এখন সব ব্যাপারে বাঙালী পিছিয়ে আসছে, ক্যাবিনেটে একটা বাঙালী মিনিস্টার নেই, একটা ছটো থাকলেও তাদের কোনও ভয়েসই নেই, নেহরুর একটা ধমকেই কাপড়ে-চোপড়ে করে ফেলে—

—তা হলে কী উপায়?

কী যে উপায় তাই ভাবতেই বুড়ো-বুড়ো পেন্‌সন-হোল্ডাররা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ ভেবেও কেউ উপায় বার করতে পারে না। সকাল থেকে বুড়োরা খেয়ে-দেয়ে ছপুরে আরাম করে ঘুমিয়ে তার পর বিকেলবেলা দেশের কথা নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবে। তাদের দোষ নেই। তারা বুড়ো মানুষ, জীবনের সবটুকু শক্তি গভর্মেন্টের চাকরিতে খুইয়ে এসে এখন আর এনার্জি নেই। এখন দূর থেকে শুধু চোখ মেলে দেখে সমস্ত আর নিজেদের মধ্যে হায়-হায় করে। বলে—এবার দেশটা গোল্লায় গেল—

শিবপ্রসাদবাবু বলেন—সেই জন্যেই তো খবরের কাগজ বার করছি—

—করুন করুন মশাই, করুন। দেশের লোকদের একটু সত্যি খবর জানান। আমরা যে কোন্‌ যুগে বাস করছি সেইটে সাধারণ মানুষদের বুঝিয়ে দিন, দেশের একটা মহা উপকার হোক—

শিবপ্রসাদবাবু বলেন—দেখি কী করতে পারি—অনেক টাকার ব্যাপার তো—

অবিনাশবাবু বললেন—আমাদের পেন্‌সন্‌-হোল্ডারদের কথাটা নিয়ে

একটু লিখবেন টিখবেন দয়া করে, আমরা মশাই বুড়ো হয়ে গেছি বলে কি কোনওকালে ইয়ংম্যান ছিলুম না? না কি আমরা ট্যাক্স দিই না—

অধরবাবু বললেন—পণ্ডিত নেহরু আপনার ফ্রেণ্ড বলে যেন তাঁকে ছেড়ে দেবেন না আবার!

—আমি মশাই সেকালের ট্রায়েড পলিটিসিয়ান, আমরা ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের এগেন্স্টে বলতে ভয় পাই নি, আর এদের ভয় পাবো?

—কিন্তু যেই কাগজ বার করবেন আর ওমনি দেখবেন আপনার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

—কী করে?

—ঘুঁষ দিয়ে—

—ঘুঁষ?

অধরবাবু বললেন—হ্যাঁ মশাই, গভর্মেণ্ট আপনাকে মোটা-মোটা টাকার বিজ্ঞাপন দেবে, আপনার স্টাফের মাইনে বাড়িয়ে দিতে বলবে—আপনি বলবেন আপনার টাকা নেই। তখন আপনাকে কাগজের কোটা বাড়িয়ে দেবে, আর শুধু কি তা-ই? আপনাকে আমেরিকা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে, ওয়েস্ট-জার্মানী ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে, সারা পৃথিবী বিনা পয়সায় ঘুরে বেড়াবার সুবিধে করে দেবে। শুধু আপনি একলা নয়, আপনার বউ ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে বিনা পয়সায় প্লেনে ঘুরে বেড়াবেন—ওরই নাম তো ঘুঁষ!

শিবপ্রসাদবাবু হাসলেন। বেশ বিজ্ঞের হাসি। বললেন—তা যদি হতো মশাই, তো কবে এতদিন আমি ক্যাবিনেটের মিনিস্টার হয়ে যেতে পারতুম। আমি সেই বান্দাই বটে। নেহরুজী আমায় কতদিন বলেছে—গুপ্ত, তুম্ হামারা ক্যাবিনেট মে আ যাও—। আমি বলেছি—নেহরুজী, সত্যি কথা বলার জন্যে একজন লোক অন্ততঃ বাইরে থাকুক, নইলে দেশ যে রসাতলে যাবে—

কথাবার্তার মধ্যেই হঠাৎ বদ্যিনাথ এসে হাজির হয়। আর তখনই সকলের টনক নড়ে। শিবপ্রসাদবাবুর পুজো করবার টাইম হয়ে গেছে। এবার ওঠবার পালা। শিবপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়াই এক সমস্যা। কখনও দিল্লী কখনও এলাহাবাদ, কখনও আরামবাগ। সারা ইণ্ডিয়াটাই চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একেই বলে মশাই পেট্রিয়ট। ইচ্ছে করলে আজ কী-ই না হতে পারতেন। স্টেট-মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে ক্যাবিনেট

পর্যন্ত সর্বত্র অব্যাহত গতি। অথচ নির্লোভ, নিরাসক্ত, নিরহংকার পুরুষ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ মশাই, প্রহ্লাদ।

সকলে চলে যাবার পর শিবপ্রসাদবাবু পুজো করতেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন। ন'টা। এই-ই ঠিক সময়। এই সময়েই মিস্টার বোস লাঞ্চ খেয়ে পার্লারে এসে বসেন।

শিবপ্রসাদবাবু টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে লাগলেন।

—হ্যাঁ, শুনেছেন বোধ হয়, আপনার কোল-টারের পারমিট বেরিয়ে গেছে।

—মেনি থ্যাঙ্কস্ মিস্টার গুপ্ত, আপনি না-থাকলে বড় মুশকিলে পড়তে হতো। চিঠি দিলে তো দিল্লী থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না, তাই আপনাকে ধরেছিলুম। এনি হাউ, কাজটা হয়ে গেছে এইটেই ভালো!

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—এবার থেকে আমাকে আপনি সব বলবেন, আমি আপনার সব কিছু পাইয়ে দেবো—

—কিন্তু দিল্লীতে এতগুলো মিনিস্টার আর এতগুলো সেক্রেটারি, ডেপুটি-সেক্রেটারি, এরা সব কী নিয়ে এত বিজি থাকে বলুন তো যে একটা চিঠি পর্যন্ত লেখবারও সময় পায় না?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—কী করে সময় পাবে? আমি সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে দেখেছি সব সেক্রেটারি কেবল মিনিস্টারদের বার্থ-ডে সেলিব্রেশন নিয়ে ব্যস্ত—

—বার্থ-ডে সেলিব্রেশন মানে? জন্মদিন? জন্মদিনের উৎসব?

—আরে হ্যাঁ মশাই, বারোটা মিনিস্টার, সেই প্রত্যেকটা মিনিস্টারের জন্মদিনের উৎসব করা কি সোজা কাজ? আজ আবুল কালাম আজাদের, কাল জগজীবন রামের, পরশু টি-টি-কৃষ্ণমাচারীর। বছরে বারোটা তো মাত্র মাস, তা বারোটা মিনিস্টারের জন্মদিনের উৎসবের ফাইল ক্লিয়ার করতে করতেই তো সারা বছরটা ফুরিয়ে যায়, এর পরে অন্য কাজ করতে তারা কখন সময় পাবে বলুন?

—কিন্তু এম-পি যারা হয়েছে তারা কী করতে আছে? তারা কী করে সেখানে বসে বসে?

—তারা হাত তোলে!

মিস্টার বোস বললেন—কিন্তু পাবলিক যদি কোনও দিন এ নিয়ে কোশ্চেন তোলে? তখন কী জবাব দেবে?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—কিন্তু পাবলিক মানে তো খবরের কাগজ। খবরের কাগজের মুখ তো তারা বন্ধ করে দিয়েছে। খবরের কাগজ তো এখন আর পিপলস্ ভয়েস নয়, এখন তো প্রোপাইটার্স্ ভয়েস—এখন তো খবরের কাগজের মালিকদের খুব বিলেত-ফিলেত ঘুরিয়ে এনে তোয়াজ করে দিচ্ছে—।

—কী রকম?

—সে আপনাকে বলবো'খন্, সেই জন্যেই তো আপনাকে বলেছি খবরের কাগজ বার করতে—আর একটা কথা, সদাব্রত কেমন কাজ করছে?

মিস্টার বোস বললেন—নাউ হি ইজ অলরাইট, ইয়াংম্যানদের যা স্বভাব তাই হয়েছিল আর কি! আমার কাছে সেদিন রেজিগ্‌নেশন-লেটার পাঠিয়েছিল—আমি ওকে ডেকে সব বুঝিয়ে বললাম—

—ও কী বললে?

মিস্টার বোস বললেন—আমি তো আপনাকে বলেছিলুম আগেই, এই বয়েসটাই সব চেয়ে ডেঞ্জারাস। কোনও রকমে তিরিশ ক্রস করে গেলেই ডেঞ্জার পার হয়ে যাবে। তিরিশ বছর বয়েস পর্যন্তই কমিউনিজমের ছোঁয়াচ লাগবার যা ভয়, তার পর দু'দিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে—আপনি কিছু ভাববেন না—

শিবপ্রসাদবাবু এবার বললেন—তা হলে বিয়ের সম্বন্ধে মিস্ বোস কী বলছে?

মিস্টার বোস বললেন—নেক্সট মন্থেই বিয়েটা হয়ে যাক, মনিলাও দেখলাম অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে একটু, পেগীকে বড্ড ভালবাসতো কি না। এখন দেখছি পেগীকে নিয়ে আর ক্লাবে আসে না—

—ভেরি গুড্, ভেরি গুড্—

শিবপ্রসাদবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তার পর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে সোজা পুজোর ঘরে গিয়ে বসলেন। পুজোর ঘরে মূর্তি-টুর্তি কিছু নেই। কার্পেটের আসন। সামনে ডিসটেম্পার-করা দেয়াল। বদ্যিনাথ সেখানে এসে টেলিফোনটা ফিট করে দিয়ে গেল। শ্বেত পাথরের রেকাবীতে কিছু ফুল আর তামার মিনে-করা 'পট'-এর ভেতরে খানিকটা গঙ্গাজল। দু'দিন আগে একটা প্লট কিনেছিলেন চন্দননগরের কাছে। দম পেয়ে বেচে

দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন কি জানতেন আরো দর উঠবে। ওখানেই মোটরের ফ্যাক্টারি হবে। তা হলে আরো কিছুদিন ধরে রাখলেই হতো। থ্রি-হানড্রেড পার্সেন্ট প্রফিট্ থাকতো তাঁর নিজের। বড় ব্যাড ইনভেস্ট্মেন্ট্ হয়ে গেল। মনটা টন টন করে উঠলো শিবপ্রসাদবাবুর। অনেকগুলো টাকা। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হয়ে গেল। ল্যাণ্ড-ডেভেলপমেন্ট সিণ্ডিকেট হবার পর থেকে এত বড় লস্ আর হয় নি কখনও। শিবপ্রসাদবাবু গঙ্গাজল হাতে নিয়ে নিজের লস্-প্রফিট-গেন হিসেব করতে লাগলেন।

একদিন ছনিবাবুকেই কুন্তি গুহর ঠিকানা খুঁজে বার করতে হয়েছিল। কুন্তি গুহকে প্লে করাবার জন্যে খোসামোদ করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়। সেই কুন্তির কাছে এসেই একদিন দরবার করতে হয়েছিল ছনিবাবুকে। সেদিন কুন্তি গুহ তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে।

বলেছিল—যান যান মশাই, আমি কেন জবাবদিহি করতে যাবো? আমার কিসের দায়?

ছনিবাবু বলেছিল—দেখুন আমার চাকরি চলে যাবার দাখিল—

—আপনার চাকরি চলে গেলে আমার কী? আমি কি আপনাদের মিস্টার বোসের খাই না পরি? আমি কিচ্ছু করতে পারবো না।

—কিন্তু আমাকে যে চার্জ-শীট দেবে?

তবু রাজী হয় নি কুন্তি, বলেছিল—আমরা মশাই থিয়েটারের প্লে করে বেড়াই, টাকা নিয়ে আমাদের কারবার, আমি টাকা পেয়ে গেছি, এখন আপনাদের কোম্পানীর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আবার যখন আপনাদের প্লে হবে, তখন যদি টাকা দেন তো যাবো, নইলে কলকাতা শহরে থিয়েটার-পাগলা লোকের অভাব?

শেষ পর্যন্ত সেদিন ছনিবাবুকে খালি হাতেই ফিরে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু ভাগ্যের এমনিই চক্র, আবার সেই ছনিবাবুর সঙ্গেই দেখা করার জন্যে ছটফট করতে লাগলো মনটা। কুন্তি গুহ আবার সেই ছনিবাবুর জন্যেই রাস্তায়-বাসে-ট্রামে এদিক-ওদিক চোখ চেয়ে দেখতে লাগলো। আর একবার যদি দেখা হতো তো ভালো হতো। কোথায় ছনিবাবুর বাড়ি, কোন্ পাড়ায়

থাকে তাও জানা ছিল না। সেই মধু গুপ্ত লেনের শম্ভুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও হতো। সে-ও চেনে শিবপ্রসাদ গুপ্তর ছেলেকে।

—ও দাদা, দাদা!

সত্যি সত্যিই শম্ভুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সেদিন ডালহৌসী স্কোয়ারের রাস্তায়।

—আরে কুন্তি যে, কী খবর তোমার?

শম্ভু কুন্তিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

—আপনাদের ক্লাবের কী হলো? 'মরা মাটি' নামিয়েছেন?

শম্ভু পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালে। তার পর বললে—আমাদের ক্লাব তো বন্ধ হয়ে গেছে—এখন যাচ্ছো কোথায়? হাতে সময় আছে নাকি? চলো না, চায়ের দোকানে গিয়ে বসি—

একটা অন্ধকার চায়ের দোকানের ভেতরে ঘেরা ঘরের মধ্যে বসলো দু'জনে।

—কী খাবে বলো? মাইনে পেয়েছি আজকে, হাতে টাকা আছে, লজ্জা করো না—

অনেক পীড়াপীড়িতে কুন্তি রাজী হলো খেতে। বললে—শম্ভুদা, বড় কষ্টে আছি—

—কেন, তোমাদের আবার কষ্ট কী গো? এ বাজারে তোমরাই তো সুখী মানুষ, খাচ্ছ দাচ্ছ রং মেখে থিয়েটার করছো, আর আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার-করা টাকা তোমাদের পায়ে ঢেলে দিচ্ছি—

কুন্তি বললে—সেইটেই শুধু দেখলেন আপনি দাদা, বাইরের শাড়ি ব্লাউজ বডিস আর রং-মাখা মুখটাই দেখলেন, ভেতরটা তো দেখলেন না—

—তা ভেতরটা দেখালেই দেখবো! ভেতরটা কি আর তোমরা দেখাও?

—আপনারাই কি ভেতরটা দেখতে চান? আমিই যদি একটু মুখ ভার করে থাকি, এই সাজ-গোজ না করি, মুখে যদি রং না মাখি তো আপনিই কি আমায় আর ডাকবেন? আমার অসুখ হলে কি আমাকে দেখতে যাবেন? আমি খেতে পাচ্ছি কি না-পাচ্ছি তার খোঁজ নেবেন? শুধু আপনাদের ফুর্তি করবার সময়ে আমাদের ডাক পড়বে, তার আগে তো নয়?

—তা ভাই, তোমরা প্লে করে বেড়াও, তোমাদের সঙ্গে তো কথায় পারবো না আমি!

কুন্তি শুধু হাসলো। বললে—শুধু আপনি কেন, সবাই তা-ই। এ-সংসারে

কেউ কারো নয় দাদা, এই সার কথাটি আমি অনেকদিন বুঝে নিয়েছি—! যদ্দিন আমাকে আপনার দরকার তদ্দিন আমার খোঁজ করবেন, তার পর দরকার ফুরিয়ে গেলেই আমাকে কমলালেবুর খোসার মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন—

শম্ভু বললে—তুমি দেখছি আজকাল বেশ ভারিক্কি কথা শিখেছ—

কুন্তি বললে—আমি শিখি নি, আপনারাই আমাকে শিখিয়েছেন, তাই বলছি—

—তা কাজ-কর্ম কেমন চলছে ? হাতে এখন ক'টা থিয়েটার আছে ?

কুন্তি বললে—আর এ-লাইনে থাকবো না দাদা, ভাবছি অন্ত লাইন নেবো—

—আবার কোন্ লাইন ? বে-লাইনে যাবে এই বয়েসে ?

—সাধ করে কি বে-লাইনে যাচ্ছি, প্রাণের দায়ে যাচ্ছি—

—তা কোন্ লাইন, শুনি ?

—গেরস্থ লাইন।

—গেরস্থ লাইন মানে ?

—এই ধরুন একটা বোন আছে, তার বিয়ে-থা দিয়ে আমি ঘরে বসে বিঁড়ি বাঁধবো। বিঁড়ি বেঁধে যদি দোকানে-দোকানে সাপ্লাই করি কিংবা খবরের কাগজের ঠোঙা তৈরি করে দোকানে গিয়ে বেচে আসি তাতেও একটা পেট স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। আর নয় তো নার্সিং। নার্সিংটা তো আমার শেখাই আছে, দু' মাস তো নার্সিং শিখেছিলুম—

শম্ভু আবার একটা সিগারেট ধরালে। বললে—তার চেয়ে নিজেই একটা বিয়ে করে ফেলো না—

—বিয়ে !

কুন্তি হেসে উঠলো জোরে। বললে—বিয়ে আমাকে কে করবে দাদা! লোকে আমাদের তো বউ হিসেবে ভাবতে পারে না। দু-একটা রাত্ত ফুর্তি করবার সময় আমাদের কথা মনে পড়ে, বড়জোর কেপ্ট রাখতে পারে, তার বেশি আমরা আশা করতে পারি না—

কুন্তির গলার স্বরে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্য ছিল। শম্ভু যে শম্ভু সে-ও অবাক হয়ে গেল। বললে—কী ব্যাপারটা খুলে বলো তো ? কারো সঙ্গে প্রেমে পড়েছ নাকি ?

কুন্তি বললে—আপনি হাসালেন দাদা, তেত্রিশ টাকা চালের মণ, এই

শাড়িটা সেদিন সাতাশ টাকা দিয়ে কিনেছি, একখানা ঘরে থাকি, তারই ভাড়া তিরিশ টাকা, এই অবস্থায় মনে প্রেম গজায় ?

তার পর হঠাৎ থেমে বললে—আপনার কী খবর বলুন ?

শম্ভু বললে—কী আর খবর, বেঁচে আছি, এই পর্যন্ত ! কলকাতার যারা বড়লোক তারাই সুখে বেঁচে আছে, আমাদের না-বাঁচা না-মরা অবস্থা, বলা যায় টিঁকে আছি—

—আর আপনার সেই বন্ধুর খবর কী ?

—কোন্ বন্ধু ?

—সেই যে সেই একটা বড়লোকের ছেলে ? আপনাদের ক্লাবে আসতো আর আমার পেছন-পেছন ঘুরতো ?

—সেই সদাব্রতর কথা বলছো ? সে এক আবার মহা বিপদে পড়েছিল !

—বিপদ ! কেন ! সে তো শুনেছিলুম দু'হাজার টাকার চাকরি পেয়েছিল, কোম্পানীর মালিকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল !

শম্ভু বললে—সে এক অবাক কাণ্ড ! বিয়ের সব ঠিক-ঠাক, এদিকে হঠাৎ কোত্থেকে এক উড়ো চিঠি একটা এসেছিল তার ভাবী বউয়ের কাছে। মানে তার ক্যারেকটারের দোষ দেখিয়ে কে নাকি চিঠি লিখেছিল। মেয়েদের নাকি বাগানবাড়িতে নিয়ে বেড়ানো স্বভাব সদাব্রতর, এই সব কথা লেখা ছিল চিঠিতে —শত্রুর তো কারো অভাব নেই সংসারে। লোকে দেখছে তো যে দু'হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে বসে বসে, তাই জ্বালা হয়েছে মনে, আর একখানা উড়ো চিঠি ছেড়ে দিয়েছে—

—তাই নাকি ? তার পর ? বিয়ে ভেঙে গেছে ?

শম্ভু বললে—চিঠি পড়ে মিস্টার বোস ডেকে পাঠিয়েছিল সদাব্রতকে—

—তার পর ?

—সব শুনে সদাব্রত চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল, রেজিগ্‌নেশন্ লেটার দিয়েছিল—

—তা হলে চাকরি গেছে ? বিয়েটাও হবে না তা হলে ?

শম্ভু বললে—সদাব্রত তো চাকরি ছেড়ে দিতেই চেয়েছিল, কিন্তু মিস্টার বোস কিছুতেই ছাড়ছে না। সদাব্রতর বাবার হাত দিয়ে যে মিস্টার বোস অনেক উপকার পায়। সদাব্রতর সঙ্গে বিয়ে না দিলে যে সেটাও মারা যাবে—সে ভয়ও তো আছে !

কুন্তি আরো আগ্রহী হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে—তা সদাব্রতর চাকরি আছে না গেছে, সেইটেই খুলে বলুন না!

শম্ভু বললে—আছে—

—কেন? তা বলে লম্পট লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে? ওটা তো একটা লম্পট চরিত্রহীন লোক!

শম্ভু বললে—এটা তুমি কী বলছো কুন্তি, সদাব্রত সে-জাতের ছেলেই নয়—

—আপনার বন্ধুকে আমি চিনি না? আমার পেছনে-পেছনে আপনার বন্ধু কদ্দিন ঘুরেছে তা জানেন? আমাকে কতদিন বাগানবাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছে, তা জানেন? আমার বাবাকে ওরা খুন করেছে, তা জানেন?

—তোমার বাবাকে?

কুন্তি বললে—জানেন দাদা, বয়েস বেশি আমার হয় নি, কিন্তু এ-লাইনে নেমে লোক চিনতে আর আমার বাকি নেই! আজ আমার পয়সা নেই বলেই আপনি আমার কথাটা বিশ্বাস করলেন না, দু'হাজার টাকা মাইনের চাকরি যদি করতুম তা হলে বিশ্বাস করতেন—এ-যুগের এই-ই তো নিয়ম—

শম্ভু বললে—আরে না না, তুমি এখনও চিনলে না ওকে—আমরা ছোটবেলা থেকে ওকে দেখে আসছি—

কুন্তি বললে—আপনাদের সঙ্গে আমি তর্ক করবো না দাদা, আপনার বন্ধু ভাল ছেলে, সৎচরিত্র ছেলে, আপনিও ভাল, খারাপ কেবল আমরা—কারণ আমাদের টাকা নেই—

—তা তুমি রাগ করছো কেন?

—তা রাগ করবো না? ওই উড়ো চিঠিই হোক আর যা-ই হোক, ও-চিঠি পাবার পর কেউ আর তাকে জামাই করে? তা সে মেয়েটাই বা কী রকম!

শম্ভু বললে—শুনিছি নাকি দেখতে খুব ভাল—

কুন্তি বললে—আরে রাখুন আপনি, আমি দেখেছি তাকে, অমন পঁচাত্তোর টাকা দামের খোপা বাঁধবার পয়সা থাকলে আমাকেও সুন্দর দেখাতো—

—তা তুমি তো সুন্দরই। কে বলেছে তোমার খারাপ দেখতে?

কুন্তি কিন্তু হাসলো না এবার। উঠে দাঁড়ালো। বললে—দেখুন দাদা, ও

বিয়ে আমি ভেঙে দেবোই, আমার সর্বনাশ যারা করেছে তাদের আমি ক্ষমা করবো না, এইটে জেনে রাখবেন! তাতে আমার যদি ফাঁসিও হয় তাও স্বীকার। আমার চোখের সামনে ওরা আরাম করবে এ আমি হতে দেবো না, এই আমি বলে রাখলুম—আমার কাজ আছে, আমি উঠি—

শম্ভু ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

—আরে বসো না আর একটু! কী এমন তোমার কাজ শুনি?

—না দাদা, আমি এর প্রতিশোধ নেবোই—

বলে কুন্তি উঠে যাচ্ছিল। কুন্তি যেন তখন থর থর করে কাঁপছে।

শম্ভু বললে—তা হলে কি তুমিই উড়ো চিঠি দিয়েছিলে নাকি? অ্যাঁ?

কুন্তি কিন্তু তখন দাঁড়ালো না। দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এলো।

শম্ভু জিজ্ঞেস করলে—এখন কোন্‌দিকে যাবে তুমি?

সে-কথার উত্তর না-দিয়ে কুন্তি জিজ্ঞেস করলে—আপনি ঠিক জানেন দাদা, যে সদাব্রতর চাকরি যায় নি?

—না, যায় নি।

—ওখানে ওই মেয়েটার সঙ্গেই বিয়ে হবে?

শম্ভু বলল—হ্যাঁ, সে-সব যা গোলমাল হয়েছিল সব মিটে গেছে—এখন আবার সদাব্রত রোজ অফিসে যাচ্ছে, রোজ ক্লাবে যাচ্ছে—মোটরে করে দু'জনে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

—আপনি ঠিক শুনেছেন তো?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ, আমি জানবো না? আমার সঙ্গে তো সেদিনও দেখা হলো। আমাকে সমস্ত বলছিল, অনেক দুঃখ করছিল। ও-মেয়েকে বিয়ে করা ছাড়া ওর গতি নেই—এই আর মাসখানেক বাদেই ওদের বিয়ে হবে, সব কথাবার্তা হয়ে গেছে—

সামনে দিয়ে একটা ট্রাম আসছিল।

কুন্তি কী যেন ভাবলে। তার পর বললে—আচ্ছা ঠিক আছে। আমিও যদি এক বাপের মেয়ে হই তো এও বলে রাখছি দাদা যে আমি ও-বিয়ে ঘুচিয়ে দেবোই—

বলে ট্রামটা সামনে এসে থামতেই তাতে গিয়ে উঠে বসলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রামটা ছেড়ে দিলে।

হস্‌পিটালের কোরিডোরে মন্মথ দাঁড়িয়ে ছিল। শৈলও তার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে সদাব্রত ওপরে উঠে এলো। উঠে কেবিনটার দিকে যাচ্ছিল।

মন্মথ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো সদাব্রতদা, রিলিজ-অর্ডার হয়ে গেছে?

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ—

—তা হলে কখন নিয়ে যাবে মাস্টার মশাইকে?

—এখুনি। আমি সমস্ত পেমেন্ট করে দিয়ে এসেছি—

আজকে মাস্টার মশাইকে হস্‌পিটাল থেকে ছেড়ে দেবে। এতদিন পরে এই কেবিনটা খালি হবে। আবার এখানে অন্য লোক এসে ঢুকবে। কত লোক ওয়েটিং লিস্টে বসে আছে কতদিন ধরে। এবার তাদের পালা। কেউ সেরে উঠবে, কেউ সেরে উঠবে না। কেউ বাড়ি যেতে পারবে, কেউ আবার বাড়ি ফিরতেই পারবে না। এখানকার এই-ই নিয়ম। হস্‌পিটালের নার্স-মেথর-জমাদার সবাই এসে এই সময়টায় দাঁড়ায়। এই সময়ে হাত পাতলে কিছু পয়সা টাকা পাওয়া যায়। তারা এতদিন সেবা করেছে। তাদের এটা পাওনা।

সদাব্রত কেবিনের ভেতরে ঢুকলো।

কেদারবাবু ফরসা জামা-কাপড় পরে বিছানার ওপরে বসে ছিলেন।

সদাব্রতকে দেখেই বললেন—কী গো সদাব্রত, গুরুপদর কাছে গিছলে? পাস করেছে?

সে-কথায় কান দেবার সময় ছিল না সদাব্রতর। বললে—আমার গাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে আপনাকে, চলুন—

—কিন্তু তোমাকে যে বলেছিলুম গুরুপদর মার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে? যাও নি? গুরুপদ পাস করলো কি ফেল করলো, জেনে এলে না? বেচারি যে ভূগোলে কাঁচা ছিল খুব—

সদাব্রত শুধু বললে—আপনি এখন নিজের কথাই ভাবুন মাস্টার মশাই, গুরুপদর কথা গুরুপদ ভাববে, তার জন্যে ইস্কুল আছে, মাস্টার আছে, হেড

মাস্টার আছে,—ভাববার লোকের অভাব নেই দেশে। তারা মোটা-মোটা মাইনে পাচ্ছে, দেশের চীফ মিনিস্টার আছে, গভর্নর আছে, অ্যাসেমব্লি আছে, পার্লামেণ্ট আছে, পুলিস-সোলজার-মেয়র, কিছুরই অভাব নেই, তারা অনেক টাকা নিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে, আপনি এখন নিজের কথা কেবল ভাবুন, আর কারুর কথা ভাববেন না, আপনার কথা ভাববার কোনও লোক নেই এইটুকু শুধু মনে রাখবেন, চলুন—

বহুদিন আগে একদিন এই পৃথিবীর মাটিতে জন্মে সদাব্রত শুনেছিল যে সত্যের জয় অবধারিত। জীবনের প্রথম পাঠই ছিল—সদা সত্য কথা বলিবে। চারিদিকে যখন এত মিথ্যাচার, তখন সত্য-প্রচারের এত হুড়োহুড়ি কেন বুঝতে পারে নি। মাস্টার মশাইও একদিন বলেছিলেন মনে আছে যে ইতিহাসের যা সত্য, বিজ্ঞানেরও সেই একই সত্য। ধর্ম, দর্শন কাব্য-সাহিত্যের সত্যও সেই একই। সত্যের কোনও জাতিভেদ নেই, সত্যের কোনও প্রথাভেদ নেই। সত্য চিরকাল সত্যই। চেঙ্গিস খাঁর কাছে যা সত্য, তথাগত বুদ্ধের কাছেও তাই-ই সত্য। হিটলারের কাছে যা সত্য, স্টালিনের কাছেও তা-ই সত্য। মানুষের সর্বনাশ করার এমন চমৎকার হাতিয়ার আর দ্বিতীয় আবিষ্কৃত হয় নি। সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্যেই নাদির শা'র তরোয়ালের মুখে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, কিংবা তথাগতের পায়ের সামনে মাথা নোয়াতে হয়েছে। এই সত্যের বাণী প্রচার করবার জন্যেই আরব-জাতি আক্রমণ করেছে পশ্চিম দিক থেকে, আলেকজাণ্ডার ইণ্ডিয়া আক্রমণ করেছে উত্তর দিক থেকে। তার পর যখন এরোপ্লেন আবিষ্কার হলো, স্টেন-গান আবিষ্কার হলো, তখন আর দিক্-বিদিক্ জ্ঞান রইল না। আক্রমণ আসতে লাগলো সব দিক থেকে। ভেতরে-বাইরে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। সত্য আর সত্য রইল না, মিথ্যেও আর মিথ্যে রইল না। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে গেলে যেমন আর তা হাইড্রোজেনও থাকে না, অক্সিজেনও থাকে না, জল হয়ে ওঠে, তেমনি সত্য-মিথ্যে মিলে আর একটা তৃতীয় জিনিস হয়ে উঠলো, তার নাম ট্যাক্ট্!

ট্যাক্টের বাঙলা হয় না। ইংরেজরা এ এক অদ্ভুত শব্দ আবিষ্কার করেছিল—একটা অদ্ভুত আদর্শ। কায়দা করে মিথ্যে কথা বলতে পারলে তা আর তখন

মিথ্যে কথা থাকে না, তা হয় ট্যাক্‌ট্‌! ট্যাক্‌ট্‌ জানা না থাকলে সত্য কথাও মিথ্যে বলে মনে হয়। জীবনে উন্নতির আদি গুপ্ত মন্ত্রই হলো ট্যাক্‌ট্‌। যে তা জানে না সে সারা জীবন কেদারবাবু হয়েই কাটায়। আর যে তা জানে সে হয় শিবপ্রসাদ গুপ্ত।

সদাব্রত আগের থেকেই বোধ হয় সব বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। হস্‌পিটাল থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়ে থাকবেন কেদারবাবু তার ব্যবস্থা করাটাই সব চেয়ে জরুরী কাজ। কিন্তু কে তার ব্যবস্থা করবে? মন্মথকে বাড়ি ঠিক করতে বলেছিল, তা সে করতে পারে নি। তাতেও হতাশ হয় নি সদাব্রত। এটুকু সে বুঝে নিয়েছিল যে মাস্টার মশাইকে যদি সুস্থ করে তুলতে হয় তো কারোর ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না।

বাগবাজারের এই নোংরা বাড়িটাতে এসে কেদারবাবু মনে-মনে শান্তি পেয়েছিলেন যেন। তিনি ভেবেছিলেন আবার পরদিন থেকেই তিনি গুরুপদকে পড়াতে যাবেন। আবার ছাতি নিয়ে এক ছাত্রের বাড়ি থেকে আর এক ছাত্রের বাড়ি টো-টো করে ঘুরে বেড়াবেন। অন্ততঃ সদাব্রতর মত আরো দশটা ছাত্রও যদি তিনি গড়ে তুলতে পারেন তা হলেই তাঁর কাজ শেষ। সেই তারাই আবার দেশে সত্যযুগ ফিরিয়ে আনবে। সেই দশ জনই সকলকে বলে বেড়াবে—'চুরি করা মহা পাপ, যে চুরি করে সকলে তাহাকে ঘৃণা করে।' সেই তারাই বলে বেড়াবে—'কাহাকেও কুবাক্য বলিও না, যে কুবাক্য বলে সকলে তাহাকে ঘৃণা করে।' সেই তারাই বলে বেড়াবে—'তোমাদের শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে, এবং যে-কেহ তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার সেবা করিতে হইবে। পরের সেবা শুভকর্ম। এই সৎকর্ম-বলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং সকলের ভিতরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন।' সেই তারাই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করে বেড়াবে—'ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টিতে সকলকেই সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতি অধম অসুর-প্রকৃতির মানুষেরও এমন কোনও গুণ আছে যাহা একজন বড় সাধুর নাই। নগণ্য কীটেরও এমন কোনও গুণ থাকিতে পারে যাহা হয়ত কোনও মহাপুরুষের মধ্যে নাই।'

কিন্তু সদাব্রত তাতেও বাদ সাধলে।

সদাব্রত বললে—না মাস্টার মশাই, আগে আপনি বাঁচুন তবে ছাত্ররা বাঁচবে। —আর আপনার মতো লোককেও যদি আমি বাঁচাতে না পারি তো দেশ রসাতলে যাক—

কেদারবাবু বললেন—কিন্তু তুমি তো বড় বিপদে ফেললে আমাকে—

সদাব্রত বললে—আপনিই তো আমাকে একদিন বলেছিলেন যে দেশটা মাটির নয়, মানুষের—

কেদারবাবু বললেন—বলেছিলুম, কিন্তু এখন তো আমি ভাল হয়ে গিয়েছি, এখন তো আমি ওষুধ-টষুধ খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছি—

—না, মাস্টার মশাই, তবু কলকাতায় আমি আপনাকে থাকতে দেবো না,—আপনাকে চেঞ্জে পাঠাবোই—

—কিন্তু তাতে তো তোমার অনেক টাকা খরচ হবে!

—তা তো হবেই। আমি তো অনেক টাকা মাইনে পাই, সে-টাকাগুলো কুকুর, ক্লাব আর চুল বাঁধবার সেলুনে খরচ হয়ে যেতো, আপনার জন্যে খরচ হলে তবু সদ্ব্যয় হলো মনে করবো—

কুকুর আর ক্লাব আর চুল বাঁধবার সেলুন কথাটা বুঝতে পারলেন না কেদারবাবু।

বললেন—তুমি আবার কুকুরের ক্লাব করেছ নাকি?

—না না মাস্টার মশাই, সে আপনি বুঝবেন না, আমি আপনার বাইরে যাবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি, পুরীতে বাড়ি ভাড়া করা হয়ে গেছে—ছ' মাসের আগাম ভাড়াও মিটিয়ে দিয়েছি—

কথাটা শুনে কেদারবাবু অবাক হয়ে গেলেন।

—তার মানে?

—তার মানে কালকে আপনাকে শৈলর সঙ্গে পুরী যেতে হবে।

—সে কী? ও একলা আমাকে দেখা-শোনা করতে পারবে কেন?

—সেজন্যে আপনি ভাববেন না—মন্মথও তো সঙ্গে যাচ্ছে—

তার পর হঠাৎ মন্মথর দিকে ফিরে বললে—কী মন্মথ, তুমি সঙ্গে যেতে পারবে না? তোমার তো এগ্‌জামিন হয়ে গেছে—

মন্মথও তখন অবাক হয়ে গেছে। শৈল দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। সেও স্তম্ভিত হয়ে গেল কথা শুনে। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোলো না।

সদাব্রত হঠাৎ নিজেই বললে—তোমরা কেউ যাবে না মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে? কথা বলো, উত্তর দাও—

মন্মথ একটু ইতস্ততঃ করে বললে—আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে বলবো—

সদাব্রত রেগে গেল।

—মাস্টার মশাইয়ের ভালোর জন্যে কিছু করলে কি তোমার বাবা কিছু মনে করবেন, মনে করো?

—না, তা বলছি না।

—তা হলে এটা কি অসৎ কাজ?

—না, আমি তো তা বলি নি!

—তবে, এখন তো তোমার ছুটি চলছে, কী এত তোমার কাজ যে তুমি যেতে পারবে না?

মন্মথ বললে—না, কাজ আর কী?

—তা হলে? আমি তোমার টিকিট কেটে ফেলেছি, ওদিকে বাড়ি ভাড়া করেও ফেলেছি। কাল তোমাদের যেতেই হবে—

তার পর ঘর থেকে চলেই যাচ্ছিল, আবার ফিরে দাঁড়ালো।

বললে—তোমরা তৈরী হয়ে থেকো। সঙ্গে যা নেবার নিয়ে নেবে, আমি গাড়ি নিয়ে আসবো সন্ধ্যে ছ'টায়, রাত আটটায় ট্রেন—

বলে সদাব্রত বাইরে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দরজার বাইরে পর্যন্ত যাবার আগেই বাধা পড়লো। পেছন থেকে শৈল ডাকলে। বললে—একটা কথা শুনুন—

সদাব্রত থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু শৈল তাকে নিয়ে গিয়ে একেবারে রাস্তার ওপর দাঁড়ালো।

সদাব্রত বললে—আমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে, যা বলবার শিগ্‌গির বলো—

শৈল বললে—আপনি সত্যিই আমাদের জন্যে যা করেছেন, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ—

কৃতজ্ঞতার কথা শুনে সদাব্রতর কেমন ভালো লাগলো না। বললে—কৃতজ্ঞতার কথা বলছো কেন? আমি কি তোমার কৃতজ্ঞতার জন্যে এই সব করছি?

শৈল বললে—কিন্তু কেন করছেন এত, আমি বুঝতে পারছি না—কেউ যে নিঃস্বার্থভাবে এমন করে না—আমি যে এর মানে খুঁজে পাচ্ছি না—

—নিঃস্বার্থভাবে কে বললে? কে বললে আমার স্বার্থ নেই?

শৈল জিজ্ঞেস করলে—কী সে স্বার্থ?

—ধরো মাস্টার মশাইয়ের ঋণ শোধ ?

—আর কিছু নয় ?

সদাব্রত বললে—আর কী থাকতে পারে ?

শৈল বললে—আমিও তো তা-ই ভাবছি, আর কী থাকতে পারে আপনার মনে ?

তার পর একটু থেমে আবার বললে—আর তা ছাড়া, আপনারও তো কোনও অভাব নেই, এই বয়েসে আপনার মত ছেলেরা যা চায় সবই তো আপনি পেয়েছেন—চাকরি, টাকা, স্ত্রী, গাড়ি, বাড়ি, বংশ কিছুই তো আপনার পেতে বাকি নেই, তবু কেন আপনি এত করছেন আমাদের জন্যে ?

সদাব্রত এর কী উত্তর দেবে বুঝে পেলে না।

বললে—তুমি আমার সম্বন্ধে এত ভাবো ?

—আপনি ভাবান বলেই তো ভাবি। সেদিন যাঁকে দেখলাম উনিই তো আপনার স্ত্রী হবেন ?

সদাব্রত বললে—সেই রকমই তো ঠিক হয়ে আছে—

—শুনলাম আসছে মাসে আপনাদের বিয়ে হবে—এটাও কি ঠিক ?

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ—

—তা হলে ? তা হলে কি সেই জন্যেই আমাদের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, যাতে আপনার বিয়ের সময় আমরা এখানে থাকতে না পারি ?

—ছিঃ !

সদাব্রতর চোখে-মুখে একটা তিরস্কারের ভঙ্গি ফুটে উঠলো।

শৈল বললে—সত্যিই এখানে দাঁড়িয়ে আমার এ-সব কথা আপনাকে বলা উচিত হচ্ছে না, জানি—কিন্তু আজ তো প্রথম নয়, অনেক দিন থেকেই আমি এ নিয়ে ভেবেছি। কাকাকে জিজ্ঞেসও করেছি, মন্মথকেও জিজ্ঞেস করেছি। প্রথম-প্রথম আপনার ওপর রাগ করে অনেক কথাও বলেছি আপনাকে, কিন্তু কারোর কোনও উত্তরই আমার মনকে তৃপ্তি দিতে পারে নি—

—কাকা কী উত্তর দিয়েছেন ?

শৈল বললে—কাকার কথা ছেড়ে দিন, কাকা আপনাকে ভাল ছাত্র বলে জানে, আপনার কোনও দোষই দেখতে পায় না—

সদাব্রত বললে—তুমি তো জানো, মানুষ দোষে-গুণে মানুষ—

—সত্যিই আপনার দোষ আছে ? সত্যি করে বলুন তো—

সদাব্রত হেসে ফেলে এবার। বললে—দেবতা যখন নই তখন দোষ তো থাকবেই।

—সেই দোষটার কথাই বলুন আপনি নিজের মুখে, আমি মনে শান্তি পেয়ে চলে যাই। আপনার কাছ থেকে কথাটা শোনবার পর আপনি আমাকে শুধু পুরী কেন, যেখানে যতদূরেই হোক' পাঠিয়ে দিলেও আপত্তি করবো না—। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি জীবনে আর কখনও এ নিয়ে প্রশ্ন করবো না—

সদাব্রত খানিকক্ষণ শৈলর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর বললে—তুমি ঠিকই ধরেছ আমি দোষী—আমার অপরাধের শেষ নেই—

শৈল বললে—বলুন, থামলেন কেন, বলুন—

সদাব্রত একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো। তার পর মুখে একটু হাসি ফোটাবারও চেষ্টা করলে। বললে—প্রশ্নটা এমন সময়ে করলে যখন আর উত্তর দেবারও সময় নেই—

শৈল বললে—আছে, সময় আছে, কাল রাত আটটা পর্যন্ত সময় আছে—

—তুমি কি মনে করো এই এতটুকু সময়ে আমার দোষ স্খালন হবে? আমার যন্ত্রণা আমার দুঃখ কি অত ছোট? এই এতটুকু সময়ে কি সব কিছু বলা সম্ভব?

শৈল বললে—তা হলে কাল সন্ধ্যের আগে কি আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না?

সদাব্রত বললে—দেখা হওয়াটাই কি উচিত?

—কেন উচিত নয় তাই বলুন? এর পরেও কি একটা রাত আমি ঘুমিয়ে কাটাতে পারবো বলে মনে করেন?

এর পর আর সদাব্রত এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত মনে করলে না। ফাঁকা গলি—মাথায় রোদ উঠেছে। দু-একটা লোকজন যাতায়াত করছে।

সদাব্রত বললে—তোমার হয়ত অনেক কাজ পড়ে রয়েছে সংসারের, আমারও অফিস আছে, আমি চলি—

—কিন্তু কেন আমাকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সেই জবাবটা আগে দিয়ে যান!

সদাব্রত আর পারলে না। বললে—তোমার কি লজ্জাও নেই?

—লজ্জা!

শৈল হঠাৎ যেন এতক্ষণে সংকুচিত হয়ে উঠলো। এতক্ষণে তার মনে

পড়লো যে রাস্তায় খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে যে-কথা বলা উচিত নয় সেই কথা-ই সে বলছে।

কিন্তু তখনি শৈল নিজেকে সামলে নিয়েছে আবার। বললে—লজ্জা তো আমার ছিল একদিন, এতদিন তো লজ্জার জন্যেই আমি কারোর সামনে বেরোতাম না, কিন্তু কেন আপনি এসে আমার সে-লজ্জা কেড়ে নিলেন? বলুন, কেন কেড়ে নিলেন?

—তার মানে?

সদাব্রত স্তম্ভিত হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার পর কী করবে বুঝতে না পেরে বললে—আমি এবার চলি—

শৈল বাধা দিলে। বললে—না, আপনি আমার কথার জবাব দিয়ে তবে চলে যান—তার আগে আপনাকে যেতে দেবো না—বলুন কেন আপনি আমার সব লজ্জা কেড়ে নিলেন? কেন আপনি এমন করে আমার সর্বনাশ করলেন—

সদাব্রত এবার সত্যি-সত্যিই চুপ করে গেল। শুধু বললে—চুপ করো, তুমি চুপ করো—

শৈল সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কেন চুপ করবো? আর আমাকে চুপ করাবার জন্যেই বুঝি এমন করে তাড়াতাড়ি দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন? আর একদিনও দেরি সইছে না?

সদাব্রত বললে—না না, বিশ্বাস করো তুমি, মাস্টার মশায়ের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, মাস্টার মশাই তো সেখানে একলা থাকতে পারবেন না, তাই তোমাকে পাঠানো…

শৈল বললে—তবু আপনি সত্যি কথা বলবেন না? আমাকে আপনার এত ভয়?

—সে কি? তোমাকে আমি ভয় করতো যাবো কেন?

—তা ভয় যদি না করবেন তা হলে আপনার বিয়ের পরও তো আমাদের দূরে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। এত আগে কেন পাঠাচ্ছেন? এত দিন কাকা হাসপাতালে রইল, আরো এক মাস হাসপাতালে থাকলে কী ক্ষতিটা তার হতো?

সদাব্রতর মনে হলো সে যেন বড় বিব্রত হয়ে পড়েছে। তাকে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে কেউ শাস্তি দিচ্ছে।

বললে—সত্যি বলছি শৈল, আমার তেমন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না—

—তা হলে আমিও যাবো না কলকাতা থেকে, যেতে হয় কাকা একলাই যাক—

—কিন্তু মাস্টার মশাই সেখানে গিয়ে একলা কী করে থাকবেন ? তুমি বুঝছো না কেন ?

শৈল বললে—বেশ, তা হলে টিকিট ফিরিয়ে দিন—এক মাস পরেই আমরা সবাই মিলে যাবো—

—কিন্তু তা তো হয় না।

—কেন হয় না ? কিসের জন্যে হয় না ? হতে কিসের অসুবিধে ?

এবার সদাব্রত আরো মুশকিলে পড়লো। বললে—আমি চাই না আমার বিয়ের সময় আমার জানাশোনা কেউ থাকুক, আমি চাই না আমার বিয়ে কেউ দেখুক, আমি চাই না……

বলতে বলতে কথাটা আর শেষ করতে পারলে না সদাব্রত। তাড়াতাড়ি নিজেকে লুকিয়ে ফেলবার জন্যে হঠাৎ শৈলর সামনে থেকে সরে পড়লো। তার পর বাঁকা-চোরা গলিটা পেরিয়ে একেবারে এক নিমেষে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিলে। যেন এখান থেকে পালাতে পারলেই সে বাঁচে।

পেছনে ঘরের ভেতর থেকে কাকার ডাক এলো—ওরে শৈল—

হাওড়া স্টেশনের এন্‌কোয়ারী অফিসের সামনে অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করেছে বুড়ি। চারিদিকে কত লোক! এও এক বিচিত্র জগৎ। এদিকটায় কখনও আসে নি আগে। ভবানীপুর চৌরঙ্গী শ্যামবাজার সব দিক ঘোরা হয়ে গিয়েছে। এদিকটা নতুন। এখানকার মানুষ সবাই খানিকক্ষণের জন্যে আসে, পরস্পরের সঙ্গে খানিকক্ষণের জন্যে আলাপ হয়, তার পর কে কোথায় চলে যায় কেউ টের পায় না।

খানিক পরে প্ল্যাটফর্ম-টিকিটের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

—একটা প্ল্যাটফর্ম-টিকিট দিন তো ?

যে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট বিক্রি করছে সেও একজন মেয়েমানুষ। সোনার চুড়ি

পরেছে, সিঁথিতে সিঁদুর। বসে বসে একটা সিনেমার কাগজ উল্টোচ্ছিল। বইটা মুড়ে রেখে একটা টিকিট দিয়ে দিলে। বুড়ি টিকিটটা নিয়ে আবার এগিয়ে এসে একটা ওয়েটিং-রুমের মধ্যে বসলো। ওয়েটিং-রুমের মধ্যে লোক গিজ-গিজ করছে। মোট-ঘাট বাঁধা তৈরী। কেউ যাবে বোম্বাই, কেউ দিল্লী, কেউ আরো কত দূরে কে জানে!

—কোথায় যাবে ভাই তুমি?

বুড়ি চেয়ে দেখলে পাশের দিকে। মহিলাটির একটু বয়েস হয়েছে। কোলে একটা ছোট্ট এক বছরের মেয়ে। মেয়েটার গলায় সোনার হারটা চিক-চিক করছে।

—আমি?

এ-কথাটা তো ভেবে রাখে নি বুড়ি। এ-উত্তরটা তৈরী নেই।

বললে—আমি, আমি কোথাও যাবো না, আমার একজন আত্মীয় আসবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—

চারদিকে লোকজন এত ব্যস্ত যে কারো সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলবার সময় কারো নেই। যে-যার নিজের নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ব্যস্ত।

মেয়েটার গলার হারটা তখনও চিক-চিক করছে। অন্ততঃ দু-ভরি ওজন হবে নিশ্চয়ই। একশো পঁচিশ টাকা করে ভরি হলে দু-ভরির দাম হবে পান-মরা বাদ দিয়ে কম করে অন্ততঃ দুশো টাকা। দুটো নতুন সিনেমা এসেছে 'বিজলী'তে আর 'রূপালী'তে। দেখা হয় নি। নতুন একটা রিস্ট-ওয়াচও কিনতে হবে। অনেক দিন থেকে বুড়ির ইচ্ছে একটা রিস্ট-ওয়াচের। অনেকে পরছে। খুব সরু ছোট দেখতে ঘড়িগুলো। বাঁ হাতে পরলে বেশ মানায়।

—আপনারা কোথায় যাবেন?

বউটি বললে—পুরীতে বেড়াতে যাচ্ছি ভাই—অনেক দিন অসুখে ভুগছি, এখন ডাক্তারে বলছে সমুদ্রের হাওয়া খেতে—

সোনার হারটা আবার চক-চক করে উঠলো।

—পুরী-এক্সপ্রেস ক'টার সময় ছাড়বে আপনাদের?

বউটি বললে—উনি তো বললেন আটটায়—

ওদিক থেকে আর একটা বড় দল এসে ঢুকলো ওয়েটিং-রুমের ভেতর। সঙ্গে অনেক মালপত্র। বিছানা, সুটকেস, হ্যারিকেন, ট্রাঙ্ক। একজন বুড়ো

মানুষ। সবে বোধ হয় অসুখ থেকে উঠেছে। একটু হাঁটতেই হাঁফিয়ে পড়ছে বুড়োটা। ঘরে ঢুকেই একটা চেয়ারে বসে পড়লো। সঙ্গে একটা মেয়ে। বয়েস হয়েছে মন্দ না। অনেকটা দিদির বয়েসী। হাতে গলায় কানে এক ফোঁটাও সোনা নেই। দু-হাতে এক গাছা করে শুধু কেমিক্যালের চুড়ি ঝন-ঝন করছে। পাশে আর একজন বেটাছেলে। মালপত্র রেখে যাবার পর আর একজন কোট-প্যাণ্ট পরা লোক এসে ঢুকলো। বেশ লম্বা-চওড়া ফর্সা চেহারা। হাতে রিস্ট-ওয়াচ। বেটাছেলের রিস্ট-ওয়াচ।

—তোমার ট্রেন কখন আসবে ?

বুড়ি বললে—আমার মামা তুফান মেলে আসবে কিনা,—

—তুফান মেল কখন আসে ?

বুড়ি বললে—সাড়ে পাঁচটায় তো আসার কথা ছিল, শুনছি সাড়ে তিন ঘণ্টা লেট্—

—ওমা, তা হলে সে তো অনেক রাত হবে তোমার ? তোমায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে !

বুড়ি বললে—তা কী করবো বলুন, আগে কি জানতুম এত লেট্ হবে, তা হলে তো দেরি করে আসতুম—

তখনও মেয়েটার গলায় সোনার হারটা চক-চক করে উঠছে।

বুড়ো ভদ্রলোক বললে—কখন ছাড়বে আমাদের ট্রেন গো ?

পাশের লোকটা বললে—আটটায় ট্রেন, সাড়ে সাতটায় প্লাটফর্মে গাড়ি ঢুকবে—

—এখন ক'টা বেজেছে ?

—এখন সাড়ে ছ'টা।

মেয়েটা চুপ করে বসে ছিল। আপন কাকা। কাকা বলেই ডাকছে। দিদির মত মেয়েটারও বিয়ে হয় নি। কোলের মেয়েটার দিকে আবার চেয়ে দেখলে বুড়ি। তখনও গলায় সোনার হারটা চক-চক করছে।

বুড়ি বললে—দিন না, আপনার মেয়েকে আমার কোলে দিন না একটু—

মহিলাটি বললে—তবেই হয়েছে, আমার কোল কি একদণ্ড ছাড়বে ? যাবি ? এই খুকু, দিদির কোলে যাবি ?

বুড়ি তখনও একদৃষ্টে হারটার দিকে চেয়ে দেখছে। সোনার হার। খাঁটি গিনি সোনার হার। অন্ততঃ দু-ভরি ওজন নিশ্চয়ই হবে। এক শো পঁচিশ

টাকা করে ভরি হলে দু-ভরির দাম হবে পান-মরা বাদ দিয়ে অন্ততঃ দু-শো টাকা কম করে। দুটো নতুন সিনেমা এসেছে বিজলীতে আর রূপালীতে। দেখা হয় নি। নতুন একটা রিস্ট-ওয়াচও কিনবে।

সোনার হারটা আবার চক-চক করে উঠলো চোখের সামনে।

ট্রেন ছাড়বে আটটায় কিন্তু তার তোড়-জোড় সকাল থেকেই হচ্ছিল। মশারি নিতে হবে, হ্যারিকেন নিতে হবে, জলের বালতি নিতে হবে। মোটকথা কোনও জিনিস বাদ দিলে চলবে না। সদাব্রত তো বলে দিয়েই খালাস। কিন্তু এত সব যোগাড় করে কে?

আর কলকাতা শহর তো আর সে শহর নেই। বাস-ট্রাম-মানুষ সমস্ত কিছু যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। কোনও জিনিস ভেবে-চিন্তে ধীরে-সুস্থে করবার উপায় নেই। মেয়েদের ট্রামে বাসে চড়ে অক্ষত থাকবার দিন চলে গেছে। কোথায় ধর্মতলা, কোথায় চাঁদনী, কোথায় কলেজ স্ট্রীট। একটা জিনিস কিনতে দশটা দোকান ঘুরতে হয়। দশটা দোকানে দশ রকম দর। সবাই ঠকাবার জন্যে দোকান খুলে বসেছে।

মন্মথ একলাই বা কী করবে?

শশীপদবাবু সকাল বেলাই এসেছিলেন। তিনি শুনে খুশী হলেন। বললেন—ভালোই হলো মাস্টারমশাই, এভাবে না গেলে শরীর আপনার সারবে না—

কেদারবাবু বললেন—সদাব্রত আমার জন্যে অনেক টাকা খরচ করে ফেললে শশীপদবাবু, প্রায় তিন হাজার টাকা বেরিয়ে গেল এই ক'মাসে—

শশীপদবাবু বললেন—আপনার প্রাণের মূল্য যে তার চেয়েও বেশি মাস্টারমশাই—

কেদারবাবু বললেন—আমি তাই ভাবছিলাম, যাদের সদাব্রত নেই তাদের কী করে চলে?

—তাদের চলে না।

—চলে না তো কী হয় তাদের?

—তারা মারা যায়!

কেদারবাবু উঠে বসলেন। বললেন—কিন্তু কেন মারা যাবে? তারা কি মানুষ নয়?

শশীপদবাবু বললেন—কিন্তু গভর্মেণ্ট তো চায় না কেউ বেঁচে থাকুক। মরে গেলে তো গভর্মেণ্টের দায় চুকে গেল। বেঁচে থাকলে তাদের চাকরি দিতে হবে, খাওয়াতে পরাতে হবে। বেঁচে থাকলে স্ট্রাইক করবে, ইউনিয়ন করবে, হরতাল করবে, ধর্মঘট করবে—তার চেয়ে মরে গেল তো ল্যাঠা চুকে গেল—

কেদারবাবু শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। বললেন—আপনি আর বলবেন না, আমার মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে আবার—

শশীপদবাবু বললেন—আমারও অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমিও আর বসবো না—আমারই মাঝে-মাঝে মাথা ঝিম-ঝিম করে, তা জানেন! আমাদের অফিসে যে কী কাণ্ড হচ্ছে তা শুনলে সুস্থ লোকের অসুখ হয়ে যাবে—

—কী কাণ্ডটা শুনি?

শশীপদবাবু বললেন—আমাদের অফিসে সেদিন বাড়ি মেরামতের জন্যে চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হলো, আমি বিল পাস করি, আমার ওপরওয়ালা সাহেবের হুকুমে দেড় লাখ টাকার বিল পাস করতে হলো—। আর না-করলে আমার চাকরি থাকতো না—তার মধ্যে বাকি এক লক্ষ দশ হাজার টাকা—ব্ল্যাক টাকা—সাহেব আর কনট্রাক্টারে ভাগাভাগি হয়ে গেল—

কেদারবাবু বললেন—চিয়াং-কাই-শেকের রাজত্বও তো ওই করে চলে গিয়েছে—

—তা এ-রাজ্যও যাবে। আপনিই বা এর কী করবেন, আর আমিই বা এর কী করবো!

শশীপদবাবু চলে যাবার পর কেদারবাবু বসে-বসে ভাবতে লাগলেন। শৈল আর মন্মথ দু'জনেই বেরিয়েছিল বাজার করতে। সন্ধ্যেবেলাই সদাব্রত এসে হাজির হবে।

কেদারবাবু ডাকলেন—শৈল—ও শৈল—

তার পর হঠাৎ মনে পড়ে গেল শৈল বাড়িতে নেই। কেউ নেই। তিনি একলাই বাড়িতে আছেন। আস্তে আস্তে পাশের দেয়ালের শেলফ্ থেকে ডায়েরী বইটা পাড়লেন। তার পর ঠিক তারিখটা বার করে শশীপদবাবুর

বলা কথাটা লিখে রাখলেন। কথাটা ভুলে যেতে পারেন। এই রকম অনেক কথা তাঁর লেখা আছে। কত ভালো ভালো কথা সব পড়েছেন, শুনেছেন, কত জিনিস দেখেছেন জীবনে। সব লেখা থাক। একদিন যখন দরকার হবে তখন হয়ত কারো নজরে পড়বে এই সব লেখাগুলো—এখনও তো সব মানুষ খারাপ হয় নি। সব মানুষ চোর-ডাকাত-খুনী হয় নি। কেন হয় নি? একদিন ভল্‌টেয়ার এসেছিলেন পৃথিবীতে, রুশো এসেছিলেন, যীশুখ্রীস্ট এসেছিলেন, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, কবীর, নানক, চৈতন্যদেব, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, গান্ধী এসেছিলেন—তাঁদের বাণী আর লেখা পড়েই তো কিছু মানুষ এখনও মানুষ হয়ে বেঁচে আছে।

কেদারবাবু লিখলেন—'শশীপদবাবুর কাছ হইতে আজ যাহা শুনিলাম তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। ইণ্ডিয়ার মানুষ ক্রমেই বিলাসপ্রিয়, অলস, পরশ্রীকাতর হইয়া উঠিতেছে। তাহারা ঘুঁষ লইতেছে, মিথ্যা কথা বলিতেছে, স্বার্থপর হইয়া উঠিতেছে। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য এই সব পাপেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। নেপোলিয়নের ফ্রান্সও তাঁহার স্বার্থপরতায় সর্বনাশের পথে পা দিয়াছিল। নেপোলিয়ন নিজের আত্মীয়-স্বজনদের বড় বড় চাকরি দিয়া নিজের ধ্বংসের পথ নিজেই প্রশস্ত করিয়াছিলেন। রাজার দোষে শুধু রাজাই নষ্ট হয় না, রাজ্যও নষ্ট হয়। ইণ্ডিয়ায় মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইহাই বড় কারণ। বাংলাদেশের নবাবদের চরিত্রদোষেই বাংলাদেশ পরহস্তগত হইয়াছিল। ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা। এই শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া যেমন চলিতেছে তেমন করিয়া চলিলে এই দেশ আবার পরহস্তগত হইয়া যাইবে।'

লিখে খাতাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ আবার একটা কথা মনে পড়লো। খাতার পাতাটা বার করে আর একটা লাইন লিখে রাখলেন—'পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অতি সজ্জন ব্যক্তি। তিনিও যদি দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে চান তো তাঁহাকে এই আত্মীয়-তোষণের নীতি ত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহার কন্যা ভগ্নী পিসীমা সকলকে চাকুরি হইতে সরাইয়া দিয়া প্রজাদের উদাহরণস্থল হিসাবে আদর্শ-চরিত্র হইতে হইবে। তাহা না করিলে অন্যান্য মন্ত্রীরাও তাহাদের আত্মীয়-পরিজনদের পোষকতা করিবে। নেপোলিয়ন নিজের পুত্র ইউজিনকে ইটালীর শাসক-পদ দিয়াছিলেন। এক ভাইকে—যাহার নাম জোসেফ বোনাপার্ট, তাহাকে স্পেনের রাজ-পদ দিয়াছিলেন। আর এক ভাই লুই, তাহাকে হল্যাণ্ডের রাজা করিয়া

দিয়াছিলেন, নেপোলিয়ন নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—"Throughout my whole reign I was the keystone of an edifice entirely new, and resting on the most slender foundations. Its duration depended on the issue of my battles. I was never, in truth, master of my movements; I was never at my own disposal." ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে যেন নেপোলিয়ানের মত মৃত্যুর পূর্বে এইরূপ অনুতাপ না করিতে হয়।'

সমস্তটা লিখে আবার খাতা বন্ধ করলেন কেদারবাবু। তার পর হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েই খাতাটা আবার তাকের ওপর তুলে রাখলেন। কেউ যেন দেখতে না পায়।

শৈল আর মন্মথ ফিরলো। তারা অনেক জিনিসপত্র কিনে এনেছে।

—এই দেখো কাকা, তোমার জন্যে এক-জোড়া জুতো কিনে আনলুম—

আশ্চর্য, কেদারবাবুর যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব সমস্ত শরীরে! এখানে এত পাপ চলতে থাকবে, এত অন্যায় চলতে থাকবে আর তিনি কারোর কোনও উপকার করতে পারবেন না। তাঁর দ্বারা একটা মানুষেরও উপকার হবে না। তিনি চলে যাচ্ছেন বিদেশে, নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে। স্বার্থটাই তাঁর কাছে বড় হলো!

সারা দিন সবাই বাঁধা-ছাঁদা নিয়ে ব্যস্ত থাকলো। শৈল আর মন্মথ দু'জনেই সারাদিন পরিশ্রম করে জিনিসপত্র গুছোতে লাগলো। এ-বাড়িও ছেড়ে দিতে হবে চিরকালের মতো। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গেও আর দেখা করা হলো না। শুধু গুরুপদ এলো বিকেলবেলা।

গুরুপদকে দেখেই কেদারবাবু রেগে গেলেন। গুরুপদ এসে পায়ের ধুলো নিলে। নিয়ে মাথায় ঠেকালে।

কেদারবাবু বললেন—আমি পায়ের ধুলো দেবো না তোমাকে, যাও, চলে যাও আমার বাড়ি থেকে—

গুরুপদ মাথা নিচু করে বললে—আজ্ঞে, আমাকে ক্ষমা করুন—

—কেন ক্ষমা করবো তোমাকে শুনি? তুমি ভূগোলে ফেল করলে কেন শুনি?

—কেউ পড়াবার ছিল না।

—কেউ পড়াবার ছিল না? আমাকে কে পড়িয়েছে শুনি? আমার কি মাস্টার ছিল? বিদ্যাসাগরের কে ছিল পড়াবার? গরীব লোকের আবার কে থাকে? আমি আর কাউকে পড়াবো না বাপু, আমি এবার থেকে কেবল নিজের কথা ভাববো, আর কারোর কথা ভাববো না—চলে যাও তুমি! তুমি ফেল করলে কী বলে শুনি?

গুরুপদ কেঁদে ফেললে। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে লাগলো।

—আবার কাঁদে! পাস করতে পারে না আবার মেয়েমানুষের মত কাঁদছে —যা, বেরো এখান থেকে, যা বেরিয়ে যা—

বলে সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গুরুপদর ওপর। তার পর দুম-দুম করে কিল মারতে লাগলেন গুরুপদর পিঠের ওপর।

শব্দ পেয়েই দৌড়ে এসেছে শৈল। কাকার হাতটা ধরে ফেললে।

—করছো কি কাকা? মারছো কেন শুনি?

মন্মথ দৌড়ে এসেছিল। কেদারবাবু তখন হাঁফাচ্ছিলেন রাগের বশে। মনের ভেতরে যত রাগ জমা হয়েছিল শশীপদবাবুর কথা শুনে, সবটা যেন গিয়ে পড়লো গুরুপদর ওপর।

—কে তোদের দেখবে? তোদের কেউ নেই জানিস না, তোদের জন্যে স্কুল-মাস্টার নেই, গভর্মেণ্ট নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তোরা মরে যেতে পারিস না? তোরা কেন বেঁচে আছিস? কার জন্যে বেঁচে আছিস? তোরা মরলেই তো সবাই বাঁচে, তুইও বাঁচিস, গভর্মেণ্টও বাঁচে—

ততক্ষণে শৈল গুরুপদকে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছে। গুরুপদর তখনও কান্না থামে নি।

শৈল তাকে সান্ত্বনা দিলে—ছি, কেঁদো না, তুমি তো চেনো আমার কাকাকে, ওঁর কথায় রাগ করতে নেই, যাও বাড়ি যাও—

গুরুপদকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে ঘরে এসে দেখলে কাকা বসে আছে চুপ করে। চোখ দুটো ছল-ছল করছে। শৈলকে দেখে কেদারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁরে, গুরুপদ চলে গেছে?

—তা তুমি অমন করে ওকে মারবে, ও চলে যাবে না?

কেদারবাবু বললেন—খুব জোরে মেরেছি নাকি ওকে?

—তা জোরে মারো নি? দুম দুম করে পিঠে কিল মারলে মানুষের লাগে না?

—খুব লেগেছে নাকি ওর? খুব লেগেছে?

তার পর মন্মথর দিকে ফিরে বললেন—হ্যাঁ গো মন্মথ, সত্যি খুব মেরেছি আমি?

মন্মথও বললে—হ্যাঁ মাস্টার মশাই, আপনি খুব জোরে জোরে ওকে মেরেছেন—

কেদারবাবু আর থাকতে পারলেন না। বললেন—তা তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী দেখছিলে? তুমি আমার হাত দুটো ধরে ফেলতে পারলে না? তুমি আমাকে বলবে তো আমি খুব জোরে মেরেছি ওকে, তোমার মুখ কি বোবা হয়ে গিয়েছিল? তুমি ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী রাজ-কার্য করছিলে শুনি? তুমি কি···

হঠাৎ ঠিক এই সময়েই সদাব্রত এসে ঘরে ঢুকলো। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে ছ'টার সময়।

সদাব্রত ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল।

—একি? এখনও আপনাদের কিছুই হয় নি? ট্রেন যে আটটার সময়!

কেদারবাবু বললেন—এই দেখ সদাব্রত, তুমি এসেছ, এতক্ষণ মন্মথ কিচ্ছু করে নি, শুধু দাঁড়িয়ে ছিল, আমি যে গুরুপদকে এত মারলুম আমাকে একবার···

সদাব্রত সে-কথায় কান দেয় নি। মন্মথর দিকে চেয়ে বললে—বলো, আর কী কী গুছোতে বাকি আছে! সাতটার মধ্যে অন্ততঃ স্টেশনে পৌঁছোতে হবেই—আমার গাড়ি তৈরী—

চিৎপুর থেকে বেরিয়েই সামনে অন্ধকার গলি। সুফল সেইদিকেই নিয়ে চললো কুন্তিকে।

সুফল বলেছিল—তোমাকে আমি এমন জায়গায় নিয়ে যাবো টগরদি, যেখানে কেউ টের পাবে না—

তার পর হঠাৎ যেন করুণায় মমতায় গলাটা ভিজিয়ে নিলে সুফল। বললে—এতদিন কোথায় ছিলে টগরদি—আমি রোজ মাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করতুম—

কুন্তি জিজ্ঞেস করলে—আমার কাছে কি তোমার কিছু পাওনা আছে স্থফল ?

স্থফল জিভ কাটলে।

—দূর, আমি কি তাই বলেছি টগরদি ? আমি কি সেই জাতের লোক ? আমার সঙ্গে কি তোমার পয়সারই সম্পর্ক ? কি যে বলো তুমি টগরদি, স্থফলকে আজো তোমরা চিনলে না মাইরি! চাটের দোকান করেছি বলে কি আমি ভদ্দরলোকের ছেলে নই ?

কুন্তি বললে—না না, আমি তা বলি নি স্থফল, তোমাকে তো আমি ভাল করেই চিনি কিন্তু তবু তো ওটা তোমার ব্যবসা—

—হোক ব্যবসা, ব্যবসা বলে কি চশমখোর বলতে চাও আমাকে ? ব্যবসা করবো ওই ঠগনলালের সঙ্গে, শেঠ ঠগনলাল। শালা নিজে গভর্মেণ্টকে ঠকাচ্ছে, আর আমরা যদি ওকে ঠকাই তা হলেই চটে একেবারে লাল—

এই স্থফলকে অনেকদিন থেকেই দেখে আসছে কুন্তি গুহ। সেই যেদিন অকূল্যাণ্ড প্রেসের বড়বাবুর সঙ্গে এখানে প্রথম এসেছিল সেইদিন থেকেই। পরোটা, মাংসের কাটলেট, কাঁকড়ার দাঁড়া ভাজা খাইয়েছিলো এই স্থফলই। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছিল। তার পর বহুদিন ধরে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে আসা-যাওয়ার সূত্রে অনেক খেয়েছে স্থফলের কাছ থেকে। অনেকবার নগদে খেয়েছে, আবার অনেকবার ধারে। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে খদ্দেররা খাবার কিনতে আসে স্থফলের দোকানে। কতবার পুলিস এসেছে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে, কতবার পুলিস এসে বাড়ি সার্চ করেছে। ওই স্থফলই আগে থাকতে সকলকে খবর দিয়ে সাবধান করে দিয়েছে। সাদা পোশাকে কত সি-আই-ডির লোক ঘোরাফেরা করে বাড়ির সামনে, তাদের স্থফল চেনে। আর চেনে বলেই আগে থেকে সাবধান করে দিতে পারে সকলকে। স্থফল পয়সাটা চেনে তা ঠিক, কিন্তু কোনও মেয়ে কিছুদিন ফ্ল্যাটে না-এলেই খবর নেয়। এ-বাড়ির সব মেয়েরাই যেন তার আপনার জন। এ-মেয়েদের সঙ্গে তার ভাগ্য যেন বহুদিন ধরে চেনাশোনার ফলে জড়িয়ে গিয়েছিল।

যদি কেউ স্থফলকে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ গো স্থফল, তোমার দেশ কোথায় ?

স্থফল হা-হা করে হাসতো। বলতো—আমার আবার দেশ কি গো, পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটই আমার দেশ—

শুধু দেশ নয়, কোথায় যে স্থফল জন্মেছে, কে তার বাপ, কে তার মা, তাও

জানতো না সুফল। সুফল শুধু হাসতে জানতো। হেসে হেসে বলতো—আমি ভাই বেজন্মা—

—বেজন্মা মানে ?

—বেজন্মা মানে বেজন্মা। মানে বাপ-মায়ের ঠিক নেই—

মেয়েরা জানতো এমন কত এ-পাড়ায় আছে। এ-পাড়ায় রাস্তায়-রাস্তায় যত কানা, খোঁড়া, ভিখিরি, চোর, গুণ্ডা, দালাল ঘুরে বেড়ায়, সবাই-ই তা-ই। সবারই কোনও পরিচয় নেই। তারা বেঁচে আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, চুরি করছে, ধরা পড়ছে—এই পর্যন্ত। তাদেরই মধ্যে থেকে যে সুফল যা-হোক বুদ্ধি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, এইটেই যথেষ্ট। তাই মেয়েরা সুফলকে বিশ্বাস করে। সুফলকে হয়ত ভালোও বাসে। সুফলকে না দেখতে পেলে মেয়েদেরও প্রাণটা কেমন হু-হু করে ওঠে। আবার সুফলও কোনও মেয়েকে ক'দিন না-দেখতে পেলে পদ্মরাণীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—অসুখ হলো নাকি গোলাপীর ? দুলালীর জ্বর হয়েছিল, কেমন আছে সে ? নিজের উনুনে সাবু তৈরি করে দিয়ে আসে ঘরে। আর যেবার পদ্মরাণীর পান-বসন্ত হয়েছিল সেবার তো তার ঘরে পর্যন্ত কেউ মাড়াতো না। তখন ওই সুফল ছিল বলেই পদ্মরাণী আবার বেঁচে উঠেছে। পদ্মরাণীর নিজের পেটের ছেলে থাকলেও অমন সেবা করতো কিনা সন্দেহ !

কুন্তি জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ—আচ্ছা সুফল, আমি যে তোমার সঙ্গে এসেছি, তা কেউ জানে না তো ? কাউকে বলো নি তো ?

—ছি ছি, আমি কি তাই বলতে পারি টগরদি ? আমাকে কি তুমি সেই রকম ছেলে পেয়েছ ? তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, আমি সব বলে-কয়ে ঠিক করে রেখে দিয়েছি—

অন্ধকার গলি। যত গলির ভেতরে যাচ্ছে ততই যেন অন্ধকার আরো ঘন হয়ে আসছে। পাথরের ইঁট-বাঁধানো গলি। এ-পাড়ায় এতদিন এসেছে কুন্তি, কিন্তু কখনও এদিকে আসে নি। এখানে এখনও ইলেকট্রিক লাইট ঢোকে নি। ভূতের মতন কারা যেন পাশ দিয়ে গা ঘেঁষে চলে গেল।

কুন্তি ফিস-ফিস করে বললে—এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে সুফল ?

সুফল আগে আগে চলছিল, বললে—তোমার কোনও ভয় নেই টগরদি, আমি রয়েছি, ভয় কী ? তুমি আমার পেছনে-পেছনে এসো না—

অনেক দূর গিয়ে সুফল একটা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ালো। তার পর

আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিতে লাগলো—। তাতেও সাড়া না পেয়ে ডাকতে লাগলো—ভুলো, এই ভুলো—

খানিক পরে দরজাটা একটু ফাঁক হলো। তার পর বোধ হয় সুফলকে দেখে বললে—আয়, ভেতরে আয়—

সুফল বললে—টগরদিকে এনিচি—

—তা ওকেও ভেতরে নিয়ে আয় না।

বলে দরজাটা আরো ফাঁক করে দিলে। সুফল ঢুকলো, কুন্তিও ঢুকলো। ভেতরে টিম-টিম করে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। নিচু ছাদ। কাঠের কড়ি-বরগা। একপাশে একটা তক্তপোশ। পাশের ঘরে যাবার দরজা আছে একটা মাঝখানে। কুন্তি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল এই আবহাওয়ায়। আগে তো সুফল কিছু বলে নি।

সুফল বললে—এই আমার টগরদি, এরই দরকার—

লোকটা কুন্তির দিকে চাইলে। মুখখানা বসন্তর দাগে ভর্তি। বললে—বসুন না, এখানে বসুন—

কুন্তি তবু বসলো না। কিন্তু সুফল বসে পড়লো। বললে—বসো না টগরদি, বসো না—এখানে কেউ দেখতে পাবে না, ভুলো আমাদের জানাশুনো লোক—

ভুলো জিজ্ঞেস করলে—এ কোথাকার?

সুফল বললে—তোকে তো আমি সব বলিচি, পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের—

ভুলো বললে—কেস-ফেস হবে না তো! আজকাল পুলিস শালারা বড্ড হুঁশিয়ার হয়ে উঠেচে—

—না না, সে-সব ভয় নেই, আমি যখন বলচি, তখন তোর ভয় কী? পাওয়া যাবে কি না তাই বল্ আগে!

ভুলো বললে—পাওয়া যাবে না কেন? অর্ডার দিলে তৈরী করে রাখবো, কিন্তু কিছু অ্যাডভান্স ছাড়তে হবে—

—কত লাগবে?

ভুলো বললে—কবে দরকার তাই বল্ না তুই? আমার বানাতে একদিন সময় লাগবে—

সুফল এবার কুন্তির দিকে চাইলে। জিজ্ঞেস করলে—কবে তোমার চাই টগরদি, বলো তো?

কুন্তির যেন দম আটকে আসছিল। বুকটা টিপ টিপ করছিল। তলা থেকে

মাটিটা যেন সরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে যেন সে মূর্ছা যাবে।

—কোথায় চালাবি ? কলকাতায়, না কলকাতার বাইরে ?

স্বফল অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—বাইরেও তোর রপ্তানি চলে নাকি ?

কুন্তির গলা দিয়ে এতক্ষণে যেন শব্দ বেরোলো। বললে—চলো, স্বফল, আমি পরে এসে বলে যাবো, পরে খবর দেবো তোমাকে—

বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো।

স্বফল অবাক হয়ে গিয়েছিল। কী হলো ? এত হাঙ্গামা-হুজ্জৎ করে আবার টালবাহানা কেন ?

কুন্তি ততক্ষণে নিজেই দরজাটা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। স্বফলও পেছন-পেছন এসেছে।

—কী হলো টগরদি ? মালটা নেবে না ?

কুন্তি বললে—আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করছে স্বফল, চলো চলে যাই—

—কিন্তু ভুলো কী মনে করলে বলো তো ? ভুলো আজ বারো বছর ধরে কারবার করছে, ও কখনও নেমখারামি করবে না,—ও তেমন মানুষই নয়।

কুন্তি বললে—তা হোক, আমার খুব ভয় করছিল ওর চেহারা দেখে—লোকটাকে যেন খুনী-খুনী মনে হচ্ছিল—

—আরে তুমি হাসালে দেখছি মাইরি, পুলিসের বাবার সাধ্যি নেই ভুলোকে ধরে। ও তো বাড়িতে মাল রাখে না। পুলিস ওর বাড়ি সার্চ করলে কিছু পাবে না—

—না না স্বফল, আমার দরকার নেই, তোমাকে আমি মিছিমিছি কষ্ট দিলুম। তোমার দোকান-টোকান ফেলে চলে এসেছ, অথচ···

স্বফল বললে—দোকানের জন্যে আমি ভাবি না। তোমার উবকারের জন্যই এসেছিলুম, তোমার এই কষ্ট, অথচ আমি কিছু উবকার করতে পারলুম না টগরদি—

—আমার কষ্টের কথা আর ভেবো না স্বফল ; আমার কপালে কষ্ট থাকবেই।

স্বফল যেন আরো অবাক হয়ে গেল কুন্তির কথাটা শুনে। বললে—শুধু তোমার কেন টগরদি, আমার কথাই ধরো না, শালা নিজের বাপ-মা, তারাই বলে আমাকে দেখলে না কেউ, আর শালা ভগবান দেখবে ?

কুন্তি বললে—অথচ দেখ সুফল, তোমার আসল বাপ হয়ত বেশ পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে এই কলকাতা শহরের মধ্যেই মোটর-গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাপও ছেলেকে চিনতে পারছে না, তুমিও বাপকে চিনতে পারছো না—

কথাগুলো বোধ হয় সুফলের মনের মত হয়েছিল। বললে—শালা বাপকে যদি একবার চিনতে পারি তো শালার মুখে একশো জুতো মেরে মুখ গুঁড়িয়ে দেবো, এই তোমাকে বলে রাখলুম টগরদি—

—আরো দেখ না, যারা আমাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে তাদের কেউ কিচ্ছু বলে না, তারা বেশ বালিগঞ্জে বাড়ি করে দিব্যি আরামে আছে, খদ্দর পরছে, মীটিং করছে, মোটর-গাড়ি চড়ছে। তা ছাড়া আমাদের দেখলে তারা আবার ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা জানো—

সুফল লাফিয়ে উঠলো, বললে—আমিও তো ভুলোকে তাই বলি টগরদি, বলি যা থাকে কপালে ভুলো, তুই একবার বোম্‌-কালী বলে সমস্ত কলকাতা-টাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্‌ করে দে দিকিনি—

ততক্ষণে বড় রাস্তা এসে গিয়েছিল। আলোয় আলো সারাটা রাস্তা। জম্‌-জমাট। সুফল তার দোকানে গিয়ে ঢুকলো। কুন্তিও পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে ঢোকবার আগে বললে—আমি আর একটু ভেবে দেখি সুফল, হুট্‌ করে একটা কিছু তো করা ঠিক নয়—

বলে কুন্তি সদর দরজা দিয়ে উঠোনে গিয়ে উঠলো।

শশীপদবাবু অফিস থেকে সোজা হাওড়া স্টেশনে এসেছিলেন। ছেলের বহু-দিনের মাস্টার। শশীপদবাবু যখন কম মাইনে পেতেন তখন থেকেই কেদার-বাবু পড়িয়ে এসেছেন মন্মথকে। সেই ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাস। বলতে গেলে কেদার-বাবুই মন্মথর ভার নিয়েছিলেন। তার পর শশীপদবাবুর ধাপে ধাপে চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কেদারবাবুকে ছাড়তে পারেন নি। একেবারে বাড়ির লোক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শশীপদবাবুর সুখে-দুঃখে কেদারবাবু জড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেই তিনিই আজ চলে যাচ্ছেন। মন্মথকেও সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। নইলে কে তাঁকে দেখবে? কে আছে তাঁর?

প্ল্যাটফর্মের ভেতরে ট্রেনের জন্যে সবাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। খালি ট্রেনটা রামরাজাতলা থেকে আসবে। কিন্তু তার আগেই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জাররা মারমুখো হয়ে অপেক্ষা করছে, ট্রেনটা এলেই যেমন করে হোক ভেতরে উঠে জায়গা করে নিতে হবে।

সদাব্রত আজকে আর ক্লাবে যায় নি। মিস্টার বোস অবশ্য জিজ্ঞেস করেছিলেন—কী তার কাজ? মনিলাও জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু তারা তো জানে না। তারা জানে না এ তার কর্তব্যের প্রশ্ন নয়। কেদারবাবুর সেবা যে সদাব্রতর কাছে কতটা জরুরী, তা বললেও তারা বুঝতে পারবে না। প্রতিদিন সেই ক্লাব, সেই কিটি, সেই ড্রিঙ্ক, সেই আবার এলগিন রোডে ফিরে যাওয়া। সেখানেও তাদের সঙ্গে ডিনার খাওয়া। আর ডিনার খাওয়ার পর 'রিডার্স ডাইজেস্ট' আর 'ইভস্ উইকলি' ওল্টানো। এ তার চেয়ে অনেক ভালো। এই এত লোক, এত ভিড়, এর মধ্যেই যেন সমস্ত ইণ্ডিয়াকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস। সমাজের আসল রূপটা যেন এই রেলওয়ে স্টেশনে এলেই ধরা পড়ে। এই স্টেশনটাই যেন এক খণ্ডে সম্পূর্ণ সচিত্র ইণ্ডিয়া!

দেখতে দেখতে ট্রেনটা এসে গেল। এর পরই খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের ওপর। মন্মথই খুঁজে বার করলে রিজার্ভ-করা কামরাটা। চারটে বার্থের কামরায় তিনজন মানুষ। বাকি বার্থে অন্য এক ভদ্রলোক। চটপট করে মন্মথ জিনিসপত্রগুলোও তুলে নিলে তখনও প্ল্যাটফর্মের ওপর জায়গা নিয়ে কুলি নিয়ে গণ্ডগোল চলছে। ভেতরে উঠে সেই যে এক কোণে গিয়ে বসেছিল শৈল, আর এদিকে মুখ ফেরায় নি।

শশীপদবাবু বললেন—কাল ভোরবেলায় নেমেই একখানা চিঠি ফেলে দেবেন—

কেদারবাবু বললেন—ওই মন্মথকে বলুন আপনি, আমি কিছু না—সব কাজ ওকে বলে দিন—

তার পর হঠাৎ থেমে বললেন—জানেন শশীপদবাবু, আমি সেখানে যাচ্ছি বটে, কিন্তু মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে বিকেল থেকে—

—কেন? আপনার স্বাস্থ্যের ভালোর জন্যেই তো যাচ্ছেন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে সেখানে গেলে—

—না না, সেজন্যে নয়, আজ গুরুপদকে বড় মেরেছি মশাই—

—গুরুপদ? সে কে?

—সে আমার এক ছাত্র। ভূগোলে ফেল করেছে মশাই, আমি আর রাগ সামলাতে পারি নি, পর-পর দশটা-বারোটা কিল মেরেছি তাকে, অথচ মন্মথ কাছে ছিল, একবারও আমাকে ধরলে না—

সদাব্রতর হঠাৎ মনে পড়লো। প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনের কামরার ওপর ঝুঁকে পড়ে শৈলকে বললে—তোমাদের সঙ্গে দেওয়ার জন্যে কিছু টাকা এনেছিলুম, এটা তোমার কাছে ভালো করে রেখে দিও—

বলে পকেটে হাত দিয়ে মনিব্যাগটা বার করতে গিয়েই হঠাৎ খেয়াল হলো। কোথায় গেল মনিব্যাগ? এ-পকেট ও-পকেট সমস্ত পকেট দেখলে। সদাব্রতর আপাদ-মস্তক হঠাৎ বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। কোথায় গেল সেটা! কোটের ভেতরের পকেটেই তো রেখেছিল সেটা। স্টেশনে আসবার আগেই ভাল করে গুনে গুনে দেখেছে। কোথায় গেল? তার ভেতর যে তিনখানা টিকিটও ছিল!

—কী হলো? মনিব্যাগ পাচ্ছো না?

কেদারবাবু, মন্মথ, শৈল, শশীপদবাবু সবাই সদাব্রতর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

—কোথায় রেখেছিলে? বুক-পকেটে? কত টাকা ছিল?

সদাব্রতর মনে পড়লো এই একটু আগেই যেন একটা মেয়ে তার বড় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। একেবারে তার গা ঘেঁষে। গায়ে গা লেগে যাওয়ার জন্যে ক্ষমাও চেয়েছিল সদাব্রত। সে-ই নিয়েছে নাকি! মেয়েমানুষ মনিব্যাগ চুরি করবে?

—টিকিটগুলোও তার মধ্যে রেখেছিলে? কী সর্বনাশ, এখন কী উপায়?

সবাই সচকিত হয়ে উঠলো।

হঠাৎ সদাব্রত দূরের দিকে চেয়ে দেখলে। সেই মেয়েটা যেন তাড়াতাড়ি হেঁটে হেঁটে গেটের দিকে চলেছে। ঠিক সেই সবুজ রঙের শাড়ি পরা, মস্ত বড় খোঁপা পেছনে ঝুলছে।

সামনে অসংখ্য মানুষ। মানুষের যেন মিছিল থেমে আছে প্ল্যাটফর্মের ওপর। ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকি। সদাব্রত হন্‌হন করে সেই দিকে ছুটে চলতে লাগলো। গেট পার হয়ে গেলেই আর ধরা যাবে না, একবার রাস্তায় নেমে পড়লে বাস-ট্রামের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাবে।

ছুটতে ছুটতে সদাব্রত চীৎকার করে উঠলো—চোর—চোর—

প্ল্যাটফর্মের সমস্ত লোক সেই শব্দ লক্ষ্য করে সেই দিকে চেয়ে দেখলে—

আর আশ্চর্য, সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটাও একবার পেছন ফিরে দেখে নিয়েই দৌড়তে শুরু করে দিয়েছে।

সদাব্রত আবার চীৎকার করলে—চোর—চোর—

আরো একদল লোক পেছন-পেছন ছুটতে শুরু করেছে—

ক'জন পুলিস কোথায় ছিল, তারা হঠাৎ ছুটন্ত মেয়েটাকে ধরে ফেললে। সদাব্রত যখন সেখানে পৌঁছুল তখন জায়গাটায় অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে গেছে। নানা লোক নানা মন্তব্য করছে। সদাব্রত ভিড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকে ভালো করে চেয়ে দেখলে মুখখানার দিকে। এই মেয়েটাই। ওয়েটিং-রুমের ভেতর থেকেই কাছে কাছে ঘুরছিল। প্ল্যাটফর্মের ভেতরেও সদাব্রতর সঙ্গে তার গা ঠেকে গিয়েছিল একবার।

মেয়েটা তখন ভয়ে থর-থর করে কাঁপছে।

পুলিস বললে—চলো, জি-আর-পি অফিসে চলো—

সদাব্রত বললে—কিন্তু মনিব্যাগের ভেতরে আমার পুরী এক্সপ্রেসের টিকিট রয়েছে—ট্রেন ডিটেন করে দাও, আর বিশ মিনিট টাইম আছে ট্রেন ছাড়তে—

কিন্তু কে কার কথা শোনে! মানুষের ভিড়ের গরমে কারোর মাথারই ঠিক নেই। সবাই মজা দেখতে জমা হয়েছে। জি-আর-পি অফিসের ভেতরে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে বসতে দিলে।

—মনিব্যাগ চুরি করেছ তুমি?

মেয়েটা কিছুই বলে না। কাঁদতে শুরু করে দিলে।

—তোমার বডি সার্চ করব কিন্তু, এই বেলা বার করে দাও—

তবু মেয়েটা কিছু বলে না।

—কী নাম তোমার? কোথায় থাকো? স্টেশনে এসেছ কী করতে? সঙ্গে কে আছে?

প্রশ্নের পর প্রশ্নের ঝড় বয়ে যেতে লাগলো, তবু মেয়েটার মুখে কোনও উত্তর নেই। মেয়েটা যেন বোবা হয়ে গেছে।

পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের রাত আরও নিঝুম হয়ে এলো। কোনও কোনও দিন গোলাপী, কুন্তি বাড়ি যেতেই পারে না। ঘরের বাবুকে ফেলে গেলে কারবারের ক্ষতি হয়। বদনাম হয় পদ্মরাণীর। পদ্মরাণীর কাছে এসে খদ্দেররা বলে—এ কি মেয়েমানুষ আপনাদের! খাতির করতে জানে না?

পদ্মরাণী খাটের ওপর থেকেই বলে—কী হলো বাবা! কিছু গাফিলতি করেছে আমার মেয়েরা?

—তা গাফিলতি নয়? আমরা পয়সা খরচ করে মাল খেয়েছি, আগাম টাকা দিয়েছি, এখন বলছে—দেরি হয়ে যাচ্ছে উঠুন—! আমাদের টাকা কি টাকা নয়! আমাদের টাকা কি খোলামকুচি?

নতুন সব বখাটে ছোকরার দল। আজকালকার পা-জামা পরা। নতুন গু খেতে শিখেছে। এরাই আজকাল আসছে এ-পাড়ার দিকে ঘন-ঘন। এদের চটানো চলে না পদ্মরাণীর। কারখানায় কাজ করছে এরা, দুটো কাঁচা পয়সা পেয়ে উড়তে শিখছে।

পদ্মরাণী বললে—কত নম্বর ঘর? কার কথা বলছো বাবা তোমরা?

যারা সংসার করে, যারা এখানে ঘণ্টাকয়েকের জন্যে টাকা কামাতে আসে তাদের বড় তাড়াহুড়ো। তারাই বলে—একটু তাড়া করুন,—দেরি হয়ে যাচ্ছে—

তা বলে এক চুমুকে তো দিশি মাল ঢক-ঢক করে গলায় ঢেলে দেওয়া যায় না! যারা এখানে আসবে বলে তোড়জোড় করে আসে, তারা আশ মিটিয়ে পেট ভরে ফুর্তি করবে বলেই আসে। ফুর্তির সময় তাড়াহুড়ো করতে বললে রাগ তো হবারই কথা।

কিন্তু ততক্ষণে গোলাপী দরজায় তালা-চাবি দিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। সামনেই একটা বাস যাচ্ছিল তাতেই লাফিয়ে উঠে পড়েছে। পেছন-পেছন কুন্তিও আসছিল, সেও উঠে পড়লো। দু'জনে একটা লেডীজ সীটে গিয়ে বসতে তবে নিশ্চিন্তি।

গোলাপী বললে—বাড়িতে ছেলেটার জ্বর দেখে এসেছিলুম ভাই, তাই মনটা কেমন ছট-ফট করছিল। আমি তো ভেবেছিলুম আজ আসবোই না,

তার পর আবার ভাবলুম, যাই, না এলেই বা করবো কী? পেট তো সে-কথা শুনবে না—

তার পর একটু থেমে আবার বললে—যার কাছে আমার নামে যা ইচ্ছে বলুক গে, আমি কাউকে ভয় করি নে, যত সব গুণ্ডো-বদমাইস, আমার সব ছেলের বয়িসী ভাই, আমাকে বলে কিনা...

তার পর বোধ হয় হঠাৎ খেয়াল হলো। কথাগুলো বাসের ভিড়ের মধ্যে বলা ঠিক হচ্ছে না। একটু সামলে নিলে নিজেকে। কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে—আজ সুফলের সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলি রে টগর?

কথাটা শুনেই চমকে উঠলো কুন্তি।

—আমি? কে বললে তোকে?

—আমি যে দেখলুম তুই তেলিপাড়া লেন থেকে সুফলের সঙ্গে আসছিস—

কুন্তি বললে—ও কোথাও নয়, এমনি!

—এমনি মানে? সুফল বুঝি দালালি করছে আজকাল? বাবু ধরাতে নিয়ে গিয়েছিল?

কুন্তি বললে—দূর, দালালি করবে কেন? আমি আসছিলুম ওখান দিয়ে, ও-ও আসছিল, দেখা হয়ে গেল—সুফল খুব ভালো ছেলে—বেচারির মা-বাপ তো কেউ নেই, আমারও মা-বাপ কেউ নেই—

গোলাপীরও মা-বাপ কেউ নেই। চিরকাল মা-বাপ কারো থাকে না। তবু তার জন্যেই সারা জীবন লোকে দুঃখ করে। কুন্তি তবু তো থিয়েটার করতে পারে। আজকাল আর তেমন ডাক পড়ে না বটে, তবুও সেখান থেকেও মাঝে-মাঝে কিছু টাকা আসে। এদের তাও আসে না। এই গোলাপী-দুলারীদের দল। এরা কবে জন্মেছে তারও হিসেব কেউ রাখে নি, যেদিন মরবে সেদিনও কেউ তার হিসেব রাখবে না। শ্মশানের কেরানীর খাতায় ভুষো কালিতে শুধু লেখা থাকবে সকলের নাম ধাম। তার পর একদিন সেই খাতাই পুরোনো খবরের কাগজের সঙ্গে ওজনদরে বিক্রী হয়ে যাবে। তখন হয় সে কাগজ উনুনে যাবে, নয় তো খাবারের ঠোঙা হয়ে দোকানে-দোকানে গিয়ে উঠবে। তখন চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তারা। আর তারই বদলে হয়ত কোনও পার্কের ভেতরে শ্বেত পাথরের স্ট্যাচু প্রতিষ্ঠা হবে ওই শিবপ্রসাদ গুপ্তর। যে তাকে সোনার মেডেল দিতে এসেছিল। হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা! ওরই ছেলে আবার তার সর্বনাশ করার জন্যে তার সঙ্গে

ভাব করতে আসে। ওরই ছেলের আবার বিয়ে হয়, বড়লোকের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়—

—হ্যাঁ রে, আমায় কিছু বলছিস ?

গোলাপীর যেন মনে হলো টগর তাকে কিছু বলছে—

কুন্তি বললে—কই না তো ?

কেউই কিছু বলছে না, তবু এই নিষ্ঠুর কলকাতার অসংখ্য জনতার মধ্যে দু'জনে দু'জনকে বড় আপন-জন বলে মনে করতে লাগলো। হয়ত খানিক পরেই বাস থেকে নেমে আর দু'জনের দেখা হবে না। আবার যদি কুন্তি কাল এই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে সন্ধ্যেবেলা আসে তবেই হয়ত গোলাপীর সঙ্গে একটুখানি সময়ের জন্যে দেখা হওয়ার আশা আছে। নইলে দু'জনের ঘরে বাবু আসবে, দু'জনেই খানিকক্ষণের জন্য সব কিছু ভুলে বাবুদের মন ভোলাতেই ব্যস্ত থাকবে, তখন আর কারোর কথা কারো মনে থাকবে না। কলকাতা শহর গড়গড় করে গড়িয়ে চলবে। কারো জন্যে সে বসে থাকবে না। পাপ পুণ্য আনন্দ বেদনা সব কিছু ধূলিসাৎ করে দিয়ে নিজের হাতে নিজের ইতিহাস রচনা করে যাবে। তাতে কে বাঁচলো কে মরলো তার হিসেব নিয়ে মাথাও ঘামাবে না সে।

—কী গো, কুন্তি যে, কী খবর ?

সাপ দেখার মত চমকে উঠেছে কুন্তি! কে ? কে ও নাম ধরে ডাকলে তাকে ?

সামনে চোখ তুলে দেখলে। একজন পায়জামা-পরা ছোকরা। ঘনিষ্ঠ হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে। কুন্তি চিনেও না-চেনার ভান করলে। কত ক্লাবে, কত সংস্কৃতি-সংঘে, কত অফিসের থিয়েটারে প্লে করেছে, সকলকে কি আর চিনে রাখা যায় ?

—কে আপনি ?

গোলাপীও অবাক হয়ে গেছে। টগরকে কুন্তি বলে ডাকছে কেন ?

—আমায় চিনতে পারছো না ? সেই যে তুমি পার্ট করেছিলে আমাদের ক্লাবে ? ওল্ড্ বালিগঞ্জ ক্লাবের প্লে হয়েছিল রঙমহলে, মনে পড়ছে না ?

—আপনি কাকে দেখে কাকে ভুল করেছেন! আমি তো প্লে করতে পারি না—

—তা তোমার নাম কুন্তি তো ? কুন্তি গুহ ?

গোলাপী আর থাকতে পারলে না।

—ওমা, এ কুন্তি গুহ হতে যাবে কেন? আপনি কথা বলব্যার আর লোক পেলেন না? আপনি সরে যান এখান থেকে, মেয়েদের ঘাড়ের ওপর না ঝুঁকে পড়ে বুঝি কথা বলা যায় না?

রাত তখন অনেক। হয়ত বাসের শেষ ট্রিপ। প্যাসেঞ্জার সামান্যই ছিল। তবু যে-ক'জন পুরুষ ছিল তারাই ব্যাপারটা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিলে—ও-মশাই, এদিকে তো অনেক জায়গা খালি পড়ে আছে, ওখানে অমন হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন কেন?

এদের কথায় ছেলেটা কিন্তু কান দেবার লোক নয়।

—আরে মনে নেই! তুমি সেই 'শেষ-লগ্ন' বইতে নন্দিতার পার্ট করলে আর আমি করেছিলুম সুধাময়ের পার্ট—মনে নেই?

কুন্তি গোলাপীর দিকে চেয়ে বললে—দেখ তো ভাই, কাকে কী বলছে ভদ্রলোক, আমি পার্টই বা কবে করলুম আর প্লেই বা আমি করতে শিখলুম কবে?

ভেতর থেকে একজন ভদ্রলোক এবার সামনের দিকে এগিয়ে এলো।

—এই মশাই, ওদিকে অনেক জায়গা পড়ে আছে, গিয়ে বসতে পারছেন না? মেয়েদের ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী করছেন?

তার পর হঠাৎ যেন কী সন্দেহ হলো। হঠাৎ বলে উঠলো—আরে, আবার মদ খেয়েছে—

—মদ!

মদের নাম শুনেই সব প্যাসেঞ্জার ছিটকে উঠলো—অ্যাঁ—

সামনে ভূত দেখলেও যেন কেউ এত চমকাতো না। মদের নাম শুনে সকলে যেন মরীয়া হয়ে উঠলো।

—কনডাক্টার, নামিয়ে দাও বাস থেকে, নামিয়ে দাও—

—আরে মশাই, আপনাদের হাত নেই? ঘাড় ধরে গলাধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিন বেটাকে—এই টুকুন-টুকুন ছেলে সব মদ খেতে শিখেছে এরই মধ্যে!

কিন্তু আর বেশি বলতে হলো না। ছেলেটা নিজেই নেমে গিয়ে সকলকে অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিলে। কুন্তির বুকটা তখনও ধুক-ধুক করছে। গোলাপীরও। গন্ধটা তাদের মুখ থেকেই হয়ত বেরিয়েছিল। এলাচ-লবঙ্গ খেয়েও পুরোপুরি যায় নি।

কুন্তির নামবার সময় হয়ে এসেছিল। গোলাপী জিজ্ঞেস করলে—কাল আসছিস তো ?

—আসছি, তুই আসছিস তো ?

গোলাপী বললে—আসবো না তো যাবো কোথায় ভাই, মরে মরেও আসতে হবে—

বাসটা কুন্তিকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল আরো দক্ষিণে। রাত্রের শেষ বাস। রাস্তাও তখন ফাঁকা হয়ে এসেছে। সেই পানের দোকানটা তখনও খোলা।

—পান দেখি একখিলি!

পানটা ভাত খেয়ে উঠে খায় কুন্তি। আয়নাটাতে একবার নিজের মুখখানাও দেখে নিলে। বুড়ি বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন স্কুলে পড়ে। তার পর বিকেলে রান্না করে। আর তার পর বই নিয়ে পড়তে বসে। সত্যি, এত টাকা খরচ হচ্ছে বুড়ির জন্যে, এত পরিশ্রম করছে। কী হবে শেষ পর্যন্ত কে জানে! কে তাকে বিয়ে করবে! কোথায় টাকা পাবে কুন্তি! হাজার তিনেক টাকা তো লাগবেই খরচ-খরচা। এ তো আর সুভেনির ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস-এর মালিকের মেয়ে নয়। বুড়ির বিয়েটা হলেই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে যাওয়া ছেড়ে দেবে কুন্তি। আর তখন তো বয়েসই বেড়ে যাবে। বলতে গেলে বুড়ি হয়ে যাবে তখন সে। তখন কে আর তাকে প্লে'র জন্যে ডাকতে আসবে! বন্দনা, শ্যামলী তাদেরই আর তেমন নামডাক নেই বাজারে। আগে কম মেয়ে ছিল এ-লাইনে তাই কুন্তির ডাক আসতো। আজকাল সবাই ছুটে এসে ভিড় করছে। মেয়ের পঙ্গপাল লেগে গেছে বাজারে। এত মেয়ে আর এত মানুষ কী খেয়ে যে পয়দা হচ্ছে কে জানে ?

বাড়ির দরজায় এসে হঠাৎ কেমন খটকা লাগলো। দরজাটা একবার ঠেলতেই ভেতর থেকে জ্যাঠাইমা দরজা খুলে দিলে। জ্যাঠাইমাকে দেখে কুন্তি অবাক হয়ে গেছে।

—এ কি জ্যাঠাইমা, আপনি জেগে আছেন এখনও ?

জ্যাঠাইমা একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

—সব্বোনাশ হয়েছে মা, তোমার বুড়িকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে গো—

—সে কি ? পুলিসে ধরেছে ? কেন ? কী করেছিল সে ? কখন ধরলে ?

একগাদা প্রশ্ন করে কুন্তি যেন হাঁপিয়ে উঠলো। জ্যাঠাইমা কাঁদবে না সমস্ত খুলে বলবে কিছু ঠিক করতে পারলে না!

—আপনাকে কে বললে জ্যাঠাইমা?

—একজন লোক এসে বলে গেল মা, হাওড়ার ইস্টিশানের থানায় তাকে ধরে রেখেছে, কী নাকি চুরি করেছে—

কুন্তি বললে—কী চুরি করেছে!

—টাকা মা টাকা! কোন্ ভদ্দরলোকের পকেট থেকে নাকি দু' হাজার টাকা চুরি করেছে বুড়ি, শুনে তো আমার হাত-পা বুকের মধ্যে সেঁদিয়ে গেছে মা, আমার ঘুমও আসে না, কিছুই না। তখন থেকে তোমার জন্যে হাঁ করে জেগে জেগে বসে আছি মা—

—এখন তাহলে কী করি আমি জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমাই বা কি বলবে! এমন ঘটনা তো সচরাচর ঘটে না। এমন ঘটনা ক'জনেরই বা ঘটেছে। কুন্তিকে একবার পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেবার তেমন কিছুই করে নি তারা। হাজতে পুরে রেখেছিল। তার পর অকারণেই আবার একদিন ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু থানা-পুলিস মানে যে কী জিনিস তা কুন্তি হাড়ে হাড়ে জেনে গেছে। কতদিন মাঝরাত্রে পুলিস এসে হানা দিয়েছে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে!

পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের কথা মনে পড়তেই একবার মনে হলো পদ্মরাণীর সঙ্গে গিয়ে কথা বলবে নাকি এ-সম্বন্ধে? মা'র সঙ্গে পুলিসের কর্তাদের খুব আলাপ! যদি খবরটা দিলে কাউকে টেলিফোন করে দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে বুড়িকে!

—ওমা, আবার কোথায় যাচ্ছিস তুই?

কুন্তি সেই অবস্থাতেই আবার রাস্তার দিকে এগোচ্ছিল। বললে—আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন জ্যাঠাইমা, আমি একবার যাই, দেখি, কী করতে পারি—

—তা বলে বাসিমুখে যাবে? কিচ্ছু খেয়ে গেলে না?

কুন্তি বললে—আমার মুখে এখন কিচ্ছু রুচবে না জ্যাঠাইমা, বুড়ি না খেয়ে আছে, আমি কোন্ মুখে খাবো বলুন তো—

তার পর রাস্তায় গিয়ে মোড়ের মাথাতেই একটা ট্যাক্সি ধরলে। ট্যাক্সির ভেতর উঠে বসে বললে—চলো চিৎপুর, সোনাগাছি—

রাত তখন অনেক। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে কিন্তু তখন রক্তে জোয়ারের টান লেগেছে। উঠোনের ওপরে দোতলায় হারমোনিয়ামে গান চলেছে: 'চাঁদ বলে ও চকোরী বাঁকা চোখে চেয়ো না।' সুফল পাঠার ঘুগনি সাপ্লাই দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। বেলকুঁড়ির মালাওয়ালা এসে আরো বারচারেক ঘুরে গেছে। পদ্মরাণীর নিজের স্টক থেকে মাল সাপ্লাই হতে আরম্ভ করেছে।

কুন্তিকে এই সময় আবার ফিরতে দেখে পদ্মরাণী অবাক হয়ে গেল।

—ওমা, কি লা, বলি টগর কী মনে করে?

কুন্তি আর ভণিতা না করেই বলে ফেললে—সর্বনাশ হয়েছে মা, বুড়িকে পুলিসে ধরেছে—

—বুড়ি কে? তোর ছোট বোন?

—হ্যাঁ মা, হাওড়া ইস্টিশানে বুড়ি নাকি কী করেছিল, আমি বাড়ি গিয়ে শুনলুম কে নাকি এসে খবর দিয়ে গেছে আমার বাড়িওয়ালীকে যে, বুড়িকে থানায় আটকে রেখেছে—

—তা কী করেছিল তোর বোন?

—আমি কিচ্ছু জানি না মা, আমি খবরটা পেয়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছি—তোমার মা, পুলিসের লাইনে কত লোকের সঙ্গে চেনা-জানা আছে, বলে-কয়ে আমার বোনকে ছাড়িয়ে দাও মা—

পদ্মরাণী যেন নিজের মনে কী ভাবলে একবার। তার পর বললে—তা এত রাত্তিরে কার সঙ্গে আমি কথা বলবো, কে আমার কথা শুনবে?

কুন্তি তবু কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। বললে—তুমি যেমন করে হোক মা, আমার বোনকে একবার ছাড়া পাইয়ে দাও—

—তা হাওড়া পুলিস আমার কথা শুনবে কেন? পাড়ার পুলিস হলে আমি বলে দিতে পারতুম। আর এত রাত্তিরে কে জেগে আছে, বল্ না?

তবু অনেক বলা-কওয়ার পর পদ্মরাণী টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে কথা বললে। কেউ ধরে না। শেষে যদিই বা একজন উত্তর দিলে, তাও কর্তারা কেউ নয়। বিরক্ত হয়ে টেলিফোন নামিয়ে রেখে বললে—দুর, পাহারাওয়ালা-গুলোকে রেখে দারোগা ঘুমোতে গেছে—

—তা হলে কী হবে মা!

—কাল সকালে দেখবো চেষ্টা করে। তুই বাপু আজ এখানেই ঘুমো, নয়ত বাবুদের ঘরে বস—

কুন্তি নাছোড়বান্দা হয়ে বলতে লাগলো—তোমাকে মা একটা কিছু ব্যবস্থা এর করতেই হবে, যেমন করেই হোক, আমার বাপ-মা-মরা একটা বোন—তার জন্যে যে আমি অনেক টাকা খরচ করিচি মা, আমি তাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি ভাল ঘরে বিয়ে দেবো বলে, আমার যে নিজের বলতে আর কেউ নেই মা—

—রাখ বাপু তোর ছেনালি কথা, কার আবার কে থাকে শুনি? আমার ক'টা দিদি ছিল ভাববার?

তখন অত কথা শোনবার সময় নেই কুন্তির।

—তা হলে কী হবে মা?

—কী আবার হবে? তোর বোনকে এখানে এনে তুলবি। দেখবো পুলিস বেটারা কী করে? তখন যে বড় বড়গলায় বলেছিলি তাকে এখানে আনবি না তুই, এখন কী হলো? তখন তো শেঠ ঠগনলাল তোকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল নথখোলানির জন্যে, এখন কী হলো? তখন আমি তো তোর হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিলুম, তুই ঠ্যাকার করে টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলি। বললি—টাকায় আমি পেচ্ছাব করে দিই, তা এখন কী হলো? এখন অত ঠ্যাকার কোথায় গেল শুনি? এখন তো তোর বোনকে সেই পাঁচ ভূতেই লুটে-পুটে খাবে! এতক্ষণ থানার মধ্যে পুলিস-পাহারাওয়ালারা কি আর তাকে আস্ত রেখেছে ভেবেছিস?

—মা!!!

হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠলো কুন্তি! যেন পারলে কুন্তি পদ্মরাণীর গালের ওপর এক চড় কষিয়ে দিতো, কিন্তু তখন কুন্তি সামলে নিয়েছে নিজেকে।

পদ্মরাণী তখনও কিন্তু বলে চলেছে—সেই কথায় আছে না, দাদ্ খোঁচাতে কুষ্ঠ হলো, তোর হয়েছে তাই। তোকে আমি পই-পই করে বললাম যে, টগর তোর বোনটাকে নিয়ে আয়, কিছু নগদ টাকা পাবি, পেটটা ভরবে। এখন বেশ হয়েছে, পেটও ভরলো না, বদনামিও হলো—

কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

—কে ?

এত রাত্রে আবার কে টেলিফোন করে ? কার আবার মেয়েমানুষের দরকার পড়লো !

না, তা নয়। ট্রাঙ্ক কল ! পদ্মরাণী চীৎকার করে উঠলো—হ্যালো ?

ওপার থেকে উত্তর এলো। ইণ্ডিয়ার অন্য এক প্রান্তে ট্রাঙ্ক কল এসেছে।

—সুন্দরিয়া বাঈ ?

ওপাশ থেকে সুন্দরিয়া বাঈ কী যেন উত্তর দিলে। আর এপাশ থেকে পদ্মরাণীর সঙ্গে কথা চলতে লাগলো। কুন্তি সে-সব কথার কিছুই বুঝতে পারলে না। এ-সব কথা তার শুনতেও ভালো লাগে না। সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তা তখন একটু একটু নিঝুম হয়ে আসছে। একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, তাতেই উঠে বসলো কুন্তি। তার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে —হাওড়া স্টেশন···

হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ির ভেতর বক্তিনাথ কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। শিবপ্রসাদ-বাবু আবার বাইরে গেছেন। বুড়ো পেনসন-হোল্ডার বাবুরা বিকেলবেলা এসে ফিরে গিয়েছে। তার পর বিকেল থেকে অনেকবার টেলিফোন এসেছে। বাবু বাড়িতে না থাকলে বক্তিনাথেরই হয় জ্বালা—

বক্তিনাথ বলে—বাবু বাইরে গেলেন, আমারই হলো জ্বালা—

মন্দাকিনী টেলিফোনের শব্দ শুনলেই ডাকে—ও বক্তিনাথ, দেখ্ বাবা কে টেলিফোন করছে—

বাবুও থাকে না বাড়িতে, দাদাবাবুও নেই। সব কাজে বক্তিনাথই ভরসা। বক্তিনাথ বলে—আর পারবো নি আমি, এবার নির্ঘাত মারা যাবো—

অনেক কাল থেকে বক্তিনাথ এ-বাড়িতে আছে। অনেক কাল থেকে এ-বাড়ির হালচাল দেখে আসছে। কুঞ্জও আছে, কাজকর্ম না থাকলে কুঞ্জ গ্যারেজের ভেতর শুয়ে শুয়ে ঘুমোবে, তবু উঠে একটু জবাব দেবে না।

মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করলে—কে রে বক্তিনাথ, কে খুঁজতে এসেছিল বাবুকে ?

—বাবুকে নয় মা দাদাবাবুকে!

—তুই কী বললি?

—আমি বললুম, এ-সময় কি দাদাবাবু বাড়িতে থাকে? এখন অফিসে চলে গেছে—

—কে এসেছিল?

—আজ্ঞে, একজন মেয়েমানুষ।

কুন্তি ভেবেছিল সকাল-সকাল না গিয়ে একটু দেরি করেই যাওয়া ভাল। কী জানি, বড়লোকেরা হয়ত একটু দেরি করেই ঘুম থেকে ওঠে। কিন্তু এত সকালে যে সদাব্রত অফিসে চলে যাবে তা ভাবতে পারে নি। সমস্ত রাতটাই ঘুম হয়নি কুন্তির। সমস্ত রাতটাই ঘুরে-ঘুরে কেটেছে। সেই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট থেকে সোজা হাওড়া স্টেশনে। দেখা কি করতে চায় সহজে! পুলিসের কাছে ঘেঁষতে দেয় না কেউ। কিন্তু ভাগ্য ভাল। চেনা লোক। যে দারোগাটা ডিউটিতে ছিল সে কুন্তিকে দেখে চিনতে পারলে।

—দেখুন, শুনলুম আমার বোনকে আপনারা থানায় ধরে রেখেছেন, আমি তার দিদি—

ইন্‌স্পেক্টর মানুষটা যেন বিরক্ত হয়ে উঠলো।

বললে—তা রাত্রে কি? কাল সকালে আসবেন—

কুন্তি বললে—দেখুন, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, আমার বাবা-মা-ভাই কেউ নেই, কী করতে হবে তাও জানি না—

—যা জানবার কালকে সকালে এসে জেনে যাবেন। এখন মিছিমিছি ঘুম ভাঙাতে এলেন কেন?

—দেখুন, আমার বোনের কম বয়েস, সে কিছুতেই চুরি করতে পারে না— নিশ্চয় কেউ মিছিমিছি তাকে এখানে জড়িয়ে দিয়েছে—

পুলিস ইন্‌স্পেক্টরটা হঠাৎ যেন একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল অকারণে।

জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোথায় থাকেন?

—কালীঘাটে। এই দেখুন না, খবরটা পেয়েই আমি কালীঘাট থেকে দৌড়ে এসেছি—

—আচ্ছা আপনার নাম কী বলুন তো?

—কুন্তি গুহ।

হঠাৎ ইন্‌স্পেক্টরের মুখের চেহারা একেবারে আমূল বদলে গেল।

—আরে, আপনি থিয়েটারে প্লে করেন না? আমাদের পুলিস-ক্লাবের থিয়েটারে আপনি হিরোইনের পার্ট করেন নি?

হঠাৎ যেন সব মনে পড়লো। এতক্ষণে যেন কুন্তি একটা আশ্রয় পেয়ে বাঁচলো। কুন্তির মাথার খোঁপাটা হঠাৎ পিঠের ওপর খসে পড়লো। এ-সব অনেক চেষ্টা করে শিখতে হয়েছিল একদিন কুন্তিকে। কিন্তু সেই শেখা যে এই পুলিসের থানায় এসে কাজে লাগবে তা তার কল্পনাতেও ছিল না। তার পর ফিগারটাকে বেশ বেঁকিয়ে দুই হাত উঁচু করে খোঁপাটা জড়াতে জড়াতে বললে—আপনিই তো হিরো সেজেছিলেন—

—খুব মনে আছে! সেই যে, আই-জি একটা মেডেল দিয়েছিলেন আপনাকে? তা আপনার বোন চুরি করতে গেল কেন?

কুন্তি বললে—দেখুন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো দিনরাত থিয়েটার আর রিহার্সাল নিয়েই থাকি, ওর জন্যে মাস্টারও রেখেছি, ও তো দিনরাত ইস্কুলের পড়াশুনো নিয়ে থাকে, কেন এখানে এই হাওড়া ইস্টিশনে আসতে যাবে, বুঝতে পারছি না। ওকে আপনি দয়া করে ছেড়ে দিন, আমি ওকে মেরে খুন করে ফেলবো—কিন্তু ওর যদি জেল হয়ে যায় তখন আমি কী করে মুখ দেখাবো বলুন দিকিনি? আপনার পায়ে পড়ছি, আপনি ছেড়ে দিন ওকে—

—কিন্তু আর তো হয় না! ডায়েরী লেখা হয়ে গেছে যে!

—তা একবার লেখা হয়ে গেলে আর তা কাটা যায় না?

ইন্‌স্পেক্টর একবার কী যেন ভাবলে মনে মনে। ভদ্রলোকের থিয়েটার করবার ঝোঁক ছিল ছোটবেলা থেকে। এখনও থিয়েটারের লোক দেখলে একটু দয়ামায়া হয়।

বললে—আর তো উপায় নেই—

—দেখুন না যদি গরীবের একটু উপকার করতে পারেন!

—কিন্তু কেসটা যে জটিল বড়!

—কেন? জটিল কেন?

—আরে কালকে এই পিক-পকেটিং-এর জন্যে পুরী এক্সপ্রেস দু'ঘণ্টা লেটে ছেড়েছে। রেলের হেড-অফিসে পর্যন্ত খবর চলে গেছে। সবাই জেনে গেছে যে! আর কমপ্লেনেন্ট তো যে-সে লোক নয়, শিবপ্রসাদ গুপ্তর ছেলে—

—কে? কার নাম করলেন?

—শিবপ্রসাদ গুপ্ত! তাঁরই ছেলে সদাব্রত গুপ্ত, তাঁরই পকেট কেটেছিল আপনার বোন—দু'হাজার টাকা ছিল পকেটে, তিনখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট ছিল আবার তাতে! সমস্ত হাওড়া স্টেশনে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল যে কাল! গরীব লোক হলে কিছু বলবার ছিল না। তা হলে কেউ আর জানতেই পারতো না। তাহলে আপনার বোনকে আমি এখুনি নিজের রিস্কে ছেড়ে দিতে পারতুম। কিন্তু শিবপ্রসাদ গুপ্তর সঙ্গে মিনিস্টারদের পর্যন্ত জানাশোনা আছে, কোত্থেকে রিপোর্ট হয়ে যাবে, তখন?

—তা হলে আমি কী করবো বলুন?

—যদি সদাব্রত গুপ্ত কেস উইথড্র করে নেন, তা হলে না-হয় তবু চেষ্টা করে দেখতে পারি—আপনি শিবপ্রসাদ গুপ্তর বাড়ি চেনেন?

কুন্তি চুপ করে রইল। তার উত্তর দেবার ক্ষমতাটাও যেন লোপ পেয়ে গেছে।

—চেনেন না? আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি!

তার পর একটু থেমে বললে—আরে আপনি বালিগঞ্জের হিন্দুস্থান পার্কে গিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সে-ই দেখিয়ে দেবে আপনাকে—। অত বড় পোলিটিক্যাল সাফারার। শুনেছি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গেও দহরম মহরম আছে। এ কেস কি আমরা সহজে ছেড়ে দিতে পারি? শেষকালে হয়ত আমাদেরই চাকরি চলে যাবে—

কুন্তি তখনও কিছু বলছে না।

—আপনি আর দেরি করবেন না। আপনি কাল সকালবেলাই গিয়ে তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করুন, লোকটি খুব ভালো, আপনি যদি আপনার ডিফিকালটি বুঝিয়ে বলতে পারেন তো নিশ্চয়ই কাজ হবে। তার পর আমার তরফ থেকে যা করবার তা আমি করবো, কথা দিচ্ছি—

তখনও কুন্তি চুপ করে ছিল।

—তা এখন কী প্লে করছেন?

মাথার মধ্যে তখন যেন আগুনের ফণাগুলো রক্ত-মাংস সব কিছু চেটে-চেটে খাচ্ছে। কুন্তির মনে হলো এর চেয়ে যেন ওই স্টেশনের পাশে ইঞ্জিনের তলায় মাথা দেওয়াও সহজ। এর চেয়ে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে গিয়ে নিজের ঘরের কড়ি-কাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করাও সহজ। এর থেকে সব কিছু সহজ, শুধু সেই ছেলেটার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যেন কিছুতেই

সম্ভব নয়। গিয়ে কী বলবে কুন্তি? কোন্ অজুহাত দেবে? ক্ষমা চাইবে? গালাগালি দেবে? তার পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাবে? কী করলে কী কথা বললে সে ক্ষমা করতে রাজী হবে?

—কালকে দেখুন না, কাদের তুলে দিতে এসেছিলেন সদাব্রতবাবু, তাদেরও যেতে দেরি হলো। সে কী হ্যাঙ্গামা। আমরা তো প্রথমে জানতুম না যে উনি শিবপ্রসাদবাবুর ছেলে। শেষকালে এখান থেকে ভদ্রলোক টেলিফোন করলো আই-জি'কে, টেলিফোন করলো সাউথ ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল—কংগ্রেসের লোক ওরা, ওদেরই তো এখন পাওয়ার। রেলওয়েও ওদের, পুলিসও ওদের। ওরা যদি বলে তো আমি বাপ বাপ বলে ছেড়ে দেবো! আমার কী? পণ্ডিত নেহরু যদি এখন বলে জেলখানায় যত কয়েদী আছে সকলকে ছেড়ে দিতে, তো ছেড়ে দেবো না?

আরো যেন কত কথা বলতে লাগলো ইন্স্পেক্টরটা।

রাত শেষ হয়ে আসছিল। সমস্ত রাতটাই যেন কুন্তির মাথার ওপর দিয়ে এক নিমেষে হু-হু করে ফুরিয়ে গেল। কিন্তু এত অত্যাচারের পরেও সেই তাদেরই কাছে গিয়ে তাকে মাথা নিচু করতে হবে? পৃথিবীতে ওদের কথাটাই থাকবে? আর কুন্তিরা কেউ নয়? কুন্তিরা মরে গেলেও কারো মাথায় ব্যথা হবে না? ওদের কাছে দু'হাজার টাকাটা কতটুকু? আর টাকা টিকিট সমস্তই তো ফেরত পাওয়া গেছে। তবু একটু দয়া করবে না? কুন্তির মনে হলো বুড়ি যদি এখন সামনে থাকতো তো আবার কুন্তি ওই মোটা রুলটা দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে তবে শান্তি পেতো। একবার বঁটি দিয়ে বুড়িকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল, তার পর হাসপাতালে গিয়ে তারই জন্যে রক্ত দিতে হয়েছিল। এবার সামনে পেলে বুড়িকে একেবারে মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিতো কুন্তি। এমন করে মারতো যেন আর বেঁচে ওঠবার ক্ষমতা পর্যন্ত চলে যেতো। মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যেন সেখানেই দম আটকে মারা যেতো! কী হবে ও-মেয়েকে বাঁচিয়ে। মরুক ও। জেলখানায় পচুক। কিছুতেই কুন্তি আর তার কথা ভাববে না। অমন বোন তার থেকেই বা কী লাভ! বরং না থাকলেই তো ভাল! বেশ ঝাড়া হাত-পা নিয়ে কুন্তি স্বাধীন হয়ে ঘুরে বেড়াবে!

হাওড়া স্টেশন থেকে বাড়িতে ফিরে এসে শাড়ি ব্লাউজ বদলে আবার সে বালিগঞ্জ প্লেসে সদাব্রতদের বাড়িতে এসে হাজির হলো। কিন্তু শুনলে তার আগেই সদাব্রত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

কুন্তি জিজ্ঞেস করলে—বাবু কখন বাড়িতে আসবে অফিস থেকে ?

বন্তিনাথ বললে—অফিস থেকে তো বাড়ি আসবে না, কেলাবে যাবে—সেখান থেকে ফিরতে রাত দশটা বাজবে—তখন আসবেন আপনি—

বলে কুন্তির মুখের ওপরেই বন্তিনাথ সদর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলে।

সেদিন কেদারবাবু সত্যিই বড় ভাবনায় পড়েছিলেন। আর তো মাত্র কুড়ি মিনিট সময় আছে। যদি ট্রেন ছেড়ে দেয় ? সদাব্রত কোথায় গেল ? শেষকালে ধরবে নাকি সবাইকে ?

মন্মথ শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। বলেছিল—আপনি কিছু ভাববেন না, সদাব্রতদা তো গেছে দেখতে—

—কিন্তু যদি ট্রেন ছেড়ে দেয় ? তোমরা কেউ কোনও কাজের নও—

শশীপদবাবুও শেষকালে আর থাকতে না পেরে সদাব্রতর খোঁজে চলে গিয়েছিলেন। আর শৈল গাড়ির ভেতরে এক কোণে পাথরের মূর্তির মত চুপ করে বসে ছিল। কোথায় যেন তার জীবনে গ্রন্থি বেঁধে গেছে। জীবনে এই প্রথম তার কলকাতার বাইরে যাওয়া। বলতে গেলে প্রথম ট্রেনে চড়া। শৈল শুধু দূর থেকে ট্রেনই দেখেছে। বাগমারীর সেই জলা-জায়গায় ফাঁকা আকাশের তলায় ওই ট্রেনই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী ! ওই ট্রেনের সঙ্গেই কতদিন শৈল উধাও হয়ে গিয়েছে কত দেশ-বিদেশে। ট্রেনের জানলায় ছোট-ছোট মুখগুলোর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়েছে। আজকে সেই ট্রেনে নিজেই সে উঠেছে। এই ট্রেনে চড়েই সে আবার নিরুদ্দেশ পরিক্রমা করবে। এতে তো তার আনন্দ হবারই কথা। কোথায় পুরী, কেমন সে দেশ, সমুদ্রই বা কেমন তাও জানা নেই। তবু মনে হলো এই কলকাতার অন্ধকার গলির সেই একখানা নোংরা ঘরই যেন তার কাছে ভালো। সেই ঘরখানার জন্যেই আজ তার মন কেমন করতে লাগলো। সারাদিন জিনিস-পত্র গুছিয়েছে, সারাদিন মন্মথর সঙ্গে একটি-একটি করে দরকারী জিনিস

সাজিয়ে পোঁটলা বেঁধেছে। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে মনটা টন্ টন্ করে উঠেছে।

আর তার পরই এই বিপর্যয়!

হে ভগবান যেন তাদের যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়! ডাক্তার-ওষুধ থাকলে এখানেই বা কেন কাকা ভাল হবে না!

—হ্যাঁরে শৈল, সদাব্রত কোথায় গেল? মন্মথ, তুমি একটু নেমে গিয়ে দেখ না। কোনও কর্মের নয় কেউ, কেবল ফাঁকিবাজ! শেষকালে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখছি মুশকিলে পড়বো আমরা!

—আমি চলে গেলে যদি ট্রেন ছেড়ে দেয়?

—ট্রেন ছেড়ে ওম্‌নি দিলেই হলো? পয়সা দিয়ে টিকিট কাটা হয় নি? আমরা কি মাগ্‌না যাচ্ছি?

—কিন্তু টিকিট তো পিক্-পকেট হয়ে গেছে।

—তোমার সব ব্যাপারে কেবল তর্ক! টিকিট পিক্-পকেট হলেই বা, রেলের অফিসে টিকিটের রেকর্ড নেই? আমাদের নামে কামরা রিজার্ভ করা নেই? এ কি মগের মুলুক পেয়েছে নাকি? গভর্মেন্ট-অফিসাররা চোর বলে একেবারে দিনে ডাকাতি করবে বলতে চাও?

তার পর অন্যের ওপর আর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। বললেন —কেউ কোনও কর্মের নয়, দেখছি আমাকেই নামতে হবে—

বলে তাড়াতাড়ি নামতে যাচ্ছিলেন। শৈল ধরে ফেললে। বললে—কাকা, তুমি একটু বোঝো না কেন?

—আমি বুঝি না মানে? সদাব্রত কোথায় গেল দেখতে হবে না? সে বেচারী এই যে আমাদের জন্যে এত করছে, তার কোনও দাম নেই? আমার পেছনে খরচ করা তার কিসের দায় শুনি? সে আমার কে? তার কোনও বিপদ হলো কি না দেখতে হবে না?

ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মের সবাই ট্রেন থেকে নেমে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সবারই এক প্রশ্ন। ট্রেন কখন ছাড়বে, কে ধরা পড়লো, কার জন্যে ট্রেন এতক্ষণ আটকে আছে।

কিন্তু সদাব্রত সেদিন যেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, আর কখনও তেমন হয় নি। জি-আর-পি অফিসের মধ্যে পুলিসের সামনে সদাব্রতর চেহারা সেদিন যে না দেখেছে সে তা কল্পনা করতেও পারবে না।

পুলিস অফিসার শুধু বলেছিল—আপনার তিনখানা টিকিটের জন্যে কি এতগুলো প্যাসেঞ্জার সাফার করবে বলতে চান?

সদাব্রত চীৎকার করে উঠলো—যাতে সাফার না করে সেই ব্যবস্থা করুন তা হলে?

—কিন্তু আমাদের পুলিসেরও তো একটা আইন আছে?

—পুলিসের আইন কি পাবলিককে কষ্ট দেবার জন্যে, না তাদের অসুবিধে দূর করবার জন্যে, তাই আগে বলুন—?

শেষ পর্যন্ত পুলিস অফিসারটি বোধ হয় অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। বলেছিল—দেখুন, আমি আপনার কাছে আইন শিখতে চাই না—আপনি এখান থেকে যান—

—ঠিক আছে, আপনাদের টেলিফোনটা আমাকে দিন, আমি আপনাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে কথা বলবো—

বলে নিজেই টেলিফোন তুলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি নেই। তখন তিনি হয়ত ক্লাবে, কিংবা সিনেমায় অথবা কোনও পার্টিতে। তার পর টেলিফোন করেছিল আই. জি-কে। তিনিও নেই। তার পর করেছিল রেলের ডি-টি-এসকে। তাঁকেও পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজারকে। সদাব্রত জেনারেল ম্যানেজারকে পর্যন্ত সাবধান করে দিয়েছিল—আপনি যদি কোনও স্টেপ না নেন আমি টেলিফোন করবো রেলওয়ে-বোর্ডকে। যদি তাতেও কোনও স্টেপ কেউ না নেয়, আমি রেলওয়ে-মিনিস্টারকে রিং-আপ করবো। তাতেও যদি কোনও ফল না হয় আমি অ্যালার্ম সিগন্যাল টানবো! আমাকে আপনারা অ্যারেস্ট করুন। আই ওয়াণ্ট দ্যাট—

কেদারবাবু সেইখানে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন আর হিস্ট্রীর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন।

চারদিকে ভিড়ে ভিড়। আপ ডাউন হাওড়া স্টেশনের সমস্ত ট্রেন-সার্ভিস সেদিন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। শশীপদবাবু, কেদারবাবু সবাই সদাব্রতর কাণ্ড দেখে হতবাক। টাকা দিয়ে টিকিট কেটে অত কষ্ট করে কাউণ্টারের সামনে ভোরবেলা থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রিজার্ভেশন করে শেষকালে যাওয়া হবে না? ইণ্ডিয়ার রেলওয়ে ইণ্ডিয়ার প্রাইম-মিনিস্টার কিংবা রেলের জেনারেল ম্যানেজারের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এ সাধারণের সম্পত্তি। এর ভাল-মন্দ ইণ্ডিয়ানদের ভাল-মন্দ। ইণ্ডিয়ার গভর্মেণ্টের ভাল-মন্দর সঙ্গেও ইণ্ডিয়ানদের ভাল-মন্দ জড়িয়ে আছে। আমেরিকা যখন স্বাধীন হলো, তার Declaration

of independence-এ লেখা হলো সাধারণ মানুষের অধিকারের কথা। ইতিহাসে এই-ই প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হলো সাধারণ মানুষকে। লেখা হলো—"We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness; that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organising its powers in such form as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.···But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such government and to provide new guards for their future safety."

সদাব্রত বললে—আমাদেরই গভর্ণমেণ্ট, আমাদেরই পুলিস—আপনাদের যা খুশি আমি করতে দেবো না—আপনি আসামীকে লক্-আপে পুরে দিয়ে আমার পার্স, আমার টিকিট ফিরিয়ে দিন—

শশীপদবাবু বললেন—জানেন স্যার, ইনি কে? ইনি শিবপ্রসাদ গুপ্তর ছেলে, এঁর নাম সদাব্রত গুপ্ত—এ-কেস পার্লামেণ্ট পর্যন্ত উঠবে, আমি বলে রাখছি, পণ্ডিত নেহরু শিবপ্রসাদ গুপ্তর পার্সোন্যাল ফ্রেণ্ড—

সঙ্গে সঙ্গে যেন ম্যাজিকের মত ফল ফললো। পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের চোখ-মুখের ভাব বদলে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে বললে—দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন আপনি—

১৭৮১ সালের আমেরিকার স্বাধীনতার আট বছর পরেই ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা, ১৭৮৯ সাল। আমরা চার্চকে মানবো না, পুরুত-ঠাকুরকে মানবো না, রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণকে মানবো না। আমরা শুধু মানবো একটি কথা—"Men are born and remain free and equal in

rights. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to take part personally or by their representatives in its formation. No man can be accused, arrested or detained except in the cases determined by the law and according to the forms it has prescribed. Propety being a sacred and inviolable right, no one can be deprived of it unless a legally established public necessity evidently demands it under the condition of a just and prior indemnity."

কেদারবাবু সব দেখছিলেন আর মনে মনে হিষ্ট্রির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। সেই আমেরিকার ডিক্লেয়ারেশন অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আর ফ্রেঞ্চ রেভলিউশানের পর সাধারণ মানুষ তো বেশ ভালো করে ঠাঁই পেলো দরবারে। কিন্তু সব গুলিয়ে গেল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশান হয়ে। কাগজ এলো, ছাপাখানা এলো, টাইপরাইটার এলো, নোট ছাপানোর কল এলো, কাপড় বোনার মেশিন এলো, মোটর গাড়ি এরোপ্লেন এলো। রাজারা নেই বটে কিন্তু বড়লোকরা এলো। সাধারণ মানুষ আবার চাকর হয়ে পড়লো। মানুষ আবার নতুন করে নতুন জাতের বড়লোকদের দাসত্ব করতে শুরু করলো। তার পরে এলো যুদ্ধ। তার পরে এলো আর এক নতুন সমস্যা। তখন সবাই বলতে লাগলো—Government is of the rich, by the rich and for the rich.

এতক্ষণে কেদারবাবু মুখ খুললেন। বললেন—আমি তোমাকে বলেছিলুম সদাব্রত, তুমি মোটে মানতে চাও নি!

সদাব্রত তখন ভিড়ের মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করলে—কী বলেছিলেন?

কেদারবাবু বললেন—তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না,—তোমাকে বলি নি কালে এইট্টিন টুভে লুই ব্লাঙ্ক এই কথাই বলে গিয়েছিল—Government is of the rich, by the rich and for the rich.

—আপনি থামুন।

—থামবো কেন? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি? হিষ্ট্রির বইটা যে নিয়ে আসি নি, নইলে তোমাকে আমি দেখাতে পারতুম—

বলে হঠাৎ বুড়ির দিকে ফিরে নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ মা, বলো তো, কেন তুমি চুরি করতে গেলে?

হয়ত পুলিস-ইন্‌স্পেক্টরই আপত্তি করতো। কিন্তু তখনই টেলিফোনে ওপরওয়ালার কাছ থেকে অর্ডার এসে গেল। মনিব্যাগ, মনিব্যাগের টাকা, টিকিট সমস্ত রেকর্ড রেখে যার জিনিস তাকেই ফিরিয়ে দাও। ট্রেন ছাড়তে হবে এখুনি। আর দেরি করা নয়।

সেদিন পুরী এক্সপ্রেস দু'ঘণ্টা লেট্-এ ছাড়লো হাওড়া স্টেশন থেকে।

জি-আর-পি থানার ইন্‌স্পেক্টর থানার ডায়েরী বইতে লিখে রাখলো—এ কেস অব পিক-পকেটিং অব ডেয়ারিং নেচার।

তার পর থানার লক-আপের মধ্যে আসামীকে পুরে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলে কনস্টেবল। আসামীর কান্নার আওয়াজ বাইরে থেকে আর শোনা গেল না। নিশ্চিন্ত মনে ইন্‌স্পেক্টর একটা সিগারেট ধরালো। এভরিথিং অলরাইট ইন দি স্টেট্ অব ডেনমার্ক!

পরদিন ভোরবেলাই ট্রেনটার পুরী পৌঁছোবার কথা। পৌঁছেছে নিশ্চয়ই। প্রতিদিনের মত ভোরবেলাই উঠেছে সদাব্রত। তার পর যথারীতি ঘড়িটা দেখেছে। কলকাতা শহরের ভোর শুরু হয় রাত বারোটার পর থেকে। আর রাত শেষ হয় রাত বারোটার সঙ্গে সঙ্গে। সেই রাত বারোটার সময়েই খবর আসে মেক্সিকো থেকে, পেরু থেকে, নিউ-ইয়র্ক থেকে, লণ্ডন থেকে, বম্বে থেকে, দিল্লী থেকে। সেই খবর রোটারী মেসিনে ছাপিয়ে ঠিক সময়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া চাই। যাতে ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠবার আগেই সকালের ব্রেকফাস্টের টেবিলে সে-কাগজ হাজির থাকে। নিউ-ইয়র্কের বুলিয়ন মার্কেটের লেটেস্ট-প্রাইস ঘুম থেকে উঠেই জানা চাই। ম্যাড্রাসের টার্ফ-ক্লাবের লাস্ট-রেসের রেজাল্ট না জানলেও চলবে না। আয়রন, স্টীল, জুট, অ্যালুমিনিয়ম সবগুলো শেয়ারের তেজি-মন্দির খবরটা না-জানলে ব্রেকফাস্টই হজম হবে না। শেয়ার মার্কেট আর হর্স-রেস এই দুটো দেখার পর তখন পলিটিক্স্। কোথায় কোন্ মিনিস্টার কী লেকচার দিলে। কোন্ ডেপুটি মিনিস্টার কোন্ কান্ট্রিতে স্টেট-ভিজিটে গেল। কোন্ গভর্নর কোথায় কোন্ কনফারেন্স ওপ্‌ন্ করলো। এগুলো ভোরবেলাই সকলের জানা দরকার। এ না জানলে তুমি ব্যাক-ডেটেড। ষোল নয়া-পয়সা ট্যাক্স না দিলে তোমাকে এ-পৃথিবীর কালচার্ড

মানুষ বলে মনে করবো না। তার পর তুমি খেতে পেলে কি না-পেলে তা দেখবার দায়িত্ব নেই আমার। তখন তুমি তোমার নিজের ধান্দায় ঘোর।

মিস্টার বোস আজ বহু বছর ধরে সকালবেলাটা এই করেই কাটিয়েছেন। তাঁর উন্নতির মূলেও এই খবরের কাগজ। ষোল নয়া-পয়সার ট্যাক্স দিয়ে দিয়ে তিনি আজ ষোল মিলিয়ন টাকার মালিক। যখন দেখেছেন বুলিয়ন মার্কেটের দর সস্তা তখন কিনেছেন। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর, তাই কখনও ঠকতে হয় নি। পোলিটিক্যাল লিডারদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। লেটেস্ট খবরা-খবর রেখেছেন। আর বিষয়বুদ্ধি খাটিয়ে সে-টাকা ইনভেস্ট করেছেন। আর কার জামাইকে চাকরি দিলে তাঁর ইনভেস্টমেণ্টে সেন্ট পার্সেণ্ট প্রফিট আসবে, কার ছেলেকে প্রমোশন দিলে স্টীলের পারমিট পেতে সুবিধে হবে তা এই খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই ঠিক করে ফেলেছেন। এ-ব্যাপারে তাঁকে জীবনে কখনও ঠকতে হয় নি।

তিনি বলতেন—ব্লাডে কোনও ডিফেক্ট থাকলে মানুষ পোয়েট হয় কিংবা ফিলজফার হয়—

তিনি বলতেন—জেসাস ক্রাইস্টের ব্লাডে নিশ্চয়ই কিছু ডিফেক্ট ছিল, যেমন ছিল মহাত্মা গান্ধীর—

তিনি বলতেন—যারা সাকসেসফুল ম্যান তারাই হলো আসলে মানুষ, আর বাকি সবাই অ্যানিম্যাল—

কলকাতার সমস্ত সাধারণ মানুষকে তিনি অ্যানিম্যাল বলে মনে করতেন। জানোয়ার। যেমন গাছপালা মরলে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তেমনি সাধারণ মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিয়েও তিনি মাথা ঘামাতেন না। যে-সব খবরের কাগজে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী কিংবা না-খেতে পেয়ে বেকার যুবকের সুইসাইডের কাহিনী, অথবা মাইনে বাড়াবার দাবিতে স্ট্রাইকের খবর ছাপা হয়, সে-সব খবরের কাগজ তিনি ছুঁতেন না। তাঁর সেক্রেটারি কেবল আইসেনহাওয়ার, চার্চিল, নেহরু, কৃষ্ণমেনন, অতুল্য ঘোষ, বি. সি. রায় আর প্রফুল্ল সেনের খবর পড়ে শোনাতো।

সেক্রেটারি যদি জিজ্ঞেস করতো—একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কাল কলকাতায়, পড়বো স্যার?

—কিসের অ্যাক্সিডেন্ট?

—একটা রিফিউজী-গার্লকে কাল গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়ে রেপ করেছে—

বিরক্ত হতেন মিস্টার বোস। বলতেন—লিভ ইট, ওটা থাক—আর কি আছে? হোয়াট্ নেক্স্ট?

—স্যার, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে কালকে—পড়বো?

—ইয়েস ইয়েস, ইউ মাস্ট্, কোথায় হলো? কার সঙ্গে? কে কে ইন-ভাইটেড্ গেস্টস্ ছিল?

সকালবেলার এই খবরের কাগজ, তার পর দুপুরবেলার ফ্যাক্টরী। একটা আর একটার করোলারি। তার পর রাত। রাতটা সব কিছু ভুলে থাকবার জন্যে। রিল্যাক্স করবার জন্যে। তখন ক্লাব, তখন অ্যালকোহল, তখন ট্রাঙ্কুইলাইজার। তখন ক্রসওয়ার্ড-পাজল, তখন রিডার্স ডাইজেস্ট, তখন ইভস্ উইক্লি।

আগের দিন এই ডিনারের সময় সদাব্রত আসতে পারে নি। ক্লাবেও আসে নি।

—কেন? আসতে পারে নি কেন?

মনিলা বলেছিল—কোথায় কাজ আছে বলছিল—

—কী কাজ? কী কাজ থাকতে পারে তার? কেন তুমি ছাড়লে তাকে মনিলা? অফিস ছাড়া আর কী কাজ থাকতে পারে? আর কাজ থাকলেও তুমিও সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। সদাব্রত কোথায় যায় তোমারও জানা দরকার। তুমি জিজ্ঞেস করো নি তার কোথায় কাজ?

তার পরদিন অফিসে যেতেই মিস্টার বোস ডেকে পাঠিয়েছিলেন সদাব্রতকে।

—কোথায় গিয়েছিলে কাল তুমি?

সদাব্রত প্রশ্নটা শুনে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তাঁকে কি তার দৈনন্দিন কাজের জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?

—কালকে তুমি ক্লাবে যাও নি, মনিলা বলছিল।

—কাল হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলুম একজনদের সী-অফ করতে।

—ও, তাই বলো! তুমি যাও নি বলে মনিলা বড় লোনলি ফীল করছিল। তুমি তো জানো মনিলা আমার খুব সেন্সিটিভ মেয়ে, খুব টাচি—তা আজ ক্লাবে যাচ্ছো তো?

—যাবো—

এরই নাম বোধ হয় চাকরি। এই চাকরির জন্তেই শম্ভু বিনয় সবাই বহুদিন থেকে তাকে ঈর্ষা করে। এই চাকরি আছে বলেই সমাজে তার এত খাতির। সবাই জানে সদাব্রত গুপ্ত গাড়ি চালিয়ে অফিসে যায়। বাসে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে তাকে যেতে হয় না। সবাই জানে তার আর্থিক অবস্থা। অথচ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে গিয়ে যে তাকে তার দৈনন্দিন কাজের জন্তে কৈফিয়ত দিতে হয়, তা কেউ জানে না। কেউ জানে না ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মেয়েকে নিয়ে বিকেলবেলা বেড়াতে যেতে হয়। তাঁর মেয়ের কুকুরকেও আদর করতে হয়। চাকরি নেবার পর তার দিনের বেলার স্বাধীনতা চলে গিয়েছিল, এখন সন্ধ্যাবেলার স্বাধীনতাটুকুও চলে গিয়েছে। আগে অনেক সময় রাস্তায় গাড়িটা রেখে ঘুরে বেড়াত সদাব্রত। মানুষ দেখতো ঘুরে ঘুরে। কেমন করে মানুষের দল পিল-পিল করে রাস্তায় বেরোয়। ছোট-ছোট ঘর, ছোট-ছোট আয়তন। সারাদিন বদ্ধ ঘরের মধ্যে থেকে থেকে তাদের দম আটকে আসে। তখন শাড়ি ব্লাউজ ট্রাউজার শার্ট পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। নিজেদেরও দেখায়, সকলকে দেখাও হয়। তখন মনিলাকে পাশে নিয়ে বেড়াতে বেরোতে হয় সদাব্রতকে।

অনেকদিন চলতে চলতে সদাব্রত জিজ্ঞেস করেছে—কোন্ দিকে যাবে আজকে ?

মনিলা কখনও বলেছে—চলো নিউ মার্কেটে যাই—

আবার কখনও বলেছে—চলো লেকে যাই—

গাড়ির ট্যাঙ্কে অফুরন্ত পেট্রল আছে, পকেটে অঢেল টাকা আছে, সামনে অনন্ত অবসর। মনিলার আশ মেটে না। দেখেও আশ মেটে না, দেখিয়েও আশ মেটে না। কেবল মনে হয় পৃথিবীটা বুঝি হাত পিছলে পালালো। ধরো, ধরো। পৃথিবীটাকে নিংড়ে সব সুখটুকু আদায় করে ছেড়ে দাও।

তার পর আবার আছে সিনেমা। আমেরিকা থেকে ম্যানুফ্যাকচার হয়ে আসা যৌবনকে হাতের নাগালে এলে ফস্কে পালাতে দেবো না। বলে—চলো মেট্রোতে—

তার পর আবার সব একঘেয়ে লাগে মনিলার। তখন আবার ক্লাবে। ক্লাবে গিয়ে আবার সেই কিটি, আবার সেই ড্রাই জিন।

মনিলা বলে—কলকাতাটা আর ভাল লাগে না—

সদাব্রত জিজ্ঞেস করে—কেন ? ভাল লাগে না কেন ?

মনিলা বলে—একটা ভাল সিনেমা আসছে না, একটা ভাল পার্টি হচ্ছে না—লাইফটাই ভাল্ হয়ে গেছে—

এর বুঝি শেষ নেই। এই ভালো না লাগার। আজকাল পেগীকেও আর ভাল লাগে না মনিলার।

সদাব্রত বলে—তা হলে তো একদিন আমাকেও ভাল লাগবে না তোমার?

—আমার কিছুই বেশিদিন ভাল লাগে না সদাব্রত! আমার কাছে দু'দিনেই সব পুরোনো হয়ে যায়, আমি কী করবো বলো?

—তা হলে আমাকে কেন বিয়ে করছো মিছিমিছি?

—বা রে, বিয়ে করলেই ভালো লাগতে হবে সারা জীবন? এমন কিছু কনট্র্যাক্ট্ আছে?

—তাহলে তো তোমাকে বিয়ে করলে বিপদের কথা!

মনিলা হেসে উঠলো—বা রে, বাবা তো মাকে বিয়ে করেছে, কিন্তু কই মা'র তো বাবাকে ভাল লাগে না মোটে, দিনরাত দু'জনে ঝগড়া, বাবা যে-ঘোঁড়া মা'কে খেলতে বলে মা সে-ঘোঁড়া খেলবে না—

—তোমার বাবা-মার কথা ছেড়ে দাও, তুমি তো এ-যুগের মেয়ে!

—কিন্তু আমি তো বললুম, আমি কী করবো? আমার কাছে সব জিনিস পুরোনো হয়ে যায়—। এই কলকাতাই আমার কাছে পুরোনো হয়ে যায় বলে আমি মাঝে-মাঝে বাবার সঙ্গে বাইরে চলে যাই। আবার কখনও কখনও এই ইণ্ডিয়াও পুরোনো হয়ে যায়—!

সদাব্রত জিজ্ঞেস করে—কেন পুরোনো হয় ভেবে দেখেছ কখনও?

—তা ভাবি নি। কিন্তু ভালো লাগে না! কিছুই ভালো লাগে না। ড্রিঙ্ক করি, কিন্তু আগে ড্রিঙ্ক করে যেমন ভালো লাগতো এখন আর তেমন ভালো লাগে না। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে তাই খাই—!

তার পর হঠাৎ একটু থেমে বললে—আচ্ছা, কেন আমার এমন হয় বলো তো?

সদাব্রত বললে—বল্‌বো?

—সত্যি বলো না?

—তুমি রাগ করবে না তো?

—না!

সদাব্রত বললে—বেশি টাকা হলে এই রকমই হয়। তোমার বাবার একটু

কম টাকা থাকলে তোমার পক্ষেও ভালো হতো, তোমার মা'র পক্ষেও ভালো হতো! তোমার বাবা-মা'র মধ্যে মিল থাকতো—

—কিন্তু আমি যে গরীবদের দেখতে পারি না। আমার বড় ঘেন্না করে!

—কেন, ঘেন্না করে কেন? তুমি গরীব কখনও দেখেছ?

—দেখেছি, আমার আয়াকে দেখেছি। খুব গরীব সে। আমি তাকে দেখতে পারি না।

সদাব্রত বললে—চলো, তোমাকে গরীব লোকদের পাড়ায় নিয়ে যাই—

বলে সদাব্রত গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য রাস্তায় ঢুকলো।—এর নাম টালিগঞ্জ! এই দেখ ছোট-ছোট বাড়ি। এখানে এক-একটা ঘরে ছ-সাতজন মানুষ শোয়। ওই রাস্তার মানুষদের দিকে চেয়ে দেখ। ওরাও এই কলকাতারই লোক। ওরাও ট্যাক্স দেয়। তোমাদেরই মত ট্যাক্স। কিন্তু তোমাদের জন্যে গভর্মেণ্ট যে সুখ-সুবিধে দিচ্ছে ওদের তা দেয় না। ওদেরও বিয়ে হয়, ওদেরও ছেলে-মেয়ে হয়, ওরাও ভালবাসে, ওরাও তোমার আমার মত মানুষ!

মনিলা জীবনে কখনও এ-কলকাতা দেখে নি। দেখেছে চৌরঙ্গী, দেখেছে পার্ক কর্নার, দেখেছে এলগিন রোড। আরো দেখেছে নিউ মার্কেট, দেখেছে গ্র্যাণ্ড আর গ্রেট-ইস্টার্ন আর স্পেনসেস হোটেল। কিন্তু কালীঘাট দেখে নি, বউবাজার দেখে নি, চিৎপুর জোড়াসাঁকো দেখে নি।

—ওরা কারা? ওই সব মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে?

—ওরা প্রস্‌টিটিউটস্‌। ওদের বলে বেশ্যা। টাকার জন্যে ওরা নিজেদের ভাড়া খাটায়!

মনিলা মাথা বেঁকিয়ে ভাল করে আবার চেয়ে দেখলে। রং-মাখা মুখে বাড়ির বারান্দায় গলির মুখে সবাই দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দিকে চেয়ে।

—হাউ ফানি! কিন্তু ওরা বিয়ে করলেই পারে?

—ওদের বিয়ে হয় না।

—কেন হয় না?

সদাব্রত বললে—ওদের না-পুষলে গভর্মেণ্ট অচল হয়ে যাবে।

—কেন?

—সে তোমার জেনে দরকার নেই। ওই দেখ বস্তি, আফ্রিকার জঙ্গলেও মানুষ এর চেয়ে বেশি আরামে থাকে।

—ওরা অত ময়লা কাপড় পরে কেন? ওরা জামা-কাপড় ড্রাইং-ক্লিনিং-এ দিতে পারে না?…

সদাব্রত দিনের পর দিন মনিলাকে সমস্ত কলকাতাটাই দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো। বললে—আরো দেখবে?

—এও কলকাতা?

—আরো যদি দেখতে চাও দেখাতে পারি। দেখবে এ-কলকাতা অ্যারেবিয়ান নাইটস্‌-এর চেয়েও বেশি ইণ্টারেস্টিং। তোমার মত চৌ-এন-লাই, ক্রুশ্চেভ, কুইন এলিজাবেথও এই কলকাতায় এসে এ-কলকাতা দেখে নি। তোমাদের এ-কলকাতা দেখতে নেই। তোমার বাবাও তোমাকে তাই এ-কলকাতা দেখায় নি—

—কিন্তু এ দেখে আমার লাভ কী হলো?

—যে-দেশটায় তুমি জন্মেছ সেই দেশটাকেও তুমি জানবে না? তোমাদের বাড়িতে যে-খবরের কাগজ আসে তাতে তো এ-কলকাতার খবর থাকে না। তুমি যে রিডার্স ডাইজেস্ট পড়ো, যে ইভস্‌ উইক্‌লি পড়ো, তাতেও তো এ-মানুষগুলোর কথা থাকে না।

—চলো, চলো এই গরীবলোক দেখে দেখে আমার মাথা ধরে গেছে। আজ দু' পেগ জিন খেতে হবে দেখছি। কেন তুমি এ-সব দেখালে আমাকে? এত ধোঁয়া এখানে, এত নর্দমা, এখানে মানুষ থাকতে পারে?

—তুমি যে বললে—তোমার কলকাতা একঘেয়ে লেগে গেছে তাই দেখালুম। কাল আরো অনেক জায়গা দেখাবো তোমাকে। দেখাবো কাদের টাকায় কলকাতায় রাস্তা তৈরী হয়েছে, কাদের তৈরী রাস্তার ওপর আমরা গাড়ি চালিয়ে যাই, সেই সব মানুষদেরও দেখাবো—

—তুমি দেখছি বড্ড বড়লোক-হেটার। বাবা কি ওদের ঠকিয়ে বড়লোক হয়েছে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সদাব্রত বললে—চলো, আর নয়, এবার ক্লাবে চলো, এসব আমাদের দেখতে নেই, কারোর দেখতে নেই। চৌ-এন-লাই, ক্রুশ্চেভ, কুইন এলিজাবেথ, আইসেনহাওয়ার, কেনেডি যে-কেউ কলকাতায় আসবে তাদের আমরা এসব দেখাবো না। দেখলে তারা আমাদের গরীব ভাববে, আমাদের পিটি করবে। ভাববে কংগ্রেস-গভর্মেণ্ট এই তেরো-চোদ্দ বছরে কিচ্ছু দেশের কাজ করে নি। তার চেয়ে আমরা তাদের চণ্ডীগড় দেখাবো,

তাথরা নাঙ্গাল দেখাবো, হীরাকুঁদ, ডি-ভি-সি দেখাবো, রাজঘাটে নিয়ে গিয়ে গান্ধীর চিতার ওপর দু'শো টাকা দামের ফুলের মালা দেবার সময় ফোটো তুলে নেবো। নিয়ে সেই ফোটো ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমাদের ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবো। সকলকে দেখিয়ে বলবো—ছাখো, সবাই কেমন ইণ্ডিয়ার ফ্রেণ্ড—

—আজকে কোন্ দিকে গিয়েছিলে তোমরা ?

মিস্টার বোস ডিনারের পর চুরোট টানতে টানতে গসিপ্ আরম্ভ করলেন।

এ নিত্য-নৈমিত্তিক। শুধু কাল হাওড়া স্টেশনে যাওয়ায় একদিনের জন্তে বন্ধ ছিল। সদাব্রত এখান থেকে সোজা বাড়ি চলে যাবে। তার পর গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

মিস্টার বোস বললেন—আজ পেপারে দেখছিলুম মিসেস পণ্ডিতের মেয়ের বিয়ে হলো, ক্যালকাটা থেকে কে কে ইনভাইটেড হয়েছিল জানো তুমি ?

১৭৮১ সালের সেই সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম ঘোষণা হয়েছিল আমেরিকাতে। তার পর ফরাসী বিদ্রোহের সময় ওদেশের রাজা-রাজড়া-দের সবাইকে সমূলে বিদায় নিতে হয়েছিল পৃথিবী থেকে। সবার উপর মানুষ সত্য—একথা সেইদিনই কাগজে-কলমে সকলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মেশিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা কবর থেকে উঠে এলো। তারা মরে নি। লুই-দ্য-ফোরটিনথ্ মরে গিয়ে আবার রকফেলার, হেনরি ফোর্ড, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, ডালমিয়া হয়ে বেঁচে উঠলো। বললে—Government is of the rich, by the rich and for the rich.

এলগিন রোডের মিস্টার বোসের বাড়ির সামনে দরোয়ান তখন চীৎকার করে উঠলো—কৌন হ্যায় ?

তার পর ভাল করে নজর করে দেখলে একজন জেনানা।

—কেয়া মাংতা ?

কুন্তি অনেকবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে। বড়লোকের

পাড়া। সকালবেলা হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে চাকরের কাছে শুনে এসেছিল সদাব্রতবাবু অফিসে চলে গেছে। তার পর বিকেলবেলাও গিয়ে শুনেছে অফিস থেকে আসেনি সদাব্রতবাবু।

কুন্তি জিজ্ঞেস করেছিল—কখন আসবেন বাবু?

বদ্যিনাথ বলেছিল—আসতে সেই রাত দশটা—

—সন্ধ্যেবেলা কোথায় থাকেন?

বদ্যিনাথ বলেছিল—সন্ধ্যেবেলা এলগিন রোডে বোস সাহেবের বাড়িতে থাকেন—

আর বেশি বলতে হয় নি। কুন্তি বুঝে নিয়েছিল স্থভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এর মিস্টার বোসের বাড়ি। ঠিকানাটাই শুধু জানতো। কিন্তু যায় নি কখনও। তবু আজ বোনের জন্যে সেই ঠিকানাতেই যেতে হলো। এতদিন এত অপমান করেছে কুন্তি, আবার আজ তারই কাছে ক্ষমা চাইতে যেতে হচ্ছে। এর চেয়ে লজ্জা আর কী-ই বা হতে পারে! তবু লজ্জার মাথা খেয়ে আজ তাকে তা-ই করতে হবে। সারা দিন ভালো করে খাওয়া হয় নি। আগের দিন সমস্ত রাত ঘোরাঘুরি করে ঘুমও হয় নি। মাথাটা কামড়াচ্ছে। রাত জাগার অভ্যেস আছে কুন্তির। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে, থিয়েটারের স্টেজে অনেক রাত সে জেগেই কাটিয়েছে। তবু এমন করে কখনও মাথা ধরে নি তার।

শাড়িটাকে ভালো করে গায়ে জড়িয়ে গেটের কাছে গিয়েও অনেকবার দ্বিধা করেছে। যদি দরোয়ান তাড়িয়ে দেয়! বড়লোকের বাড়ি। যদি অপমান করে কথা বলে!

কেমন করে গিয়ে কথা বলবে দরোয়ানের সঙ্গে, সন্ধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথাটাই কেবল ভেবেছে।

তার পর হঠাৎ মনে হলো একখানা গাড়ি আসছে। এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই দরোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দিলে। অন্ধকারে দেখা গেল ভেতরে সদাব্রত বসে আছে, আর তার পাশে সেই মেয়েটা। গাড়িটা ভেতরে গাড়ি-বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালো। দু'জনে নামলো। নেমে ভেতরে চলে গেল।

দরোয়ানটার মুখ দেখে প্রথমে ভয়ই পেয়েছিল কুন্তি। তার পর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—সদাব্রতবাবু হ্যায়?

—কেয়া মাংতা ?

—সদাব্রতবাবু, আভি যো বাবু গাড়িমে আয়া, ও বাবুকো থোড়া বোলানা—

দরোয়ান একবার আপাদমস্তক দেখে নিলে কুন্তির। তার পর কী ভেবে ভেতরে খবর দিতে গেল। হয়ত মেয়েমানুষ দেখে দয়া হয়েছে তার। মেয়ে-মানুষ হওয়ার এই সুবিধে। সুবিধেও যেমন আছে, অসুবিধেও তেমনি।

—কৌন্ হায় ? কাকে চাই ? কে তুমি ?

কুন্তি দেখলে পোর্টিকোর তলায় সেই মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে। কুন্তি গেটের ভেতর ঢুকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল সেইদিকে। মোরাম ছড়ানো রাস্তা। দুর্-দুর্ করে বুকটা কাঁপছে তখনও।

—আমি সদাব্রতবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—তুমি কে ?

—আমার নাম বললে আপনি চিনবেন না। আমার বোনের জন্যে আমি এসেছি। আমার বোনকে পুলিসে ধরেছে, সেই ব্যাপারেই সদাব্রতবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলবো।

—কিন্তু সদাব্রতর সঙ্গে দেখা করতে চাও তো এখানে কেন ? তার নিজের বাড়ি নেই ?

কুন্তি বললে—তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিলুম, তাঁর চাকর এখানে আসতে বললে। বললে—সন্ধ্যেবেলা তিনি এখানেই থাকেন—

মনিলা বললে—না, এখানে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করবে না—

—কিন্তু তাঁকে একবার খবরটা দিন না আপনি—

—সে এখন এখানে নেই।

—কিন্তু আমি যে দেখলুম তিনি এখুনি এলেন! আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, আমি যে নিজের চোখে এখুনি দেখলুম তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে—

মনিলা আর থাকতে পারলে না। চীৎকার করে উঠলো—তুমি বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে, নিকালো, নিকাল যাও—

—আপনি তবু মিথ্যে কথা বলছেন ?

—দরোয়ান, নিকাল দো ইস্‌কো, বেওকুফ্ বেতমিজ, ইজ্জৎ রেখে কথা বলতে জানে না, শির প্যাকাড়কে নিকালো ইস্‌কো—নিকাল দো সামনেসে—

কুন্তি হঠাৎ নিচু হয়ে মনিলার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে গেল। বললে—

আপনি জানেন না আমার কী বিপদ চলছে, আমার বোন জেলখানায়, আমার মাথার ঠিক নেই, আপনি…

কিন্তু মিস্টার বোসের বাড়ির দরোয়ান বড় সাধারণ দরোয়ান নয়। বড় প্রভুভক্ত। ততক্ষণে সে এসে একেবারে কুন্তির চুলের মুঠি ধরে ফেলেছে।

—বাহার নিকালকে গেট্ বন্ধ্ কর দো—

এবার কুন্তি নিজেই সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার চোখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছে তখন। গায়ের শাড়িটা সামলে নিয়ে মাথার খোঁপাটাও ঠিক করে নিলে। চটিটা পা থেকে খুলে গিয়েছিল, সেটা পায়ের ভেতরে গলিয়ে নিলে।

মনিলার মাথার ভেতরে তখন ড্রাই জিন্ ক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে।

—নিকাল দো, বাহার রাস্তামে নিকাল দো—

কুন্তির মনে হলো বিশ্ব-সংসারে যদি কোথাও কোনও অবলম্বন থাকতো তা হলে সেখানে গিয়েই আজ সে আশ্রয় নিতো। এতদিনকার সমস্ত প্রতিরোধ যেন প্রতিশোধ হয়ে তার আত্মাকে আঘাত করেছে। এত প্রতিকার সে কেমন করে করবে? কে আছে তার? সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন তার অপমানে বেশ মজা পেয়ে গিয়েছে। তার দিকে চেয়ে যেন সবাই হো হো করে হেসে উঠলো—বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, বড়লোকদের সঙ্গে আর বাহাদুরি করবে!

সমস্ত কলকাতা শহর তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট ছাড়া। শুধু পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটই বা বলি কেন? কলকাতা শহরে কি পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট একটা? সেই যেদিন ১৬৯০ সালে এই কলকাতার প্রতিষ্ঠা হলো, হয়ত সেইদিন থেকেই এরা আছে। এই কুন্তি, এই গোলাপী, এই দুলারী, এই টগর—এদের দল। এরা একদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের নিঃসঙ্গতা ভোলাবার জন্যে বাইজী হয়ে নেচেছে, এরাই আবার মহারাজ নবকৃষ্ণ মুন্সীর বাড়িতে দুর্গাপূজার আসরে বাবুদের গেলাসে মদ ঢেলে দিয়েছে। আজ এতদিন পরেও এরা বেঁচে আছে। এরাই কলকাতা শহর আজ জাঁকিয়ে রেখেছে। একদিন ছিল যখন বাঁধা এলাকায় এরা থাকতো। এখন পাড়ায় পাড়ায়

ছড়িয়ে গেছে এরা—পার্ক স্ট্রীট, পার্ক সার্কাস, কুইন্‌স পার্ক, বালিগঞ্জ সর্বত্র এরা ছেয়া বেঁধেছে। এদেরই আকর্ষণে বম্বে থেকে মিলিওনেয়াররা উড়ে এসে এদের এখানে রাত কাটিয়ে যায়। এক রাত এখানে কাটালে কেউ আর ভুলতে পারে না সেই স্মৃতি। বারে বারে তাদের আসতে হয় তাই এখানেই।

যে এখানে এসেছে সে-ই যাবার সময় বলে গেছে—ক্যালকাটা ইজ্‌ এ ল্যাভ্‌লি প্লেস্—

এখানে দুর্ভিক্ষ আছে, মহামারী আছে, মাছি আছে, মশা আছে, কলেরা বসন্ত সবই আছে। এখানে দারিদ্র্য আছে, চোর-গাঁটকাটা গুণ্ডা বদমাইস আছে। কী নেই এখানে? ১৯৪৭ সালের পর থেকে আকারে আয়তনে ডিগ্রিতে সমস্ত কিছু শুধু বেড়েই চলেছে। কিন্তু এ-ছাড়া অন্য জিনিসও আছে, উল্টো দিকটাও আছে। এখানে আছে অফুরন্ত মদ, অজস্র টাকা, অসংখ্য নারী আর অনন্ত অবসর। এখানে গানের জলসা হলে ভিড় ভেঙে পড়ে, পাড়ায় থিয়েটার হলে চেয়ার দিয়ে জায়গা কুলোয় না, বাঁদর-নাচ দেখতেও এখানে মানুষের কিউ লেগে যায়।

কেদারবাবু এই কলকাতারই লোক, মিস্টার বোসও এই কলকাতারই মানুষ। শিবপ্রসাদ গুপ্ত এই কলকাতারই লীডার, আবার কুন্তি গুহ এই কলকাতারই আর্টিস্ট্‌!

'সাহেব-বিবি-গোলামে', যে কলকাতার কথা লিখেছি, সে-কলকাতা ১৯১১ সালেই দিল্লি চলে গিয়েছিল। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর কলকাতা ব্রিটিশ এম্পায়ারের সেকেণ্ড সিটি কলকাতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট-এর পর সে-কলকাতাও ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল সেদিন রাত বারোটার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এ-কলকাতা একক-দশক-শতকের কলকাতা। আপনার আমার আর আরো অনেক লোকের হাহাকারের কলকাতা। চল্লিশ লক্ষ মানুষের দুঃখের আনন্দের পাপের পুণ্যের অভিশাপের আর অশ্রুজলের কলকাতা।

এ কলকাতায় কুন্তি গুহরা এই শহরেই বাস করে কিন্তু এই শহর তাদের আশ্রয় দেয় না। এ কলকাতার কেদারবাবুরা এই শহরেরই শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু এই শহর তাদের ভালবাসে না। এ-কলকাতার মিস্টার বোসেরা এই শহরেরই নুন খায়, কিন্তু এই শহর তাদের গুণ গায় না। সবাই এরা আউটসাইডার।

সদাব্রত থেকে শুরু করে বিনয় শম্ভু শৈল মনিলা সবাই এখানে বিদেশী। ট্রেনের রিটার্ন টিকিট কেটে সবাই এখানে এসে উঠেছে ধর্মশালায়, মেয়াদ শেষ হলেই এরা আবার চলে যাবে একদিন।

সুফলই সত্যি সুখী। সুফলকেই এদের মধ্যে সব চেয়ে সুখী বলে মনে হয় কুন্তির।

সুফল বলে—ছুটো দিন টগরদি, ছুটো দিন শিঙে ফুঁকেই কাটিয়ে দেবো—তার পর কখনও বলে—জানো টগরদি, সব বেটার ক্যারেকটার খারাপ হয়ে গেছে, দোষ করেছি শুধু তুমি আর আমি—

তার পর হঠাৎ কুন্তির দিকে চেয়ে বলে—কী হলো তোমার, আজ ঘরে ধুনো-গঙ্গাজল দেবে না?

—না রে সুফল, মনটা ভাল নেই—

—আরে, তুমি দেখছি হাসালে! মন আবার কবে কার ভাল থাকে? একটু দিশি মাল গলায় ঢেলে দাও, দেখবে মন বেটা বেশ জব্দ হয়ে গেছে—

—না রে, বোনটার জেল হয়ে গেল আজ!

সুফল যে সুফল সেও প্রথমটা শুনে একটু চমকে গেল। তার পর হঠাৎ বুড়ো আঙুল আর সামনের আঙুলটা দিয়ে একটা তুড়ি মারলে। বললে—তা হলে তো কেল্লা ফতে টগরদি—কেল্লা একেবারে ফতে—

—ঠাট্টা নয়, আমার আর কিচ্ছু ভালো লাগছে না রে!

সুফল বললে—তুমি ওপরে যাও দিকিনি, ওপরে যাও, আমি দাওয়াই দিয়ে দিচ্ছি—

কুন্তি বললে—না ভাই সুফল, আমি চললুম—

—আরে, ঘরে বসবে না তো এ-পাড়ায় এসেছিলে কেন?

—কী করবো? কোথায় যাবো? সারাদিন তো কোর্টে ছিলুম, বুড়ি খুব কাঁদছিল, পুলিসরা ধরে নিয়ে চলে গেল। ভাবলুম কোথায় যাই এখন? বাড়িতে গিয়েও তো থাকতে পারবো না, তাই এখানে চলে এলুম—মা'কে সব বললুম, এখন চলে যাচ্ছি—

—কিন্তু সেই তো বাড়িতেই যেতে হবে শেষকালে।

—তা আর তো কোনও চুলোয় জায়গাও নেই আমার যাবার—

সুফল বললে—তা এখানে থাকো না, এই পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে, কাউকে ঘরে বসাতে ভালো না লাগে তো ঘরের আলো নিবিয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে

থাকো, আমি তোমায় গরম পরোটা করে খাওয়াবো—পয়সা দিতে হবে না তোমায়—

কুন্তি কী যেন ভাবছিল।

সুফল বললে—মাইরি বলছি আজকে পয়সা দিতে হবে না তোমায়, আমি তোমাকে এমনি খাইয়ে দেবো—

কুন্তি হাসলো। বললে—দূর, এই বাসটা এলেই উঠে পড়বো, আর পারছি না—

সারা দিন কোর্টের মধ্যে কেটেছে। উকীলে মুহুরীতে পেয়াদায় পেস্‌কারে একেবারে হাড় মাস সব জ্বালিয়ে খেয়েছে। কতটুকু শক্তি আছে কুন্তির। কতটুকু ক্ষমতা আছে তার। যতদিন মামলা চলেছে ততদিন কোর্টে গিয়ে টাকার শ্রাদ্ধ করেছে সে। পান খেতে, ডেমি লিখতে, একগ্লাস জল পর্যন্ত পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয়েছে, এমন জায়গা।

সদাব্রতও সাক্ষ্য দিতে এসেছিল।

একবার মনে হয়েছিল গিয়ে বলে তাকে সমস্ত। তার নিজের বোনের কথা, তার নিজের কথা। দূর থেকে সদাব্রতকে দেখে অনেকবার মনে হয়েছিল মামলা তুলে নেবার কথা বলবে। এবার আপনি আমাকে শুধু একবারের জন্যে বাঁচান। আমি আপনাকে যা কিছু বলেছি সব কিছুর জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাই আজ।

—তুমি কেন চুরি করেছিলে?

—আমার টাকার অভাব হয়েছিল—

—তুমি জানো চুরি করা পাপ?

—জানি।

কুন্তি উকিলবাবুর কাছে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে—উকিলবাবু, কী হবে মনে হচ্ছে? আমার বোনের কি জেল হয়ে যাবে?

উকিল বলেছিল—দাঁড়াও না মা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি—

—ওদের যদি গিয়ে বলি মামলা তুলে নিতে তো মামলা বন্ধ হয়ে যাবে না?

—কাকে তুলে নিতে বলবে?

—ওই ওদের যে প্রধান সাক্ষী, ওর সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। আমি ওকে গিয়ে বলবো? আপনি যদি বলেন তো বলি—

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তখন সদাব্রত সেদিন যা যা ঘটেছিল সমস্ত বলে চলছে। কেমন করে ওয়েটিং-রুমের ভেতর থেকেই মেয়েটা তাদের সঙ্গ নিয়েছিল। কেমন করে সকলের অসাক্ষাতে তার পকেট থেকে তার মনিব্যাগটা তুলে নিয়েছিল। দিনের আলোর মত পরিষ্কার ভাষায় একটার পর একটা ঘটনা বলে গিয়েছিল সদাব্রত। কেউ জানতো না, কেউ টেরও পায় নি, কারো জানবার কথাও নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় দিদিমণির কাছে পড়েছে বুড়ি, এইটেই কুন্তি বিশ্বাস করেছে। রোজ রাত্রে বাড়ি ফিরে গিয়ে যতদিন কুন্তি জিজ্ঞেস করেছে ততদিন বুড়ি কেবল মিথ্যে উত্তর দিয়েই দিদিকে ঠকিয়েছে। আজ জলের মত সব স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রতি মাসে দিদিমণিকে চল্লিশটা করে টাকা দিয়ে এসেছে, সে কি এই জন্যে? কোর্টের ভেতর বসে বসে উকিলের জেরার মুখে বুড়ি কিছুই আর চেপে রাখতে পারলে না। বোকা মেয়ে, পৃথিবীটাকে এখনও ভালো করে চিনতে পারে নি। উকিলের জেরায় গড়-গড় করে সব বলে গেল। হয়ত ভেবেছিল নিজের দোষ স্বীকার করলে, সব অপরাধ মাথায় পেতে নিলে, পৃথিবী তাকে ক্ষমা করবে। হয়ত ভেবেছিল অনুতাপের কদর দেবে ধর্মাধিকরণ!

কিন্তু না। সদাব্রত অকাট্য সাক্ষ্য দিয়ে কুন্তির সমস্ত চেষ্টা বানচাল করে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল কোর্ট থেকে। দূরে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কুন্তি শুধু অসহায়ের মত সেই দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো শুধু।

—তা হলে কী হবে উকিলবাবু?

—আজকের দিনটা দেখ না মা, কালকে তো রায় বেরোবে! তার পরে আপীল তো আমার হাতে—

পরদিনই রায় বেরোলো। কী যেন একটা সেকশান, সেই ধারায় ছ'মাসের মেয়াদ হয়ে গেল বুড়ির। শাস্তি গুহর। কলকাতা শহর নিরাপদ হলো, নিরুপদ্রব হলো। আর ভয় নেই। এবার কলকাতার ভদ্রসন্তানেরা নির্বিঘ্নে শহরে ঘোরা-ফেরা করতে পারবে। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের চূড়ান্ত ধারায় শান্তি গুহকে চালান দিয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া নিশ্চিন্ত হলো।

—তার পর?

কুন্তি বললে—তার পর আজ রায় বেরোলো সুফল। কাল রাত্তিরেও আমার ঘুম হয় নি, আজ সকাল থেকে সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, খাওয়া-দাওয়া কিচ্ছু হয় নি, এখন আর বাড়িতে যেতেও ইচ্ছে করছে না—

—না না, তুমি বাড়ি যাও টগরদি! ও তুমি ভেবে কী করবে! ও আপীল করে কিছু হবে না। দেখবে জেলে গিয়ে তোমার বোনের চেহারা ফিরে যাবে। আমার নিজের তো জেলে গিয়ে আড়াই সের ওজন বেড়ে গিয়েছিল—তুমি কিছু ভেবো না—

রাস্তার দিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ যেন সামনে ভূত দেখলে কুন্তি।

কে? ও কে?

সুফলও চেয়ে দেখলে—ওই গাড়িটা দেখছে টগরদি!

কুন্তির কানে কথাগুলো ঢুকলো না। অন্ধকারে অল্প-আলোয় ট্রাম-রাস্তার ওপর ঝক্‌ঝকে একখানা গাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। ভেতরে বসে গাড়ি চালাচ্ছে সদাব্রত আর তার পাশে বসে মিস্টার বোসের সেই মেয়েটা। উঁচু খোঁপা। রং-মাখা মুখ। গাড়ি চালাতে চালাতে সদাব্রত বুঝি আশে-পাশের বাড়িগুলো দেখাচ্ছে, আর মেয়েটা হাঁ করে শুনছে।

—ওই গাড়িটা চেনো নাকি তুমি টগরদি!

কুন্তি তখনও সেই গাড়িটার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে।

সুফল বললে—হয়ত নতুন এসেছে কলকাতায়, বুঝলে টগরদি! বউকে নিয়ে বোধ হয় কলকাতার বেশ্যাপাড়া দেখাচ্ছে, আর একদিন এসেছিল ওই গাড়িটা, সেদিনও পাশে বসে ছিল বউটা—

কুন্তির মনে হলো সমস্ত আকাশটা যেন তার মাথার ওপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। এতদিন তার নিজের ওপর বাইরের মানুষ যতখানি অত্যাচার করেছে, তার বোনের ওপর যত অত্যাচার করছে কোর্টের পুলিস আর জেল-খানার দারোগা, এ যেন তার কাছে কিছু না। এ যেন আরো নিষ্ঠুর, আরো কঠোর।

—সেদিন শ্যামবাজারের মোড়ে গিয়েছিলুম কাঁকড়া কিনতে, সেদিনও দেখেছিলুম গাড়িটা। বুঝলে টগরদি, হয়ত নতুন এসেছে এখানে। গাড়িটা নতুন কিনেছে হয়ত, তাই দেখিয়ে দেখিয়ে আর দেখে দেখে বেড়াচ্ছে—

ততক্ষণে গাড়িটা দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

—ওসব দেখে কী লাভ টগরদি, তুমি বরং ফ্ল্যাটে যাও, আমি গরম পরোটা করে দিচ্ছি, খেয়ে কবে ঘুম দাও গে—

সুফলেরও বোধ হয় তখন খুব খদ্দেরের তাড়া। তখন এ-পাড়ায় খদ্দেররা আসতে আরম্ভ করেছে। কাঁকড়ার দাঁড়া ভাজা, মেটুলির চচ্চড়ি আর ডিমের

কারি নিয়ে তখন ওপর-নীচে ছোটাছুটি করবার পালা। তখন বেলফুলওয়ালারা আসবে হাতে গোড়ে-মালা ঝুলিয়ে, কুলপি বরফ আসবে মাথায় লাল ন্যাকড়া-জড়ানো হাঁড়ি নিয়ে। তখন পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে দুলারীর ঘরে হারমোনিয়ম বেজে উঠবে, তবলায় চাঁটি পড়বে। তখন গান শুরু হবে—'চাঁদ বলে ও চকোরী বাঁকা চোখে চেয়ো না।'

সুফলের দোকানে তখন খদ্দের জমে গেছে। লোহার কড়ার ওপর তেল পুড়ছিল। তাড়াতাড়ি তার ওপর কাঁচা চপ্‌গুলো ঢেলে দিয়ে গরম করতে লাগলো। গরম না হলে মালের সঙ্গে খেয়ে সুখ নেই। সোনাগাছির সব পাড়ার লোক এই সুফলের দোকান থেকেই চাট্‌ কিনতে আসে।

সুফল বলে—দাঁড়া রে বাবা, একটা তো হাত, ক'দিক সামলাই?

ঝিয়েরা বলে—দাঁড়ালে আমাদের চলবে না রে বাছা, বাবুরা রেগে একসা করবে, তখন কে ঠ্যাকাবে শুনি?

সুফলও রেগে যায়। বলে—আমি অত পারবো নি বাপু, সুফল কারো বাপের চাকর নয়, যখন হবে তখন দেবো,...এই পঞ্চা, হাঁ করে দেখছিস কী, গরম মশলাটা গুঁড়িয়ে দে—খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে, দেখছিস না—

তার পর চপ্‌টা নামিয়েই চারখানা চপ্‌ একটা ডিশের ওপর রেখে কাঁচা পেঁয়াজকুচো খানিকটা দিয়ে বললে—এটা সতেরো নম্বর ঘরে দিয়ে আয় তো দৌড়ে, আর ফিরে এসে ময়দা ঠাসবি, পরোটা করতে হবে টগরদির জন্যে......

—সুফল!

সুফলও অবাক হয়ে গেছে। আবার টগরদি ফিরে এসেছে।

কুন্তি বললে—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল সুফল, একটু এদিকে এসো না ভাই—

সুফল হাতের কাজটা ফেলে রেখে নীচে এসে দাঁড়ালো। তার পর আড়ালে এসে বললে—কী হলো? তোমার পরোটা তো বানাচ্ছি—

—না, অন্য একটা কাজ আছে তোমার সঙ্গে।

—কী বলো?

—সেই ভুলো? তোমার বন্ধু ভুলো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলোর কাছে তো তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলুম সেদিন। তা কী হবে? যাবে সেখানে? মাল্‌ কিনবে নাকি?

কুন্তি বললে—হ্যাঁ—

—কিন্তু টাকা এনেছ—?

—আমার কাছে টাকা আছে অনেক। মা'র কাছ থেকে ধার করে আনলুম, আমাকে একবার সেখানে নিয়ে চলো না—আমার বড্ডো দরকার—

—কিন্তু আমার তো······খদ্দের দাঁড়িয়ে···

তার পর কী যেন ভাবলে একবার। ওদিক থেকে পঞ্চাও সতেরো নম্বর ঘরে চপ্ সাপ্লাই করে ফিরে এসেছে।

—তা চলো, বেশিক্ষণ লাগবে না। ওর মাল তৈরীই থাকে—নেবে কিসে?

কুন্তি বললে—এই আমার ব্যাগে, এতে ধরে যাবে—

—চলো, চলো পা চালিয়ে চলো—

অন্ধকার সেই গলি। হোক অন্ধকার। সারা জীবন অন্ধকার দেখে ভয় পেলো না কুন্তি, আর আজ এত কাণ্ডের পর এখন অন্ধকারে চলতে আবার ভয়?

—ও গাড়িটা সারা কলকাতা শহরটাই ঘুরে বেড়ায়, না স্থফল?

সে কথায় কান না দিয়ে স্থফল একটা বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে টোকা মারলে। কেউ সাড়া দিলে না। তার পর আস্তে আস্তে স্থফল নিচু গলায় ডাকলে—ভুলো—এই ভুলো—
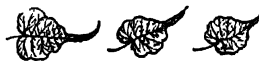
শিবপ্রসাদ গুপ্তর এমনিতে সময় কম। কম সময়ের মধ্যেই বেশি কাজ করতে হয়। হাতে বেশি সময় থাকলে তাঁর খারাপ লাগে। দিনের মধ্যে অন্ততঃ কুড়িটা টেলিফোন আসবে, তিনি অন্ততঃ পনেরটা টেলিফোন করবেন, তবেই তো জীবন। রোজ অন্ততঃ পনেরটা করে মীটিং-এ যাবার নেমন্তন্ন আসবে, সভাপতিত্ব করবেন অন্ততঃ তিনটেতে, রিফিউজ করবেন চল্লিশটা। এখন খবরের কাগজ করলে এটা আরো বাড়বে। উমেদারের সংখ্যা আরো বাড়বে। দেখা করবেন জন তিরিশের সঙ্গে, দু'শো লোক দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাবে।

এমনি করেই তিনি এতদিন কাটিয়ে এসেছেন। এখন বয়েস হয়েছে,

এখন অভ্যেসটা আরো শেকড় গেড়ে বসে গেছে। যেদিন কম লোক আসে দেখা করতে, যেদিন কম টেলিফোন আসে, সেদিন মেজাজ বিগড়ে যায়।

কিন্তু যখন অবিনাশবাবুরা আসে তখন বলেন—আর পারি না মশাই, এবার পাব্লিক-ওয়ার্ক ছেড়ে দেবো—আমি একলা মানুষ কত দিক দেখবো—

যারা সামনে বসে শোনে তারা আসে মিনিস্ট্রি-মহলের ভেতরের খবর শোনবার জন্যে। কার কী কেলেঙ্কারি, কার ওপর নেহরুর নেক-নজর, দিল্লীতে কার কীরকম পোজিশন, সমস্ত খবর জানবার জন্যেই তাদের আগ্রহ।

শিবপ্রসাদবাবু বলেন—কী জানি মশাই, আমার স্ক্যাণ্ডেল শোনবার সময় তো থাকে না, আমি যাই, আমি গিয়েছি খবর পেলেই পণ্ডিত নেহরু ডেকে পাঠায়, আবার কাজ ফুরোলেই চলে আসি—

তার পর হঠাৎ থেমে আবার বলেন—এই দেখুন না সেদিন আমেরিকান এম্ব্যাসি থেকে আমাকে আমেরিকায় যাবার জন্যে রিকোয়েস্ট্ করলে—

—আমেরিকা? কেন? হঠাৎ আমেরিকায় যাবেন কেন?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—আর কেন, এমনি!

—তা অনেক টাকা তো খরচ হবে যাওয়া-আসাতে?

—তা তো হবেই!

—সেখানে গিয়ে আপনি কী করবেন?

—ওই তো বলে কে! আমি বললুম যে, আমার নিজের কান্ট্রিকে কে দেখবে? ওদের যা প্রোগ্রাম তাতে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হবে আমাকে নিয়ে গেলে। কিন্তু লাগে টাকা দেবে আইসেনহাওয়ার!

তার পর আবার থামলেন শিবপ্রসাদবাবু।

বললেন—আরে এই ই তো হয়েছে মুশকিল! ওরা তো জানে কে অনেস্ট্ লোক আর কে নয়! এই তো মশাই, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাশিয়ার এ্যামব্যাসাডার হয়ে গিয়েছিল মস্কোতে। স্টালিনের সঙ্গে কতবার দেখা করবার চেষ্টা করলে, দেখাই পেলে না। শেষকালে রাধাকৃষ্ণন যখন গেল সেই পোস্টে, সঙ্গে সঙ্গে স্টালিন আধ-ঘণ্টা ধরে কথা বললে। তাই তো বলছিলাম আমাদের মত অনেস্ট্ লোকদেরই হয়েছে মুশকিল। ওদিকে রাশিয়াও ধরেছে মস্কো যাবার জন্যে, ওদিকে আমেরিকাও ধরেছে ওয়াশিংটন যাবার জন্যে, আমি মহাবিপদে পড়েছি—যাই কোথায়?

—তা গিয়ে আপনি কী করবেন সেখানে?

—সেই কথাই বা বলে কে? ওই লোভ দেখাচ্ছে আর কি! পয়সা খরচ করে নিয়ে যাবে, আরামে রাখবে, ভালো ভালো খাওয়াবে, প্লেনে মোটরে ঘোরাবে, সুন্দরী দেখে মেমসাহেব দেবে পাশে-পাশে ইণ্টারপ্রিটার হিসেবে—

অবিনাশবাবু বলে—তা আমাদের তো কই এ-রকম চান্স দেয় না মশাই, সারা জীবন জজিয়তি করে এলাম, আমরা কি সব একেবারে আন্‌ফিট্ লোক?

অম্বিকাবাবু বললে—না না শিবপ্রসাদবাবু, এ অপর্‌চুনিটি ছাড়বেন না মশাই, সাজা-তামাক আর বাড়া-ভাত ছাড়তে নেই—

—সত্যিই তো, এতদিন তো দেশের কাজ করলেন প্রাণ দিয়ে, মিনিস্ট্রি পর্যন্ত নিলেন না, আপনি যান এবার, হেল্‌থটাও তো দেখা দরকার—বয়েস তো হচ্ছে—

শিবপ্রসাদবাবু হাসলেন। বললেন—নিজের স্বার্থের কথা যদি ভাবতুম তো আজকে আমাকে আর আপনারা এই বুড়ো বয়েসে খেটে খেতে দেখতেন না। এখনও আমাকে ভাবতে হয় কাল কী খাবো—জানেন—

অম্বিকাবাবু বললেন—তা তো বটেই, আপনার তো আর পেন্‌সন্ নেই আমাদের মত—

—তা তো নেই-ই। আজ যদি স্ট্রোক হয়ে বিছানায় পড়ে থাকি তো খেতেই পাবো না মশাই!

—তবু তো আপনার ছেলে রয়েছে, ছেলে মোটা মাইনে পাচ্ছে, একেবারে উপোস করতে হবে না!

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—ছেলে? আজকালকার ছেলেদের কথা বলছেন? আজকালকার ছেলেরা কি বাপের কথা শোনে! ছেলে তো দু-হাজার টাকা মাইনে পায়, একটা পয়সা তো আমি কখনও চাই নি তার কাছে!

—সে কি?

—না মশাই, ছেলের টাকা আমি চাই না। আমি পণ্ডিত নেহরুকে এবার সেই কথাই বললুম। আমি বললুম আমি সেল্‌ফ-মেড ম্যান, আমি অনার চাই না, পোস্ট্ চাই না, আমি শুধু চাই আমার কান্ট্রির সেবা করতে। যদি ওয়াশিংটন বা মস্কো যেতেই হয় তো আমি গিয়ে দেখে আসবো ওরা ওদের দেশ কীভাবে চালাচ্ছে, ওদের দেশের এডুকেশন-প্রবলেম্, ফুড-প্রবলেম্ ওরা কী করে সলভ্ করছে—আমি বেড়াতে যেতে চাই না, আমি জানতে চাই, আমি শিখতে চাই—

—তার পর ? পণ্ডিত নেহরু শুনে কী বললে ?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—পণ্ডিতজী আমাকে এই এমনি করে হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—গুপ্ত, এখন তুমি কান্ট্রির বাইরে যেয়ো না। দেশের একটা দুর্দিন চলছে এখন। কমিউনিস্টরা বড্ড এজিটেশন্ আরম্ভ করেছে। সমস্ত এশিয়া এখন টারময়েলের মধ্যে দিয়ে চলেছে, এখন তুমি ইণ্ডিয়া ছেড়ে বাইরে যেয়ো না।

—তার পর ?

—তার পর আমি আর কী বলবো বলুন ? আমিও ভেবে দেখলুম কথাটা সত্যি। পাকিস্তান-প্রবলেম্, ইন্দোনেশিয়া-প্রবলেম্, কঙ্গো-প্রবলেম্, কিউবা-প্রবলেম্, চারিদিকে কত প্রবলেম্ রয়েছে। এখন তো আর শুধু ইণ্ডিয়ার কথা ভাবলে চলবে না। সে পৃথিবী তো আমাদের আর নেই এখন। এখন সবাই জোট বেঁধে বাঁচবার দিন এসেছে। এখন 'সিয়াটো' 'ন্যাটো' এইভাবে জোট বাঁধছি আমরা। দেখছেন না কঙ্গোতে কী কাণ্ড হলো, কিউবা নিয়ে কী হচ্ছে, একদিকে ক্রুশ্চেভ আর একদিকে আমেরিকার নতুন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি। —কোথাকার জল যে কোথায় গড়াচ্ছে পণ্ডিত নেহরু নিজেও বুঝতে পারছে না। আমি তো কোন্ ছার! দেখলেন না সিলোনের প্রাইম মিনিস্টার বন্দরনায়ক কেমন করে খুন হয়ে গেল। দিন দিন কেবল নতুন নতুন আর্মস্ তৈরী হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন প্রবলেম্ও গজিয়ে উঠছে—মানুষ মানুষ হতেই ভুলে যাচ্ছে।

অবিনাশবাবু বললে—তা ক্যাপিট্যালিজম্ ভালো না কমিউনিজম্ ভালো ? কোনটা ভালো আপনার মতে ?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—আরে সেই কোশ্চেনটাই তো রোটারি-ক্লাবে আমাকে করেছিল মিস্টার পল ইভ্যানস্—

—সে আবার কে ?

—আরে গাদা গাদা লোক তো আসছে ইণ্ডিয়ায় বেড়াতে, আমাদের কাছে সবাই-ই তো এক এক জন কেষ্ট-বিষ্টু। আমাকে জিজ্ঞেস করলে—Mr Gupta, what is capitalism ? আমি উত্তর দিলুম—Man exploiting man.

অম্বিকাবাবু বললে—ঠিক বলেছেন মশাই—ঠিক বলেছেন—

—তার পর সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলে—And what is communism ? আমি বললাম—ঠিক ওর উল্টো, ওটাই উল্টে নিন্—

—তার মানে ?

—মানে, কথাটা উল্টোলেও ওই একই মানে দাঁড়ায়—Man exploiting man.

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো পাশে। রিসিভারটা তুলে নিয়ে শিবপ্রসাদ-বাবু বললেন—হ্যালো—

রাত হয়ে যাচ্ছিল। পেন্‌সন্‌-হোল্ডাররা উঠলো সবাই। এবার শিবপ্রসাদবাবুর কাজের কথা হবে। তার পর শিবপ্রসাদবাবুর চাকর আসবে পুজোর কথা বলতে। সবাই দাঁড়িয়ে উঠলো। দরজার দিকে চলতে লাগলো। এখানে এলে তবু কিছু ভালো-ভালো কথা শুনতে পাওয়া যায়। বুড়ো হবার পর ছেলে বউ কেউই আর ভালো করে কথা বলে না তাদের সঙ্গে। একমাত্র খবরের কাগজ ভরসা, আর রেডিও ভরসা। গভর্মেণ্টের ভেতরকার মজার-মজার খবর শুনতে তাই এখানে আসে দল বেঁধে। যেদিন শিবপ্রসাদবাবু থাকেন না সেদিন পার্কের বেঞ্চিতে তাদের মীটিং বসে, আলোচনা চলে, তার পর একটু বেশি রাত হলে ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে আস্তে আস্তে মাথা-কান ঢেকে আবার যে যার বাড়ি চলে যায়।...

মিস্টার বোসের গলাটা যেন বড় ভারী ভারী। তাই প্রথমটায় চিনতে একটু কষ্ট হয়েছিল।

—মিস্টার বোস ? আপনি ? কী হলো ? এত রাত্রে হঠাৎ ?

—আপনি এখুনি চলে আসুন,—

—কোথায় ? কোথায় চলে আসবো ?

—পি-জি হস্‌পিট্যালে।

—কেন ? পি-জি হস্‌পিট্যালে কী হয়েছে ? কার অসুখ ?

মিস্টার বোস বললেন—অসুখ নয়, অ্যাক্‌সিডেণ্ট—

—কী অ্যাক্‌সিডেণ্ট ?

মিস্টার বোস বললেন—তা জানি না। এখুনি পুলিস আমাকে ফোন করেছিল, আমার গাড়ি রেডি, আমি এখুনি চললুম, আপনিও আসুন—

—কিন্তু কার অ্যাক্‌সিডেণ্ট ? কোথায় হয়েছে ?

মিস্টার বোসের তখন বোধ হয় আর সময় ছিল না। তিনি লাইনটা ছেড়ে দিয়েছেন। শিবপ্রসাদবাবু রিসিভারটা রেখে দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

বললেন—বস্তিনাথ—

বন্তিনাথ পেছনেই থাকে সব সময়। সামনে এলো।

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—কুঞ্জ কোথায় ? কুঞ্জকে বল্ গাড়ি বার করতে—

—ন'টা বেজেছে, আপনার পুজোর ঠাঁই করেছি যে—

পুজো ! পুজো করতে গেলে আরো এক ঘণ্টা সময় লাগবে। তা হোক, মাথার ওপর মা'র ছবিটা টাঙানো রয়েছে। অনেক ভাবনা। কঙ্গো, কিউবা, লুমুম্বা, কেনেডি, বন্দরনায়ক, ত্যাটো, সিয়াটো, পাকিস্তান। যাদবপুরের বাড়িটা হয়ে এলো। পার্ রুম ফর্টি রুপীজ। তা হলে টোট্যাল দু' হাজার টাকা মাসে।

কুঞ্জ সামনে এসে দাঁড়ালো।

—আমাকে ডেকেছেন ?

—তুমি একটু দাঁড়াও, গাড়ি বার করে রাখো, আমি পুজো সেরে একবার পি-জি হস্পিট্যালে যাবো—বলে চেয়ার থেকে উঠলেন শিবপ্রসাদবাবু।

কিন্তু পুজোয় সবে বসেছেন এমন সময় হঠাৎ আবার টেলিফোন বেজে উঠলো।

—হ্যাল্লো !

ওপাশ থেকে মিস্টার বোসের গলা আর্তনাদ করে উঠলো—আপনি এখনও এলেন না, এখুনি চলে আসুন, ভেরি সিরিয়াস্ কন্ডিশন, আমি পি-জি হস্পিট্যাল থেকে কথা বলছি—

বিপ্লব যখন আসে, তখন বেশির ভাগ মানুষ তা জানতে পারে না। সব যুগের সব মানুষই নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েই মেতে থাকে। নিজের ব্যবসা, নিজের ছেলে-মেয়ে, নিজের স্বাস্থ্য ! তার পর যারা আরো বড়লোক তাদের থাকে মেয়েমানুষ, তাদের থাকে ক্লাব, তাদের থাকে প্রতিপত্তি। এই নিয়ে জীবনটা কেটে গেলেই হলো। ভালো খেয়ে ভালো পরে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারলে আর কী চাই ? ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে যখন রাজাগোপালাচারীজী লাট-সাহেব হয়ে এলেন কলকাতাতে, তখনও কেউ ভাবতে পারে নি সময় বদলে যাচ্ছে। বুঝতে পারে নি বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে। কারণ এ-বিপ্লব বড় আস্তে-আস্তে আসে। নিঃশব্দে এসে একেবারে সকলকে গ্রাস করে ফেলে। যখন ধরা পড়ে তখন মানুষ চমকে ওঠে। তখন মানুষের ঘুম ভাঙে। এতদিন মানুষ অতীত নিয়েই পড়ে ছিল। আজ যাদের বয়েস পঞ্চাশ তারা পেছন ফিরে দেখলে মনে করতে পারে

কেমন করে মানুষের হাজার হাজার বছরের পুরোনো ধ্যান-ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এক যুগের পর আর এক যুগ এসেছে আর ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর ভয় কমে এসেছে, ভগবানের ভয় কমে এসেছে। ভয় কমেছে, ভক্তিও কমেছে। তার বদলে এসেছে যুক্তি। এই যুক্তি দিয়েই মানুষ আবিষ্কার করেছে নিজেকে। আবিষ্কার করেছে যে ভগবানই বলো আর প্রেসিডেণ্টই বলো, সবই মানুষের তৈরী। ভগবান যেমন এককালে সব রাগ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতো, প্রেসিডেণ্টেরও তেমনি রাগ আছে, স্বার্থপরতা আছে। প্রেসিডেণ্টও তেমনি কাউকে ওঠায় কাউকে নামায়। উঁচুতলার কর্তা যারা তাদের খোসামোদ করলে যেমন ভাল-ভাল চাকরি পাওয়া যায়, তাদের বিরাগভাজন হলে তেমনি চাকরি চলে যাবার ভয়ও থাকে। ভাগ্য মানুষকে প্রেসিডেণ্ট করে না, মানুষই প্রেসিডেণ্ট হলে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তোলে। শুধু তা-ই নয়। মানুষ আরো জেনেছে, মানুষ যে অমৃতের সন্তান এর চেয়ে বড় ধাপ্পা পৃথিবীতে আর নেই। অমৃতের সন্তানদেরই একদিনে নির্মূল করে দেওয়া যায় নতুন-নতুন ট্যাক্স বসিয়ে। মানুষ বলে, এ আমাদের ডেমোক্রেসি, তোমরা আমাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছ, তাই আমরা মন্ত্রী হয়েছি। আবার মানুষই বলে, তোমরা মন্ত্রী হয়েছ বলেই আমাদের কষ্টের সীমা নেই, তোমাদের জন্যেই আমরা অনাহারে মরছি। তাই Babeuf বলেছিল—Government is nothing but conspiracy of the few against many, whatever form it takes.

—তুমি হিস্ট্রি পড়েছ ?

মনিলা বললে—পড়েছিলুম, এখন ভুলে গেছি—

সদাব্রত বললে—আমাকে আমার প্রাইভেট টিউটর হিস্ট্রিটা পড়াতেন তাই ভুলি নি, নইলে আমিও কবে ভুলে যেতুম তোমার মত—

তার পর একটু থেমে বললে—যে-ইংরেজরা এতদিন আমাদের দেশে রাজত্ব করেছিল, সেই ইংরেজরাই একদিন নিজেদের দেশের এক রাজার মুণ্ডু কেটে ফেলেছিল, আর একজন রাজাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়েছিল—তা জানো ?

—ওসব হিস্ট্রির কথা থাক এখন।

সদাব্রত বললে—তোমার মত ফ্রান্সের রাণীও এ-সব কথা শুনতে চাইত না, বলতো—ও-সব কথা থাক এখন—আর ঠিক তার পরেই ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন হলো—

হঠাৎ মনিলা যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে বললে—ওই ট্যাক্সিটা আমাদের পেছন পেছন আসছে কেন বলো তো ?

—কোন্ ট্যাক্সিটা ?

সদাব্রত গাড়ি চালাতে চালাতে পেছন ফিরে দেখলে।

—না, বাজে কথা। ও কিচ্ছু নয়—

কিন্তু মনিলার যেন তবু বিশ্বাস হলো না। ক'দিন থেকেই দেখে আসছিল মনিলা, সন্ধ্যের পর যখন দু'জনে গাড়ি নিয়ে বেরোয়, যখন লেকে যায়, রেড রোড দিয়ে চাকাগুলো গড়িয়ে গড়িযে চলে, হঠাৎ তখন যেন খেয়াল হয় পাশ দিয়ে একটা ট্যাক্সি সোঁ করে চলে গেল। আর ভেতর থেকে কে যেন তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলে।

এমনি একদিন নয়, একবার নয়, অনেক দিন ধরে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা যেতে যেতে এক-এক সময় মনে হতো এই বুঝি অ্যাক্‌সিডেণ্ট্ হলো। দু' পাশে ভাঙা গাড়ি পড়ে আছে। ড্রাইভাররা মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে নাকি ?

—চলো, চলো ফিরে চলো সদাব্রত, এ-রাস্তায় বেড়াবার দরকার নেই।

সদাব্রত বলতো—তা হলে ক্লাবে চলো—ক্লাবেই বসা যাক গিয়ে—

মনিলা বলে—ক্লাব ভালো লাগলো না বলেই তো বেরিয়ে এলুম—

—তা হলে চলো লেকে যাই—

মনিলার তাতেও আপত্তি। বলে—লেকটা বড় ডেমোক্র্যাটিক—

—তা হলে চলো যশোর রোডে—

যশোর রোড ধরে চলতে চলতেও কেমন যেন গা-টা ছম্ ছম্ করে মনিলার। সদাব্রত পাশে বসে গাড়ি চালায়। রোজ রোজ নতুন শাড়ি, নতুন ব্লাউজ, নতুন খোঁপা, নতুন কসমেটিকস্ মেখে বেরোয় মনিলা। তবু ভাল লাগে না।

—জানো, ফ্রান্সের মেরি অ্যাণ্টোনিয়েটের গল্প শুনলে তো, এবার রাশিয়ার জারিনা ক্যাথেরিন দি গ্রেটের গল্প বলি।

—আবার হিস্ট্রি ?

—না শোন না, শুনলে তোমার ভাল লাগবে। রাশিয়ার সঙ্গে তখন ইংলণ্ডের যুদ্ধ বেধেছে, জার গেছে যুদ্ধ করতে, জারিনা হঠাৎ লক্ষ্য করলে চারদিকে পুলিস-পাহারা কেউ কোথাও নেই, ক্রেমলিন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলে রাজার কাছে। কিন্তু আশ্চর্য,

জারিনা জানেও না যে, রাশিয়ার ভেতরে তখন সিভিল-ওয়ার শুরু হয়ে গেছে। পোস্টাফিস থেকে সে-টেলিগ্রাম ফিরে এলো। তাতে লেখা আছে—Whereabouts of the addressee is not known—

মনিলা হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো—ওখানে কে ?

—কোথায় ?

মনিলা নিজেও অবাক হয়ে গেল। শ্যামবাজারের মোড়ের কাছে লোকে লোকারণ্য। তাদের গাড়ির ঠিক ওপাশে একটা ট্যাক্সি এসে থামলো। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে কে যেন ঠিক তাদের দিকেই আসছিল। তার পর ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো।

—কে আসছিল ? কী রকম চেহারা ?

—একজন গুণ্ডার মতন মনে হলো।

সদাব্রত হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—গুণ্ডা তোমার কী করবে ?

—তা জানি না, ওই গুণ্ডাটাকে সেদিনও দেখেছিলুম, আমার দিকে চেয়ে ছিল একদৃষ্টিতে—

সদাব্রত আবার গাড়ি ছেড়ে দিলে।

বললে—ও কিছু না, কলকাতায় যত কমন্ পীপ্‌ল, তাদের সকলেরই গুণ্ডার মতন চেহারা। তোমাদের চোখে সবাই গুণ্ডা—ওরা ফরসা জামা-কাপড় পরতে পায় না, মাথার চুলে তেল মাখতে পায় না, চেহারাটা তাই গুণ্ডাদের মত দেখায়, আসলে গরীব লোক ওরা—

গাড়িটা গিয়ে আপার সার্কুলার রোডে পড়লো। আর তার পর সোজা রাস্তা। সর্বনাশের রাস্তা চিরকাল সোজাই হয়। সর্বনাশের পথে কোনও বাঁক নেই। বড় পিছল বড় মসৃণ তার গতি। মনিলা যে-সমাজে মানুষ সেখানে বাঁকা পথ কেউ পছন্দ করে না। সকালবেলার ব্রেকফাস্টের পর একেবারে লাঞ্চে এসে হল্ট্। তার পর সেখান থেকে সোজা ডিনার। আর ডিনারের পর রিল্যাক্স। দিন সে-সমাজে এমনি করেই চলেছে, রাতও এমনি। রাতের মধ্যেও কোনও সেমিকোলন, কমা কিছু নেই। ট্র্যাঙ্কুইলাইজারের রাত নিঃশব্দে শান্তি এনে দেয়।

কিন্তু সেদিন বোধ হয় প্রথম বাঁকা রাস্তায় গিয়ে পড়লো গাড়িটা।

ক'দিন থেকে সদাব্রত ভাবছিল। অনেকদিন চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত একটা চিঠি এসেছিল। চিঠি লিখেছিল মন্মথ।

মন্মথ লিখেছে—

সদাব্রতদা,

তুমি গত মাসে যে সাত শো টাকা পাঠিয়েছিলে তার হিসেব এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। দুধের দাম বাকি আছে। মাস্টার মশাইয়ের জন্যে দু' সের করে যেমন দুধ নিতে বলেছিলে, তেমনি নেওয়া হচ্ছে। মাস্টার মশাই কলকাতায় যাবার জন্যে ছটফট করছেন। আর এখানে থাকতে চাইছেন না। বলছেন অসুখ সেরে গেছে। আমি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আটকে রেখে দিচ্ছি। কিন্তু কিছুতেই শুনছেন না। তুমি একবার চিঠি লিখে ওঁকে বুঝিয়ে বলো। একমাত্র তোমার কথাই শুনবেন। আমাকে দিন-রাত বকাবকি করেন। অকারণে রাগারাগি করেন। শৈল ভাল আছে। সে-ও যেন এখানে আসার পর থেকে কেমন হয়ে গেছে। তারও বোধ হয় এখানে আর বেশিদিন থাকতে ভাল লাগছে না। এই অবস্থায় আমি কী করি বুঝতে পারছি না। তোমার চিঠির অপেক্ষায় রইলুম। তুমি যেমন বলবে সেই রকমই করবো। ইতি—

মিস্টার বোস সেদিন ক্লাবে একটু বেশি হুইস্কি খেয়েছিলেন। সদাব্রত কিছু বলতে গিয়েছিল। তাকে দেখেই বললেন—চিয়ার আপ্ মাই বয়, চিয়ার আপ্—

মনিলা ডাকলে—বাবা—

মনিলা আবার বললে—বাবা, ক'পেগ্ খেলে তুমি?

মিস্টার বোস হো হো করে হেসে উঠলেন। সেই সেদিনকার ছোট মেয়ে! তাকে তিনি চোখের সামনে জন্মাতে দেখেছেন। সেই মেয়ে আজকে তাঁকে শাসন করছে। মেয়ের কথায় কিছু উত্তর দিলেন না। আর এক পেগ্-এর অর্ডার দিলেন। ইণ্ডিয়া অনেক অনেক অ্যাড্ভান্স করে গেছে।

ফাইভ্ ইয়ার প্ল্যানে মাথা-পিছু ইনকাম বেড়ে গেছে। আমেরিকা রাশিয়া সবাই 'এড্' দিচ্ছে। কার তোয়াক্কা করবো ? কাকে ভয় করবো ? বানডুং কনফারেন্সেই ডিসাইড' হয়ে গেছে সমস্ত। আমরা কারোর নিজের দেশের ভেতরের ব্যাপারে মাথা ঘামাবো না। লিভ এণ্ড লেট লিভ। পঞ্চশীল। কোনও ভয় নেই। ডোণ্ট কেয়ার। আমেরিকা আমাদের ফ্রেণ্ড, রাশিয়া আমাদের ফ্রেণ্ড, নাসের আমাদের ফ্রেণ্ড, মাও-সে-তুং আমাদের ফ্রেণ্ড। দালাই লামা ইণ্ডিয়ায় পালিয়ে এসেছে। আসুক। উই আর এভ্রিবডি'জ ফ্রেণ্ড!

—বাবা আজকে আউট-অব-গিয়ার হয়ে গেছে—

গাড়িতে উঠে মনিলা হাসতে লাগলো। আবার বললে—মা'র সঙ্গে আজকে খুব ঝগড়া হয়েছে কিনা, তাই আজকে বাবা একটু আউট-অব-গিয়ার হয়ে গেছে—

—কেন, ঝগড়া হয়েছে কেন ?

—মা আজকে ব্রেক্‌ফাস্টের সময় পরিজ খায় নি বলে! ও কথা থাক, আজ কোন্ দিকে যাবে ?

—যে-দিকে বলবে।

—দেখো, সেকেণ্ড তারিখে আমাদের বিয়ে, বিয়ের পর উই মাস্ট গো সামহোয়ার, হনিমুন কোথায় করবে বলো তো ?

তার পর হঠাৎ মনিলা সদাব্রতর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সদাব্রত কেমন গম্ভীর হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।

—কী হলো, হিস্ট্রির কথা ভাবছো নাকি ?

সদাব্রত বললে—না,—

—তা হলে কী ভাবছো ? আজকে বাড়িতে মা ব্রেক্‌ফাস্ট খায় নি, লাঞ্চ খায় নি বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে, দুপুরবেলা দেখেছি শুধু এক বোতল গোল্ডেন ঈগল বিয়ার খেয়ে আছে, বাবাও আজকে ছ'পেগ হুইস্কি খেয়েছে, তুমি দেখলে তো! এর পর তুমিও দেখছি আন্‌মাইণ্ডফুল।

সদাব্রত বললে—না, তুমি কিছু মনে করো না, আমি একটু অন্য কথা ভাবছিলুম—

—কী কথা ? আমাদের বিয়ের কথা ?

তার পর কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হলো। সদাব্রত স্টিয়ারিং হুইলটা ধরে ছিল। তার সমস্ত শরীরটা যেন ফেটে ছিঁড়ে

টুকরো-টুকরো হয়ে গেল এক মুহূর্তে। তার পর হঠাৎ পাশের দিকে নজর পড়তেই দেখলে মনিলার সমস্ত শরীরে যেন আগুন জ্বলছে। অন্ততঃ আগুন জ্বললে যেমন করে মানুষ চীৎকার করে ওঠে, তেমনি করে আর্তনাদ করে উঠলো মনিলা। সমস্ত মুখখানা, সমস্ত বুক, হাত, কাঁধ সব যেন ঝলসে উঠেছে। আর যন্ত্রণায় ছটফট করছে মনিলা।

এক মুহূর্ত!

রাস্তায় লোকজন সেই সঙ্গে যে-যেমন ছিল সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ছিটকে পড়েছে। যারা অন্যদিকে ফিরে ছিল তাদের কানেও বিকট আওয়াজটা পৌঁছেছে। রাত্রের দিকে এ রাস্তায় এমনিতেই ভিড় বাড়ে। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-রিক্সা সমস্ত গুঁতোগুঁতি করে। আশে-পাশের দোকানগুলোতে বেচা-কেনা চলছিল। খদ্দের, ফেরিওয়ালা, ভবঘুরে, ভিখিরি সবাই চমকে উঠেছে সেই আওয়াজে। বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি সব থেমে গেছে।

—পাকড়ো, পাকড়ো, পাকড়ো উসকো—

একদল লোক পেছন-পেছন দৌড়লো। সদাব্রত গাড়িটা থামিয়ে দিয়েছে তখন। কিন্তু মনিলা তখনও আর্তনাদ করছে—মাই ঘড্,—মাই ঘড্—

কিন্তু আর বোধ হয় কথা বলবার ক্ষমতাও তার নেই তখন। গলা বোধ হয় শুকিয়ে গেল। সদাব্রত গাড়ি থেকে নেমে কী ঘটেছে সেটা বুঝতে না বুঝতেই পুলিস এসে পৌঁছে গেছে। তার পর যা দেখলে তখন আর তার করবার কিছু নেই।

মধু গুপ্ত লেনের ক্লাবে সেদিন আবার 'মরা-মাটি'র কথা উঠেছে। কালীপদ তখনও আশা ছাড়ে নি। শম্ভু দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে রে কালীপদ—

—কী হলো?

ক্লাবের সব মেম্বার হৈ-চৈ করে উঠলো। শম্ভুই বলতে গেলে মধু গুপ্ত লেনের ড্রামাটিক ক্লাবের বড় পাণ্ডা। কালীপদ তখনও হাল ছাড়ে নি। শম্ভুকে ধরে আর একবার শেষ চেষ্টা করবার আশায় ছিল। ঠিক ছিল শম্ভুই ডেকে

আনবে কুন্তি গুহকে। একশো টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে গেছে বহুদিন আগে। সুতরাং আসতে বাধ্য।

—আজকে ভাই ওই জন্যেই তো আসতে দেরি হয়ে গেল! ডালহৌসী স্কোয়ারের সব ট্রাম-বাস বন্ধ!

—কেন? বন্ধ কেন? আবার গুলি চলেছে?

—নারে, আমাদের কুন্তি গুহ, তাকে পুলিসে ধরেছে শুনলাম।

খবরটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবের হাওয়া যেন গরম হয়ে উঠলো এক মুহূর্তের মধ্যে।

—কেন? কী করেছিল?

—একটা মেয়ের গায়ে অ্যাসিড-বাল্‌ব ছুঁড়ে মেরেছিল।

—কোন্ মেয়ে? কে সে? মরে গেছে মেয়েটা?

শুধু মধু গুপ্ত লেনের ক্লাবেই নয়। কথাটা যেন আগুনের মত হাওয়া পেয়ে সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়লো দু'দণ্ডের মধ্যে। যারা অফিসের ফেরত তারা আড্ডায়-আড্ডায় আলোচনা করছে।

পদ্মরাণীও অবাক হয়ে গেছে শুনে।

—হ্যাঁ লা, আমাদের টগর? টগরকে ধরেছে পুলিসে? তুই ঠিক বল্‌চিস্?

বিন্দু বললে—হ্যাঁ মা, আমি তো তাই শুনলুম।

—সে কী করেছিল লা?

—শুনছি তো কাকে খুন করেছে নাকি!

—দূর, ভুল শুনেছিস তুই। সে কী করে খুন করবে? সে কেন খুন করবে লা? তার বলে মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, তার বোনটার ছ'মাসের জেল হয়ে গেল, সে খুন করবে কেন বাছা? তার কি প্রাণের ভয় নেই গা? খুন অমনি করলেই হলো?

পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের দুলারী গোলাপী সবাই খবরটা শুনে গালে হাত দিয়ে হাঁ করে রইল। কোথায় যেন সব আলো তাদের চোখের সামনে থেকে নিবে গেল এক নিমেষে!

কালীঘাটের বাড়িতে জ্যাঠাইমা বুড়ি পিদিমের সলতে পাকাচ্ছিল পরের দিনের জন্যে। কথাটা শুনে তারও দেহখানা থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

—ওমা, কী সব্বোনাশ! খবরটা কে দিলে বাছা?

—উনি অফিস থেকে এসে বললেন যে!

১৯৫৭ সালে মস্কো থেকে খবর রটে গিয়েছিল আকাশে 'স্পুটনিক' উঠেছে। সারা পৃথিবীর লোক সেদিন চমকে উঠেছিল সে খবর শুনে। এ খবরও তেমনি। আকাশে যখন 'স্পুটনিক' উঠেছে তখন মাটির পৃথিবীতে মানুষের গায়ে মানুষই আগুন ছুঁড়ে মেরেছে। এও কম আশ্চর্যের খবর নয়। পুলিসে-পুলিসে ঘিরে ফেললে জায়গাটা। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের সেকশান থ্রি হানড্রেড থ্রি কিংবা টু। হয় ফাঁসি, নয় ট্র্যান্সপোর্টেশান ফর লাইফ।

মিস্টার বোস সেদিন ক্লাব থেকে ফিরে এসেছিলেন একটু বেশি টিপসি হয়ে। বেবির সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়ে গেছে সকালবেলাই। ব্রেক্‌ফাস্টের সঙ্গে বেবি পরিজ খায় নি। অথচ মেজর সিনহা বলে দিয়েছে—শি মাস্ট হ্যাভ ওটস পরিজ! বাড়িতে ফিরে এসে শুনলেন মেমসাহেব ব্রেকফাস্ট খায় নি, লাঞ্চও খায় নি। শুধু রেফ্রিজারেটার থেকে গোল্ডেন ঈগলের বটল বার করে খেয়েছে। খেয়ে তখনও নিজের বিছানার ওপর আন্‌কন্‌শাস হয়ে পড়ে আছে।

হঠাৎ টেলিফোন এলো থানা থেকে।

—হ্যালো—

—ইয়েস—

খবরটা শোনার পর ছ-পেগ হুইস্কির নেশা যেন এক নিমেষে জল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিবপ্রসাদ গুপ্তকে রিং করলেন। বেশি কথা বলবার সময়ও ছিল না। সোজা গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন পি-জি হস্‌পিট্যালে। সেখানে এমার্জেন্সী-ওয়ার্ডে তখন মুহূর্তগুলো থম্‌থমে হয়ে এসেছে। ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড মাস্টার, পুলিস! সদাব্রত চঞ্চল হয়ে ঘোরাঘুরি করছে এদিক-ওদিক।

—হোয়াট হ্যাপেণ্ড সদাব্রত? হাউ? মনিলা কেমন আছে?

সব কথা শোনার আগেই আবার মনে পড়লো শিবপ্রসাদ গুপ্তর কথা। মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ম্যান।

—তোমার ফাদার এখনো আসেন নি? এত দেরি করছেন কেন? পুলিস কমিশনারকে খবরটা জানানো হয়েছে? পুলিস-মিনিস্টারকে? আমি তো খবরটা পেয়েই তাঁকে রিং করে দিয়েছি—

তার পর যেন কী করবেন ভেবে পেলেন না। একবার ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, বাধা পেলেন পুলিসের কাছ থেকে।

পুলিস সার্জেণ্ট সবিনয়ে বললেন—নট্ নাউ স্যার—

—তা হলে টেলিফোনটা কোথায়? আই ওয়াণ্ট টু রিং আপ সাম্‌বডি—

তার পর টেলিফোন-রুমে ঢুকে রিসিভারটা তুলে নিলেন।

—মিস্টার গুপ্ত? এত দেরি করছেন কেন? হ্যাঙ্গ ইওর পুজো। আপনি এখুনি চলে আসুন, কন্‌ডিশান ভেরি সিরিয়াস—

কলকাতার লোক সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে যাবার কথা নয়, তবু অবাক হয়েছিল। সকালবেলা খবরের কাগজের পাতায় চোখ পড়তেই চায়ের কাপ আরো মিষ্টি হয়ে উঠলো। দোকানে-দোকানে চায়ের খদ্দেররা এক কাপ চায়ের বদলে দশ কাপ চা খেয়ে ফেললে।

—আর এক কাপ চা দাওম্যানেজার,আজকেগরম-গরম খবর আছে মাইরি—

অন্য দিন যারা সিনেমা-স্টার নিয়ে মাথা ঘামায়, যারা কিছু কাজ না পেয়ে রাস্তায় ফুটপাথে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, তারাও যেন কিছু নতুন খোরাক পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলো। কিছু বড়-ঘরের কেলেঙ্কারির খবরে উদ্দাম হয়ে উঠলো। এমনিতেই সবাই অসাড় হয়ে গেছে। কোথাও কোনও আশা নেই। মাঝে-মাঝে কখনও কোনও কেলেঙ্কারির খবর কাগজে ছাপা হয়, লাখ লাখ টাকা চুরির খবর বেরোয়, তার পর আবার সব ধামা চাপা পড়ে। যারা ব্ল্যাক-মার্কেট করে, যারা গভর্মেণ্টের টাকা চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার হয়, তাদের খবর ছাপা হলেই লোকের আশা হয় এইবার বোধ হয় একজনের শাস্তি হবে, এইবার বোধ হয় একজনের ফাঁসি হবে। চালে কাঁকর মেশানোর অপরাধে, ওষুধে ভেজাল দেবার জন্যে একজনেরও অন্ততঃ জেল হবে কিংবা ফাইন হবে। কিন্তু তার কিছুই হয় না। আবার সব নিঝুম হয়ে পড়ে।

এমনি করে করে লোকে আশা করা ছেড়েই দিয়েছিল।

—কিন্তু এইবার? এইবার কেলেঙ্কারি কী করে চাপা দেবে চাঁদ? কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যে সাপ বেরিয়ে পড়বে!

—জানিস, মেয়েটা থিয়েটার করতো রে!

—কিন্তু ও-মেয়েটাকে মারতে গেল কেন? নিশ্চয়ই ভেতরে অনেক কেলেঙ্কারি আছে।

থিয়েটারের ক্লাবে-ক্লাবেও আলোচনা হয়। টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যাদের

ক্লাবে-ক্লাবে রিহার্সাল দিয়ে দিয়ে পেট চালাতে হয় সেই সব মেয়েরাও অবাক হয়ে গেছে।

শ্যামলী বলে—কুন্তিদি এ কী করলে বল্ তো ভাই ?

বন্দনা বলে—খবরটা শুনে পর্যন্ত আমার তো ভাই বুকটা কাঁপছে।

কালীপদরই সব চেয়ে লোকসান। অনেক দিন ধরে ক্লাবের ঝগড়া মিটিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ফয়সালা হয়েছিল মেম্বরদের সঙ্গে। 'মরা-মাটি' শেষ পর্যন্ত স্টেজ হবার একটা আশা হয়েছিল, কিন্তু এবার তাও গেল। শম্ভু ক্লাবে আসতেই কালীপদ জিজ্ঞেস করলে—কী রে, আর কিছু খবর পেলি আজকে ?

শম্ভুর মুখটা খুব গম্ভীর-গম্ভীর।

বললে—আমি সদাব্রতর বাড়িতে আজকে গিয়েছিলুম ব্যাপারটা কী জানবার জন্যে।

—কী বললে সদাব্রত ?

—সদাব্রত কী আর বলবে! খুব মুষড়ে পড়েছে দেখলুম। ওর সঙ্গেই তো বিয়ে হতো সদাব্রতর, আর ওই বিয়েটার জন্যেই তো ওর চাকরি—

—এখন কী হবে ? তা মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে না মরে গেছে ?

—বেঁচে আছে। সমস্ত মুখ বুক সব পুড়ে গেছে, চোখ-টোখ কিচ্ছু নেই, শুধু মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়ে রেখে দিয়েছে। এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো—!

—আর কুন্তি গুহ ?

হঠাৎ বাইরে ক্লাবের সদরে দুজন পুলিসের লোক দেখে কালীপদ থেমে গেল।

—এটা আপনাদের ড্রামাটিক-ক্লাব তো ?

শম্ভু দাঁড়িয়ে উঠে বললে—হ্যাঁ, ভেতরে আসুন—

দু'জন পুলিসের সাব ইন্‌স্পেকটর। ভেতরে এসে মাদুরের ওপর বসে হাতের ফাইল-পত্র পাশে রাখলেন।

—আমরা থানা থেকে আসছি, আপনাদের নাম ?

নাম-ধাম শুনে একজন বললেন—দেখুন, কুন্তি গুহ বলে একজন অ্যাক্‌ট্রেসের সম্বন্ধে আমরা এন্‌কোয়ারি করতে এসেছি। আপনাদের এখানে এই ক্লাবে সে নাকি রিহার্সাল দিতে আসতো ?

ক্লাবের সব মেম্বাররা যেন বিব্রত হয়ে পড়লো। কী উত্তর দিলে ভালো হয় বুঝতে পারলে না কেউ।

—দেখুন, আসামী যে-স্টেটমেণ্ট দিয়েছে তাতে আপনাদের ক্লাবের নামও আছে। সে বলেছে, আপনারা তাকে নাকি ভাল করেই জানেন। শম্ভুবাবু আর কালীপদবাবু দু'জনের নামই করেছে—আমরা ভেরিফাই করতে এসেছি সত্যিই তাকে চেনেন কিনা আপনারা—

কালীপদ বললে—আমাদের এখানে রিহার্সাল দিতে আসতো এই পর্যন্ত, তার বেশি তো কিছু জানি না—

—আর আপনি ?

—আমিও তাকে ওইটুকুই চিনি।

—কখনও তার বাড়িতে গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, যখন সে যাদবপুরে থাকতো, দু-একবার গিয়েছি কন্‌ট্র্যাক্ট করতে। অন্য কোনও সম্পর্ক ছিল না তার সঙ্গে—

—তার সঙ্গে কখনও ট্যাক্সি করে কোনও হোটেলে গিয়ে এক ঘরে রাত কাটান নি ?

শম্ভু চমকে উঠলো—এই কথা স্টেটমেণ্টে বলেছে নাকি সে ?

—কী বলেছে সে পরের কথা, আপনারা তার সঙ্গে থিয়েটারের সূত্রে কোথায়-কোথায় গিয়েছিলেন তা-ই বলুন না—

কালীপদ বললে—আমরা মশাই সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে এই ক্লাবে থিয়েটার-রিহার্সাল নিয়ে আলোচনা করি, ওসব করতে যাবো কেন আর্টিস্ট্‌দের সঙ্গে ?

—কিন্তু থিয়েটারের ক্লাবই বা আপনারা করেছেন কেন ? মেয়েদের সঙ্গে মেশবার জন্যে তো ?

—না, তা কেন ? আমাদের বাড়িতে বউ-ছেলে-মেয়ে আছে, ওসব মেয়েদের সঙ্গে অকারণে মিশতে যাবো কেন ? থিয়েটারটাও তো একটা আর্ট, আমরা আর্টের কালচার করবার চেষ্টা করছি—

সাব ইন্‌স্পেকটর কথাগুলো লিখে নিলেন। বললেন—তা হলে আর কিছু উদ্দেশ্য আপনাদের নেই বলছেন ?

—আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? আমরা থিয়েটার করে ইণ্ডিয়ার কালচারকে গ্লোরিফাই করবার চেষ্টা করছি। আর তা না হলে গভর্মেণ্ট থেকে তা হলে এত হাজার-হাজার টাকা দিচ্ছে কেন আমাদের ?

—গভর্মেণ্ট আপনাদের টাকা দেয় ?

—দেয় নি, কিন্তু অন্য সব ক্লাবকে তো দিচ্ছে, কাউকে চল্লিশ হাজার, কাউকে কুড়ি হাজার, কাউকে দশ হাজার, আবার কাউকে পাঁচ হাজারও দিচ্ছে। আমরা দু-একটা থিয়েটার করেই মিনিস্টার হুমায়ুন কবিরের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করবো। আমাদেরও টাকা পাবার আশা আছে—। সবাই পাচ্ছে, আর আমরাই বা পাবো না কেন ?

পুলিস-দারোগা যা লেখবার লিখে নিলে। তার পর চলে গেল।

শম্ভু সঙ্গে এলো। বাইরে এসেই জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, এ-রকম কেন করতে গেল মশাই বলুন তো ? কী হয়েছিল ?

পুলিসের কাছ থেকে অত সহজে কথা আদায় করা যদি সম্ভব হতো তো কথা ছিল না। আর হয়ত পুলিসরাও জানে না। ইন্‌ভেস্টিগেশন্ হবে, এন্‌কোয়ারী হবে, তবে তো ? কোনও সম্পর্ক যদি না থাকবে তো কেন মারতে যাবে একজন নিরীহ মেয়েকে। নিশ্চয়ই কিছু সম্পর্ক ছিল ভেতরে-ভেতরে যা কেউ জানতো না। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন কেউই দেখে নি। সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত ছিল। শুধু বিকট শব্দটা কানে এসেছে সকলের। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। শুধু সদাব্রত গাড়ি চালাচ্ছিল মনিলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। আজে-বাজে সব কথা। তাদের বিয়ে হবে পরের মাসের দু' তারিখে, সেই কথাই হচ্ছিল।

—আপনি জানতেই পারেন নি যে আপনাদের কেউ ফলো করছে ?

—না। শব্দটা হতেই আমার একটা জার্ক লাগলো। আমি চমকে উঠলাম। তারপর কী হয়েছে দেখবার জন্যে পাশে চাইতেই দেখি মনিলার সমস্ত শরীর পুড়ছে। তার পোড়া শরীর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, চামড়া পোড়ার বিশ্রী একটা গন্ধ বেরোচ্ছে।

—তার পর ?

—তারপর তাড়াতাড়ি আমি গাড়িটা হ্যাণ্ড-ব্রেক টেনে বন্ধ করে দাঁড়ালুম। তখন চারদিক থেকে লোক-জন-পুলিস ছুটে এসেছে।

—তার আগে, শব্দটা হবার ঠিক পরে আপনি কিছুই দেখতে পান নি ?

সদাব্রত একটু ভেবে নেবার চেষ্টা করলে। তার পর বললে—আমার আবছা মনে পড়ছে গাড়ির পাশে কে যেন দৌড়ে এসেছিল, আর সেই শব্দটা হবার পরই দৌড়ে পালিয়ে গেল—

—কী রকম চেহারা তার ?

—আমি পাশ থেকে দেখেছি, ঠিক সামনে থেকে দেখতে পাই নি।

—তবু পাশ থেকে দেখে কী মনে হয়েছিল? কত বয়েস হতে পারে? পুরুষ না মেয়েমানুষ?

—মেয়েমানুষ, বয়েস হয়ত···

—চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে?

—তা হবে।

—আচ্ছা, যদি আপনাকে সে মেয়েটিকে দেখাই তো আপনি চিনতে পারবেন?

—নিশ্চয় পারবো। আমার চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

তার পর জেলখানার লোহার দরজাটা খুলে আর একটা ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল তারা সদাব্রতকে। বলতে গেলে দিনের বেলাতেও সে-জায়গাটা অন্ধকার। অদ্ভুত বিস্বাদ একটা গন্ধ চারিদিকে। সদাব্রতকে অফিস থেকে ডেকে নিয়ে এসে আইডেন্টিফিকেশন্ করানো হচ্ছে। মিস্টার বোস বড় মুষড়ে পড়েছিলেন। একমাত্র মেয়ে। নিজের স্ত্রীর কাছে জীবনে কখনও শান্তি পান নি। তাই মনিলাই ছিল মিস্টার বোসের একমাত্র সান্ত্বনা। মনিলা বাবার কাছে যা কিছু চেয়েছে, সব পেয়েছে। তার কোনও আবদার, কোনও অনুযোগ কখনও উপেক্ষা করতে পারেন নি তিনি। আজ মিস্টার বোসের চোখ দিয়েও তাই জল পড়েছিল। বোধ হয় স্নুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস পুড়ে গেলেও তিনি এতখানি মুষড়ে পড়তেন না। সদাব্রতকে তিনি বলে দিয়েছিলেন—দি কালপ্রিট মাস্ট বি পানিশড্—

তিনিই পুলিস-কমিশনারকে টেলিফোন করে দিয়েছিলেন যেন তাঁর মেয়ের ব্যাপারে স্পেশ্যাল কেয়ার নিয়ে ইনভেস্টিগেশন্ করা হয়। পুলিস-মিনিস্টারের সঙ্গেও নিজে গিয়ে দেখা করেছিলেন। আর শুধু তিনি নন, শিবপ্রসাদ গুপ্তকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। দিস্ ইজ হরিব্‌ল্। এই যদি ক্যালকাটার ফেট হয় তা হলে পিস-লাভিং লোক যারা এখানে আছে তাদের কী হবে? তারা কোথায় যাবে? ক্যালকাটায় আজকাল এই যে এত রেফিউজী, এরাই এর জন্যে দায়ী। গভর্মেন্ট বড় বেশি কাইণ্ড এদের ওপর। এদেরই হাজার হাজার টাকা লোন দিয়ে দিয়ে আজ আমাদের মাথায় তুলে দিয়েছেন আপনারা। আমরা ওয়েস্ট-বেঙ্গলের লোক, আমাদেরই আজ এরা ক্যালকাটাতে আউটসাইডার করে দিয়েছে।

শিবপ্রসাদ গুপ্তও যা বলবার তাই বললেন।

শেষকালে পুলিস-মিনিস্টার জিজ্ঞেস করলেন—এখন পেশেণ্ট কেমন আছে?

শিবপ্রসাদ গুপ্ত বললেন—বাঁচবে কিনা সন্দেহ! কিন্তু সে তো ডাক্তারের কাজ। যখন রেফুজীরা প্রথম কলকাতায় আসে তখনই আমি শ্যামাপ্রসাদবাবুকে বলেছিলাম—এরাই একদিন ওয়েস্ট-বেঙ্গলের ইনটিগ্রিটি নষ্ট করবে। আমি যা বলেছিলুম, তাই-ই আজ ফললো।

—আপনি ডাক্তার রায়কে এ নিয়ে একটু বলুন না।

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—নিশ্চয় বলবো। ভিয়েনাতে আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, ফিরে এলেই বলবো, আমি কেন ডাক্তার রায়কে ভয় করতে যাবো আপনাদের মতো? আমি কার তোয়াক্কা রাখি মশাই? আমি কংগ্রেসেরও কেউ না, মিনিষ্ট্রিরও কেউ না, আমার ভয় কিসের? দরকার হলে পণ্ডিত নেহরুকে বলে স্পেশ্যাল পুলিসকে দিয়ে ইন্‌ভেস্টিগেশন্ করাবো—

—কিন্তু আপনার কী মনে হয়? হঠাৎ মারতে গেল কেন একজন ইনোসেণ্ট মেয়েকে?

মিস্টার বোস বললেন—আমার মেয়েকে দেখেন নি আপনি, শি ইজ এ্যান ইনোসেণ্ট গার্ল—

—কোনও পার্সোন্যাল গ্রাজ ছিল নাকি? জানাশোনা ছিল? জেলাসি?

—একটা হ্যাগার্ড মেয়ের সঙ্গে জানাশোনা থাকবে কী করে?

পুলিস-মিনিস্টার শিবপ্রসাদ গুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু আপনার ছেলের সঙ্গে?

—কী বলছেন আপনি? আমার ছেলেকে আমি চিনি না? আসলে সব-কিছুই কমিউনিস্ট্‌দের কাণ্ড, আমি আপনাকে বলছি, এই কমিউনিস্ট্‌দের যদি আপনারা এখন থেকে সাবডিউ না করেন তো এর ফল আপনাদের পরে ভুগতে হবে, তা বলে রাখছি। আমি অতুল্যবাবুকেও এ নিয়ে অনেক দিন থেকে বলে আসছি—

পুলিস মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুলিস সাব-ইন্‌স্পেকটর সবাই ইন্‌ভেস্টিগেশন শুরু করে দিয়েছে। মিস্টার বোসের এ ট্র্যাজেডি তাঁর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এ স্টেটেরও ট্র্যাজেডি, এই ওয়েস্ট-বেঙ্গল স্টেটও একদিন বিপদে পড়বে এদের হাতে, যদি এখন থেকে কালপ্রিটদের না শায়েস্তা করা যায়।

অন্ধকার সেল।

একটা সেলের সামনে গিয়ে পুলিসের লোক চাবি খুললো।

প্রথমটায় কিছুই দেখতে পায় নি সদাব্রত। তার পর হঠাৎ মনে হলো ভেতরে কী যেন একটা নড়ে উঠলো। পুলিসের লোকের হাতে টর্চ ছিল। টর্চের আলোটা পড়তেই মেয়েলি-গলায় একটা বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। বিকট আর্তনাদ। ঠিক যেমন করে মনিলা সেদিন গাড়ির ভেতর চীৎকার করে উঠেছিল যন্ত্রণায়, তেমনি। যেন টর্চের আলোটা গিয়ে বিষাক্ত তীরের মত তার গায়ে বিঁধছে। অন্ধকারে ধাঁধা লেগে গেছে চোখে। আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠেছে।

—একে চিনতে পারেন? একেই তো আপনি সেদিন দেখেছিলেন?

সদাব্রত চিনেছিল। টর্চের আলোটা অতক্ষণ মুখের ওপর না-রাখলেও চলতো—

—এ-ই তো আপনার গাড়ির পাশে ছুটে এসেছিল?

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ—

—এর সঙ্গে কি আর কেউ ছিল? আর কাউকে দেখেছিলেন এর সঙ্গে?

—না।

যে-কাজের জন্যে আসা সে-কাজ এক মিনিটেই শেষ হয়ে গেল। লোহার দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল ঝনাৎ করে শব্দ করে। সদাব্রত তখনও মাথাটা নিচু করে রইল। এতদিন পরে সেই কুন্তি গুহকে এভাবে দেখতে হবে তা যেন ভাবতে পারে নি সে। সেই কুন্তি গুহ! মাথার ওপর দিয়ে সমস্ত ঘটনাগুলো একে একে ভেসে যেতে লাগলো। সেই প্রথম দেখা শম্ভুদের ক্লাবে। তার পর সেই ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানো। তার পর একদিন বোধ হয় তার ঠিকানা খুঁজে তার বাড়িতেও গিয়েছিল। সেও ভুল ঠিকানা। তার পর সেই কুন্তি গুহর সঙ্গে দেখা ধর্মতলার রাস্তায়। শৈল জুতো সারাচ্ছিল, কুন্তি গুহ ধাক্কা দিয়েছিল ইচ্ছে করে। স্মৃতির পর্দা-গুলো একটার পর একটা খুলতে খুলতে গেলে যেন কুন্তি গুহকে নিয়ে অনেক দূরে পৌঁছনো যায়। তার পর শেষ দেখা সেই দিন। সেই যেদিন স্থভেনির

ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এর ফাউণ্ডার্স-ডে'র থিয়েটার। বাবার দেওয়া গোল্ড-মেডেলটা অপমান করে ফিরিয়ে দিলে।

—এর পানিশমেণ্ট্ কী হবে?

সাব-ইন্‌স্পেকটর ভদ্রলোক বললে—যদি গিল্‌টি প্রুভড্ হয় তা হলে ডেথ-সেন্‌টেন্স—

—ও কী স্টেটমেণ্ট দিয়েছে?

—ও স্টেটমেণ্ট দিয়েছে ও ওখানে ছিলই না—। ও একজন আর্টিস্ট, থিয়েটার করে বেড়ায় অ্যামেচার ক্লাবে—

—সে তো আমি জানি!

—আপনি জানেন? আপনি থিয়েটার দেখেছেন ওর?

—একবার দেখেছি।

—তা হলে আগে থেকেই আপনি ওকে চিনতেন?

সদাব্রত বললে—সামান্য চিনতুম। আমাদের বন্ধুদের একটা ক্লাবে ও রিহার্সাল দিতে যেত, সেখানে একবার দু'বার দেখেছি ওকে—

—আর একটা কথা···

সদাব্রত থম্‌কে দাঁড়াল।

বললে—বলুন।

—ও স্টেটমেণ্ট দিয়েছে যে ও নাকি নার্স ছিল এককালে। আপনি জানেন কিছু? কখনও কোনও ব্যাপারে ওকে আপনি কাজ দিয়েছেন?

সদাব্রত বললে—না—

—তা হলে এর পেছনে আর কী কারণ থাকতে পারে? আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন?

সদাব্রত বললে—আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

—মিস্ বোসের সঙ্গে আপনার বিয়ে হওয়ার কথাতে সেদিক থেকে ওর কিছু জেলাসি থাকা কি সম্ভব মনে করেন?

—তা কী করে থাকতে পারে? মিস্ বোসের সঙ্গে আসামীর কী সম্পর্ক? শি ইজ নো-বডি টু মি, অর টু হার—ওর সঙ্গে আমার কোনও রিলেশনই নেই, মিস্ বোসেরও নেই—

পুলিস-স্টেশনেই দেরি হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে সোজা হস্‌পিট্যাল। হস্‌পিট্যালের কেবিনের মধ্যে একটা রোগীর ঘরে তখন বিশ্বের উদ্বেগ জমা

হয়ে অসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। এত কস্‌মেটিকস্‌, এত রুজ, এত লিপস্টিক, এত ম্যাক্সফ্যাক্টর সব আজ অকেজো অকর্মণ্য হয়ে গেছে। মাথার চুল কিছুটা আছে, সেটা পেছন দিকে। চোখ মুখ নাক কান, কোন্‌টা কোন্‌ জিনিস তা বলে না দিলে চেনা যায় না। একদিন পার্ক স্ট্রীটের সেলুন এই মুখখানাকেই সাজাতে-গোছাতে অনেক টাকা নিয়েছে। ওই চুল-গুলোকেই খোঁপা বেঁধে স্কাইস্ক্রেপারের চূড়োয় পরিণত করতে তাদের অনেক মেহনত হয়েছে, আজ ওতে শুধু অয়েন্টমেণ্টই লাগাতে হয়, চামড়া ঝুলে কুঁচকে পুড়ে ঝলসে গিয়েছে, রবারের টিউব গলার একটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে খাওয়াতে হয়। এতটুকু শব্দ করা চলবে না, এতটুকু এক্‌সাইটমেণ্ট হলেও চলবে না। একটা প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ায় যত মেডিসিন আছে, সব কিনে নিয়ে এসো, আমি টাকা দেবো, আমি ষোল মিলিয়ন টাকার মালিক। আমি মিস্টার বোস। আমার ওনলি চাইল্ড। শি মাস্ট লিভ।

মিসেস বোস এসেছিলেন একদিন।

আগেই ডাক্তার বলে দিয়েছিল যে কোনও শব্দ করা চলবে না। একটু উত্তেজনা হলেই, বাপ-মা কেউ এসেছে টের পেলেই কোল্যাপ্স করবে। গাড়ি থেকে নেমেও মিসেস বোস গ্যারাণ্টি দিয়েছিলেন যে তিনি মনিলাকে একবার মাত্র দেখেই নিঃশব্দে ফিরে আসবেন।

কিন্তু কেবিনের ভেতর ঢুকে হঠাৎ যেন ভূত দেখলেন তিনি।

আর বলা নেই কওয়া নেই একটা বিকট চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। তাঁর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। হস্‌পিট্যাল স্টাফ স্ট্রেচার এনে অনেক কষ্টে তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। একটা বিপদের ওপর আর একটা বিপদে মিস্টার বোস সেইখানে দাঁড়িয়েই পকেট থেকে প্যাকেট বার করে ট্র্যাঙ্কুলাইজার-পিল খেয়ে নিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—আমার ওনলি চাইল্ড, শি মাস্ট নট ডাই ডক্‌টর, ওকে যেমন করে পারেন বাঁচাতেই হবে, ওর বাঁচা চাই-ই—

প্রত্যেক দিনের মত সদাব্রত সেদিনও এলো। প্রত্যেক দিনের মত সেদিনও সে নিঃশব্দে এসে মাথার কাছে দাঁড়াল। কথা বলা বারণ। কেমন আছ মনিলা—তা জিজ্ঞেস করাও অপরাধ। চারটে নার্স, তিনটে দাই, ছ'টা ডাক্তার সব সময় অ্যাটেণ্ড করছে পেশেণ্টকে। সুতরাং মনিলার বাঁচা চাই-ই চাই।

মিস্টার বোসের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীকে বাঁচাতেই হবে। নইলে অনেক টাকা আইড্‌ল্‌ হয়ে যাবে। দশ ভূতে লুটেপুটে খাবে। ষোল মিলিয়ন টাকা, আর স্নুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এর মালিকানা সব বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। তাকে বাঁচানো চাই-ই চাই। শি মাস্ট লিভ, শি মাস্ট!

প্রত্যেক দিনই এমনি করে এখানে আসতে হয়, এসে এই জড়-পদার্থটার সামনে দাঁড়াতে হয়, খানিকটা মানসিক উদ্বেগ প্রকাশ করতেও হয়, আবার তার পর মুখটা নিচু করে চলে আসতেও হয়। সদাব্রতর ভাবতেও কেমন অবাক লাগে একদিন এই শরীরটাই জিন না হলে চাঙ্গা হয়ে উঠতো না, একদিন এই মুখটাই ম্যাক্সফ্যাক্টর না মেখে রাস্তায় বেরোতে পারতো না। আর আজ সেই চেহারাটাই এমনি করে অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

মিস্টার বোস আসেন।

চুপি চুপি গলা নিচু করে জিজ্ঞেস করেন—হাউ ইজ শি?

সদাব্রত বলে—ভালো—

—এনি হোপ?

বোঝা যায় আজকাল ড্রিঙ্কের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন মিস্টার বোস। রেসখেলার মাঠে আরো বেশি টাকা স্টেক করেন। ক্লাবে গিয়ে আরো বেশিক্ষণ কিটি খেলেন। তার পর যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখন মিসেস বোসের ডিনার শেষ হয়ে গেছে। তিনি বিছানায় গিয়ে বেড-ল্যাম্পের আলোয় রেসের হ্যাণ্ডিক্যাপ-বইটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। তার পর তিনিও স্লিপিং-পিলটা মুখে পুরে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেন।

তার পর সেই চূড়ান্ত দিন এলো।

এ ক'দিন বড় অস্বস্তিতে কেটেছে সদাব্রতর। শুধু সদাব্রত কেন, সমস্ত কলকাতার লোকদেরই বড় অস্বস্তিতে কেটেছে। স্নুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এর স্টাফের মধ্যেও একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তারা দূর থেকে দেখে। সদাব্রতর গাড়িটা অফিসে ঢোকবার সময় দূর থেকে তারা লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখে। কিছু মন্তব্যও করে হয়ত। কিন্তু সদাব্রতর কানে আসে না কিছু। কিন্তু আন্দাজ করা যায় সব।

—এইবার গুপ্ত সাহেবের কী হবে ?

—আর কী হবে, চাকরি যাবে—

—ওদের চাকরি মাইরি গেলেই বা কী আর থাকলেই বা কী ? ওর বাবার টাকাই বা খায় কে ? ওই তো এক ছেলে—

শিবপ্রসাদ গুপ্তর কিন্তু সত্যিই এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। তিনি আরো বড়-বড় ব্যাপার নিয়ে বিচলিত। ইণ্টারন্যাশন্যাল পলিটিক্স্ নিয়ে তাঁর ভাবতে হয়। এশিয়াতে কোন্ পাওয়ার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তা তিনি প্রত্যেক দিন খবরের কাগজের পাতায় লক্ষ্য রেখে চলেছেন। সুয়েজ-ক্যানেলের ঘটনার পর থেকেই পলিটিক্স্ অন্য পথে মোড় ঘুরে গেছে। পণ্ডিত নেহরুর সুপ্রিমেসীটা ইজিপ্টের নাসেরের হাতে গিয়ে পড়লো। এর পর আস্তে আস্তে সিরিয়া ইরাক সৌদি-এ্যারাবিয়া সব চলে গেল অ্যাংলো-আমেরিকার হাত থেকে। ইজরায়েলকে সবাই এবার কোণঠাসা করে দেবে। এইবারই হচ্ছে আসল ভয়ের পালা। কে কোন্ দলে থাকবে। এইবারই ইণ্ডিয়ার ওপর চাপ পড়বে। এইবারই ইণ্ডিয়ার জবাবদিহি চাইবে ওরা। বলবে—তুমি কোন্ দলে, বলো ? আর ঝাপ্‌সা কথা শুনতে চাই না, স্পষ্ট করে খুলে বলো—

সেদিন খবরের কাগজ খুলে দেখতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়লো। এ তো সেই মিস্ বোসের কেস !

ডাকলেন—বিশ্বিনাথ—

বিশ্বিনাথ আসতেই বললেন—হ্যাঁ রে, খোকাবাবু কোথায় ?

—আজ্ঞে দাদাবাবু তো অফিসে চলে গেছেন।

মন্দাকিনীও কিছু বলতে পারলে না।

শিবপ্রসাদ গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন—কোর্টে মামলা উঠে গেছে বুঝি ?

মন্দাকিনী বললে—তা তো জানি না—

—আজকের কাগজে যে দেখলুম।

তা হবে। মন্দাকিনী কোনও কিছুতেই থাকে না। কোনও ব্যাপারে মন্দাকিনী থাকুক সেটাও কেউ চায় না বোধ হয়। নইলে এই সংসারের বাইরে তার একটা আলাদা অস্তিত্ব নেই কেন ? তার স্বামী তার ছেলে কী করে, কোথায় যায়, কখন আসে তার খবরাখবর দেওয়ার প্রয়োজনও কখনও বোধ করে নি তারা। এই সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে তোমার সাম্রাজ্য

নিয়ে তুমি সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকো, আমাদের ব্যাপারে তুমি মাথা ঘামাতে এসো না। এই কলকাতা শহরের মধ্যেই যে এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, এত পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট, এত ক্লাব, এত কিটি, এত টি-বি, এত ঝঞ্ঝাট, এত ঝামেলা, সব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তোমাকে আমরা নিশ্চিন্তি দিয়েছি, এর জন্তে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তুমি গৃহিণী, তোমার জানবার দরকার নেই ল্যাণ্ড-ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশনের কত প্রফিট্ কত লস্ হলো। তোমার জানবার দরকার নেই সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এর অফিসে তোমার ছেলে দু-হাজার টাকা মাইনে পেয়ে কোনও ব্যাঙ্কে সে-টাকা রাখে, না সে-টাকা সে দাতব্য করে।

সেদিন হঠাৎ বন্তিনাথ তাড়াতাড়ি ভেতরে এসেছে।

—মা, একজন লোক তোমাকে ডাকছে।

মন্দাকিনী অবাক হয়ে গেল। আমাকে কী রে? কে? আমাকে ডাকতে যাবে কেন? তুই নিশ্চয়ই ভুল শুনেছিস—

বন্তিনাথ বললে—না মা, আমি বলেছি বাড়িতে বাবুরা কেউ নেই, তবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে—

—কে? কারা? কী চায়?

এমন তো হয় না। মন্দাকিনীর সঙ্গে একমাত্র গয়লা, ঘুঁটেওয়ালা, বাসন-মাজা-ঝি আর ঠাকুর-চাকরের দরকার থাকে। তবু তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে আসতেই অবাক হয়ে গেল অচেনা কয়েকটা মুখ দেখে।

মন্মথ বসে ছিল। মন্দাকিনীকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠলো।

—আমি তো চিনতে পারছি না ঠিক।

কেদারবাবু এগিয়ে গেলেন। বললেন—আমাকে আপনি দেখেছেন মা, আমি সদাব্রতর মাস্টার, সেই মধু গুপ্ত লেনে আমি রোজ পড়াতে যেতুম—

তবু চিনতে না পারারই কথা। পাশের চেয়ারে একটি মেয়ে বসে ছিল চুপ করে।

—এ আমার ভাই-ঝি, শৈল, শৈল মা, তুমি ওঁকে প্রণাম করো—

শৈলর উঠতে বা প্রণাম করতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মন্দাকিনী নিজেই বাঁচিয়ে দিলে।

—না না, প্রণাম করতে হবে না মা, আমি এখনও বাসি কাপড়ে আছি—

মন্মথ বললে—আমরা পুরী থেকে সোজা এখানে আসছি, মাস্টার মশাইয়ের অসুখের জন্যে সেখানে গিয়েছিলুম, কিন্তু খবরের কাগজে সদাব্রতদার অ্যাকসিডেণ্টের খবর পড়বার পর আর মাস্টার মশাই থাকতেই চাইলেন না। বললেন, আর এক মিনিটও এখানে থাকবো না, টিকিট পেতে দশ-বারো দিন দেরি হলো তাই, নইলে আমরা আরো আগেই চলে আসতাম—হাওড়া স্টেশন থেকেই সোজা এখানে চলে আসছি—

কেদারবাবু থামিয়ে দিলেন মন্মথকে। বললেন—তুমি থামো তো, তুমি বড় বাজে কথা বলো—আপনি বলুন তো মা, সদাব্রতর কী হলো? খবরের কাগজে তো সব খবর পাই নি। কে এমন সর্বনাশ করলে? আমি তো শুনে পর্যন্ত মা বড় অস্থির হয়ে আছি—

মন্দাকিনী বললে—কী জানি বাবা, আমিও ঠিক সব জানি না—

—আপনি জানেন না? তা হলে কে জানে? কার কাছে গেলে সব জানা যাবে? সদাব্রত কোথায়?

—সে তো অফিসেই গেছে সকালবেলা।

—তা হলে অফিসেই যাই আমরা। তা হলে অফিসেই চলো মন্মথ—এখন উঠি মা আমরা, চল্ শৈল, সদাব্রতর অফিসে যাই—মহা ভাবনায় পড়া গেল দেখছি—

মন্মথ বোধ হয় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল একটু। বললে—সারা রাত ট্রেনে এসে এখন আবার সদাব্রতদার অফিসে যাবেন? একটু খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করে…

—তুমি থামো তো! চল শৈল, তুই যে বসতে পেলে আর উঠতে চাস না রে—

মন্দাকিনী বললে—তোমাদের কি কারো খাওয়া-দাওয়া হয় নি?

কেদারবাবু বললেন—খাওয়া হবে কী করে? সদাব্রতর এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল আর আমি খাবো? বিয়েটা বন্ধ হয়ে গেল তো? দু-হাজার টাকার চাকরিটা কি আর এর পরে থাকবে? মহা ভাবনায় পড়া গেল দেখছি—

—তা আমাদের এখানে খাবে বাবা তোমরা? আমার তো উনুনে এখনও আগুন রয়েছে…

কেদারবাবু দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। বললেন—উনুনে আগুন রয়েছে?

—হ্যাঁ, ঠাকুরকে বললে এখুনি ভাত ফুটিয়ে দেবে—

কেদারবাবু শৈলর দিকে ফিরলেন। বললেন—কী রে, খাবি? খিদে পেয়েছে তোর? লজ্জা করিস নি, বল্, এখনও উনুনে আগুন রয়েছে, ঠাকুরকে বললেই দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে—

তার পর মন্দাকিনীর দিকে ফিরে বললেন—শুধু ভাত? আর কিছু নেই? একটা আলু ভাতে আর একটু মুগের ডাল—

শৈল বাধা দিয়ে বললে—তুমি থামো তো কাকা!

কেদারবাবু বললেন—কেন? অন্যায়টা কী বলেছি? এরা বড়লোক, আমরা তিনজন খেলে আর কতই বা খরচ হবে, কী বলুন মা—

মন্মথ বললে—কিন্তু আমাদের বাড়িতেও তো রান্না হয়েছে, আমি বাড়িতেও খবর দিয়েছি যে—

কেদারবাবু রেগে গেলেন—তুমি বড় বাজে বকো মন্মথ, তোমাদের বাড়ির খাওয়া আর এ-বাড়ির? এ-বাড়ির সঙ্গে তুলনা করছো তোমাদের বাড়ির? সদাব্রতরা কত বড়লোক তা জানো? তোমার বাবাকে কিনে নিতে পারে। কী বলুন মা, আমি অন্যায় কিছু বলেছি?

মন্দাকিনীর হাসি পেয়েছিল। কিন্তু শৈল ততক্ষণে উঠে পড়েছে। উঠে মন্মথকে বললে—মন্মথদা, তুমি চলো, আমার সঙ্গে চলো তো, কাকা এখানে থাকুক—

বলে সোজা বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

কেদারবাবু ভাইঝির ব্যবহারে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মন্মথও তখন বাইরে চলে গেছে। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। ট্যাক্সির ভেতরে বাক্স বিছানা, যাবতীয় জিনিস।

কেদারবাবু ভাইঝির ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। এমন আরাম, এমন আদর কেউ অবহেলা করতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

উপায় না দেখে তিনিও সিঁড়ি দিয়ে আবার ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন সকলের সঙ্গে। ওঠবার আগে মন্দাকিনীকে বললেন—সদাব্রতকে তা হলে বলে দেবেন মা, যে আমরা এসে গেছি, শৈল মন্মথ সবাই এসে গেছি বলে দেবেন, ভুলে যাবেন না যেন আবার—

ট্যাক্সিটা হু-হু করে চলে গেল।

কোর্টের ভেতরে আসামীর কাঠগড়ায় তখন একটা মানুষের মূর্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের পদধ্বনি শুনছে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, তোমরা দেখ আমি আজ আসামী। এতদিন আমিই ছিলাম ফরিয়াদী। আমার ফরিয়াদ একদিন এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস-অন্তরীক্ষকে স্পর্শ করেছিল। আমি খেতে পেয়েছি কি পাই নি তা নিয়ে এরা সেদিন মাথা ঘামায় নি। আমি সেদিন আছি কি নেই তার খবরও কেউ নেওয়া দরকার মনে করে নি। আমার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেদিন সবাই অচেতন ছিল। যেটা সম্বন্ধে সবাই সচেতন ছিল সে আমার বয়েস। সে আমার স্বাস্থ্য। সেদিন আমার বয়েস দেখে আমার স্বাস্থ্য দেখে লোকে আমাকে সোনার মেডেল দিয়েছে। আমার অভিনয় দেখে হাততালি দিয়েছে। আমার পাশে শোবার জন্যে টাকা দিয়েছে। অকল্যাণ্ড প্রেসের বড়বাবু—সেই বিভূতিবাবু থেকে শুরু করে শেঠ ঠগনলাল পর্যন্ত সবাই আমার সঙ্গে শুয়েছে, আমাকে হাততালি দিয়েছে আর দরকার ফুরিয়ে গেলে আবার জুতোর শুকতলার মত আমাকে দু'পায়ে মাড়িয়েছে। আমার রাত কেটেছে কেঁদে, দিন কেটেছে অভিনয় করে আর রিহার্সাল দিয়ে। আমার থাকবার আশ্রয়টুকু পর্যন্ত এরা গুণ্ডা লাগিয়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সে-আগুনে আমার বাবাও পুড়ে মরেছে। তবু আমি এক হাতে চোখের জল মুছে মুখে রং মেখে থিয়েটারে রাণী সেজেছি। আমার এ ফরিয়াদ কেউ কান পেতে শোনে নি। যারা সেদিন আমার পাশে শোবার জন্যে টাকা দিয়ে খোসামোদ করেছে, আজ তারাই আমাকে আসামী বানিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

এক-একজন সাক্ষী আসে আর কত কী বলে যায়। কিছুই কানে ঢোকে না কুন্তি গুহর। ক'দিন থেকেই কোর্টে যেন মানুষের মেলা বসে গেছে।

শম্ভু এসেছিল। সাক্ষী শম্ভুবাবু।

—আপনাদের ক্লাবে আসামী রিহার্সাল দিতে যেত?

—হ্যাঁ।

—তা হলে আপনি তো একে চেনেন! এখন বলুন তো এর স্বভাব-চরিত্র কেমন?

—ভালো।

—আপনি কি জানেন যে এই আসামীই সোনাগাছির বেশ্যাবাড়িতে টগর নাম নিয়ে পাপ-ব্যবসা করতো ?

পাবলিক প্রসিকিউটারের এই প্রশ্নে শম্ভু চমকে উঠলো। বললে—আমি জানি না তো ?

—আচ্ছা আপনি আসুন।

পরের সাক্ষী পদ্মরাণী। পদ্মরাণী মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসে সাক্ষীর জায়গায় দাঁড়াল।

শেষ পর্যন্ত শশীপদবাবুর বাড়িতে গিয়েই ট্যাক্সিটা থামলো। কেদারবাবু, মন্মথ, শৈল তিনজনেই। সেই কাল রাত্রে পুরী থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন। প্রত্যেক মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছে সদাব্রত। এত কাজের মধ্যেও সদাব্রত টাকা পাঠাতে ভোলেনি। রেজিস্টার্ড খামের ভেতর মাসের তেসরা তারিখে পিওন এসে যথারীতি টাকা দিয়ে গেছে। আর রসিদের ওপর সই করে নিয়েছেন কেদারবাবু।

সাত শো করে টাকা মাসে। তাতেও মাঝে-মাঝে কম পড়তো।

দুধের দাম বাড়ছে, ওষুধের দাম বাড়ছে, চালের দাম বাড়ছে। প্রথমে গিয়ে যে-দরে চাল কিনেছিলেন পরে সেই চালই দেড়া দরে কিনতে হয়েছে। আর ওষুধ ? টাকা দিলেই কি ওষুধ পাওয়া যায় !

একদিন রেগে গিয়েছিলেন মন্মথর ওপর।

বললেন—ওষুধ পাওয়া যায় না মানে ? বললেই হলো ওষুধ পাওয়া যাবে না ? চলো আমি তোমার সঙ্গে দোকানে যাবো—

মন্মথ ক'টা মাস যে কী ভাবে কাটিয়েছে তা মন্মথই জানে। কেদারবাবু একজন সরল আদর্শগতপ্রাণ মানুষ। মানুষের ওপর আর মানুষের গভর্মেণ্টের ওপর অচল ভক্তি নিয়ে তিনি পৃথিবীতে বাঁচতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রতিবার তাঁকে আঘাত পেতে হয়েছে। প্রতিবার আঘাতের পর আঘাত পেয়ে পেয়ে আজকাল যেন কেমন একটু স্তিমিত হয়ে এসেছেন।

এক এক সময়ে বলতেন—না মন্মথ, আর হবে না—

—কী হবে না স্যার ?

—আমাদের দ্বারা কিছু হবে না, আমাদের মর‍্যাল ক্যারেক্‌টারই খারাপ হয়ে গেছে—

কেদারবাবুর কোনও কাজ ছিল না পুরীতে, তাই আরো বেশি ভাববার সময় পেতেন। ভেবে ভেবেই তাই তাঁর শরীরটা তত ভাল হতো না। হেগেল বলে গেছে : State is the natural, necessary and final form of human organisation. গান্ধীজী সে-মত মানতেন না। গান্ধীজীর মত ছিল : An ideal state should be an ordered and enlightened anarchy. In such a state everyone is his own ruler. He rules himself in such manner that he is never a hindrance to his neighbours. In this ideal state therefore there is no political power because there is no state.

পুরীর সমুদ্রের হু-হু করা হাওয়ায় বসে বসে এই সব আকাশ-পাতাল ভাবতেন তিনি। কার কথাটা সত্যি ? কিসে মানুষের ভাল হবে ? কেমন করে মানুষের মঙ্গল হবে ? একজন গভর্নর কি একজন প্রেসিডেণ্টকে বদলালে যদি ভালো হতো তো নেপোলিয়ন মারা যাবার পর ফ্রান্সে তো শান্তি আসতো। ফজলুল হক একদিন বাংলার চীফ-মিনিস্টার ছিল। ফজলুল হক সরে গেলেই যদি বাংলাদেশে শান্তি আসতো তো আজ তো বাংলাদেশে আর দুঃখ থাকতো না কারো। সে ফজলুল হকও নেই, সেই নাজিমুদ্দিন সাহেবও নেই, তা হলে কেন চালের দাম বাড়ে আর ওষুধে ভেজাল মেশানো হয় ?

ইউক্লিড সাহেব বহুদিন আগে লাইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখে গিয়েছিলেন —A line is one which has length but no breadth. কিন্তু ইউক্লিড সাহেবের লাইনের মত লাইন কি কেউ টানতে পেরেছে ? এ কি সম্ভব ? হয়ত এটা আদর্শের কথা। কিন্তু এই আদর্শের কথা মনে রেখেই তো জিওমেট্রি এগিয়ে চলেছে আজো। সব মানুষও তেমনি ভাল হবে সৎ হবে, এ সম্ভব না-ই বা হলো, মানুষের গড়া গভর্মেণ্ট তো এগিয়ে যাবে ! তা কেন যাচ্ছে না ?

কেদারবাবু সামনে কাউকে পেলেই জিজ্ঞেস করতেন—কী গো মন্মথ, তুমি কী বলো ? এগিয়ে যাচ্ছে না কেন ?

মন্মথ এ-কথার কী উত্তর দেবে। তার অনেক কাজ। বাজার করা,

ওষুধ কেনা, সব তো তার ওপরেই ভার। শৈল যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। বেশি কথা বলতো না।

কেদারবাবু শৈলকেও জিজ্ঞেস করতেন—কী রে শৈল, তুই কী বলিস?

প্রথম প্রথম শৈল কাকার কথায় কান দিত। কিন্তু পরে আর কিছু শুনতো না।

কেদারবাবু বলতেন—হ্যাঁ রে, তোরা কেউই কিছু বলবি না? কেউই কিছু ভাববি না? আমি একলাই ভাববো?

শৈল তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিত—আমরা তো আর পাগল নই কাকা, আমাদের অনেক কাজ আছে—

সত্যিই তো! কেদারবাবু আর রেগে উঠতেন না তখন। সবাই কেন তাঁর মত ভাবতে যাবে? সবাই-ই যদি ভাবতো তা হলে তো পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠতো। বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন কেদারবাবু। সবাই শাড়ির কথা ভাবছে, সবাই গয়নার কথা ভাবছে। সবাই প্রমোশন, ডিভিডেণ্ড, প্রফিটের কথা ভাবছে। টাকা, গাড়ি, বাড়ি, যশের কথা ভাবছে। নিজের প্রয়োজনের বাইরে ভাববার সময় কারো নেই। কেন জিনিসের দাম বাড়ে, কেন যুদ্ধ হয়, কেন সৎ লোক রাতারাতি অসৎ হয়ে যায়, কী তার ঐতিহাসিক কারণ, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অথচ তোমার পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে তুমিই কি বেঁচে যাবে? পাকিস্তানে অশান্তি হলে তোমার ইণ্ডিয়াই কি রেহাই পাবে? বর্মা, ইজিপ্ট, সিলোনে রিভলিউশন হলে তুমিই কি শান্তিতে থাকতে পারবে?

ঠিক এই সময়ে খবরটা বেরিয়েছিল। খবরের কাগজে সদাব্রতর খবরটা পড়ার পরই কেদারবাবু আর পুরীতে থাকতে চাইলেন না। তাঁর মনে হলো তাঁর অঙ্ক যেন মিলে গিয়েছে। এখন? আমি তখনই তো বলেছিলাম পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করার দিন ফুরিয়ে গেছে। এখন সব সময় সাবধান থাকতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেসব দিন কাটিয়ে গেছেন, সে-সব দিন আর নেই। এখনও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তো আমরা তলিয়ে যাবো। আমরা ভেসে যাবো। বাড়িতে এসেই হার্বার্ট রীডের বইটা নিয়ে খুলে বসলেন—

বললেন,—এই দেখ, কী লিখেছে দেখ হার্বার্ট সাহেব—

তার পর পড়তে লাগলেন—It is a society with leisure—that

is to say spare time—without compensatory occupation out of which crime gangsterdom andfascism inevitably develop.

তার পর পিয়ারীলালের বইটাও খুলে দেখালেন—এই দেখ, পিয়ারীলাল লিখেছেন—There is a growing class of people today in our midst who are proud of the jobs because of their remuneration and social status it gives them but they hate the very sight of their work. It is they who, to cover the essential emptiness of boredom of their occupation give themselves up to the advancement of morbid dreams of ambition and power.

তার পর হঠাৎ মুখ তুলে দেখলেন সামনে কেউ নেই। মন্মথ শৈল কোথায় চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেউ শোনে না তাঁর কথা। কেউ শুনতেও চায় না। জানতেও চায় না।

আর তার পর দিনই চলে এলেন কলকাতায়। সদাব্রতর সঙ্গেই প্রথম দেখা করবার ইচ্ছেটা ছিল। সদাব্রত থাকলে হয়ত কথাগুলো বুঝতো। কথাগুলো তাকে শুনিয়েও আরাম পাওয়া যেত। আজ না-হয় একটা মেয়ে ধরা পড়েছে, আজ না-হয় একটা মেয়েই চোখ মুখ পুড়ে গিয়ে হাসপাতালে উঠেছে। কিন্তু যেদিন এর চেয়েও বেশি হবে? যেদিন আরো ভয়াবহ হয়ে উঠবে ইণ্ডিয়া, সেদিন? সেদিন কী হবে? সেদিনের কথা ভেবেই কেদারবাবু শিউরে উঠেছেন মনে মনে।

শশীপদবাবু অফিসে চলে গিয়েছিলেন তখন। মন্মথ মাকে চিঠি দিয়ে দিয়েছিল আগেই। খাবার-দাবার সব তৈরীই ছিল।

ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মন্মথর মা বললে—এসো মা, এসো এসো—

কেদারবাবু বললেন—আপনি মা শৈলকে আগে দুটি খেতে দিন, না খেয়ে আমার ওপর খুব রেগে আছে, আমার সঙ্গে কথাই বলে নি কাল থেকে—

—কেন, আপনারও তো খাওয়া হয় নি, আপনি খেয়ে নিন, আমার সব তৈরী—

মন্মথ বললে—মা, ওপরের বড় ঘরটায় মাস্টার মশাই থাকবেন, ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে দাও—

—সে তোকে ভাবতে হবে না, আমি সব গুছিয়ে রেখেছি—

সন্ধ্যেবেলাই সদাব্রত এলো। একেবারে সোজা কোর্ট থেকে। মাথাটা ক'দিন থেকেই ভারী হয়ে আছে। ওদিকে একবার করে হস্‌পিট্যাল, আর একবার করে কোর্ট। একদিন এই কলকাতাই সে দেখতে বেরোত। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় একটা জায়গায় সেটাকে রেখে হেঁটে বেড়াত। এই মানুষ, কলকাতার নতুন যুগের মানুষকে দেখতে ভাল লাগত তার। কত অভাব—কত অসহায় এই মানুষগুলো। কিন্তু অকুপেশন কেউ তাদের দেয় না, তাই তারা ঘুরতে বেরোয়। তাই এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে ফ্রকের দর করে, গেঞ্জির দর করে, তার পর আবার নিরুদ্দেশ চলতে শুরু করে। সেই বিনয়ের মত কেবল ইনস্টলমেণ্টে সুট কেনে, সেই শম্ভুদের মত কেবল ড্রামাটিক ক্লাব করে।

কিন্তু আজ এতদিন পরে সেই কোর্টের মধ্যেই যেন সমস্ত কলকাতাটা দেখতে পেলে সে।

কোথাকার কোন্ পদ্মরাণী। সেও সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। এতদিন এরা কোথায় ছিল? এরাও কি এই কলকাতার মানুষ?

প্রথম দিকটা ট্রায়াল হয়েছিল লোয়ার কোর্টে। সবাই যা-কিছু বলবার বলেছে। ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেট কেসটা পাঠিয়ে দিয়েছে হাইকোর্টে। কজিং গ্রিভিয়াস ইনজিওরি অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার।

পদ্মরাণী বলেছিল—না বাবা, ও আমার কেউ নয় বাবা, পেটের মেয়েও নয়, পুষ্যি মেয়েও নয়—

—বেশ ভাল করে দেখুন, আসামীর নাম কুন্তি গুহ না টগর?

—ওমা, কুন্তি গুহ কেন হতে যাবে? ও তো আমার টগর। আমার ফ্ল্যাটে ঘর ভাড়া নিয়েছিল।

—কিসের জন্যে ঘরভাড়া?

—এই বাবা, একটু গান-বাজনা হয়, আমার মেয়েরা আবার নাচ জানে কিনা। তা আমি বলি ভদ্দরলোকের ছেলেরা যদি আমার এখানে বসে একটু…

—আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি কি কখনও একে থিয়েটার করতে দেখেছেন?

—ওমা, থিয়েটার করবে কী করে বাবা ! আমিই থিয়েটার করতে পারি নে তা ও ?

—আপনি বাড়ি ভাড়া দিয়ে কত টাকা উপায় করেন মাসে ?

—তা কি হিসেব আছে বাবা ? হিসেবই যদি রাখতে পারবো তো আমার আজ এই দুর্দশা ?

—কত উপায় করেন তা জানেন না ?

—না বাবা, মনে নেই !

—আচ্ছা আপনি এবার নেমে যান—

পদ্মরাণীর বোধ হয় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল। অনেক পুলিস অনেক উকিল দেখেছে পদ্মরাণী জীবনে। কিন্তু এমন বিপদে কখনও পড়ে নি।

যে-পদ্মরাণী নীচের কোর্টে সাক্ষী হয়ে আগাগোড়া মিথ্যে বলে এসেছে, হাই-কোর্টে গিয়ে সেই পদ্মরাণীই জেরার মুখে জেরবার হয়ে গেল। একেবারে উল্টো কথা বলতে লাগলো।

—আপনি সুন্দরিয়া বাইয়ের নাম শুনেছেন ?

কপালে মুখে দর-দর করে ঘাম ঝরছে পদ্মরাণীর। পদ্মরাণীর চেহারা দেখে কোর্টসুদ্ধ্ লোক অবাক হয়ে গেছে। আগের দিন যারা দেখেছে তারা দেখেছে পদ্মরাণীর পাতা-কাটা চুল, মুখে পানের দাগ। বেশ মোটা-সোটা গোলগাল নাদুস-নুদুস চেহারাটি। কোর্টের ভেতরে খুন-খারাপির মামলা দেখতে বেকার লোকের অভাব হয় না। সোনাগাছির বাড়িওয়ালীর জেরার দিনে সবাই অফিস-কাছারি ফেলে শুনানি শুনতে ছুটে এসেছে। কত মাস ধরে মামলা চলছে। বড় ঘরের কেচ্ছা শুনতে যেন কারো আলস্য নেই। শুধু খবরের কাগজের শুকনো রিপোর্ট পড়েও কারো তৃপ্তি নেই। আসামীকে নিজের চোখে দেখতে হবে। থিয়েটারে যাকে প্লে করতে দেখেছে, এখানে সে রক্ত-মাংসের মানুষ। দিনের পর দিন সেই রক্ত-মাংসের মানুষটাকে দেখতে পাওয়া যাবে। এই মেয়েটাকেই কলকাতার মানুষ রাত্রে উপভোগ করেছে কতদিন। কত লোককে টাকা নিয়ে ঘরে বসিয়েছে। আবার কোনও দিন সিরাজ-উদ্দৌলা নাটকে আলেয়া সেজে নেচেছে, গান গেয়েছে। একই মেয়ের দুটো নাম। কখনও কুন্তি গুহ, কখনও টগর।

পাড়ায় পাড়ায় বাড়ির রোয়াকে রোয়াকে আড্ডায় আলোচনায় সব সময় কুন্তি গুহর নাম।

কেউ বলে—আসলে মেয়েটা কমিউনিস্ট, জানিস—পেছনে কমিউনিস্টরা আছে—

আবার কেউ বলে—দূর, কমিউনিস্ট কেন হতে যাবে, পেছনে কংগ্রেসের লোকেরা আছে—শিবপ্রসাদ গুপ্তর ছেলেটার সঙ্গে কিছু লট-ঘট আছে নিশ্চয়ই—

এক-একদিন হিয়ারিং হয়, আর হাওয়া উল্টে যায় রাতারাতি।

—আরে সুন্দরিয়া বাঈটাই হচ্ছে আসল সাপ্লায়ার, তা জানিস?

—কে সুন্দরিয়া বাঈ?

সুন্দরিয়া বাঈয়ের নাম লোয়ার কোর্টে ওঠে নি। উঠেছে হাইকোর্টে। কোথায় কোন্ রাজপুতানায় জয়পুরে থাকে। সে পদ্মরাণীকে মেয়ে সাপ্লাই করে। গ্রাম থেকে মেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে এসে ভালো দরে বেচে দেয় পদ্মরাণীকে। শুধু রাজপুতানা নয়, উড়িষ্যা, ইউ-পি, বেহার, আসাম, ঈস্ট-পাঞ্জাব, সব স্টেট থেকে দালালেরা মেয়ে নিয়ে এসে বেচে যায় পদ্মরাণীকে। পদ্মরাণী তাদের সাজিয়ে-গুছিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করে তোলে। তার পর তাদের ইনকামে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে খায়।

আর শুধু কি তা-ই। বাইরে থেকে মেয়েরা ঘর ভাড়া নিয়ে এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ব্যবসা করে টাকা উপায় করে। কারোর বাড়িতে ছেলে-মেয়ে-স্বামী আছে। তারাও এখানে ঘর-ভাড়া নেয়।

এক-একদিন এক-একটা ঘটনা জেরায় বেরিয়ে পড়ে আর সমস্ত কলকাতার লোকের চোখ কপালে ওঠে। এ-ও সম্ভব মশাই! ভেতরে-ভেতরে এত কাণ্ড হচ্ছে? বাইরে তো প্ল্যানিং-কমিশন আর ফরেন-এডের কথা শুনি, আর ভেতরে ভেতরে এই?

রোয়াকে রোয়াকে ক্লাবে ক্লাবে কলকাতার মানুষের মুখে আর কোনও কথা নেই। অফিস-পাড়ায়ও এই একই আলোচনা।

লোয়ার কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট কুন্তি গুহকে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কিছু বলবার আছে?

দিনের পর দিন চুপ করে শুধু শুনেছে কুন্তি গুহ। একজনের পর একজন পাবলিক-প্রসিকিউটারের জেরার উত্তরে কথা বলে গেছে, আর কথাগুলো তার কানেই ঢুকেছে শুধু। একদিনও একটা কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয় নি। কুন্তি গুহ জানে এ-কলকাতা শুধু তার সর্বনাশ করতেই পারে, তার ভাল করবার ক্ষমতা নেই কারো। বুড়ির মকদ্দমার সময়েই সে দেখেছে এ-কলকাতাকে।

কেউ খবর নেওয়ার দরকার মনে করে নি কেন সে চুরি করে, খবর নেওয়ার দরকার মনে করে নি কেন সে অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ছুঁড়ে মারে! যদি খবর নিত?

ম্যাজিস্ট্রেট আবার বললে—তুমি তো সব শুনলে! যিনি এ-কেসের প্রধান সাক্ষী সেই সদাব্রত গুপ্ত নিজেই তোমাকে অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ছুঁড়তে দেখেছেন। এ-সম্বন্ধে তোমার কী বক্তব্য? তুমি দোষী না নির্দোষ?

কুন্তি গুহ মাথা নীচু করে বললে—আমি নির্দোষ—

ম্যাজিস্ট্রেট বোধ হয় কথাটা ভাল করে শুনতে পায় নি।

বললে—আর একটু স্পষ্ট করে বলো, আমি শুনতে পাই নি—

সমস্ত কোর্ট-ঘর থমথমে হয়ে এলো।

কুন্তি গুহ এবার স্পষ্ট গলায় বললে—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ!

সদাব্রত একবার চেয়ে দেখলে কুন্তি গুহর দিকে। তার পর দু'পাশে দু'জন কনস্টেবল এসে আসামীকে নিয়ে কোথায় চলে গেল। কোর্টসুদ্ধ্‌ লোক নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। যে-মেয়ে বাজারের লোকের ভোগ্যা সেও নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে। এর চেয়ে হাসির ঘটনা যেন আর কিছু নেই। এর চেয়ে অবাস্তব কাহিনী যেন আর কিছু হতে পারে না। এর চেয়ে বড় মিথ্যে আর আবিষ্কার হয় নি পৃথিবীতে।

কিন্তু হাইকোর্টে সেদিন পদ্মরাণী নাস্তানাবুদ হয়ে গেল।

স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল আবার প্রশ্ন করলে—আপনি সুন্দরিয়া বাঈয়ের নাম শুনেছেন?

পদ্মরাণী কী বলবে বুঝতে পারলে না।

—বলুন, শুনেছেন কি-না? আর যদি না শুনে থাকেন তো সেই সুন্দরিয়া বাঈকে আমরা ডেকে এনেছি তিনিই বলবেন আপনি তাকে চেনেন কি-না! এখন বলুন আপনি, তার সঙ্গে আপনার কিসের সম্পর্ক?

পদ্মরাণী বললে—বাবা, তাকে আমি মাঝে-মাঝে টাকা পাঠাতাম।

—মাঝে-মাঝে না মাসে-মাসে?

—মাসে মাসে।

—কেন টাকা পাঠাতেন তাকে ?

—সে আমার উপকার করতো !

—কী উপকার ?

—যে-সব মেয়েদের কেউ দেখবার-শোনবার নেই, অভাবী মেয়ে, তাদের পাঠিয়ে দিতো আমার কাছে, আমি তাদের খাওয়াতাম পরাতাম মানুষ করতাম—

—তারপর ?

—তার পর তারা আমার ফ্ল্যাটে থাকতো, ঘর ভাড়া দিতো, আর,…

স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল আবার প্রশ্ন করলে—সুন্দরিয়া বাঈয়ের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হলো কী করে ?

পদ্মরাণী চুপ করে রইল।

—বলুন কী করে যোগাযোগ হলো ?

পদ্মরাণী মুখ নিচু করে বললে—মনে নেই।

—মনে করবার চেষ্টা করুন না !

—মনে পড়ছে না।

কোর্টভর্তি লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছে কথাগুলো। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠলো। জুরিরা নিজেদের ঘরে চলে গেল। ট্রাইং জজ্‌ও নিজের কামরায় চলে গেলেন। টিফিন। টিফিনের ছুটি।

আবার শুনানি আরম্ভ হলো। সবাই আবার এসে জুটেছে যে-যার জায়গায়। এবার নতুন সাক্ষী। নতুন সাক্ষীর নাম সুন্দরিয়া বাঈ।

—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি সত্য বই মিথ্যা বলিব না।

—তুমি কোথায় থাকো ?

—জয়পুর।

—তুমি পদ্মরাণী দাসীকে চেনো ?

—হ্যাঁ।

—তার সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক ?

—আমি তার সঙ্গে কারবার করি।

—কিসের কারবার ?

—মেয়েমানুষের কারবার !

—ভালো করে বুঝিয়ে বলো তুমি, মেয়েমানুষের কারবার বলতে কী বোঝায়? জজ্ সাহেব তোমার মুখ থেকে স্পষ্ট শুনতে চান।

সুন্দরিয়া বাঈয়ের ঘোমটাটা একটু খসে গেল। এবার তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট ভাষায় সে বলতে লাগলো। সারা ইণ্ডিয়ায় কেমন তার জাল পাতা আছে। উড়িষ্যায়, ইউ-পিতে, মধ্যপ্রদেশে, বোম্বাইতে, সর্বত্র। কলকাতায় তার এজেন্ট পদ্মরাণী দাসী। আজ পর্যন্ত তিন-চারশো মেয়েমানুষ সে বিক্রী করেছে পদ্মরাণী দাসীর কাছে। এক-একটা মেয়ে-পিছু তার রেট দু'হাজার। তেমন সুন্দরী কম-বয়েসী মেয়ে হলে চার হাজারও দর চেয়েছে। তার লোক আছে। তারাই তার হয়ে মেয়েমানুষ যোগাড় করে। গ্রামে শহরে আড়কাটি আছে। সেই আড়কাটি কখনও ফুসলিয়ে, কখনও গয়নার লোভ দেখিয়ে মেয়ে ধরে নিয়ে আসে। তার পর চালান দেয় বিভিন্ন স্টেটে।

—এই আসামীর দিকে চেয়ে দেখ, একে কি তুমি সাপ্লাই করেছিলে?

সুন্দরিয়া বাঈ ভাল করে চেয়ে দেখলে কুন্তি গুহর দিকে। তার পর বললে —না হুজুর, এ আমার পাঠানো মেয়ে নয়—

—কী করে জানলে? সব মেয়েকে কি তুমি দেখেশুনে পরখ করে পাঠাও?

—হ্যাঁ।

—যাদের যাদের পাঠিয়েছ পদ্মরাণীর কাছে, সবাইকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে?

—তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে আসামী বাঙ্গালী মেয়ে, বাঙ্গালী মেয়ে নিয়ে আমি কখনও কারবার করি নি।

—বাঙ্গালী মেয়েদের কি পদ্মরাণী নিজেই যোগাড় করে?

—তা বলতে পারি না।

—এই যে মেয়ে পাঠাও, তার জন্যে পদ্মরাণীর সঙ্গে কি তোমার চিঠিপত্র চলে?

—না, চিঠিপত্র লিখে এ-কারবার হয় না। আমরা লেখা-পড়ার মধ্যে যাই না। আমি ট্রাঙ্ক-কল করি, ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে দর-দস্তুর করি—

—আজ যে তুমি এত কথা বলে দিচ্ছ, এতে তোমার কারবারের ক্ষতি হবে না?

—হ্যাঁ, ক্ষতি হবে জেনেই বলছি।

—কেন বলছো?

—হুজুর, আজ আর আমার কোনও ভয় নেই, আমার টাকার দরকারও নেই।

—জানো, এর জন্যে তোমার পানিশমেণ্ট্ হতে পারে, তোমার শাস্তি হতে পারে ?

—আমার শাস্তি হয়ে গেছে হুজুর।

—কী শাস্তি হয়ে গেছে ?

সুন্দরিয়া বাঈ বললে—আমার এক লেড়কা ছিল, একই ছেলে, ছেলের সাদি হয় নি, সাদির সব ঠিকঠাক করেছিলাম, সে আজ এক মাহিনা হলো মারা গেছে !

সমস্ত কোর্টের ভেতরে যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

—আজকে আর আমার কেউ নেই, আমার টাকা খাবারও কেউ নেই আর। আমার কাছে সব টাকা বিলকুল মিথ্যে হয়ে গেছে হুজুর—

—কিন্তু এটা জানো তো যে তোমার সাক্ষ্যের ওপর পদ্মরাণীর শাস্তি হতে পারে ?

—আমি চাই তার শাস্তি হোক।

—কেন ?

—পদ্মরাণী আমাকে অনেক ঠকিয়েছে হুজুর। পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার লোকসান করে দিয়েছে। আমি অনেকবার লোক পাঠিয়েছি, অনেকবার আমি নিজেও এসেছি পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে, টাকা চেয়েছি, তার পর অনেকবার ট্রাঙ্ক-টেলি-ফোন করেছি, তবু আমাকে টাকা দেয় নি।

সেদিনকার মত কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল। আবার দলে-দলে কলকাতার লোক বেরিয়ে এলো রাস্তায়। আবার ক্লাবে-ক্লাবে রোয়াকে-রোয়াকে আড্ডা বসতে লাগলো।

কোর্ট থেকে একবার হাসপাতালে গিয়ে কেবিনটার সামনে এসে দাঁড়াল সদাব্রত। কেবিনের ভেতরে সেই অচল-অনড় বীভৎস মূর্তিটা জড়পিণ্ডের মত চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। দুটো নার্স দু'পাশে অক্সিজেন দিচ্ছে। গলার কাছে একটা ফুটো দিয়ে রবারের নল দিয়ে বুঝি খাওয়ানো হচ্ছে তাকে।

মিস্টার বোস একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। সদাব্রতর দিকে চাইলেন। তার পর বাইরের দিকে এলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—কোর্টের প্রোসিডিংস কতদূর ? হাউ ইজ ইট প্রোগ্রেসিং—

সদাব্রত বললে—ভালো—

মিস্টার বোস জিজ্ঞেস করলেন—অ্যাকিউজ্‌ড্‌ কী বলছে ?

সদাব্রত বললে—বলছে নট গিল্‌টি—সম্পূর্ণ নির্দোষ—

—এখনও নট্ গিলটি বলছে ? তুমি নিজের চোখে দেখেছ, তবু ওই কথা বলছে ?

সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—মনিলা কেমন আছে ?

—শি মাস্ট লিভ। মনিলাকে বাঁচতেই হবে, নইলে আমি মারা যাবো, সদাব্রত, আই ওণ্ট লিভ—

তার পরে একটু থেমে সদাব্রতকে জিজ্ঞেস করলেন—মিস্টার গুপ্ত কোথায় ?

—বাবা দিল্লীতে গেছেন কাল !

—কবে আসবেন ?

—তা জানি না। সেখানে কালচারাল মিনিস্ট্রির পক্ষ থেকে আমেরিকান লিটারারি ডেলিগেট্‌দের রিসেপশন্ দেওয়া হচ্ছে, সেই ব্যাপারেই গেছেন—

সেদিনকার মত হস্‌পিট্যাল ডিউটি সেরে সোজা বাড়ির দিকে চলে এলো সদাব্রত।

বাড়িতে এসেই সদানন্দ খবরটা পেলে। মন্দাকিনী বললে—জানিস খোকা, তোর মাস্টার মশাই এসেছিল আজ—

—মাস্টার মশাই ! কখন ?

—সকালবেলা। এই দশটার সময়—

—কোথায় গেলেন তাঁরা ?

—তা তো জানি না—

কথাটা শুনে সদাব্রত আর দাঁড়ায় নি। সেই অবস্থাতেই একেবারে সোজা মন্মথদের বাড়ি চলে এসেছে। এমন করে হঠাৎ চলে আসতে তো বারণ করেছিল সদাব্রত। তবু কেন মাস্টার মশাইকে নিয়ে এলো মন্মথ !

মন্মথ দরজা খুলে দিলে।

সদাব্রতকে দেখে শশীপদবাবুও অবাক হয়ে গেছেন। বললেন—তুমি ?

কেদারবাবু বোধ হয় সদাব্রতর গলাটা শুনতে পেয়েছিলেন।

বললেন—বুঝলে সদাব্রত, আমি আর থাকতে পারলুম না। খবরের কাগজে কেস্‌টা দেখে আর কী করে সেখানে থাকি বলো? আমি তখন থেকে বলছিলুম কোর্টে যাবো হিয়ারিং শুনতে, তা শৈল যেতে দেয় না, মন্মথ আপত্তি করে—

সদাব্রত সে-কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কেমন আছেন?

—আমার কথা ছেড়ে দাও, তোমার এ মামলা কেন হলো, বলো? তোমার বিয়েটাও তো আটকে গেল? ছি ছি, কী সব কেলেঙ্কারি বেরোচ্ছে বল দিকিনি! শুনছি নাকি এই সব কেলেঙ্কারি পড়বার জন্যে খবরের কাগজ খুব বিক্রী হচ্ছে? কী গো, কথা বলছো না কেন, সত্যি?

তার পর শশীপদবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—শশীপদবাবুকেও তো তা-ই বলছিলাম, ভদ্রলোকদের তো তাহলে বড় বিপদ হে আজকাল, তোমার বাবার কথাই ধরো না, তোমার বাবার নজরেও তো এ-সব পড়ছে—

শশীপদবাবু বললেন—তা নজরে পড়ছে বৈ কি! ওই রকম দু-একজন সৎ লোক যাঁরা আছেন, তাঁরা ওই খবরগুলো পড়ছেন আর ছি ছি করছেন!

—তা খবরের কাগজওয়ালারা ওসব ছাপছে কেন?

শশীপদবাবু বললেন—কেন ছাপবে না, ওদের তো ওটাই ব্যবসা—

—তা ব্যবসা বলে এই সব কেলেঙ্কারি-কুৎসা ছাপবে? কলকাতার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তো ওসব পড়ছে— ?

শশীপদবাবু বললেন—তা তো পড়ছেই—সারা দেশে যখন আগুন লেগেছে, তখন কি আর তার হাত থেকে আপনি-আমি বাঁচবো ভেবেছেন?

কেদারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তা ও মেয়েটার সঙ্গে তোমাদের কী শত্রুতা ছিল সদাব্রত! বেছে বেছে তোমাদের গাড়ির দিকেই বা অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ছুঁড়লো কেন?

সদাব্রত চুপ করে ছিল।

—ও-সব মেয়েরা এত লোক থাকতে তোমাদের ক্ষতি করে গায়ের ঝাল মেটালো কেন? কী করেছিলে তোমরা?

সদাব্রত বললে—আমি ওঁকে চিনতাম—

—তুমি চিনতে?

শশীপদবাবুও অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি চিনতে নাকি ? ওই কুন্তি গুহকে !

সদাব্রত চুপ করে রইল। কোনও উত্তর তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরোতে চাইল না। কয়েক মাস ধরেই এমনি বোবা হয়ে গেছে সে। সেই যেদিন থেকে মনিলা হস্‌পিট্যালে গিয়ে উঠেছে সেইদিন থেকেই। তার পর আরো বাক্‌রোধ হয়ে গেছে যেদিন থেকে কোর্টে মামলা উঠেছে। অ্যাক্‌সিডেন্ট হবার পরদিন থেকেই চেনা-অচেনা সবাই তাকে বিব্রত করে তুলছে। সবাই তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। সবাই জানতে চায় ও-মেয়েটার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক! সম্পর্কটা যে কী তা কি সে নিজেই জানে! না, কাউকে বললে সে ই বিশ্বাস করবে ? আর তা ছাড়া কেমন করেই বা সদাব্রত জানবে কুন্তি গুহ শুধ্ অ্যামেচার থিয়েটারের আর্টিস্টই নয়, সে আবার পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের মেয়ে টগর ! কেমন করে সদাব্রত জানবে যে, যে-মেয়েটা হাওড়া স্টেশনে তার মনিব্যাগ চুরি করেছিল সে কুন্তি গুহরই বোন ! কেমন করে জানবে তার সাক্ষ্যতেই সেই বোনটার ছ-মাস জেল হয়ে গেছে ! কেমন করে জানবে যে কুন্তি গুহ একদিন সদাব্রতকে খুঁজতে এলগিন রোডের বাড়িতে এসেছিল, আর মনিলা তাকে দারোয়ান দিয়ে চুলের মুঠি ধরে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল ! কেমন করে জানবে তাদের যাদবপুরের জমিতেই একদিন উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল কুন্তি গুহরা, আর সদাব্রতরাই গুণ্ডা লাগিয়ে তাদের সব বাড়ি পুড়িয়ে সবাইকে উৎখাত করেছে ! কেমন করে জানবে সেই গুণ্ডাদের লাঠির ঘায়েই কুন্তি গুহর বাবা মারা গেছে ! এই কেস্ যদি না হতো তো সদাব্রত কি এত কিছু জানতে পারতো ? তার চোখের আড়ালে এত ঘটনা ঘটে গেছে তা যদি একবারও জানতে পারতো সে, তা হলে কি আজ মনিলাই হস্‌পিট্যালে মুমূর্ষু হয়ে পড়ে থাকতো, না কুন্তি গুহকেই খুনের অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো ?

শশীপদবাবু বললেন—আমি তখনই জানি এর ভেতরে একটা কিছু মিস্ট্রি আছে—

কেদারবাবু তখনও নিঃসন্দেহ হন নি। বললেন—সত্যিই তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল মেয়েটার ?

সদাব্রত চুপ করে ছিল। তার উত্তর দিতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না এ-সব কথার।

হঠাৎ ভেতরের ঘর থেকে শৈল বেরিয়ে এলো। বললে—হ্যাঁ কাকা, আমি জানি আলাপ ছিল—

—তাই নাকি? তুইও জানিস?

—হ্যাঁ, আমি জানি। আমি সে-মেয়েটাকে দেখেছি।

—কোথায় দেখেছিস?

কেদারবাবু শশীবাবু দু'জনেই শৈলর কথায় আকাশ থেকে পড়েছেন।

—আমি তোমার অসুখের সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে যখন সদাব্রতবাবুর সঙ্গে ওষুধ কিনতে গিয়েছিলাম, সেইদিনই দেখেছি, আমার চটি ছিঁড়ে গিয়েছিল, আমি মুচির কাছে জুতো সারাচ্ছিলাম—তখনই—

—তার পর? তার পর?

সদাব্রত গম্ভীর হয়ে শৈলর দিকে তাকিয়ে রইল।

শৈল সেদিকে না চেয়ে বলতে লাগলো—সেই দিনই আমার সন্দেহ হয়েছিল, নইলে অমন করে জঘন্য ভাষায় কেন সে আমাদের গালাগালি দিলে?

—অ্যাঁ, গালাগালি দিয়েছিল তোকে?

—না, আমাকে নয়, সদাব্রতবাবুকে—

কেদারবাবু সদাব্রতর দিকে চাইলেন—সত্যি নাকি, সদাব্রত?

সদাব্রত আর বসে থাকতে পারলে না। উঠলো।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে—এর উত্তর আমি আজ দিতে পারবো না মাস্টার মশাই, আমি সারা দিন কোর্টে ছিলাম, বড় টায়ার্ড, কাল এর জবাব দেবো—

তার পর—আজ উঠি, বলে রাস্তায় চলে এসে গাড়িতে উঠে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে দিলে। মন্মথ এসেছিল দরজা পর্যন্ত। তার দিকেও সদাব্রত একবার ফিরে চাইলে না।

পৃথিবীতে অনেক দুঃখ আছে, যার প্রতিকার মানুষের হাতে নেই। মানুষের হাতে প্রতিকার নেই বলে কোনও মানুষই চুপ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে না। মানুষ ছুটোছুটি করে, পরামর্শ করে, প্রতিকারের উপায় খোঁজবার জন্যে আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ আবার আকাশের অদৃশ্য দেবতার কাছেও নিঃশব্দে প্রার্থনা করে।

কিন্তু আজ যেন সদাব্রতর নিজেকে সত্যিকারের নিরাশ্রয় বলে মনে হলো।

ছোটবেলা থেকেই নিঃসঙ্গ ছিল সে। ছোটবেলা থেকেই সদাব্রত একমাত্র মাস্টারমশাইয়ের কাছেই নিজের অস্তিত্বের সমর্থন পেয়ে এসেছিল। একমাত্র কেদারবাবুই জানতেন সদাব্রতর জীবনের সমস্যার কথা; কিন্তু সেখান থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিরে আসতে হলো তাকে। এতদিনে এই প্রথম মনে হলো যেন কেদারবাবুও তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন।

গাড়িটা নিয়ে মন্মথদের বাড়ি থেকে বেরোলো বটে, কিন্তু তখনই বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছে হলো না তার। এত দিনের সব চিন্তা সব ধারণা যেন তার সমূলে ধসে যেতে বসেছে। একদিন কলকাতার এই রাস্তাতেই সে ঘুরে বেড়িয়েছে শুধু মানুষ দেখবার জন্যে। বাবার খ্যাতি, বাবার টাকা তাকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। বাবার কাছে টাকা নিয়েছে, কলেজের মাইনে দিয়েছে সেই টাকা দিয়ে, বই কিনেছে সেই টাকা দিয়ে, দরকার হলেই চেনা দোকান থেকে পেট্রলও কিনেছে। সমস্ত বাবার টাকাতেই। তবু সে-টাকা সদাব্রতকে কখনও আকর্ষণ করে নি।

সে আকর্ষণ না-থাকার মূলে ছিলেন কেদারবাবুই। কেদারবাবুই তাকে মানুষ করেছেন প্রতিদিনের সঙ্গ দিয়ে, প্রতিদিনের চিন্তা দিয়ে, প্রতিমুহূর্তের জীবন-যাপন দিয়ে। মাস্টার মশাইয়ের চোখ দিয়েই এই শহরটাকে সে এতদিন দেখে এসেছে। এই মানুষগুলোকে চিনে এসেছে।

আজ হঠাৎ এই বিপর্যয়ের পর অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে মনে হলো তার সব দেখা, সব চেনা যেন ব্যর্থ হয়েছে।

অন্ধকার রাস্তা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই একটা ট্রাফিক-সিগন্যালের লাল আলোর সামনে গাড়ি থামাতে হলো।

আরও কয়েকটা গাড়ি উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে। আর খানিক পরেই অ্যাম্বার সিগন্যাল দেবে, তার পর গ্রীন। গ্রীন দিলেই আবার চলা।

কিন্তু সদাব্রতর মনে হলো এখন থেমে থাকতে পারলেই যেন তার পক্ষে ভালো হতো। অনন্তকাল ধরে থেমে থাকতে পারলেই সে যেন বেঁচে যেত। বহুদিন ধরে চলে চলে যেন এই প্রথম নিজেকে তার বড় ক্লান্ত মনে হলো। কেন এমন হলো? থামা মানেই তো মৃত্যু। কেন আজ সে মৃত্যু চাইছে এমন করে! এতখানি ভেঙে পড়লো সে কেন? কী হয়েছে তার? অস্তিত্বে যখন আঘাত লাগে তখনই কি মানুষ তার চার পাশে চেয়ে দেখে?

তা তো নয়। এতদিন ধরে এতখানি পথ চলে এসে কী দেখেছে সে? সেই আর একদিন, যেদিন সে জন্মায় নি, সেদিন তো এই কলকাতার বুকেই সাত সমুদ্র পেরিয়ে একজন ভাগ্যান্বেষী মানুষ এখানে নৌকো থেকে নেমেছিল। সেদিনকার সেই জব চার্নকই কি স্বপ্ন দেখতে পেরেছিল যে এখানে একদিন এমন এক জনপদ গড়ে উঠবে। ভাবতে পেরেছিল কি যে সেই জনপদ থেকেই একদিন মানুষ আবার সেই ভাগ্যান্বেষীদের তাড়িয়েও দেবে! এই শহরেই একদিন অর্থ আর বিলাসের স্রোত বয়ে গিয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হঠাৎ-পাওয়া টাকায়। আবার এই শহরেই তার পাশাপাশি একজন মানুষ নিজের আত্মানুসন্ধানের চেষ্টায় একদিন নিজেকে আবিষ্কার করেছিল। পৃথিবীর আর কোথায় আছে এমন শহর, যার অতীত এমন বিচিত্র, বর্তমান এমন রোমাঞ্চকর, অথচ ভবিষ্যৎ যার এত অন্ধকার। মানুষ যেন আরব্য উপন্যাসের রোমাঞ্চ পায় এই শহরের ইতিহাসের মধ্যে। অথচ কে এর এত বড় সর্বনাশ করলে? কে সে? কারা? কারা এমন করে সেই ইতিহাসের অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছে, সেই ইতিহাসের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দিচ্ছে?

সদাব্রতর মনে পড়লো বাবা একদিন তাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন—কারা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে জানো?

—কারা?

উত্তর দিতে গিয়ে বোধ হয় একটা টেলিফোন-কল এসেছিল, আর উত্তর দেওয়া হয় নি। তার পর বহুদিন কেটে গেছে, বহু বছর কেটে গেছে, এতদিন পরে যেন উত্তরটা পেয়ে গেল সদাব্রত। যারা মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে অমানুষের মত ব্যবহার করে তারাই এর মূলে। তারাই হঠাৎ একদিন সরষের তেলের দাম বাড়িয়ে দেয়, তাদেরই অপচেষ্টায় একদিন বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় চিনি, তারাই আবার কুন্তি গুহদের ভাড়া খাটিয়ে অর্থের পাহাড় জমিয়ে তোলে!

কোর্টের প্রোসিডিংস শুনতে শুনতে লজ্জায় ঘৃণায় অনেক দিন সদাব্রতর চোখ-কান-মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। এ কার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ? কে মনিলাকে খুন করবার জন্যে অ্যাসিড ছুঁড়েছে? এ কি কুন্তি গুহ?

গাড়িগুলো সার সার একটার পর একটা দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ অত রাত্রেও যেন কে একজন রাস্তা পার হতে গিয়ে ঠিক সদাব্রতর সামনে এসে তার দিকে চেয়ে একটু হাসলো। কে? সদাব্রতকে চেনে নাকি মেয়েটা!

—আমাকে একটু লিফ্‌ট দেবেন ?

ভাল করে চেয়ে দেখলে সদাব্রত। আগে তাকে কখনও দেখেছে বলে তো মনে পড়ল না।

হঠাৎ মাথার মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। হয়ত এ-ও কুন্তি গুহদের একজন হবে। এ-ও হয়ত কুন্তি গুহর মত কোন সুন্দরিয়া বাঈয়ের শিকার, কোনও পদ্মরাণীর টেনেণ্ট্‌।

—আমি একটুখানি কষ্ট দেবো আপনাকে—

—আসুন।

এবার স্পষ্ট নজরে পড়লো সদাব্রতর। কাঁধ-কাটা স্লিভলেস ব্লাউজ, উস্কোখুস্কো মাথার চুল, ঠোঁটে-মুখে রঙ মাখা, অথচ গায়ের রঙ কালো।

—আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?

বহুদিন আগে ঠিক এমনি করেই একদিন কুন্তি গুহকেও গাড়িতে তুলে নিয়েছিল সদাব্রত। এমনি করেই প্রশ্ন করেছিল কুন্তি গুহ। কিন্তু এবার মেয়েটা যেন ইচ্ছে করেই সদাব্রতর দিকে একটু সরে বসতে চেষ্টা করতে লাগলো। আশ্চর্য ! এরাও সেই কুন্তি গুহর মত তাকে লোভ দেখাচ্ছে !

—তুমি কোথায় থাকো ?

—আপনি যেখানে খুশি আমাকে নামিয়ে দিন, আমার এখন কোনও কাজ নেই।

—তার মানে ?

মেয়েটা বললে—আপনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন দেখছি, ভয় নেই, আমি কুন্তি গুহ নই—

—কুন্তি গুহ ? কে কুন্তি গুহ ?

—কেন, আপনি চেনেন না ? খবরের কাগজে দেখেন নি, কেস চলছে ? আমাদের কুন্তি গুহর মত খারাপ মেয়ে মনে করবেন না—

—কুন্তি গুহ কি খারাপ মেয়ে ?

—কী বলেন আপনি, খারাপ মেয়ে নয় ? ওদের জন্যেই তো সব মেয়েদের বদ্‌নাম হয়ে গেছে বাজারে। এই দেখুন না, অনেককেই তো লিফ্‌ট দিতে বললুম, কেউ দিলে না, আজকাল আমাদেরও পর্যন্ত লোক সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে—দেখবেন ঠিক ওর ফাঁসি হবে—

—তুমি কী করে জানলে ?

—বা রে, সবাই জানে, কুন্তি গুহ যে-মেয়েটাকে মেরেছে তার বাবা বিরাট বড়লোক, আর যে-ছেলেটা তার সঙ্গে ছিল…

—কোন্ ছেলেটা?

—ওই যার নাম সদাব্রত গুপ্ত, জানেন ও কে?

—তুমি জানো?

—আমি শুনেছি। মস্ত বড়লোকের ছেলে ও। শিবপ্রসাদ গুপ্তর নাম শুনেছেন তো, মস্ত বড় পলিটিক্যাল সাফারার, অনেকবার জেল খেটেছেন, এখন বাড়ি-জমির ব্যবসা করেন, তাঁরই ছেলে—

সদাব্রত আরো কৌতূহলী হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে—তুমি কী করে জানলে এত?

—শুধু আমি কেন, সবাই জানে। কলকাতার যাকে জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলবে। কেন, আপনি কিছু শোনেন নি? আপনি বুঝি কলকাতায় থাকেন না? মিস্টার বোসের মেয়েকে বিয়ে করলে ছেলেটা আরো অনেক টাকা পেতো—তা জানেন?

মেয়েটার কানের দুল দুটো রাস্তার আলো পড়ে ঝিক-ঝিক করে উঠলো।

—নিজের বাবারও অনেক টাকা, আবার শ্বশুরেরও অনেক টাকা—সব গোলমাল করে দিলে কুন্তি গুহ এসে—

সদাব্রতর এবার কেমন সন্দেহ হলো—তুমি কি কুন্তি গুহকে চেনো?

মেয়েটা সত্যিই যেন ভয় পেয়েছে, বললে—সত্যি বলছি আমি চিনি না, আমাকে বিশ্বাস করুন—

—কিন্তু তা হলে এত রাত্তিরে রাস্তায় একলা-একলা কেন ঘুরছো?

মেয়েটা আরো ভয় পেয়ে গেল।

—কী করো তুমি? কোথায় থাকো?

মেয়েটা এবার একটু সরে বসলো।

—বলো, কথার উত্তর দাও? নইলে তোমায় পুলিসে ধরিয়ে দেবো, থানায় নিয়ে যাবো—

মেয়েটার চোখ দিয়ে তখন কান্না বেরিয়েছে।

—আমাকে আপনি এখানেই নামিয়ে দিন—

—কিন্তু তার আগে বলো তুমি কে?

ততক্ষণে চোখের জলে গালের পাউডার চোখের কাজল ঠোঁটের লিপস্টিক

সমস্ত ধুয়ে মুছে ঝাপসা হয়ে গেছে। দূরে সরে গিয়ে বললে—আমাকে আপনি নামিয়ে দিন এখানে, নামিয়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি—

বলে মেয়েটা গাড়ির দরজা খুলে নেমে যেতে চাইছিল। সদাব্রত হাত দিয়ে মেয়েটার একটা হাত খপ্ করে ধরে ফেলেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে লাল আলোটা জ্বলে উঠেছে।

—সদাব্রত!

এ-পাশ থেকে ও-পাশ থেকে গাড়িগুলো তখন নড়তে আরম্ভ করেছে। পাশের গাড়ি থেকে সদাব্রত নিজের নামটা শুনতে পেয়ে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। মিস্টার বোস।

মিস্টার বোস গাড়িটা নিয়ে পাশের রাস্তায় দাঁড় করালেন। সদাব্রতও পেছনে নিয়ে গিয়ে তার গাড়িটা রাখলো।

—এ কে?

মেয়েটার দিকে লক্ষ্য করেই কথাটা বললেন মিস্টার বোস। মেয়েটা ততক্ষণে ফাঁক পেয়ে দরজা খুলে পালিয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেছে।

—হু ইজ শি?

সদাব্রত বললে—জানি না। বোধ হয় ব্ল্যাকমেল করতে লিফ্ট চেয়েছিল আমার গাড়িতে—

মিস্টার বোস বললে—বি কেয়ারফুল, হোল ক্যালকাটা এখন ব্ল্যাকমেলারে ভর্তি হয়ে গেছে—

সদাব্রত বললে—আমার তা মনে হয় না—

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

সদাব্রত বললে—আমার মনে হয় এও কুন্তি গুহদের মত একজন—

—কুন্তি গুহ কে?

ক্লাব থেকেই আসছিলেন বোধ হয় মিস্টার বোস। অত বড় বিপর্যয়ের পরেও নেশাটা ছাড়তে পারেন নি। কথাটা বলেই বোধ হয় মনে পড়ে গেল নামটা। বললেন—ও, ইউ মীন প্যাট স্কাউণ্ড্রেল অব এ বিচ—

বলে একবার চুরোটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন—কিন্তু হোল্ ক্যালকাটায় বড্ড স্প্রেড করে গেছে নিউজটা। আমি চেয়েছিলুম, যাতে খবরটা কাগজে না বেরোয়, তার জন্যে আমি খবর-কাগজওয়ালাদের অনেক টাকা দিতে

চেয়েছিলুম, কিন্তু কাগজ বিক্রির জন্যে ওরা ছাপছে। কিন্তু তা হোক, আমি ওতে ভয় পাই না, জীবনে এ-রকম অনেক সাফার করতে হয়েছে, আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অব নো-বডি, এখন প্রবলেম হচ্ছে মনিলা—

সদাব্রত চুপ করে রইল।

মিস্টার বোস বললেন—হয়ত মনিলা বেঁচে যাবে, আমি এখন হস্‌পিট্যাল থেকেই আসছি, ওরা বললে ও চিরকালের মত ওই রকম ইনভ্যালিড হয়ে থাকবে, অর্থাৎ লাম্প অব্ ফ্লেশ—এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইছিলাম। তুমি তো জানো আমার এখন আর পরামর্শ করবার কেউ নেই, বেবী আজকাল আরো বুজ্‌ড্ হয়ে থাকে, দিনরাত হুইস্কিতে ডুবে আছে, পুওর লেডী, ওর জন্যে আজকাল আমার মায়া হয়—জানো—

রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এত কথা বলা যে ঠিক নয় মিস্টার বোসের যেন এখন সে-জ্ঞানটুকুও নেই। আজকাল সেই আগেকার মিস্টার বোস যেন আর নেই তিনি। অফিসেও বেশিক্ষণ থাকেন না। ক্লাবেও হয়ত যান না। কেবল হস্‌পিট্যাল আর ড্রিঙ্কস! আর আছে কোর্ট।

—তোমার এভিডেন্স কবে?

—পরশু—

—তুমি প্রিপেয়ার্ড আছো তো? দেখবে সব ব্ল্যাক্‌মেলারদের প্রপার জবাব দিতে হবে, যারা ক্যালকাটার পিসফুল সিটিজেনদের লাইফ মিজারেবল করে তুলেছে সেই স্কাউণ্ড্রেলদের শিক্ষা দিতে হবে; এ সমস্ত ওই কমিউনিস্টদের কাজ, আমি তোমাকে গোড়াতেই বলেছিলুম, তখন তুমি বিশ্বাস করো নি, এখন দেখছো তো? আমি ওদের কোনও ক্ষতি করি নি, আমি হাজার হাজার গরীব লোকদের এমপ্লয়মেণ্ট দিয়েছি আমার ফার্মে, ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টও ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান করেছে ওদেরই ভালোর জন্যে, তবু ওরা হ্যাপি নয়, আমরা গাড়ি চড়ে বেড়াই বলে ওরা চায় ওদের সকলকেই গাড়ি দিতে হবে, হাউ সিলি!

কথাগুলো যেন মিস্টার বোস নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন।

সদাব্রত একবার দ্বিধা করে বললে—আপনার হয়ত দেরি হয়ে যাচ্ছে—

—কেন? তুমি বাড়ি যাবে?

সদাব্রত বললে—না—

—আর এই ইম্‌মর‍্যাল ট্রাফিক! ও কোন্ দেশে নেই? ইংলণ্ডে নেই?

আমেরিকাতে নেই? ফ্রান্সে নেই? ইটালিতে নেই? টোকিও, বার্লিন —কোথায় নেই ওই প্রসটিটিউশন? আমি তো মনিলাকে নিয়ে—পুওর গার্ল— সারা ওয়ার্ল্ড ঘুরেছি, সব জায়গায় ওসব আছে, সব জায়গায় থাকবে, তা হলে তা নিয়ে এত হৈ-চৈ করছে কেন ওরা?

সদাব্রত আবার বললে—আপনার খুব রাত হয়ে যাচ্ছে—

—হোক রাত, আমার তাড়া নেই, আমার কাছে রাস্তাও যা, বাড়িও তা-ই—

—চলুন আপনাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি—

এতক্ষণে যেন মিস্টার বোস একটু সংবিৎ ফিরে পেলেন। সদাব্রত মিস্টার বোসের হাত ধরে তাঁকে নিজের গাড়িতে তুলে নিলে। মিস্টার বোসের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে পেছন পেছন আসতে লাগলো।

এক-একদিন এমনি করেই কাটে সদাব্রতর। এমনি করেই সকাল হয় চিরকালের সকালের মত, আবার এমনি করেই রাত হয় রাত হবার সময় হলে। সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এর অফিসে গিয়ে নিজের ঘরে গিয়েও বসতে হয়। তার পর হঠাৎ একসময় হয়ত টেলিফোন আসে মিস্টার বোসের।

মিস্টার বোস বাড়ি থেকেই টেলিফোন করেন—সদাব্রত—

সদাব্রত গলা শুনেই বলে—ইয়েস স্যার—

তার পর এ-কাজ সে-কাজের লিস্ট দিয়ে একবার থামেন মিস্টার বোস। মিস্টার বোসের অনুপস্থিতিতে সদাব্রতই কোম্পানীর মালিক। অন্ততঃ ব্রাদার-অফিসাররা তাই-ই জানে। সেই সম্মানও দেয় সবাই সদাব্রতকে। সদাব্রত মিস্টার বোসের কাজগুলো করে। কোম্পানীও এক-একদিন চালায়।

আর ও-দিকে মিস্টার বোসের সেক্রেটারি খবরের কাগজ খুলে পড়ে শোনাতে আসে। কোনও খবরই খুশী করতে পারে না মিস্টার বোসকে। দিশি কাগজ-গুলোই কুন্তি গুহর মামলা বড় বড় অক্ষরে ছেপে দেয়। সেদিকে মাড়ায় না সেক্রেটারি।

মিস্টার বোস বলেন—হোয়াট নেক্সট? তার পর আর কী আছে?

সেক্রেটারি একে একে সব নিউজ পড়ে যায়। মিস্টার বোসের মেজাজের সঙ্গে কোন্ খবর যে খাপ খাবে তা আগে থেকে বুঝতে পারে না সেক্রেটারি। নেপালের কিং মহেন্দ্র প্রাইম মিনিস্টারকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে অ্যাডমিনি-স্ট্রেশন হাতে নিয়েছে। নেপাল নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার দরকার নেই। ওটা থাক। তার পর? পণ্ডিত নেহরু বিনোবা ভাবেকে আসামে পাঠিয়েছে।

—হোয়াই?

—আজ্ঞে, ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে গণ্ডগোল চলছে, অসমীয়া ভাষাকেই ওরা আসামের স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ করতে চায়,……বাঙালীরা চায় বাংলা ভাষাও থাকবে—

—রটন্! আমার সময় নষ্ট করছো তুমি। হোয়াট নেক্সট?

—দালাই লামা ইউ এন ও-তে অ্যাপীল করেছে—

—কেন?

—বলছে টিবেট একটা সভারেন পাওয়ার, সভারেন পাওয়ার না হলে যখন ম্যাকমেহন লাইন তৈরী হয়েছিল তখন ইণ্ডিয়া আর চায়নার সঙ্গে টিবেট কেন সিগনেচার দিয়েছিল?

মিস্টার বোস চুরোটটা মুখ থেকে নামিয়ে নিলেন।

—দিস দালাই লামাকে ইণ্ডিয়াতে শেলটার দেওয়াই অন্যায় হয়েছে। তার পর? হোয়াট নেক্সট?

রোজই এমনি। খবরের কাগজের খবর শুনে শুনে আর ভাল লাগে না। সেক্রেটারিকে চলে যেতে বলেন। তার পর নিজে ওঠেন। উঠে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে হঠাৎ হয়ত বেবীর কথা মনে পড়ে। বেবীর ঘরের দিকে যান।

—বেবী।

বেবী নয়, মিসেস বোসের আয়া বেরিয়ে আসে। সে যেন সাহেবকে দেখে চমকে ওঠে।

—মেমসাহেব কোথায়?

বলতে বলতে ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখেন বেবী তখনও শুয়ে আছে। আয়া বোধহয় পা টিপে দিচ্ছিল। অসাড় অচৈতন্য হয়ে শুয়ে আছে বেবী। বেবীর কাছে গেলেন মিস্টার বোস। হয়ত ঘুমোচ্ছে। ডাকলেন না

আর। আয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—মেমসাহেব কি আজো পিল খেয়েছে ?

—জী হাঁ।

—আমি বারবার বলেছি না যে পিল মোটে দেবে না খেতে। কে পিল কিনে এনে দেয় ?

যেদিন থেকে মনিলা হস্‌পিট্যালে গেছে, সেই দিন থেকেই বেবী ট্র্যাঙ্কুই-লাইজার পিল খেতে শুরু করেছে। আগে কখনো-সখনো খেতো, এখন রোজ চারটে-পাঁচটা করে খেতে শুরু করেছে। মেজর সিনহা বিশেষ করে বলে দিয়েছে পিল না খেতে। এ প্রথম প্রথম ভালো লাগবে, প্রথম প্রথম এ খেলে ঘুম হবে, খিদে হবে, তার পর মানুষ পাগল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পারকিনসনস্‌ ডিজিজও হতে পারে।

দারোয়ানকেও ডাকলেন। চাকর-বাকর সবাইকে ডাকলেন। বাড়ির সব কর্মচারী এসে সাহেবের সামনে হাজির হলো। ড্রাইভার, কুক, বাবুর্চি, খানসামা, আর্দালী সবাই।

—আবার মেমসাহেবকে পিল এনে দিয়েছ তোমরা ?

—আজ্ঞে না, আমি আনি নি হুজুর।

—স্টপ !

চীৎকার করে উঠলেন মিস্টার বোস।

—আমি কারোর কোনও কথা শুনতে চাই না। যে পিল কিনে এনে দেবে, আমি তাকে স্যাক করবো। আই মাস্ট !

ষোল মিলিয়ন টাকার মালিক মিস্টার বোস যেন হঠাৎ বড় নিঃসহায় মনে করলেন নিজেকে। নিজের স্টাফকে ধমকাতে গিয়ে যেন নিজেকেই ধমকালেন তিনি। একদিন তিনি নিজেই এ-পিল বাড়িতে এনে আদর করে বেবীকে খেতে দিয়েছিলেন। তখন খেলে ফুর্তি হতো, মনের চিয়ারফুলনেস্‌ আসতো, আজ সেই পিলই তাঁর ফ্যামিলি-লাইফ ধ্বংস করে দিয়েছে। আদর করে কতদিন মনিলাকেও দিয়েছিলেন খেতে।

হঠাৎ কোরিডোরের পাশের দিকে নজর পড়তেই মনটা বড় ভিজে উঠলো। পেগী। পেগী যে এ-বাড়িতে আছে, এটাও যেন ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। এককালে পেগীকে দেখতে পারতেন না তিনি। পেগী সেটা জানতো। আজ মিস্টার বোসকে তাই সে-ও যেন চিনেও চিনতে পারলে না।

আস্তে আস্তে পেগীর কাছে গেলেন। মনিলা আজ নেই। শেষের দিকে মনিলা থাকলেও পেগীর ওপর টান কমে গিয়েছিল তার।

কাছে গিয়ে ডাকলেন। আদর করে হাত বাড়ালেন—পেগী—

পেগী প্রথমটায় কিছু বললে না। তাঁর দিকে চেয়েও দেখলে না। হয়ত বুঝতে পেরেছে। জানোয়াররাও বুঝতে পারে। অথচ মানুষ বোঝে না।

—পেগী!

পেগী হঠাৎ যেন বিরক্ত হলো। কামড়াতে জানে না, তবু যেন কামড়াতে এলো…

হঠাৎ পেছন থেকে আর্দালী বললে—সাব, টেলিফোন—

আর পেগীর কথা ভাবা হলো না। তাড়াতাড়ি খাস-কামরায় গিয়ে টেলিফোন-রিসিভারটা তুললেন।

—আমি সদাব্রত কথা বলছি—

—বলো।

—সলিসিটর এখ্খুনি টেলিফোন করেছিল। আমাদের মামলা একটা সিরিয়াস টার্ন নিয়েছে—

—কী টার্ন?

সদাব্রত বললে—তা জানি না, সে-কথা আমাকে বললেন না, আপনাকে নিয়ে এখুনি তাঁর ফার্মে যেতে বললেন, এবার মামলা অন্য দিকে ঘুরে গেছে। আপনি চলে আসুন—

শশীপদবাবুর বাড়িতে গিয়েও সেই একই সমস্যা। এখন আর কারো কথা কানে তোলেন না কেদারবাবু। সকালবেলাই বেরিয়ে যান। ছাতাটা হাতে নিয়ে টো-টো করে বেড়ান। একবার যান গুরুপদর বাড়ি। সেখান থেকে যান অধীরের বাড়ি। অধীরের বাড়ি থেকে সোমনাথের বাড়ি।

—কেমন আছিস রে তোরা সব?

কেউ পাস করেছে, কেউ বা পাস করে নি। কেউ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, কেউ চাকরি পেয়ে গেছে। সকলের সঙ্গে দেখা করে তৃপ্তি পান মনে মনে। কেদারবাবুর শরীর খারাপ হবার পর অনেকে টিউটোরিয়্যাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিল।

সেখানে অনেক সুবিধে। ভাল রকম মোটা টাকা দিলে কোশ্চেন আউট করানো যায়। তার পর আবার বাড়ি ফিরে আসেন। মন্মথর মা তখনও খাবার নিয়ে বসে থাকে।

একদিন কাকাকে বাড়িতে একলা পেয়েই শৈল ধরলে।

—কাকা, তুমি কি বরাবর এই বাড়িতেই থাকবে?

কেদারবাবু চমকে উঠলেন। মুখ তুলে চেয়ে বললেন—কেন? ও-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন রে? তোর কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

—না, আমি সে-কথা বলছি না।

—তা হলে? পেট ভরে খেতে দিচ্ছে না বুঝি এরা? ভাত কম দেয়?

—কাকা, তুমি আস্তে কথা বল না, শুনতে পাবে যে—

কেদারবাবুও গলা নীচু করলেন। বললেন—ঠাকুরটা বোধ হয় তা হলে ভাত-তরকারি চুরি করে জানিস, দাঁড়া তুই, কিচ্ছু ভাবিস নি, আমি মন্মথর মাকে বলে আসছি, বাড়িতে চোর পোষা তো ভাল নয়—

বলে উঠতে যাচ্ছিলেন। শৈল বাধা দিয়ে বললে—তুমি কী কাকা, তুমি কোনও দিনই কি কিছু বুঝবে না?

কেদারবাবু তবু কিছু বুঝতে পারলেন না। বললেন—কেন? আমি বুঝবো না মানে? তুই বলছিস কী? পেট ভাল করে না ভরলে কষ্ট তো হবেই—না খেতে পেলে কষ্ট হবে না? আমি তো তখনই বলেছিলুম তোকে, সদাব্রতদের বাড়িতে চল্, ওখানে থাকলে তোর কোনও কষ্ট হতো না—

শৈল চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ। তার পর বললে—আমি কি সেই কথা বলেছি? তুমি অবাক করলে—

—তুই না-ই বা বললি, আমি বুঝতে পারি না ভেবেছিস? পাগল-পাগল দেখতে আমাকে, তা বলে আমার কি সত্যিই মাথা খারাপ? দাঁড়া, আমি আজই শশীপদবাবুকে বলছি—

—কী বলবে আবার? না না, তোমায় কিছু বলতে হবে না—

—বলবো না মানে? নিশ্চয় বলবো। ঠাকুরে ভাত-তরকারি চুরি করবে আর বাড়ির লোক খেতে পাবে না, এটা কি ভাল কথা? আমার নিজেরই তো এখানে ভাল লাগছে না—চল্ আমরা চলে যাই সদাব্রতর বাড়ি, সেখানে আরাম করে থাকবি, বালিগঞ্জের পাড়ায়—

হঠাৎ যেন বাইরে কার পায়ের শব্দ হলো।

—কী হলো বাবা, তোমাদের কোনও অসুবিধে হলো নাকি ?

মন্মথর মা হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

—দেখুন মা, আপনি যে ঠাকুর রেখেছেন সে চোর, আমি বলছি সে চোর—ওকে ছাড়িয়ে দিন—

—চোর ?

—হ্যাঁ, বিশ্বাস না হয় ওই শৈলকেই জিজ্ঞেস করুন, পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পায় না, এমন কষ্ট হচ্ছে ওর আপনাদের এখানে—

মন্মথর মা শৈলর দিকে চাইলেন।

—কী মা, তোমার পেট ভরে না ? কই, আমাকে কোনও দিন তা বলো নি তো মা !

কেদারবাবু বললেন—আপনাদের কী করে সে-কথা বলে বলুন ? আমি ওর কাকা, আমাকে চুপি চুপি বলতে এসেছে, আমি বললুম, এ কি চুপি চুপি বলার জিনিস ? দিদিমাকে গিয়ে বললেই হয়—

মন্মথর মা বললেন—তা তো বটেই—

—আপনিই বলুন ঠিক বলেছি কি না। আমি ওকে বলছিলুম যদি এখানে থাকতে তোর কষ্ট হয় তো চল্, সদাব্রতদের বাড়িতে চল্, সে এ-বাড়ির চেয়ে অনেক ভাল বাড়ি, সেখানে অনেক ঝি-চাকর আছে, সেখানে এ-রকম কষ্ট হবে না তোর, সদাব্রতর মা তোকে রানীর হালে রাখবে, বাসন মাজতে হবে না, ঘর ঝাঁট দিতে হবে না, কিচ্ছু না—

তার পর মন্মথর মার দিকে চেয়ে বললেন—কী বলুন, আমি কিছু অন্যায় বলেছি—

শৈল এতক্ষণ অনেক কষ্টে সহ্য করছিল, এবার আর পারলে না। ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে চলে গেল।

কেদারবাবু সেটা লক্ষ্য করে হাসতে লাগলেন।

বললেন—দেখলেন তো, আপনাকে সব বলে দিয়েছি বলে ওর লজ্জা হয়েছে, ঘর থেকে পালিয়ে গেল—

মন্মথর মা কিন্তু হাসলেন না। তিনিও ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলেন, কেদারবাবু ডাকলেন। বললেন—দেখুন মা—

মন্মথর মা মুখ ফেরাতেই কেদারবাবু কাছে গিয়ে বললেন—আপনি যেন আবার বকবেন না ওকে—

—না না, বকবো কেন আমি ?

কেদারবাবু বললেন—না, তাই বলছি, বড় রাগী বড় একগুঁয়ে মেয়ে কিনা, কারোর ওপর রাগ হলেই ওর যত তেজ তখন আমার ওপর ফলায়, আমি বুড়ো মানুষ, আমি আর কত সহ্য করবো বলুন—ওর বাবাও ওই রকম রাগী ছিল, মাথার শির ছিঁড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল—

—দেখি, আমি ওর কাছে যাচ্ছি—

বলে চলে গেলেন মন্মথর মা। কেদারবাবু জামাটা খুলে ফেললেন। তার পর টেবিলের আলোটা জ্বেলে বইটা নিয়ে পড়তে বসলেন। শশীপদবাবু তখনও অফিস থেকে আসেন নি। এলে তাঁকেও একচোট শুনিয়ে দিতে হবে। শশীপদ-বাবু গভর্মেণ্ট অফিসের সবাইকে চোর বলেন। আর এদিকে যে তাঁর নিজের বাড়ির মধ্যেই চোর ঢুকে বসে আছে তা তো আর জানেন না।

দরজা খোলার শব্দ হতেই কেদারবাবু বলে উঠলেন—আসুন শশীপদবাবু, আপনি মশাই…

কিন্তু মন্মথর মাকে আবার ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

—কী হলো মা ? বুঝিয়ে বললেন তো শৈলকে ? এখন একটু শান্ত হলো ? আমারও ওই রকম হয়, খিদে পেলে কী-রকম নাড়ী-ভুঁড়ি যেন জ্বলতে আরম্ভ করে—

—আচ্ছা বাবা,—

মন্মথর মা সামনের চেয়ারটায় হঠাৎ বসে পড়লেন।

বললেন—আপনার ভাইঝির বয়েস হয়েছে, এখনও পর্যন্ত একটা বিয়ের বন্দোবস্ত করছেন না, আমি সেই কথাটাই বলতে আবার এলুম—

কেদারবাবু গলা নিচু করলেন।

—কেন ? শৈল বলছিল নাকি আপনাকে ?

মন্মথর মা বললেন—না, সে-কথা কি কোনও মেয়ে মুখ ফুটে বলে ? ও সে-রকম মেয়েই নয়—

—তবে ?

—আমি নিজের থেকেই বলছি বাবা, গেরস্ত-ঘরের মেয়ে, বয়েস হয়েছে, সংসারে মা-মাসী কেউ নেই, আপনার নিজেরই তো সেটা ভাবা উচিত—

কেদারবাবু বললেন—আমি তো ওর বিয়ের জন্যে ঘুরছি, সদাব্রত মামলা নিয়ে ব্যস্ত খুব, তাই আর তাকে বিরক্ত করছি না, অন্য পাত্রকে ধরলেই তো

একগাদা টাকা চেয়ে বসবে, তখন? তখন তো সদাব্রতর কাছেই আমায় হাত পাততে হবে—দু-হাজার টাকা মাইনে তো পায় সদাব্রত—ওর কাছে হাজার টাকা কিছু না, সেই আশাতেই তো আছি—

মন্মথর মা বললেন—তা যে-মেয়ের সঙ্গে সদাব্রতর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল সে তো হাসপাতালে, এখন সদাব্রত তো নিজেও বিয়ে করতে পারে শৈলকে—

কেদারবাবুর মাথায় এ-কথাটা এতদিন ঢোকে নি।

বললেন—ঠিক বলেছেন তো! এ-কথাটা তো আমার মাথায় আসে নি—

—আপনি কথাটা পাড়ুন না একবার।

—কথা আর পাড়তে হবে না, আমার কথা সদাব্রত ঠেলতে পারবে না, আমি কালই যাবো—

হঠাৎ মন্মথ ঘরে ঢুকলো।

ঘরে ঢুকেই বললে—মাস্টার মশাই, সর্বনাশ হয়েছে—

মন্মথর মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কী হলো?

মন্মথ বললে—আমি এখুনি সদাব্রতদার কাছে থেকেই আসছি—

—কেন?

মন্মথ বললে—সেই যে সেদিন আসবে বলেছিল, আর এলো না, তাই একবার আসতে বলতে গিয়েছিলাম। শুনলাম তাদের মকদ্দমা একটা নতুন টার্ন নিয়েছে—

—তার মানে?

মন্মথ বললে—তা জানি না, সলিসিটরের অফিস থেকে টেলিফোন পেয়ে মিস্টার বোসকে টেলিফোন করে দিলে সদাব্রতদা, দু'জনে মিলে সলিসিটরের অফিসে যাবে—

—নতুন টার্নটা কিছু বুঝলে না?

মন্মথ বললে—কেসটা নাকি সব উল্টে গেল। সুন্দরিয়া বাঈ যে এভিডেন্স দিয়েছে তাতে কেসটা সদাব্রতদার এগেন্স্টে চলে গেছে, সদাব্রতদাকে খুব নার্ভাস দেখলাম, আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলবারও সময় পেলে না—গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল—
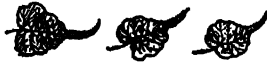
জীবনের নিশ্চয় একটা অর্থ আছে। সে অর্থ কে খুঁজে পেয়েছে কেউ জানে না। ইতিহাসেরও একটা অর্থ হয়ত আছে, তারও হদিস কে পেয়েছে কে জানে। কিন্তু আদিযুগ থেকে তা খোঁজার যেন আর বিরাম নেই। এক যুগের পর আর এক যুগ এসেছে আর আগেকার সমস্ত মূল্যবোধ বদলে গেছে আমূল। আগের যুগের সব কিছু সমূলে উপড়ে ফেলে নতুন যুগের জয়যাত্রা শুরু করবার চেষ্টা হয়েছে। যখন তাতেও সমস্যার সমাধান হয় নি তখন আবার বিদ্রোহ হয়েছে, বিপ্লব হয়েছে। এমনি করেই ভাঙতে-ভাঙতে গড়তে-গড়তে ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। মহাকালের দিকে এগিয়ে চলেছে অনাদি কাল ধরে। এ চলার যেন আর বিরাম নেই—

শিবপ্রসাদ গুপ্ত যখন ছোট্ট ছিলেন, তখন তাঁর সেই কালটাই ছিল আধুনিক কাল। কখন যে তিনি আধুনিক থেকে বিগত কালে চলে গেলেন তা তিনিও টের পান নি। মিস্টার বোসও ছিলেন ভবিষ্যতের উদীয়মান ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। একদিন তাঁর কাছে দেশ অনেক কিছু আশা করেছিল। তাঁর ওপরেই ভরসা করেছিলাম আমরা। সদাব্রতও সেই যুগের শিশু। আজ সে ইয়াং ম্যান। আজকের মানুষও তার কাছে অনেক কিছুই আশা করছে। আশা করছে একদিন এই সদাব্রতরা ভবিষ্যতের মিস্টার বোসদের কবল থেকে মানুষের শ্রমকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। এমনি করেই হাত বদল হয়, সিংহাসন বদল হয়। উন্নতি-অবনতির তারতম্য হয়। আজকের শিশু কালকের যুবকে পরিণত হয়, কালকের যুবক পরশুর বৃদ্ধে রূপান্তরিত হয়। সৃষ্টির শৃঙ্খলে এমনি নিয়মানুবর্তিতা। এখানে কেউ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মৌরসী পাট্টার অধিকার নিয়ে আসে নি।

কিন্তু সেই শৃঙ্খলে যখন গ্রন্থি বাঁধে, তখনই শুরু হয় গোলযোগ।

সেই ১৭৮১ সালের গ্রন্থির পর গ্রন্থি বেঁধেছিল ১৭৮৯ সালে। রুশোর লেখা সেই বই যেখানে যে-দেশে গিয়ে পৌঁছুল, সেইখানেই গোঁজামিল ধরা পড়লো। তার পর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, যন্ত্রপাতি, মেশিন, ফ্যাক্টরি। আর তার পরেই নেপোলিয়নের চেয়েও বড় বড় দুর্ধর্ষ ডেসপটের আবির্ভাব হলো। যেখানে কল-কারখানা গজালো সেখানেই।

সেখানেই এক-একদল মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে বলে উঠলো—অয়মহং ভো—

তার পরের ইতিহাসও কেদারবাবুর জানা। কখন থেকে কলোনী করতে বেরোলো ইওরোপের সবাই, তাও জানা আছে। তার পর...

বসন্তকে হিস্ট্রী পড়াচ্ছিলেন কেদারবাবু। পড়াতে পড়াতে একেবারে চলে এলেন মডার্ন পিরিয়ডে।

মডার্ন পিরিয়ড বসন্তর দরকার নেই। বসন্ত বললে—স্যার, নাইন্‌টিন্ ফর্টি-সেভেনের পর থেকে আর আমাদের দরকার নেই—

কেদারবাবু একমনে পড়িয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাধা পেয়ে থেমে গেলেন।

—কেন? দরকার নেই কেন?

—এ-দিকটা আমাদের কোর্সে নেই।

কেদারবাবু বললেন—কোর্সে না থাকলে পড়বে না?

না পড়ুক। তবু যেন কেদারবাবুর বলতে ভাল লাগে। ভাবতেও ভাল লাগে। অথচ আর কারো ভাল লাগে না। তিনি ছাড়া আর কেউ ভাবে না। রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেন তিনি। কখনও মনে হয় এটা সেভেন্‌টিন্ এইট্টি-নাইন্। আবার কখনও মনে হয় এটা এইট্টিন্ ফিফটি-সেভেন্। কখনও মনে হয় এটা এইট্টিন থার্টি-থ্রি, রামমোহন মারা গেছেন সবে। আবার কখনও মনে হয় আর ভয় নেই, এটা এইট্টিন্ টোয়েন্টি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্ম নিয়েছেন। আবার রাস্তায় বাস থেকে যখন দেখেন সিনেমার সামনে মানুষের কিউয়ের ভিড় তখন মনে হয় এটা যেন সেভেন্থ সেঞ্চুরি বি-সি। স্লেভ-ট্রেড-এর যুগ। সব স্লেভদের যেন পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে নিলেম হচ্ছে।

বসন্ত বললে—স্যার, আজ এই পর্যন্ত থাক—

আবার যেন বর্তমানে ফিরে এলেন কেদারবাবু। একেবারে নাইনটিন সিক্স্‌টি-টুতে। এ ইয়ারে তুমি ব্যবসা করতে চাও তো বলো তুমি কোন্ জাত! বাঙালী, না গুজরাটী, না ওড়িয়া, না অসমীয়া, না পাঞ্জাবী, না অন্য কেউ। রাইটার্স-বিল্ডিংস-এ গেলে তোমার সঙ্গে মিস্টার অমুক দেখাই করবে না। কিন্তু হঠাৎ ডেপুটি গিয়ে খবর দিলে—স্যার,—মিস্টার দত্ত এসেছেন—

মিস্টার দত্ত যে-ই হোক, তাঁর টাকা আছে। একেবারে টপ্ থেকে বটম্ পর্যন্ত সবাই তাঁর কাছে চাঁদির জুতো খেয়েছে। মিস্টার দত্তর টাকা খায় নি

এমন অফিসার এমন ক্লার্ক যদি কেউ থাকে তো তার চাকরি খেয়ে নাও। ঘুষ না খেলে নাইন্‌টিন্‌ সিক্স্‌টি-টুতে সে মিস্‌ফিট্‌। সে বিশ্বাসঘাতক, সে ট্রেটার। গভর্মেন্ট-সার্ভিসে তার থাকা বে-আইনী। মিস্টার দত্তর খবরটা শুনেই মিস্টার অমুক, ডিপার্টমেন্টাল হেড, একেবারে রাস্তায় নেমে এলেন নিজের চেয়ার ছেড়ে।

বসন্ত অবাক হয়ে গেল। বাইরে খাঁ খাঁ করছে দিন। রাস্তা দিয়ে রিক্সা-লোক-গাড়ি চলেছে। সেই ভোরবেলা পড়াতে এসেছেন মাস্টার মশাই, আর এখন এগারোটা বাজতে চললো। এখনও ওঠবার নাম নেই। পড়াতে-পড়াতে কখন চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়াচ্ছে।

বসন্ত আবার ডাকলে—স্যার—

কেদারবাবু কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলেন।

—স্যার, আপনার কি শরীর খারাপ হলো আবার?

—না, বলে কেদারবাবু উঠলেন।

—স্যার, একটা রিক্সা ডেকে দেবো আপনাকে?

কেদারবাবুর চোখ দুটো তখনও ভিজে। বললেন—না রে, শরীর খারাপ নয়, তোদের কথাই ভাবছিলুম, ভাবছিলুম কী হবে তোদের?

—কেন স্যার, আমার তো প্রিপেয়ারেশন ভালোই হয়েছে!

—প্রিপেয়ারেশন করে কী করবি? কেউ যে নেই তোদের। আমরা তো বুড়ো হয়েছি, আমরা আর ক'দিন? তোদের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে, তোদের দেখবার কেউ যে নেই রে—

বলে ছাতাটা নিয়ে রোদের মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

বসন্ত বহুদিন থেকে দেখে আসছে মাস্টার মশাইকে। কিন্তু যত দেখছে ততই যেন অবাক হয়ে যাচ্ছে। বাবার যখন অবস্থা খারাপ ছিল তখন অনেক মাস মাইনেই দিতে পারে নি মাস্টার মশাইকে। তবু তিনি পড়াতে আসা বন্ধ করেন নি। এতদিন পরে এই অসুখটার পর থেকেই যেন তিনি আরো ভেঙে পড়েছেন। মাঝে মাঝে মডার্ন-হিস্ট্রি পড়াতে-পড়াতে তাঁর চোখ ছল ছল করে ওঠে।

শুধু বসন্ত নয়, এ-যুগে যেন কারোরই কোনও গার্জেন নেই। বসন্তর মত গুরুপদরও গার্জেন নেই। রাস্তার পাশ দিয়ে চলতে চলতে ছাতাটা

নামিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন কেদারবাবু। সেভেন্থ-সেঞ্চুরি বি-সি'র মত অবস্থা। কারো গার্জেন নেই। এরা পাস করে তো আর কলেজে ঢুকতে পারবে না কেউ। কলেজে ঢুকলেও তো চাকরি পাবে না। ব্যবসা করলেও এরা গভর্মেন্টের সাপোর্ট পাবে না। এরা যে বাঙালী। মানুভাই শা'রা যে এদের দেখতে পারে না। এদের বিয়ে হবে না, ব্যবসা হবে না, চাকরি হবে না। তাহলে কোথায় যাবে এরা! কী করবে এরা?

আশ্চর্য! শৈলও তো এদের দলে! এতদিন ছাত্রদের কথাই ভেবে এসেছেন কেদারবাবু। এবার হঠাৎ শৈলর কথাও মনে পড়লো। সদাব্রতর মামলাটা হবার পর থেকেই শৈলর কথা বেশি করে মনে পড়ছে। তিনি যতদিন আছেন, ততদিন না হয় চললো কোনও রকমে। কিন্তু তার পর?

খবরের কাগজের রিপোর্টটা পড়বার পর থেকেই ভাবনা আরো বেড়েছে। কুন্তি গুহর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই তো মেয়েটা এই পথে এলো।

কেদারবাবু আবার ফিরলেন।

একবার সদাব্রতর মায়ের সঙ্গে পাকা কথাটা বলে ফেলাই ভালো। আর যদি সদাব্রত এখন বাড়ি থাকে তো সে আরো ভালো। তার সামনেই মুখোমুখি কথা হয়ে যাবে।

ট্রামে উঠে উল্টো দিকে বালিগঞ্জের পাড়ায় গিয়ে নামলেন কেদারবাবু। তার পর হাঁটতে হাঁটতে হিন্দুস্থান পার্কে সদাব্রতদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লেন।

দরজা খুলে দিয়েছিল বদ্যিনাথ। এমন অসময়ে আবার কে এলো?

কেদারবাবু বললেন—তোমার ঘরের ভেতরে একটু বসতে দাও বাপু, পাখাটা আগে খুলে দাও, একটু হাওয়া খাই, বড় ঘেমে গেছি—

ভেতরে বসতে দিলে বদ্যিনাথ। বললে—বড়বাবু, দাদাবাবু কেউ-ই নেই কিন্তু বাড়িতে—

—তা তো জানি বাপু। আমি কী আর নতুন লোক? তোমার মা-মণিকে একবার ডেকে দাও দিকি, দু'টো কথা বলে যাই—

মন্দার দুপুরবেলা হাতে কাজ থাকে না। খোকার মাস্টার মশাই এই অসময়ে আবার তাকে ডাকছে কেন বুঝতে পারলে না। ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়াল বাইরের ঘরের দরজায়।

—মা, আমি একটু এলাম আপনার কাছে।

মন্দা বললে—আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

—সে-জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না মা। আমি দেখি করে খাই, কোনও-কোনও দিন আবার খাই-ই না, আমি সে-জন্যে আসি নি আপনার কাছে। মন্মথ কাল বললে, সদাব্রতর মামলা নাকি উল্টে গেছে সব ?

—তা তো আমি শুনি নি কিছু ?

—আপনি শোনেন নি অথচ মন্মথ শুনলো কোত্থেকে। মন্মথ বললে যে সদাব্রতর কাছে শুনে এসেছে। মামলা এতদিন যেমন চলছিল, সব নাকি উল্টে দিয়ে গেছে একজন সাক্ষী—! আপনি কিছুই জানেন না ? শিবপ্রসাদবাবু কোথায় ?

—তিনি তো সেই দিল্লীতে গেছেন, এখনও তো ফেরেন নি।

কেমন করে কথাটা পাড়বেন বুঝতে পারলেন না কেদারবাবু। তাঁর মত লোকও একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। তার পর অনেক দ্বিধার পর বলেই ফেললেন। বললেন—আচ্ছা মা, একটা কথা বলবো আপনাকে ?

—বলুন না।

—আজকে মন্মথর মা আমাকে বলছিল, বলতে গেলে মন্মথর মা-ই কথাটা পেড়েছে। আসলে আমার খেয়ালই ছিল না। আপনি তো জানেন আজকাল দিনকাল কেমন পড়েছে, মানে সাধারণ মানুষের বড় কষ্ট—

সদাব্রতর মা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

—এই দেখুন না আমার কথা। আমি ছ'টা টিউশানি করি। সবাই যদি ঠিকমত মাইনে দেয় তো আমার মোট একশো চল্লিশ টাকা হয়, একশো চল্লিশ টাকাতে মোটামুটি ভালই চালিয়ে নিতে পারি। তারপর আবার আমার ভাইঝি শৈল আছে, শৈলকে তো আপনি দেখেছেন, সে খুব হিসেবী মেয়ে—

সদাব্রতর মা তখনও কিছু বুঝতে পারছিলেন না।

—কিন্তু মাইনে তো অনেকে দিতেই পারে না। দেবে কী করে বলুন ? সাঁইত্রিশ টাকা মণ চাল, আমাকে শশীপদবাবু নিজে বলেছেন। শশীপদবাবু তো মিথ্যে কথা বলবার লোক নন। তা ধরুন আমি একলা মানুষ। আমার জন্যে আমি ভাবি না, ভাববো কেন বলুন ? একলার জন্যে কে আর ভাবে ? সমাজে আমরা অনেক লোক বলেই এত ভাবনা। কিসে আমাদের ভাল হবে, কী করলে আমরা সুখী হবো, এই সব ভাবনার জন্যেই তো এত

রকমের আইন-কানুন করা হয়েছে, যাতে কেউ কারোর ওপর অত্যাচার না করতে পারে, কেউ যেন···

বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। রাস্তাতেও কোনও লোকজন নেই। শুধু ঘরের মধ্যে গড়-গড় করে কথা বলে চলেছেন কেদারবাবু। কথাগুলো বলছেন সদাব্রতর মাকে লক্ষ্য করেই। কিন্তু কে যে শুনছে তা যেন কেদারবাবুর জানবার দরকার নেই। তাঁর শুধু বলতে পারলেই হলো। সেভেন্থ সেঞ্চুরি বি. সি. থেকে শুরু করে মানুষ আর মানুষের সমাজ কেমন করে সেভেন্‌টিন্‌-এইটিওয়ানে এসে প্রথম একটা পদক্ষেপের জায়গা পেল। কেমন করে ফ্রেঞ্চ-রিভলিউশন্‌ অতিক্রম করে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশানে এসে···

হঠাৎ বদ্রিনাথ ঘরে ঢুকে সব গোলমাল করে দিলে। বললে—মা—

কেদারবাবুর তাল-ভঙ্গ হয়ে গেল। এমন শ্রোতা সাধারণত পান না কেদার-বাবু। কিন্তু আলোচনার মাঝপথে বাধা পড়ায় বিরক্ত হলেন।

—বাবু দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে কথা বলছেন—

মন্দা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বোধ হয় ভেতরে যাবার জন্যে চলে যাচ্ছিল।

—আচ্ছা আমি তা হলে উঠি মা এখন—বলে চলেই যাচ্ছিলেন কেদারবাবু। কিন্তু হঠাৎ আবার ফিরলেন।

বললেন—আর একটা কথা বলবো মা—আচ্ছা, শৈলকে তো আপনি দেখেছেন?

মন্দা এই ব্যস্ততার মধ্যেও প্রশ্নটা শুনে যেন চমকে উঠলো। এ-প্রশ্নের মানে কী, তাও বুঝতে পারলে না। শুধু প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যেই বললে—হ্যাঁ, দেখেছি বৈ কি, সেদিন যে দেখলুম—

কেদারবাবু তবু ছাড়লেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন?

—ভালো। খুব ভালো,—

—খুব ভালো নয়?

মন্দা বললে—ওদিকে টেলিফোনে উনি দাঁড়িয়ে আছেন—

কেদারবাবু ওইটুকুতেই খুশী। বললেন—না না, আপনি আর দেরি করবেন না, আসি আমি মা তা হলে—বলে ছাতিটা নিয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

শৈল একলাই বেরিয়েছিল। জীবনে বোধ হয় তার একলা বেরোনো এই প্রথম। বাড়িতে কাউকেই জানায় নি। তবু ঠিকানাটা মুখস্থ করে রেখেছিল। পাছে ভুলে যায়। কাকাও সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। মন্মথও নেই। সেও ভর্তি হয়ে গেছে ইউনিভার্সিটিতে।

মাসীমা বলেছিলেন—তোমার কাকা এলে খাবে, না আগেই খেয়ে নেবে তুমি?

শৈল বলেছিল—আপনি আমার জন্যে ভাববেন না মাসীমা, আমি কাকার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো—

তবেই হয়েছে। কাকার যেন বাড়ি ফেরার সময় বাঁধা আছে। মাসীমা বাইরে যেতেই শৈল তাড়াতাড়ি শাড়িটা বদলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। যতবার রাস্তায় বেরিয়েছে ততবার—হয় মন্মথ নয় তো সদাব্রত তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে।

বাড়ি থেকে বাসে ওঠবার মুখেই যেন বাধা পড়লো। যদি কেউ দেখতে পায় তাকে? যদি কেউ তাকে চিনতে পারে? কিন্তু, কে আর চিনবে! হয়ত কাকার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। সকালবেলাই কাকার তিনটে টিউশনি। এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যায় ট্রামে চড়ে। ট্রামের মান্থলি-টিকিট আছে কাকার।

একটা বাস আসতেই উঠে পড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হল এ-বাসটা কোথায় যাবে কে জানে!

সামনে আসতেই কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলে—এটা কোথায় যাবে?

—হাওড়া। আপনি কোথায় যাবেন?

—বেহালা।

—তাহলে উল্টো দিকের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ান।

বাইরের পৃথিবীর লোকগুলোকে এতদিন ভয়ই করে এসেছে শৈল। সবাই যেন তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছে, এই ধারণা নিয়েই এতদিন সে কলকাতায় আছে। রাস্তায় চলতে চলতে একবার ধাক্কাই দিয়েছিল সেই মেয়েটা। সেই মেয়েটারই তো মামলা হচ্ছে। একবার চটিজোড়াও ছিঁড়ে

গিয়েছিল তার। সব রকম বিপদের কথা ভেবে নিয়েই রাস্তায় বেরিয়েছিল সে। তবু না বেরিয়েও যে উপায় ছিল না।

এবার ঠিক বাস পাওয়া গিয়েছিল। এ-বাস সোজা গিয়ে বেহালায় পৌঁছবে। জীবনে এ-দিকে কখনও আসে নি সে। শৈলর মনে হলো সবাই যেন তার দিকে কৌতূহলী চোখ নিয়ে দেখছে। সে যে রাস্তা-ঘাট চেনে না তা যেন জানতে পেরেছে সবাই। কিন্তু কেউ যদি তার পিছু নেয়? শাড়িটা সমস্ত গায়ে জড়িয়ে নিলে শৈল। শরীরের কোনও অংশ যেন দেখা না যায়। মুখখানাও ভাল করে ঢাকতে পারলে যেন ভাল হতো। কোথা দিয়ে কোন্ দিকে বাসটা চলেছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ক'টা বেজেছে তাও জানবার উপায় নেই। এতক্ষণে মাসীমা টের পেয়ে গেছে কি-না কে জানে! হয়ত মাসীমা ঘরে এসে শৈলকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে আরম্ভ করেছে।

আর কাকা যদি এতক্ষণে বাড়ি এসে গিয়ে থাকে?

কাকা তো এসেই খুঁজতে আরম্ভ করবে। কাকা বরাবর বাড়িতে ঢুকেই শৈল বলে ডাকে। শৈল যেখানেই থাক তখন সামনে এসে দাঁড়ায়। আজ আর কাকা তাকে দেখতে পাবে না।

বহুদিন আগেকার সেই বাগমারীর জলা জায়গাটার কথা মনে পড়লো। সেইদিনই যদি সে সেই জলে ডুবে মরতে পারতো, তা হলে আর এত দুর্ভোগ হতো না তার কপালে।

পাশে একজন মহিলা ছিল।

শৈল জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা আপনি কি আমায় বলতে পারেন, ঘোষালপাড়া কোন্ জায়গাটা?

ঠিক জায়গাটাতে আসতেই ভদ্রমহিলা নামিয়ে দিলে। একেবারে অচেনা জায়গা। অথচ কাউকেই জানতে দেওয়াও চলে না যে এ-পাড়ায় নতুন এসেছে। তবু জিজ্ঞেস না-করেও উপায় নেই। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতাটা খুলে আবার একবার দেখে নিলে। রাস্তার ধারে নেম-প্লেট রয়েছে। তাতে রাস্তার নাম লেখা। অনেক কষ্টে পড়তে পারা যায়। মরচে-পড়া পুরোনো প্লেট। নামটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

—দেখুন, এখানে ঘোষাল-পাড়া লেনটা কোন্‌দিকে পাবো?

পুকুরের ঘাটে একজন মেয়েমানুষ বাসন মাজছিল। তাকেই ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করলে শৈল। পানাভরা পুকুর। তবু বাগমারীর চেয়ে ভালো। অনেক

বাড়ি, অনেক লোক এদিকে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বার করলে বাড়িটা। সদর দরজায় কড়া নাড়তেই কে একজন বুড়িমতন মেয়েমানুষ এসে দরজা খুলে দিলে।

—আপনাদের এ-বাড়িতে ঘর ভাড়া দেওয়া হবে? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এসেছিলুম—

বুড়িটা একবার আপাদ-মস্তক দেখে নিলে। বললে—ওমা, সে তো আজ সকালেই ভাড়া হয়ে গেছে—

—ভাড়া হয়ে গেছে?

শৈল যেন বসে পড়লো একেবারে। এত আশা করে এসেছিল! কাউকে না জানিয়েই চলে এসেছিল। ভেবেছিল বাড়িটা দেখে নিয়ে পছন্দ হলে তার পর কাকাকে বলবে। এতদিন ধরে পরের বাড়িতে আছে। কাকার লজ্জা না করুক, শৈলর করে।

—আচ্ছা দেখুন, এখানে আর কোথাও বাড়ি-ভাড়া আছে?

—এখানে আর কোথায় বাড়ি-ভাড়া পাবে মা, বাড়ি কি আজকাল পড়ে থাকে? আমরা সেলামি চেয়েছিলুম ছ'মাসের, তাই পড়ে ছিল, নইলে—

সমস্ত আকাশটা যেন ঘুরতে লাগলো শৈলর মাথার ওপর। রোদ তেতে উঠেছে। সেই অবস্থাতেই আবার ফিরলো সেই একই রাস্তা দিয়ে। আবার সেই ট্রাম-রাস্তা। কোন্ রাস্তা দিয়ে এসেছিল, তাও তখন আর মনে নেই। কিন্তু তখনও যেন বুড়ি-মানুষটার কথাটাই কানে বাজছে। বাড়ি কি আর আজকাল খালি পড়ে থাকে মা!

কিন্তু রাস্তায় ট্রাম-বাস কিছুরই দেখা নেই। অনেকে হেঁটেই চলেছে রাস্তা ধরে। লাল পাগড়ি পরা পুলিস সার-সার দাঁড়িয়ে আছে। কে যেন আসবে বলে সবাই রাস্তার ধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

শৈল একজন মহিলাকে জিজ্ঞেস করলে—দেখুন, বাস আসবে না?

—আপনি কোথায় যাবেন?

—বৌবাজারে।

—এখন দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে, প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ এসেছে এদিকে, তাই সব বাস-ট্রাম বন্ধ!

শৈল বললে—তা-হলে আপনারা কী করে যাবেন?

—আমাদের তো এদিকেই বাড়ি। আপনার বাস-ট্রাম চলতে দুপুর

একটা বেজে যাবে, ততক্ষণ যদি বসে থাকতে পারেন বসুন কোথাও, আর নয় তো—

শৈলর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো! তা হলে উপায়!

অফিসেই টেলিফোন-মেসেজ পেয়েছিল সদাব্রত। খবরটা পেয়ে তখনই জানিয়েছিল মিস্টার বোসকে। মিস্টার বোস বলেছিলেন লাঞ্চের পর তিনি আসবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও এলেন না। তার পর এসেছিল মন্মথ। মন্মথকে দেখে একটু অবাকই হয়ে গেল সদাব্রত।

—হঠাৎ তুমি যে?

মন্মথ বললে—অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি, তাই এলুম। মাস্টার মশাইও তোমার কথা প্রায়ই বলেন—

—এখন কেমন আছেন?

—আবার সেই রকম টিউশানি আরম্ভ করে দিয়েছেন, বারণ করলেও শুনছেন না, খাওয়ারও ঠিক নেই, সময়েরও ঠিক নেই—

সদাব্রত বললে—কিন্তু শৈল কিছু বারণ করে না কেন?

—বাঃ, তুমি এত জেনেও এই কথা বলছো? মাস্টার মশাই কি শৈলর কথা শোনেন? বাবার কথাও শোনেন না, সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এলুম বলতে—। তুমি একবার চলো সদাব্রতদা, বুঝিয়ে বলবে চলো—

সদাব্রত কী বলবে বুঝতে পারলে না। একে তার নিজের মাথার ওপর অসংখ্য দুর্ভাবনা, তার ওপর আর একটা ভাবনা চাপাতে যেন ভাল লাগে না। কোথা দিয়ে যেন সব ওলটপালট হয়ে যায়। জীবনটা তো এ-ভাবে আরম্ভ হয় নি তার। আর আরম্ভ যেমন ভাবেই হোক, সমস্ত কিছু এমন করে জট পাকিয়ে গেল কেন? দিনের পর দিন মনিলা হাসপাতালে শুধু বেঁচে আছে। বেঁচে আছে মানে এখনও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। অথচ যে-জন্যে চাকরি তার, যে-জন্যে মাসে মাসে মাইনে নিচ্ছে, তার কোনও উদ্দেশ্য সফল হবার আশা নেই। স্টাফেরা করুণার চোখে তাকে দেখে আজকাল। সবাই জানে চাকরিতে তাকে রাখার আর কোনও অর্থ নেই। এ-মাইনেটা পাচ্ছে সে ফাঁকি দিয়ে। আর তার পর আছে মামলা। দিনের পর দিন হিয়ারিং হচ্ছে

—কে সে ?

—তা বুঝতে পারছি না, সুন্দরিয়া বাঈয়ের কথাতে কালকেই সব বোঝা যাবে, আপনি আসবেন কাল নিশ্চয়ই—

সদাব্রত চলে আসবার আগে বলেছিল—নিশ্চয়ই যাবো। তাই অফিস-আওয়ার্স-এর মাঝখানেই বেরিয়ে এলো গাড়িটা নিয়ে। অনেক রাস্তায় ট্রাফিক বন্ধ। অনেক ঘুরে-ঘুরে যেতে হলো। অনেকগুলো রোড ক্লোজ্‌ড। ঘুরতে ঘুরতে যখন ডালহৌসীর পাড়ায় এসেছে তখন সামনের রাস্তাটাও বন্ধ হয়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদের জন্যে কি এরা সারা শহরই বন্ধ করে দেবে ? কোনও কাজ-কর্ম করতে দেবে না ?

আবার গাড়ি ঘোরাতে হলো।

আজকাল প্রায়ই এ-রকম হচ্ছে। ভি-আই-পি'রা এক-একজন আসে কলকাতায় আর সঙ্গে সঙ্গে শহরের সব নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

গাড়িটা একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল। সার-সার পুলিস পাহারা দিচ্ছে। কাউকে রাস্তা পার হতে দেবে না। হঠাৎ সব লোক যেন চকিত হয়ে উঠলো। ওই আসছে, ওই আসছে !

সামনে দিয়ে একটা মোটর-সাইকেল চলে গেল। পুলিসের সার্জেণ্ট। তার পর একটা গাড়ি। গাড়ির ভেতরেও হয়ত পুলিস কিংবা কোনও গভর্মেণ্ট অফিসার। তার পরে আরো একখানা গাড়ি। মাঝখানে প্রেসিডেণ্টের গাড়ি। তাঁর মাথায় খদ্দরের টুপি। গলা-বন্ধ কোট। শিবপ্রসাদ গুপ্তর বন্ধু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বাবার মুখেই শুনেছে সদাব্রত।

গাড়িটা যেতেই লোকগুলো চীৎকার করে উঠলো—ওই যে, ওই যে প্রেসিডেণ্ট—

সবাই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো প্রেসিডেণ্টকে দেখবার জন্যে। কিন্তু পুলিসের দল তৈরীই ছিল। কাউকে ভেতরে যেতে দেবে না। ল-অ্যাণ্ড-অর্ডার মানতেই হবে। মানুষের কাজ-কর্মের ব্যাপার গোল্লায় যাক সব, প্রেসিডেণ্টের গাড়ি ঠিক সময়ে পৌছুনো চাই-ই চাই, সে-ব্যাপারে ডিসিপ্লিন্ রাখতেই হবে।

সদাব্রত একবার ঘড়িটা দেখলে। দুটো বেজে গেছে। লাঞ্চের পর সুন্দরিয়া বাঈয়ের ক্রস-এগ্‌জামিনেশন্ শুরু হবে। সদাব্রত ট্রাফিক সিগন্যালের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

শেষেও একটা মোটর-সাইকেল ছিল। সেখানা চলে যাবার পর রাস্তা ক্লিয়ার।

সদাব্রত এঞ্জিনে স্টার্ট দিতে যাবে হঠাৎ পাশের ভিড়ের দিকে নজর পড়তেই কেমন অবাক হয়ে গেল। শৈল না! শৈল একলা এখানে কী করতে এসেছে? এ-পাড়ায়? শৈলও কি প্রেসিডেন্টকে দেখতে এসেছে নাকি? গাড়িটা পাশের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সদাব্রত নামলো।

—একি, তুমি এখানে?

শৈলর চেহারা দেখে মনে কেমন সন্দেহ হলো সদাব্রতর। চুল রুক্ষ। স্নান করে নি। চারদিকে এলোমেলো দৃষ্টি। সদাব্রতকে দেখে চমকে উঠেছে সেও। কিন্তু মুখে কিছু কথা নেই।

—তুমি এখানে এই বেলা ছুটোর সময় কী করছো? তোমার সঙ্গে কে আছে?

শৈল মুখ নিচু করে বললে—কেউ না—

—কেউ না তো এখানে কী করছো একলা-একলা?

—আমি বেহালায় গিয়েছিলুম।

—বেহালা? সে তো এখান থেকে অনেক দূর? এ তো ডালহৌসী স্কোয়ার! এখানে এলে কী করে?

—বাস-এ এসেছিলুম, বাস আজকে ঘুর-পথে এসেছিল, সেইজন্যে এখানে নামিয়ে দিয়েছে।

—বাড়িতে কেউ জানে তুমি বেহালায় গিয়েছিলে?

শৈল চুপ করে রইল।

সদাব্রত বললে—এখন বাড়ি যাবে তো, না কী?

শৈল এ-কথারও কোনও উত্তর দিলে না।

—বেহালায় কী করতে গিয়েছিলে?

এ-কথারও কোনও উত্তর দিলে না শৈল।

সদাব্রত বললে—ওঠো, আমার গাড়িতে ওঠো, আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি—

কেদারবাবু বাড়ি গিয়েই যথারীতি ডাকলেন—শৈল—ও শৈল—

অন্যদিন শৈলই এসে দরজা খুলে দেয়। দুপুর গড়িয়ে গেছে। সেই সকাল-বেলা বেরিয়েছিলেন তিনি বসন্তকে পড়াতে, তার পর গিয়েছিলেন আর এক জায়গায়। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছিলেন সদাব্রতদের বাড়িতে, সেখান থেকে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। মাথাটাও ঘুরছিল।

মন্মথদের চাকর দরজা খুলে দিতেই কেমন অবাক হয়ে গেলেন কেদার-বাবু।

—শৈল কোথায়? তুমি দরজা খুলে দিলে যে?

মন্মথর মা এসে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ বাবা, শৈল কোথায় গেল বুঝতে পারছি না তো!

—কেন? বাড়ি নেই সে?

—না, তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

—তা হলে মন্মথর সঙ্গে বেরিয়েছে নাকি?

মন্মথর মা বললে—না, মন্মথ তো খেয়ে-দেয়ে কলেজ চলে গেছে সকালবেলা। তখন তো শৈল বাড়িতেই ছিল দেখেছি—

কেদারবাবু হতাশ হয়ে মন্মথর মায়ের দিকে চাইলেন। কোনও কিনারাই করতে পারলেন না ভেবে। কোথায় যেতে পারে সে!

—খেয়েছে সে? তার খাওয়া হয়েছে?

—না, সকালবেলা সেই চা খেয়েছিল, আর কিচ্ছু খায় নি তো!

কেদারবাবু চেয়ারটার ওপর থপ করে বসে পড়লেন। বড্ড রাগী মেয়ে। রাগের মাথায় সে সব করতে পারে। তার বাবার মত শৈলরও রাগ হয়েছে।

বললেন—জানেন মা, শৈলকে দেখতে ওই রকম, কিন্তু ভীষণ রাগী, রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না, রাগ হলে শৈল সব করতে পারে। ওর বাবাও ওই রকম ছিল, রেগে গিয়ে মাথার শির ছিঁড়ে সে মরে গেছে—

মন্মথর মা আর কি বলবে!

শুধু বললে—তা হলে তুমি খেয়ে নাও বাবা, তুমি আর না-খেয়ে কতক্ষণ থাকবে!

কেদারবাবু বললেন—কিন্তু আমি খেলে তো আর সে ফিরবে না! আর সে না ফিরলে আমিই বা খেয়ে কী করবো?

—কিন্তু না-খেয়ে থাকলে তোমারও তো শরীর খারাপ হবে! আমরা তো সবাই খেয়ে নিয়ে বসে আছি—না-খেলে চাকরদেরও যে ছুটি হয় না, বাসন-মাজার ঝি এসে আবার ওদিকে ফিরে যাবে—

—কিন্তু কী করা যায় বলুন তো মা, এমন তো কখনও হয় নি আগে! একবার এই রকম বাগমারীতে গিয়ে হয়েছিল। আমার ওপর রাগ করে পুকুরে ডুবে মরতে গিয়েছিল—। আমি বরঞ্চ একবার থানায় যাই মা, পুলিসে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি—

মা বললে—তুমি আগে খেয়ে নাও বাবা, মন্মথ এলে সে-ই যাবে'খন—

কেদারবাবু শুনলেন না। সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়ালেন। শৈল নেই, শৈল খায় নি আর তিনি আরাম করে খাবেন তা সম্ভব নয়। বাইরে যেতে গিয়েও থামলেন।

বললেন—এদিকে শৈলর বিয়ের আমি সব ঠিক করে ফেলেছি, তা জানেন তো? আপনি বলেছিলেন সদাব্রতর বাবার কাছে যেতে, আমি গিয়েছিলুম—

—কী বললেন তিনি?

—ওর বাবা বাড়িতে ছিলেন না, দিল্লীতে গেছেন, তা আমি তো সদাব্রতকে ছোটবেলা থেকে পড়িয়েছি, সবাই আমাকে চেনে, ওর মাকেই বললুম। বললুম—আপনি তো শৈলকে দেখেছেন, এখন বলুন আপনার পছন্দ কি-না—

—কী বললেন সদাব্রতর মা?

—মা'র খুব পছন্দ। আমি ভাবছি আসছে অঘ্রাণ মাসেই বিয়েটা দিয়ে দেবো মা, আপনি কী বলেন? সেই সময় তরি-তরকারি সস্তা হবে। ধরুন নতুন ফুলকপি উঠবে, কড়াইশুঁটি উঠবে, মাছটাও সস্তা হয়ে যাবে।

তার পর একটু ভেবে বললেন—কিন্তু একটা কথা—

—কী?

কেদারবাবু বললেন—আমার তো ওই এক ভাইঝি, ওর বিয়েটা হয়ে গেলেই তো সব দায় চুকে গেল, তার পর আমার আর কিসের দায় বলুন? আমার দু'চোখ যেদিকে চায় চলে যাবো। আমি আর কারো কথা ভাববো

না, ইণ্ডিয়ার কথা ভেবে ভেবে আমি একলা কতটুকু করতে পারবো ! আমার আর সে উৎসাহ নেই, স্বাস্থ্যও গেছে—

বলেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ বাড়ির বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পেয়ে সেই দিকে চাইলেন। প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি। তার পর চোখ দুটো যেন আটকে গেল। সদাব্রতর গাড়ি না !

সত্যিই সদাব্রত বটে।

সদাব্রত গাড়িটা নিয়ে এসে মন্মথদের বাড়ির সামনে থেমেছে। তারই ভেতর বসে আছে শৈল।

কেদারবাবুও অবাক হয়ে গেছেন ! মন্মথর মা-ও অবাক !

কেদারবাবু আর থাকতে পারলেন না। চীৎকার করে উঠলেন—আরে তুই ? তোর খোঁজ করতেই তো আমি থানায় যাচ্ছিলুম ! সদাব্রতর সঙ্গে তোর দেখা হলো কোথায় ?

এ শহরের এও এক রহস্য। মানুষ এখানে মানুষকে চিনতে পারে না সহজে। কিন্তু একবার চিনলে আর সহজে বিচ্ছিন্নও হতে পারে না। হয় কাছে টানে, নয় তো দূরে ঠেলে। কিন্তু আর ত্যাগ করতে পারে না তাকে সারা জীবনে। সুখে দুঃখে সে কেবল ফিরে ফিরে আসে। সশরীরে ফিরে না এলেও চিন্তায় ফিরে আসে। মাঝরাতের ঘুম-না-হওয়ায় ফিরে আসে, দারিদ্র্যের নিঃসঙ্গতায় ফিরে আসে, বিলাসের প্রাচুর্যেও ফিরে আসে। এখানে এত কোটি-কোটি মানুষ। পোকার মত, পঙ্গপালের মত মানুষ। মানুষের স্পর্শ বাঁচাতে মানুষ অস্থির। তবু এই মানুষের জন্যেই মানুষের বড় মন কেমন করে। মানুষ সেই মানুষকেই চায় ফিরে ফিরে।

এতদিন পরে দেখা। অথচ কে যে প্রথমে কথা বলবে সেইটেই ছিল সমস্যা। তবু সদাব্রতই প্রথমে কথা বললে। তারই যেন প্রথম কথা বলা কর্তব্য।

সদাব্রত বললে—কোথায় গিয়েছিলে ?

শৈল চুপ করে রইল। কোনও উত্তর দিলে না।

—সত্যি বলো তো, কোথায় গিয়েছিলে? সেদিন মন্মথ এসেছিল, এসে বললে মাস্টার মশাই নাকি আবার খুব ঘোরাঘুরি করছেন?

শৈল এবার বললে—হ্যাঁ—

—তা তুমি একটু বারণ করতে পারো না? আমি অনেকদিন ধরে তো দেখে আসছি, কিন্তু আমার নিজেরও তো দুশ্চিন্তা আছে, আমার নিজেরও তো সমস্যা থাকতে পারে। আমি কত দিকে দেখবো, তুমিই বলো? আমার নিজেরই রাত্রে অনেকদিন ঘুম হয় না ভেবে ভেবে—

শৈল যেমন চুপ করে ছিল তেমনই চুপ করেই রইল।

সদাব্রত বলতে লাগলো—ছোটবেলায় এমনি দুশ্চিন্তা আমার আর একবার এসেছিল, কে একজন মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমি নাকি আমার বাবা-মা'র আপন ছেলে নই। সে ক'দিন যে কী অশান্তিতেই কাটিয়েছিলুম!...তার পর একদিন হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে গেলুম। মোটা মাইনের চাকরি। কিন্তু সে-চাকরিটাও যে কত বড় বিপর্যয় তাও কেউ বুঝলো না। সবাই আমাকে হিংসে করতে লাগলো—

শৈল হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু আমাকে আপনি এ-সব কথা বলছেন কেন?

সদাব্রত বললে—তোমাকেই যদি না বলি তো কাকে বলি বলো? কে শুনবে আমার কথা? আমি কাকে পাবো এত কথা শোনাবার জন্যে?

তার পর একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলো—বাইরে থেকে তোমরা ভাবো আমি বেশ আছি। কিন্তু সত্যিই যদি বেশ থাকতে পারতুম! যেমন করে আমার অফিসের অন্য অফিসাররা চাকরি করে, ক্লাবে যায়, ড্রিঙ্ক করে, বিয়ে করে, গাড়ি চড়ে আর মাসের পয়লা তারিখে মাইনে নিয়ে যায়—তেমনি করে যদি আমিও জীবন কাটাতে পারতুম! সে সুখ বোধ হয় আমার কপালে কোনও দিনই হবে না—

—কিন্তু এ-সব কথা আমাকে শুনিয়ে আপনার লাভ কী?

—লাভ?

সদাব্রত একবার চেয়ে দেখলে শৈলর দিকে। তার পর বললে—লাভ কিছুই নেই। আমি সান্ত্বনা চাইও নি কোনও দিন কারো কাছে, পাইও নি। সান্ত্বনা চাইবার জন্যেই এত কথা বলছি তাও যেন মনে কোরো না। মানুষের তো একজন কেউ শোনবার লোক চাই, কথা বলবার লোক চাই—

শৈল বললে—আমার কথা শোনবারই কি লোক আছে ভেবেছেন ?

—তোমার আবার কী কথা ?

শৈল সেই রকম ভাবেই সামনের দিকে চেয়ে বললে—আমারও তো অশান্তি থাকতে পারে, আমারও তো সমস্যা থাকতে পারে, আমারও তো রাত্তিরে ঘুম না হতে পারে—আমিও তো একটা মানুষ !

সদাব্রত গাড়ি চালাতে চালাতে চমকে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে বললে—সত্যি ? সত্যি তোমারও ঘুম হয় না আমার মত ?

শৈল চুপ করে রইল। সদাব্রতও আর কোনও প্রশ্ন করলে না। তার পর গাড়িটা মোড় ঘুরিয়ে অন্য রাস্তায় এসে পড়লো।

শৈল বললে—এবার আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমি রাস্তা চিনতে পেরেছি, এখানেই আমাকে নামিয়ে দিন—

সদাব্রত সে-কথায় কান না দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলো।

—নামিয়ে দিন !

সদাব্রত বললে—এতদূর যখন তোমাকে এনেছি, শেষটুকুও তখন নিয়ে যেতে পারবো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলে আমার কিছু ক্ষতি হবে না—

—কিন্তু আমার তো তাতে কিছু লাভ হবে না।

সদাব্রত বললে—তোমার লাভ হোক আর না হোক, আমার ক্ষতি নেই, বরং লাভই আছে—

—কিন্তু আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আপনার কী লাভ ?

সদাব্রত সোজা গাড়ি চালাতে লাগলো। সে-কথার উত্তর দিলে না।

শৈল বললে—বলুন, আপনার কী লাভ ?

সদাব্রত বললে—তোমাকে তো একটু আগেই বলেছি আমার অনেক সমস্যা, অনেক অশান্তি। তুমিও তার কিছু-কিছু জানো, কিছু-কিছু খবরের কাগজেও পড়ছো—। সব কথা স্পষ্ট করে বলবার মত মনের অবস্থাও আমার নেই এখন—

—কিন্তু সে-অবস্থা কি আমারই আছে ভেবেছেন ?

—তবু তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা ?

শৈল বললে—সবাই নিজের দুঃখটাকেই বড় করে ভাবে, এইটেই সংসারের নিয়ম—আপনার তবু তো বাবা-মা আছে, আপনার তবু তো চাকরি আছে, আপনার তবু তো করবারও একটা কিছু আছে কিন্তু আমি কী করি বলুন

তো, আমি কী নিয়ে থাকি বলুন তো? আপনি পুরুষ-মানুষ আপনার তবু যেখানে খুশি যাবার জায়গা আছে, আপনার নিজের হাতে অন্ততঃ টাকা আছে, আপনি ইচ্ছে হলে যাকে খুশি যত ইচ্ছে দানও করতে পারেন, আপনার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমি? আমার কথা একবার ভাবুন তো!

সদাব্রত চুপ করে শুনতে লাগলো।

—আপনি ছোটবেলা থেকে বাপ-মায়ের আদরে মানুষ হয়েছেন, ইস্কুলে কলেজে বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে পেরেছেন, ইচ্ছে হলে রাগ করেছেন, আবদার করেছেন, ঝগড়া করেছেন। দরকার হলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। আর আমি? ওই পাগল কাকাকে নিয়ে কী অবস্থায় দিন কাটিয়েছি তা যদি একবার কল্পনাও করতে পারতেন!

সদাব্রত চেয়ে দেখলে শৈলর মুখের দিকে। মুখটা যেন বড় ভার-ভার মনে হলো, চোখ দুটোও যেন ছলছল করে উঠছে।

—আজকে সকালে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলুম যে আজকে যেমন করে হোক যেখানে হোক একটা বাড়ি-ভাড়া করে আসবোই। কিন্তু আমি আবার একটা মানুষ, আমার আবার একটা প্রতিজ্ঞা!

—সেই জন্যেই বেহালায় গিয়েছিলে?

শৈল কোনও উত্তর দিলে না।

—তা তুমি কি মনে করেছ বাড়ি-ভাড়া পাওয়া অত সহজ কলকাতা শহরে? তুমি কোন্ সাহসে অত দূর গিয়েছিলে বলো তো? যদি কোনও বিপদ হতো?

শৈল তবু চুপ করে রইল।

—আর তা ছাড়া কে তোমায় বাড়ি খুঁজতে বললে? মন্মথদের বাড়িতে তোমার কিসের অসুবিধে হচ্ছে? আলাদা করে বাড়ি ভাড়া করলে তোমাকে দেখবার কে থাকবে? মাস্টার মশাই তো সারা দিন বাইরে বাইরে ঘুরবেন, তুমি একলা বাড়িতে থাকবে কী করে? আবার কি সেই বাগমারীর মত কাণ্ড করে বসতে চাও?

শৈল বললে—কিন্তু এভাবে আর বেঁচে থেকেই বা কী হবে?

সদাব্রত বললে—মরে যাওয়া তো সহজ, খুবই সহজ। সে তো সবাই পারে। বাঁচতে ক'জন জানে? কলকাতায় ক'টা লোক সত্যিকারের বেঁচে আছে বলো তো?

—কিন্তু আমার মতন অবস্থায় পড়লে ও-ছাড়া আর উপায়ই বা কী ?

সদাব্রত বললে—খুব উপায় আছে। যারা বাঁচার উপায় জানে না তারাই কেবল মরতে চায়। তুমি আমার কথা ভাবো তো, আমি কী করে বেঁচে আছি ?

শৈল গলা নীচু করে বললে—আপনি ? আপনার কী নেই ? আপনার যা আছে আমার কি তা আছে ?

সদাব্রত বললে—তোমার সব আছে। তোমার কাকা আছে, মন্মথ আছে, আমি আছি—

—এবার চুপ করুন। এসে গিয়েছি।

বাড়ি এসে গিয়েছিল। সদাব্রত গাড়িটায় ব্রেক কষে থামিয়ে দিলে।

কেদারবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শৈলকে দেখেই বলে উঠলেন—আরে তুই ? তোর খোঁজ করতেই তো আমি থানায় যাচ্ছিলাম! সদাব্রতর সঙ্গে তোর দেখা হলো কোথায় ?

সদাব্রতও নেমে পড়েছে।

কেদারবাবু সদাব্রতর দিকে চেয়ে বললেন—আমি যে তোমাদের বাড়ি থেকেই আসছি এখন—তোমার মা'র সঙ্গে সব কথা পাকা করে এলুম—

সদাব্রত বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কিসের কথা ?

—তোমার বিয়ের কথা। শৈলকে তোমার মা'র খুব পছন্দ হয়েছে। আমি ভাবছি অঘ্রাণ মাসটাই ভাল, তরি-তরকারিটা সস্তা, তখন নতুন ফুলকপি উঠবে…

সদাব্রত বললে—আমি এখন হাইকোর্টে যাচ্ছি মাস্টার মশাই, ফিরে এসে কথা বলবো…এখন আর সময় নেই—

বলে তাড়াতাড়ি গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চলে গেল—

সমস্ত হাইকোর্ট তখন থমথম করছে। একদিন এই ধর্মাবতারই বিচার করেছে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর। বিচার করেছে মহারাজ নন্দকুমারের। বিচারের দণ্ড একদিন এমনি করেই নেমে এসেছে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, জে. এম. সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বোসের মাথার ওপর। একদিন এই বিচারেরই দণ্ড নিয়ে

বাংলার ছেলে ক্ষুদিরাম, গোপীনাথ, সবাই প্রাণ দিয়েছে। তাদের দেওয়া প্রাণের বিনিময়ে যে-স্বাধীনতা এসেছে, সেই স্বাধীনতাই আজ আবার পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু পরীক্ষা নয়, অগ্নি-পরীক্ষা। ইণ্ডিয়া থেকে পাপ দূর করতে হবে। যে পাপী তার শাস্তি চাই। অভাব থাকবে, কিন্তু অভিযোগ করো না কেউ। অভিযোগ করলে শান্তির পথে করো। বিদ্রোহ করলে তার দণ্ড মাথায় নিয়ে নতজানু হতে হবে। দরকার হলে তোমার মাথাও দিতে হবে।

এক-একজন করে সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে, আর ইতিহাসের পাতা এক-একটা করে খুলে যাচ্ছে চোখের সামনে। এই কলকাতার নিয়নলাইট, গান্ধীঘাট, রাজভবন, এই কলকাতার শাড়ি, গয়না, গাড়ি, ঐশ্বর্য, এই কলকাতার রং-মাখা মুখের আড়ালে আর এক কলকাতার ছবি ফুটে উঠেছে একটার পর একটা। সে-কলকাতায় ফাইভ-ইয়ার-প্ল্যানের গ্রাফ নেই। সে-কলকাতায় ভদ্রলোকের ছেলেরা বাড়িতে ঘর নেই বলে পাড়ার খোলার ঘরে 'সংস্কৃতি-সংঘ' করে। মেয়েদের কাছাকাছি পাবার জন্যে ড্রামাটিক ক্লাব করে। শত্তুরা সেখানে খানিকক্ষণের জন্যে এসে আফিম খেয়ে জীবনের সব স্বাদ ভুলে থাকে। সে-কলকাতায় বিনয়ের মত ছেলেরা বিয়ে করতে পারে না চাকরি পায় না বলে। বিয়ে করে না বলে বাসের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়েদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি হবে বলে। সে-কলকাতায় সিনেমার সামনে কিউ দিয়ে বসে তাস খেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই কলকাতারই সুস্থ ছেলের দল। সেই তারাই আবার সে-কলকাতায় রাত কাটাতে যায় আর এক অঞ্চলে। যেখানে মানুষের লোভ আর মানুষের লালসা অজগরের মত প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে সবাইকে গোগ্রাসে গিলে ফেলে। সে-কলকাতায় স্বামী-পুত্র-ছেলে-মেয়ে বাড়িতে রেখে রোজগার করতে গোলাপীরা যায় পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে।

যারা কোর্টে হিয়ারিং শুনতে যায় তারা দিনের পর দিন কলকাতার কুৎসা শোনে। যা তারা দেখে নি, যা তারা জানে নি তা-ই দেখতে তাই জানতে যায়। আর বাড়িতে এসে ছি ছি করে। এসে বলে—আরে ছি ছি, এই আমাদের কলকাতা!

কলকাতা যেন গোল্লায় গেছে। কলকাতা যেন জাহান্নামে গেছে। এমনি মানুষের ভাবখানা। কিন্তু তবু ভালো লাগে শুনতে। তবু ভালো লাগে সকালবেলা খবরের কাগজের পাতায় কলকাতার মানুষের কেলেঙ্কারিগুলো

পড়তে। কেমন করে একটা মেয়ে পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে অক্ল্যাণ্ড হাউসের বড়বাবুর পাল্লায় পড়ে এই শহরেরই বুকের ওপর আর্টিস্ট হয়ে ভদ্রসমাজে মিশেছে, সেই ভদ্রসমাজই আবার কেমন করে সেই মেয়েকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে, সেই মেয়েকে সোনার মেডেল দিয়েছে। তার কাহিনী নভেল-নাটকের কাহিনীর চেয়েও বিচিত্র। তার সঙ্গে কেমন করে জড়িয়ে গেছে সদাব্রত গুপ্ত, মনিলা বোস, সুন্দরিয়া বাঈ, শেঠ·ঠগনলাল, পদ্মরাণী, গোলাপী, যূথিকা, বাসন্তী, দুলাল সান্যাল, সঞ্জয় সরকার, শম্ভু, কালীপদ—সে আরো বিচিত্র কাহিনী।

সবাই সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। সবাই বললে—টগরকে তারা জানে না। তারা জানে শুধু কুন্তি গুহকে—

আবার কেউ-কেউ বলছে—কুন্তি গুহকে তারা চেনে না, তারা শুধু চেনে টগরকে—

আর যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই কুন্তি গুহ প্রতিদিন আসামীর কাঠগড়ায় প্রেতের মতো এসে দাঁড়িয়েছে। তার ছায়ায় যেন বিষ আছে। সেই বিষের ফণা তুলে সে যেন নিঃশব্দে সকলকে বলছে—আমি যা করেছি সে শুধু আমার একলার পাপ নয়, সে আমার সে তোমার পাপ! এই কলকাতার প্রত্যেকটা মানুষের পাপ, এই ইণ্ডিয়ার যুদ্ধ-পরবর্তীদের সকলের পাপ—

সেই প্রেত যেন আরো বলছে—আমাকে একলা শাস্তি দিলে চলবে না। আমাকে একলা শাস্তি দিলেও এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তোমাদের সকলকেই এ-পাপের ভাগ নিতে হবে। আমার পাপের সঙ্গে তোমাদের পাপেরও বিচার করতে হবে। যাদের সঙ্গে আমি মিশেছি, যাদের সঙ্গে আমি শুয়েছি, যাদের হাত থেকে আমি পাপের টাকা নিয়েছি, যারা আমার হাতে মদের গ্লাস তুলে দিয়েছে, তাদেরও ডাকো। তারাও আসুক। তাদের শাস্তি না দিলে আমার শাস্তি যে মিথ্যে হবে। তাদের বিচার না হলে যে তোমাদের সব আয়োজন পণ্ড হবে।

বিরাট পুরনো হাইকোর্টের ভেতরে যেন আরো অনেকের অশরীরী আত্মা এসে ছায়ার মতন নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করে। বারান্দায় একটা পায়রা এসে বক-বকম শব্দ করে খানিকক্ষণের জন্যে সকলকে সচকিত করে তোলে। আকাশে কোনও দূরাগত এরোপ্লেনের শব্দে গম্বুজওয়ালা সমস্ত বাড়িটা গম-গম করে ওঠে। এর আগে যত লোকের ফাঁসির দণ্ড হয়ে গেছে এজলাসে,

সবাই এসে যেন কান পেতে থাকে। এবার আর একজন আসছে। আর একজন এসে তাদের সংখ্যা বাড়াবে।

প্রেতটা বলে—কই, ওদেরও ডাকো, যারা দিনের পর দিন মানুষের খাবারে বিষ মিশিয়েছে, যারা ওষুধে ভেজাল চালিয়েছে, যারা মানুষের খাবার মানুষকে না দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। তাদেরও ডাকো যারা আকাশে বাতাসে মাটিতে সমুদ্রে বিষের বোমা ফাটিয়ে পৃথিবীকে কলঙ্কিত করবার চেষ্টা করছে। তারা কই, যারা এখনও এই শহরে, ক্লাবে, মহাজাতি-সদনে, ময়দানে, চৌরঙ্গীতে হোটেলে, বারে, মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। তারাই কি নিরপরাধ আর আমি একলাই অপরাধী? তা হলে কাদের জন্যে আমাদের দেশ ভাগ হলো? কাদের জন্যে আমরা জন্তু-জানোয়ারের মত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে রইলুম, কাদের জন্যে আমাদের কলোনী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল? কারা আমার বাবাকে হত্যা করলে, কারা আমার বোনকে চুরি করতে শেখালে? তারা কোথায়? তারা না এলে, তাদের শাস্তি না হলে যে আমার প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ থাকবে! ডাকো, ডাকো তাদের।

এবার সুন্দরিয়া বাঈয়ের পালা।

স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, তুমি যদি আসামীকে না পাঠিয়ে থাকো তো আর যাদের পাঠিয়েছ তাদের নাম করতে পারো?

সুন্দরিয়া বাঈ বললে—তাদের আসল নাম পরে সব বদলে দেওয়া হয়—আসল নাম থাকে না—

—তুমি বলেছিলে তুমি কখনও চিঠি-পত্র লেখো নি, কিন্তু এটা কার চিঠি? ভাল করে দেখে উত্তর দাও তো—

বলে একটা চিঠি দেখানো হলো সুন্দরিয়া বাঈকে।

সুন্দরিয়া বাঈ চিনতে পারলো। বললে—হ্যাঁ, এ-চিঠি আমারই চিঠি—

—তা হলে তুমি আগে যা বলেছিলে তা মিথ্যে?

—না মিথ্যে নয়, আমার মনে ছিল না ও-চিঠিখানার কথা।

—এমনিতে তুমি চিঠি লিখতে না, ওই একখানা ছাড়া, এ-কথা কি সত্যি?

—সত্যি!

—ওখানা কেন লিখেছিলে?

—আমি আমার পাওনা-টাকা পাই নি বলে।

—কত টাকা পাওনা হয়েছিল তোমার?

—সামান্য চল্লিশ হাজার টাকা। চল্লিশ হাজার টাকা দিতেই দেরি করছিল আমাকে।

—তুমি জানো যে, যে-সাক্ষ্য তুমি দিচ্ছ তাতে তোমার শাস্তি হতে পারে?

সুন্দরিয়া বাঈ বললে—আমি তার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছি—

—তোমার ভয় নেই?

—এখন আর আমি ভয় করবো কার জন্যে? কে আছে আমার? আমার বেঁচে থেকেই বা লাভ কী?

সদাব্রত চুপ করে বসে শুনছিল। শুধু সদাব্রত নয়, সদাব্রতর মতো আরো অনেকে এসেছে। দূরে দেখা গেল শম্ভুও এসেছে অফিস কামাই করে। বিনয়ও এসেছে। কালীপদ এসেছে। আরো অনেকগুলো চেনামুখ বসে রয়েছে। অবিনাশবাবু, বঙ্কুবাবু, শিবপ্রসাদবাবুর পেন্‌সন্‌-হোল্ডার বন্ধুরাও শুনতে এসেছে। রোজই আসে সবাই। খবরের কাগজে মামলার ছোট খবর পড়ে কারো তৃপ্তি হয় না, এখানে পুরোপুরিটা জানতে চায়। আসামীকেও দেখতে পাওয়া যায় চোখ দিয়ে। এই মেয়েটাই এত কাণ্ড করেছে এতদিন। এই মেয়েটাকে নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেছে আমাদের চোখের আড়ালে আর আমরা জানতেই পারি নি কিছু। শিবপ্রসাদবাবু তো সৎ লোক, তার ছেলে এর মধ্যে ছিল? এই তো সেদিন ছোট ছিল ছেলেটা, কলেজে পড়তো। মুখ-চোরা ছেলে। আমাদের সঙ্গে লজ্জায় কথা বলতো না, মুখ নিচু করে থাকতো। তার এই কীর্তি!

—চল্লিশ হাজার টাকা আমার কাছে কিছুই না। তার থেকে আরো বেশি লোকসান হয়েছে আমার।

—কী লোকসান?

—যারা লাখ লাখ টাকা লাভ করেছে, তারা আমার ন্যায্য পাওনা দেয় নি।

—কত টাকা দেয় নি?

—আমার প্রায় দেড়-লাখ টাকা পাওনা হয়েছে, তা আর পাচ্ছি না—আমি জানি তা আর পাবোও না।

কুন্তি গুহর পক্ষের উকিল হঠাৎ পয়েন্ট-অব-অর্ডার তুললো। কোর্টময় স্তব্ধতা। কুন্তি গুহ পাথরের মত ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। এবারও ছন্দপতন হলো না। একদিন এই কলকাতাকে

জয় করবার পণ নিয়েই এখানকার রাস্তায় নেমেছিল সে, তার সে-জয় আজ যেন সম্পূর্ণ হলো। এবার ঘোষণা করে যাবার সময় হয়েছে—আমি অপরাধী কিন্তু আমার এ-অপরাধ তোমার-আমার সকলের অপরাধ। আমি তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নই। কলকাতার হৃৎপিণ্ডের ওপর তোমরা যে ঐশ্বর্যের আরব্য-উপন্যাস রচনা করেছ তা আমাদের শ্যামলীদের আর বন্দনাদের মাংস-অস্থি আর মজ্জার উপকরণ দিয়ে তৈরী। আমাদের রক্তই তোমাদের ব্লাড-ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে তোমাদের পুষ্টিসাধনের জন্যে। জানুক! সবাই জানুক আমি একলা নই, আমাদের সকলকে সামনে রেখে মানুষের সমাজ আমার চেয়েও কত বড় অপরাধী। আমি মাত্র একটা অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ছুঁড়ে একজন প্রাণীকে হত্যা করেছি, আর তোমরা দিন-রাত লক্ষ-লক্ষ অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ছুঁড়ে লক্ষ-লক্ষ প্রাণীকে হত্যা করছো, তবু তোমরা ফরিয়াদী আর আমি আসামী!

—তুমি তো জানো আসামী নিজেকে নির্দোষ বলেছে?

সুন্দরিয়া বাঈ বললে—জানি।

—তুমি কিছু জানো কোথায় অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ তৈরী হয়? কারা তৈরি করে?

—না।

—তুমি কিছু জানো আসামীর সঙ্গে ফরিয়াদী-পক্ষের প্রধান সাক্ষী সদাব্রত গুপ্তর কোনও সম্পর্ক ছিল কি-না?

—না।

—তুমি কি জানো ফরিয়াদী-পক্ষের প্রধান সাক্ষী কখনও পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল কি-না?

—তা আমি কী করে জানবো?

—তা হলে এত লোক থাকতে প্রধান সাক্ষীর সঙ্গে যে-মেয়েটির বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক, তাকে হত্যা করবার চেষ্টার মধ্যে কী কারণ থাকতে পারে আসামীর?

—আসামীই যে মেরেছে তাও আমি জানি না। মারলে তবে তার কারণ অনুমান করতে পারি।

—তুমি কি মনে করো আসামী নিরপরাধ? সে অ্যাডিড-বাল্‌ব্‌ ছোঁড়েনি?

—আমি কিছু জানি না। আমি শুধু জানি যে আসামী নিরপরাধ বলে জবানবন্দি দিয়েছে।

—কিন্তু আসামীর মতো যারা জঘন্য চরিত্রের লোক, যারা নিজের দেহ বিক্রী করে জীবিকা অর্জন করে, মদ খায়, তাদের পক্ষে এ ধরনের অপরাধ করা কি অসম্ভব ?

সুন্দরিয়া বাঈ বললে—আমি জানি সকলের পক্ষে সব অপরাধই সম্ভব। আমার এতদিনের কারবারের অভিজ্ঞতায় আমি তাই-ই দেখে এসেছি।

—কিন্তু বাংলার নারী-সমাজ কি এই জঘন্য অপরাধে ধিক্কার দেয় নি অপরাধীকে ?

—কে অপরাধী সেইটেই আগে ঠিক করুন।

—সেই অপরাধী খুঁজে বার করবার জন্যেই তো আমরা এখানে এসেছি।

সুন্দরিয়া বাঈ এতক্ষণে প্রথম যেন একটু দম নিলে। বললে—আপনারা যতই চেষ্টা করুন আসল অপরাধীকে খুঁজে বার করতে পারবেন না।

স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলো—কেন ?

সুন্দরিয়া বাঈ বললে—আসল অপরাধী খুব চালাক বুদ্ধিমান লোক—

—কে সে ? তার নাম কী ?

সুন্দরিয়া বাঈ যেন একটু দ্বিধা করতে লাগলো, এক মুহূর্তের ভগ্নাংশের একটুখানি সংকোচ।

—বলো, কী তার নাম ?

সুন্দরিয়া বাঈ বললে—তাঁর নাম শিবপ্রসাদ গুপ্ত—

—বলছো কী তুমি ?

সুন্দরিয়া বাঈয়ের মুখখানা পাথরের মত নীরস কঠিন হয়ে উঠলো হঠাৎ।

—হ্যাঁ, স্পষ্ট করে বলছি, নামটা শুনে রাখুন, তাঁর নাম শিবপ্রসাদ গুপ্ত। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের আসল মালিক তিনিই। তাঁর বাড়ি গাড়ি, জমির কারবার, কংগ্রেস, দিল্লী, খদ্দর, এই সব কিছুর পেছনে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের মালিকানা।

হঠাৎ সমস্ত হাইকোর্ট যেন ভিতসুদ্ধ নড়ে উঠলো, হাইকোর্টের ভেতরে যত লোকান্তরিত আত্মা আজ বিচার শুনতে এসেছিল তারাও সবাই যেন চমকে উঠলো। ওয়ারেন হেস্টিংস, মহারাজ নন্দকুমার, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, জে. এম. সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, গোপীনাথ সবাই নিঃশব্দে আর্তনাদ করে উঠলো একসঙ্গে। ইণ্ডিয়ার সমস্ত মানুষের সব চেষ্টা সব চিন্তা রাতারাতি ধূলিসাৎ হয়ে গেল এই ১৯৬২ সালে এসে।

মানুষের মনের ইচ্ছে যেখানে অন্যের ইচ্ছের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, অন্যের চাওয়ার ওপর নির্ভর করতে চায়, তখনই সে-ইচ্ছের আর স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না। তখন সে পরাধীন। এতদিন সদাব্রতরও তা-ই ছিল। বাইরে থেকে সদাব্রত ভাবতো সে বুঝি স্বাধীন। তার বুঝি যা-ইচ্ছে-তাই করবার ক্ষমতা আছে। সে যা ভাবে যেন তা-ই সে। সে চাইতো সবাই ভাল হবে। সে চাইতো কলকাতার সব মানুষ পেট ভরে খেতে পাবে। সে চাইতো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে কোনও গ্রন্থি থাকবে না। সে যেমন করে সকলের হতে চায়, সকলে তেমন করেই তার হবে। কিন্তু তার এই চাওয়াটাই যে মিথ্যে, তার এই ইচ্ছেটাই যে ভেজাল তা-ই সে জানতো না। জানতো না যে তার এই ইচ্ছের আড়ালে অন্য আরো অনেকের ইচ্ছে কাজ করছিল। যখন সে নিজেকে স্বাধীন বলতো তখন যে সে সত্যিকারের পরাধীন, তা সে টের পায় নি। এতদিনে তাই তার যেন চৈতন্য হলো।

কতদিন বিনয়কে সে কত উপদেশ দিয়েছে, শম্ভুকেও কত কী বলেছে। মন্মথকে শৈলকে সকলকেই তার ইচ্ছের দোসর করতে চেয়েছে। সমস্ত কলকাতাই বা কেন? সমস্ত ইণ্ডিয়াটাকেই তার ইচ্ছের দোসর করে নিয়ে ভাবতে চেয়েছে সে।

সদাব্রত ছোটবেলা থেকেই বলে এসেছে—যে-পথে সবাই চলেছে সেটা ভুল পথ। এই আমার পথটাই ঠিক। আমার বাবার পথটাই ঠিক। এই আমার মাস্টার মশাই কেদারবাবুর পথটাই ঠিক। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ইচ্ছেকে আমাদের ইচ্ছের সঙ্গে মেলাতে হবে, তবেই সকলের উন্নতি হবে, তবেই সকলের ভাল হবে—

কিন্তু আজ মনে হলো সমস্ত ভাবনাটাই তার ভুল। এতদিনের সব চেষ্টা তার ব্যর্থ। এতদিনের সব প্রয়াসই তার মিথ্যে। সে নিজেই একজন মূর্তিমান ভেজাল।

কোর্ট সন্ধ্যেবেলাই খালি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ তাকে দেখবার আগেই সদাব্রত বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যেই যেন হারিয়ে যেতে ভাল লাগলো সদাব্রতর।

যে-ভিড় তাকে চেনে না, যে-ভিড় তাকে স্বীকার করে না, সেই ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করেই যেন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

—ওই যে, ওই যে শিবপ্রসাদ গুপ্তর ছেলে!

—ওই যে পালিয়ে যাচ্ছে! ধর ওকে, ধর—

সদাব্রতর মনে হলো সমস্ত কলকাতা যেন তাকে তাড়া করেছে। তার পেছন-পেছন চলেছে সমস্ত ইণ্ডিয়া, সমস্ত পৃথিবী। সদাব্রত গাড়িটার অ্যাক্সিলারেটারটা আরো জোরে টিপে ধরলে। আরো স্পীড্। আরো গতি। আরো তাড়াতাড়ি।

এই আস্ত কলকাতাটাই যেন বিষ হয়ে গেল একটা মুহূর্তের মধ্যে। তা হলে কে সে? কোথায় তার অস্তিত্বের চরম আশ্রয়? সে কি ঐ পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের উপার্জনের সন্তান? তার প্রতিদিনের রক্ত-কণিকার মধ্যে কি পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের বিষ এমন করে এতদিন লুকিয়ে ছিল? ওই গোলাপী, ওই দুলারী, ওই বাসন্তী, ওই কুন্তি গুহ, ওই টগর, ওই পদ্মরাণী! যারা সাক্ষ্য দিয়েছে কোর্টে গিয়ে, যারা প্রমাণ করেছে কলকাতার মানুষের আড়ালের ইতিহাসের কাহিনী, তারাই কি সদাব্রতর সৃষ্টিকর্তা? তারাই কি তিল-তিল পাপ দিয়ে, তিল-তিল অভিশাপ দিয়ে তাকে গড়ে তুলেছে? যাদের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ তারাই কি তাকে এতদিন মানুষ করে আসছে?

কোর্টের মধ্যে সুন্দরিয়া বাঈয়ের উত্তর শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু সদাব্রতই বা কেন? প্রায় সমস্ত কলকাতার লোক ভিড় করেছিল সেদিন মামলা শোনবার জন্যে। প্রতিদিন তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতো মামলা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। কতদূর গড়ায়। কোথায় কলকাতার কোন্ বড়লোকদের বাড়ির শোবার ঘরে গিয়ে স্পর্শ করে। শেষ পর্যন্ত তারা তা জেনেছে। শেষ পর্যন্ত তারা খুশী হয়েছে। খুশী হয়েছে আর অবাকও হয়েছে।

গাড়িটা আরো জোরে চালিয়ে দিলে সদাব্রত।

সমস্ত কলকাতাকে, সমস্ত ইণ্ডিয়াকে, সমস্ত পৃথিবীকে, সমস্ত সভ্যতাকে ছেড়ে সদাব্রত সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চললো। হয়তো নিজের মুক্তির দিকেই এগিয়ে চললো। হয়তো আত্ম-অনুসন্ধানের দিকেই এগিয়ে চললো। হাইকোর্ট-পাড়া পেরিয়ে হেস্টিংস্ স্ট্রীট। হেস্টিংস স্ট্রীট পেরিয়ে বউবাজার, বউবাজার পেরিয়ে কলেজ স্ট্রীট। ডান দিকেই শম্ভুদের ক্লাব। আজ সেখানে তুমুল আলোচনা চলবে।

শম্ভুর দুলালদার আজ গলা ভারী হবে। বলবে—আমি বলেছিলুম তোদের—

কী যে বলেছিল তা আর কাউকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। সবাই জানবে শম্ভুর বন্ধু সদাব্রত তাদের চেয়েও আরো নিচুস্তরের মানুষ। সবাই জানবে শিবপ্রসাদ গুপ্তর খদ্দর আর তাঁর দেশসেবার আড়ালে আর একটা পেশা এতদিন ধরে পোষা ছিল। সবাই জানবে সদাব্রতর গাড়ি, সদাব্রতর শিক্ষা, দীক্ষা, সদাব্রতর সব কিছু কতকগুলো মেয়েমানুষের পাপের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শিবপ্রসাদ গুপ্তর সব গৌরব কলকাতার নিচুতলার মেয়েমানুষদের উপার্জনের যোগফল।

হঠাৎ কতকগুলো চীৎকার কানে এলো সদাব্রতর।

গাড়ি চালাতে চালাতেই থামিয়ে দিলে। কিসের চীৎকার? কিসের হল্লা?

—লড়াই শুরু হো গিয়া!

চমকে উঠলো সদাব্রত। কিসের লড়াই!

শুধু সদাব্রত নয়, আরো অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে খবরের কাগজের হকারটার সামনে। হিন্দুস্থানী নিরক্ষর মানুষ। ১৯৩৯ সালে একবার ঠিক এমনি করেই চীৎকার করেছিল সে। রাতারাতি অনেকগুলো টাকা উপায় করে ফেলেছিল যুদ্ধের খবর বেচে। তার পর অনেকদিন আর টাকার মুখ দেখে নি। অনেকদিন আশা করে বসে ছিল কবে যুদ্ধ বাধবে। আবার কবে লড়াই শুরু হবে। আবার তা হলে সে দুটো টাকার মুখ দেখতে পায়।

—লড়াই শুরু হো গিয়া!

গলায় যত জোর আছে তত জোর দিয়ে চীৎকার করছে লোকটা। শুধু একজন নয়। দলে দলে পাড়ায় পাড়ায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে অনেকে বেরিয়ে পড়েছে খবরের কাগজ নিয়ে। আবার সুযোগ এসেছে। যুদ্ধের সময় আগে যারা সুবিধে করতে পারে নি, এবার তাদের সুযোগ। এবার কিছু কিনে রেখে দাও। দাম বাড়লে বেচে দিও। অনেক প্রফিট্ হবে।

সমস্ত কলকাতায় যেন তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। আবার যুদ্ধ? আবার সাইরেন? আবার বোমা? আবার এ-আর-পি, সিভিক-গার্ড? আবার চালের দাম বাড়বে? আবার দুর্ভিক্ষ হবে? আবার সেই রকম হবে যেমন হয়েছিল ১৯৩৯ সালে?

মোড়ে মোড়ে দল বেঁধে মানুষের ভিড় দাঁড়িয়ে গেছে। ভাবতে শুরু করেছে। জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু করেছে। সত্যিই কি যুদ্ধ বাধলো আবার ?

সদাব্রত গাড়ি থামিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনলো।

এবার আর ইয়োরোপ নয়। এবার এশিয়া। ইয়োরোপের মানুষের ঘা এখনও শুকোয় নি। তারা হয়ত এখনও মনে-মনে ভয় পায়। কিন্তু আমরা ? আমরা বুঝি নি। আমরা শুধু দুর্ভিক্ষ দেখেছি, আমরা শুধু রায়ট দেখেছি। আমরা শুধু জানি যুদ্ধ বাধলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। কিন্তু ওরা জানে যুদ্ধ মানে মৃত্যু। ওরাই জানে যুদ্ধ মানে ধ্বংস।

সদাব্রত গাড়ির মধ্যে বসে বসেই খবরের কাগজ পড়তে লাগলো। একেবারে পঞ্চাশ ডিভিশন সৈন্য হঠাৎ ইণ্ডিয়ার বর্ডার-গার্ডদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাতারাতি। নেফা, লাদাকপূর্ব-পশ্চিম সীমান্তের সবগুলো জায়গায় চায়না আক্রমণ করেছে আচম্‌কা।

পড়তে পড়তে সদাব্রত কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে এলো। মনের মধ্যে যতখানি ক্ষোভ যতখানি জ্বালা এতক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল সব যেন আস্তে আস্তে থেমে এলো। তার পর বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে। মানুষের জটলা তখনও কমে নি। তখনও সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে এ ওর সঙ্গে কথা বলছে। বাস-ট্রাম যেন সব থেমে গেছে কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে। এ তো বেশি দূরে নয়। এ তো বর্মা নয়, ইজিপ্টও নয়। বার্লিন, লেনিন্‌গ্রাদ, প্যারিস, লণ্ডনও নয়। এ একেবারে ঘরের দরজায়। এ আসাম। নেফা থেকে আসামে আসতে কতক্ষণ ? কয়েকটা পাহাড়। পাহাড় পেরিয়ে তেজপুরে এলেই তো একেবারে আসামের সদর দরজা। সদাব্রত গাড়িটা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চালিয়ে দিলে।

কেদারবাবুর কথা মনে পড়লো। শৈলর কথা মনে পড়লো, মন্মথর কথা মনে পড়লো।

কেদারবাবুকে কথা দিয়েছিল কোর্ট থেকে ফেরবার সময় একবার দেখা করবে। কিন্তু···! কিন্তু ভাবতে গিয়েও সংকোচ হলো। কোন্ মুখ নিয়ে সে সেখানে যাবে ? কী বলবে সে ? কোন্ মুখে তাদের সামনে দাঁড়াবে ? যদি কেউ প্রশ্ন করে—যদি কেউ তাচ্ছিল্য করে তাকে দেখে ? নিশ্চয়ই এতক্ষণে তারা সবাই টের পেয়ে গেছে। এতক্ষণে সবাই জেনে গেছে।

শশীপদবাবু তাকে দেখে কিছু না বলতে পারেন। কিন্তু মাস্টার মশাই ? মাস্টার মশাইকে কী বলে সে জবাবদিহি করবে ? কেদারবাবু হয়ত সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করে বসবে—যা শুনছি, এ কি ঠিক ?

সমস্ত মাথাটা যেন বন বন করে ঘুরতে লাগলো। কেদারবাবুকে না-হয় জবাবদিহি করা গেল কোনও রকমে, কিন্তু নিজের কাছে সে কী বলে জবাবদিহি করবে ?

—সদাব্রতদা !

হঠাৎ যেন কলকাতা শহর তাকে পেছন থেকে ডাকলো।

—সদাব্রতদা !

বাড়ির কাছাকাছি এসে গিয়েছিল ততক্ষণে। সদাব্রত গাড়িটা থামিয়ে পেছন ফিরে দেখলে। মন্মথ।

মন্মথ দৌড়োতে দৌড়োতে কাছে এসেছে।

—আমি তো তোমাদের বাড়ি থেকেই আসছি। তোমাকে না-পেয়ে চলে যাচ্ছিলুম।

সদাব্রত বোবার মত মন্মথর মুখের দিকে চেয়ে রইল। আজ যেন তার আর জবাব দেবার মত কোনও কথা নেই।

—তুমি বলেছিলে কোর্ট থেকে আমাদের বাড়িতে আসবে। অনেকক্ষণ বসে-বসেও তুমি এলে না, তাই ডাকতে এসেছিলুম—মাস্টার মশাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

—কিন্তু আমি তো এখন যেতে পারবো না—

মন্মথ বললে—মাস্টার মশাই কিন্তু তোমার জন্যে বসে আছেন, বাবাও বসে আছে, সবাই বসে আছে—

—কিন্তু কেন বসে আছেন ? আমি কী করবো সেখানে গিয়ে ? আমি না গেলে কি তোমাদের সব কাজ আটকে যাবে ? কেন বার বার আমাকে ডাকো তোমরা ? আমি কে ? আর তা ছাড়া আমার নিজের কাজ নেই ? আমার নিজের ঝঞ্ঝাট নেই ?

কথাগুলো বলে সদাব্রত নিজেই অবাক হয়ে গেল। এমন করে কড়া কথা কেন শোনালো সে ? মন্মথও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সদাব্রতদা তো এমন করে আগে কখনও কথা বলে নি !

—তা হলে আমি আসি—

মন্মথ কথাটা বলে চলেই আসছিল। সদাব্রত ডাকলে।

বললে—শোন—

তার পর মন্মথ ফিরতেই সদাব্রত বললে—জানি না তুমি কী মনে করলে! কিন্তু তুমি জানো না আমি কী অবস্থার মধ্যে রয়েছি—

মন্মথ বললে—আমি জানি—

সদাব্রত বললে—কতটুকু আর তুমি জান—কতটুকুই বা বাইরের লোকে জানে!

মন্মথ বললে—আজকাল তো সবাই জেনে গেছে—

—জেনে গেছে?

মন্মথ বললে—পেপারে তো সবই বেরোচ্ছে,—সবাই তো পড়ছে, আলোচনা করছে—

—কী আলোচনা করছে?

মন্মথ বললে—সব কথাই তারা আলোচনা করছে। বলছে, রিফিউজীরা এসে আমাদের সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছে—থিয়েটার করার নাম করে এই সব সামাজিক অন্যায় পাপ চলছে—

—বাজে কথা!

মন্মথ যেন চমকে উঠলো।

সদাব্রত বললে—আর আমাদের দোষ নেই? আমরা যারা ভদ্রলোক বলে নিজেদের পরিচয় দিই? তুমি জানো না বলেই ওদের নামে দোষ দিচ্ছ! আমার নিজেরই তো সব চেয়ে বেশি দোষ।

—তোমার?

—হ্যাঁ আমার। কালকে সবাই জানতে পারবে। সবাই তখন দেখবে, কুন্তি গুহকে কেউ আর দোষ দেবে না। আমাকেই গালাগালি দেবে। আমিই অন্যায় করেছি, মন্মথ, আমিই পাপ করেছি। কুন্তি গুহ কোনও অন্যায় করে নি। আমার দোষের জন্যে মনিলা বোসের জীবন নষ্ট হয়েছে, কুন্তি গুহর কন্‌ভিকশন্ হতে চলেছে, কুন্তি গুহর বোনের জেল হয়েছে। আমার জন্যেই এত অশান্তি হয়েছে, আমিই এর মূল—

—কিন্তু তুমি কেন দোষী হতে যাবে সদাব্রতদা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না—

সদাব্রত বললে—সব কথা এখন বুঝতে পারবে না, এখন আমি এর বেশি

বোঝাতেও পারবো না, আমি আজ কোর্ট থেকে সোজা অন্য দিকে চলে যাচ্ছিলুম, মনে হচ্ছিল আর বাড়ি ফিরবো না, হঠাৎ এই খবরের কাগজটা দেখে মনটা বদলে গেল, আবার বাড়ির দিকে চলে এলুম—

মন্মথ আস্তে আস্তে বললে—সেই জন্যেই তো মাস্টার মশাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, মাস্টার মশাই বুঝতে পেরেছেন তোমার এই-রকম হবে!

—কেন, মাস্টার মশাই কিছু শুনেছেন নাকি? আজকের কোর্টে যা-কিছু ঘটেছে সব তিনি জেনে গেছেন নাকি?

মন্মথ বললে—বাবা অফিস থেকে শুনে এসে সব বলেছেন।

—সব বলেছেন? সুন্দরিয়া বাঈ কী কী বলেছে সব বলেছেন? সুন্দরিয়া বাঈ কার নাম করেছে তাও তিনি জানেন?

মন্মথ বললে—হ্যাঁ—

সদাব্রত চীৎকার করে উঠলো—এর পরেও আমাকে ডেকে পাঠাবার মানে? আমাকে অপমান করবার জন্যে? আমাকে গালাগালি দেবার জন্যে?

মন্মথ শুধু বললে—ছিঃ সদাব্রতদা, ছিঃ—

সদাব্রত কিন্তু তবু থামলো না।

—এর পরেও কেন তিনি আমাকে ডাকলেন? আমি কি তাঁর সামনে আর জীবনে কখনও মুখ দেখাতে পারবো? আমি কি কাউকে বলতে পারবো আমি কেদারবাবুর ছাত্র? মাস্টার মশাইয়ের বড় গর্ব ছিল আমার জন্যেই, আজ আমি তাঁর গর্ব খুব ভাল করেই রেখেছি!

—এসব কথা তুমি কী বলছো আমাকে সদাব্রতদা?

সদাব্রত বলতে লাগলো—তুমি যাও মন্মথ, আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না, তুমি মাস্টার মশাইকে গিয়ে বলো যে সদাব্রত মারা গেছে—জীবনে মাস্টার মশাইকে আর সে কখনও তার মুখ দেখাবে না—আমি তাঁর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছি—

হঠাৎ বদ্যিনাথ সামনে এসে হাজির। বাড়ি থেকেই সে দাদাবাবুর গাড়ি দেখতে পেয়েছে।

—দাদাবাবু, বাবু এসে গেছেন!

সদাব্রত যেন কথাটা শুনেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মন্মথ যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে-কথাও ভুলে গেল। তাড়াতাড়ি গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে একেবারে বাড়ির সামনে গিয়ে থামলো।

১৯৬২ সালের সেই দিন। ঠিক পুজোর পরের কথা। ইণ্ডিয়া যেন চারদিকের আবহাওয়ায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। শম্ভুরা ড্রামা নিয়ে মেতে আছে, বিনয়রা স্যুট-টাই-শার্ট নিয়ে সন্তুষ্ট, মিস্টার বোসরা ডলার উপায়ের দিকে চেয়ে পারমিট পাবার নেশায় উন্মত্ত, কেদারবাবুরা মানুষের অধঃপতন দেখে শঙ্কিত, পেন্‌শন্-হোল্ডাররা নিজেদের ডিয়ারনেস অ্যালাওয়্যান্স নিয়ে ভাবছে, আর যারা ভি-আই-পি তারা মাসের পর মাস ফরেন-ডেলিগেশনে যাবার ছুতো খুঁজছে। মানুষের খাবারের দাবি নিয়ে, মানুষের ভাল করবার আশা নিয়ে তখন আর একদল লোক মিছিল করছে, মীটিং করছে, বক্তৃতা দিয়ে পার্ক-রাস্তা-খবরের কাগজ গরম করে তুলছে। ছেলেদের স্কুলে-কলেজে-পরীক্ষায় অবিচার-অনাচার-স্বৈরাচার চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নতুন দল উঠেছে। তারা হলো নিউ ক্লাস। এতদিন তাদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। এতদিন তাদের কেউ চিনতো না। এতদিন তারা মোটা কাপড় পরে মোটা চালের ভাত খেয়ে পায়ে হেঁটে দেশের কাজ করেছিল, এবার তারা গাড়ি কিনেছে, বাড়ি করেছে। এবার এয়ার-কন্‌ডিশন্ করা ঘর না হলে তারা ঘুমোতে পারে না, এবার তারা ভি-আই-পি হয়েছে। এই নিউ ক্লাসের সাহায্য না নিলে কেউ পারমিট পাবে না, এই নিউ ক্লাসের সাহায্য না পেলে কেউ চাকরি-ব্যবসা-ইণ্ডাস্ট্রি কিছুই করতে পারবে না। অথচ কোথা থেকে এদের ইন্‌কাম, কোথা থেকে এদের ঐশ্বর্য, কোথা থেকে এদের গাড়ি-বাড়ি, রেফ্রিজারেটার, রেডিওগ্রাম, তাও কেউ জানে না।

এমনি যখন অবস্থা তখন হঠাৎ একদিন সবাই খবরের কাগজ খুলে দেখলে পুব আর পশ্চিম দিক থেকে চায়নার পঞ্চাশ ডিভিশন সোলজার ইণ্ডিয়ার বর্ডার গার্ডকে আক্রমণ করেছে। ওয়ার! যুদ্ধ! লড়াই!

পণ্ডিত নেহরু লেকচার দিলেন দিল্লী থেকে—What the Chinese may have in mind is anybody's guess. We are at the cross-roads of history and are facing great historical problems on which depends our future, We have to be big in mind, big in vision, and big in determination—

সদাব্রতরও সেইদিন সেই কথাই মনে হয়েছিল—আমরা বড় ছোট হয়ে গিয়েছিলাম। ছোট ছোট জিনিস নিয়ে আমরা বড় মেতে উঠেছিলাম। অনেকদিন আগে থেকেই এ-কথা মনে হয়েছিল তার। মনে হয়েছিল শম্ভুরা বড় সামান্য জিনিস নিয়ে মেতে আছে। বিনয়রা বড় সামান্য জিনিস পেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। একদিন সদাব্রত জন্মাবার আগে ঠিক এমন করে ইণ্ডিয়ার মানুষের দিন কাটতো না। সেদিন ছিল সামনে বৃহত্তের আদর্শ। সেদিন ইণ্ডিয়ার মানুষই ইংলণ্ডে গেছে আমেরিকায় গেছে। চায়না জাপান জাভা সুমাত্রায় গেছে। সে রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামতীর্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যাওয়া। সে রাসবিহারী বোসের যাওয়া, সাভারকরের যাওয়া, মহাত্মা গান্ধীর যাওয়া, সুভাষ বোসের যাওয়া। আজকের মত স্টেট-গেস্ট হয়ে যাওয়া নয়, আজকের মত স্টেট-ডেলিগেশনে যাওয়া নয়।

এ যেন ভালোই হয়েছে।

শিবপ্রসাদ গুপ্তও তা-ই বলছিলেন। চায়নার ব্যাপার নিয়ে সমস্ত ইণ্ডিয়ার মানুষ যখন হাঁ করে পণ্ডিত নেহরুর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, তখন শিবপ্রসাদ গুপ্ত বলতেন—এ ভালোই হয়েছে—

মিস্টার বোস টেলিফোনের ওপার থেকে বললেন—কিন্তু কোর্টের প্রোসীডিংস শুনেছেন আপনি?

—না।

—সুন্দরিয়া বাঈ কী বলেছে জানেন? সুন্দরিয়া বাঈ আসলে কে? ওকে আপনি চেনেন? ডু ইউ নো হার?

শিবপ্রসাদবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কে? কার কথা বলছেন?

—সুন্দরিয়া বাঈ! আপনি চেনেন ওকে?

—সুন্দরিয়া বাঈ?

শিবপ্রসাদ গুপ্ত ভাবতে লাগলেন। যেন ভেবে ভেবে চিনতে চেষ্টা করলেন।

বললেন—না—

—তা হলে আপনার নামে কোর্টে কালকে যে সে অ্যালিগেশন এনেছে, আপনিই নাকি পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের ওনার? আপনিই নাকি মালিক?

—পদ্মরাণীর ফ্ল্যাট? তার মানে কী? সেটা আবার কী?

মিস্টার বোস বললেন—তা জানেন না? সেটা একটা ব্রথেল! সেই ব্রথেলের একটা মেয়েই তো মনিলাকে অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ছুঁড়ে মেরেছে!

—ব্রথেল? মানে বেশ্যা-বাড়ি? সে কি! আমি ব্রথেলের মালিক হতে যাবো কেন?

—ট্রু! আমিও তো তা-ই ভাবছি। হোয়াট এ সিলি থিং! আপনি কেন ব্রথেলের ওনার হতে যাবেন? দেখুন, পলিটিক্স্‌ কী ন্যাস্টি থিং!

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—কিন্তু এতে তো ভয় পেলে চলবে না মিস্টার বোস! এ রকম দুর্নাম আমাদের কপালে চিরকাল থাকবে, যতদিন আমরা সিনসিয়ার্লি দেশের কাজ করবো! দেখলেন না, কৃষ্ণ মেননকে কেমন ভাবে ক্যাবিনেট ছাড়তে হলো? তার এগেন্‌স্টে কত অ্যালিগেশন আনলে সবাই! কী করবো, আমি তো সে-জন্যে কান্ট্রির কাজ বন্ধ করতে পারি না—

তার পর একটু থেমে বললেন—মনিলা কেমন আছে?

—সেই রকমই।

—পুওর গার্ল! রিয়্যালি পুওর!

তার পর চায়নার কথা উঠলো। দেশের খুব দুর্দিন। চায়নার সঙ্গে এত ফ্রেণ্ডশিপ করা উচিত হয় নি নেহরুর। আমি তো তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম দিল্লীতে। জেনারেল চৌধুরীকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বোধ হয় তাকেই চীফ-অব-দি-আর্মি-স্টাফ করে দেওয়া হবে। সমস্ত ক্যাবিনেট নার্ভাস হয়ে গেছে। এক্‌স্টারন্যাল-অ্যাফেয়ার্স মিনিষ্ট্রি খুব ব্যস্ত। ওয়ার্ল্ডের সব পাওয়ারের কাছে চিঠি চলে গেছে। নেহরু সকলের কাছে চিঠি লিখেছে। চীনেরা লোহিত ডিভিশনে এসে ঘাঁটি বসিয়েছে। এবার বোধ হয় ওয়ালংও যাবে।

মিস্টার বোস জিজ্ঞেস করলেন—সদাব্রতর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—না—সে বাড়িতে নেই—

—তা হলে গেল কোথায়? কোর্ট থেকে আমার এখানে আসবার কথা, এখনও আসে নি—

—তা হলে বোধ হয় পি-জি-হস্‌পিট্যালে গেছে।

—না, সেখানেও যায় নি। আমি তো সেখান থেকেই আসছি!

হঠাৎ বদ্যিনাথ এসে খবর দিলে—দাদাবাবু এসেছে।

শিবপ্রসাদবাবু বললেন—এই যে, এসে গেছে সদাব্রত, আমি এখনি কথা বলছি—পরে আপনাকে টেলিফোন করবো। এখন ছেড়ে দিলুম—

সেদিনও কোর্ট বসেছে। কলকাতায় চারিদিকের মানুষ যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এতদিন। মামলা কোন্ দিকে গতি নিচ্ছিল কেউ বুঝতে পারছিল না। পাড়ায় পাড়ায় জটলা হয়। জটলা হয় শুধু এই মামলা নিয়ে নয়। ইণ্ডিয়ার মানুষ যেন হঠাৎ আবার নতুন করে জেগে উঠেছে, এতদিন ঘুমিয়ে ছিল। এতদিন জানতো না কোন্ মাটির ওপর দাঁড়িয়ে সে বেঁচে আছে, সে নিঃশ্বাস ফেলছে। কোন্ নির্ভরতা তাদের আশ্রয়। কাদের ভরসার ওপর তাদের অস্তিত্ব। এবার জেনেছে। এবার পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে এসে আর এক কলঙ্ক তাদের সমস্ত অতীত-গৌরব কলুষিত করে দিয়েছে।

সবাই চাঁদা দিচ্ছে।

শুধু চাঁদা নয়, রক্তও চাই। সোনা, টাকা, চাঁদা, জামা-কাপড়, তোমার যা-কিছু নিজের বলতে আছে সব দাও। এ সকলের বিপদ। এ শুধু কুন্তি গুহ'র একলার কলঙ্ক নয়। এ শুধু মিস্ মনিলা বোসের একলার অপঘাত নয়। এ শুধু মিস্টার বোসের একলার শোক নয়। আজ সকলের বিপদ। সকলকেই আজ কাঠগড়ার আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবে। সকলকেই জবানবন্দি দিতে হবে—আমি নিষ্পাপ। সকলকে মহাধিকরণের সামনে হাজির হয়ে বলতে হবে তারা কোনও অন্যায় করেছে কি-না। তুমি যদি পৃথিবীর কারোর ওপর অত্যাচার করে থাকো তো তাও বলো। বলো কোনও দিন স্বপ্নেও তুমি তোমার দেশের অকল্যাণ কামনা করেছ কি-না। তোমার দেশের লোক, তোমার প্রতিবেশী, তাদের তুমি অনিষ্ট-চিন্তা করেছ কি-না। নিজের স্বার্থের জন্যে কোনওদিন কারো স্বার্থে আঘাত যদি দিয়ে থাকো তো আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করবার দিন এসেছে।

পার্লামেণ্ট হাউসে রেজলিউশন্ পাস করা হলো—This House notes with deep gratitude this mighty upsurge amongst all sections of our pepole for harnessing all our resources towards the organisation of an all out effort to meet this grave national emergency. The flame of liberty and sacrifice has been

kindled, a new and a fresh dedication has taken place to the cause of Indian freedom and integrity.

ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে বিচার সম্বন্ধে কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। তুমি রাজাই হও আর প্রজাই হও ধর্মাধিকরণের দৃষ্টিতে তুমি সমান; তুমি এক। তুমি যদি পাপ করো তো তোমাকে তার শাস্তি পেতেই হবে। আইনের চোখে তুমি আসামী ছাড়া আর কিছুই নও।

তাই শিবপ্রসাদ গুপ্ত যত বড় ভি-আই-পিই হোন তাঁকেও এসে সেদিন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। বড় ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির সাক্ষী। কোনও চাপল্য, কোনও অস্থিরতা, কোনও বাচালতা নেই।

সমস্ত কোর্ট নিস্তব্ধ। কলকাতার মানুষ তাদের শ্রেষ্ঠ দেশ-সেবককে তাদের হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েছে। আজ তাঁর দেশ-সেবকের খোলস খুলে যাবে। আজ দেশের নেতার ভণ্ডামির তলায় তাঁর আসল স্বরূপটা প্রত্যক্ষ করবে সবাই।

তাই কোর্টে সেদিন কোর্টের ভেতরে অত ভিড়, অত কৌতূহল। এক-একটা প্রশ্ন করে এ্যাড্‌ভোকেট আর ধীর-স্থির গলায় জবাব দেন শিবপ্রসাদ গুপ্ত।

—পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটের মালিকানা সম্বন্ধে যে-অভিযোগ উঠেছে আপনাকে তা জানানো হলো, এবার আপনার পক্ষ থেকে কোর্ট আপনার বক্তব্য শুনতে চায়। আপনি বলুন এ সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?

শিবপ্রসাদবাবুর এক মুহূর্তও দেরি হলো না জবাব দিতে।

বললেন—আমি অপরাধী—

উপস্থিত সমস্ত শ্রোতা চমকে উঠলো। শিবপ্রসাদ গুপ্ত এ কী বলছেন!

—আপনি স্বীকার করছেন আপনি অপরাধী?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আসামী আজকে যে-অপরাধ করেছে তার দায়িত্ব আপনারই?

শিবপ্রসাদ গুপ্ত বললেন—পৃথিবীর যেখানে যত অপরাধ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তার সমস্ত দায়িত্বই আমার। ঈশ্বরকে আমরা পতিত-পাবন বলি কারণ তিনি পতিতকে উদ্ধার করেন। আমার এমন অহঙ্কার নেই যে আমি নিজেকে পতিত-পাবন বলি। কিন্তু আমি যে এতকাল ইংরেজদের জেল খেটেছি সে কি আমার নিজের উদ্ধারের জন্যে? আমি যে নিজের জীবনই উৎসর্গ করেছি যারা লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত যারা নিপীড়িত যারা পতিত তাদের জন্যে! অথচ এত করেও যদি তাদের কোনও উপকার না করতে পেরে থাকি তো সে-অপরাধও তো

আমার। তাই আমিই এই মামলার আসল অপরাধী, আপনারা কুন্তি গুহ'র বদলে আমাকেই শাস্তি দিন—

—আমি যে প্রশ্ন করছি শুধু সেই প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি পদ্মরাণীকে চেনেন ?

—চিনি।

—সুন্দরিয়া বাঈকে চেনেন ?

—চিনি।

—তাহলে এই কুন্তি গুহকেও চেনেন ?

শিবপ্রসাদ গুপ্ত বললেন—চিনি—শুধু ওদেরই চিনি না, পৃথিবীর সব পদ্মরাণী, সব সুন্দরিয়া বাঈ, সব কুন্তি গুহকেই চিনি—

—ধর্মাবতার, সাক্ষীর স্বীকারোক্তি শুনলেন, আমার মনে হয় এই সাক্ষীই এই সমস্ত অপরাধের মূলে। এই মামলার বিচারের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীর অপরাধেরও বিচার হওয়া উচিত···

কেদারবাবু সেদিন আর থাকতে পারলেন না। সোজা বাড়ি থেকে একেবারে সদাব্রতর কাছে চলে এলেন।

বললেন—শুনেছ তো সদাব্রত ?

সদাব্রতর সারা রাত ঘুম হয় নি। কাকে সে বিশ্বাস করবে ? নিজের বাড়িতেই আজ তার আশ্রয় ভেঙে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

শিবপ্রসাদবাবু ডেকেছিলেন তাকে। সামনে গিয়ে সদাব্রত চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পর ছোটবেলা থেকে যে-বাবাকে সে জেনে এসেছে, সেই শিবপ্রসাদ গুপ্তই তাকে যেন এতদিন পরে আবার নতুন করে উল্টো শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি এতদিন কলকাতায় ছিলেন না। আর তারই মধ্যে এতখানি অনিষ্ট ঘটে গেছে। তাঁর কি একটা কাজ ? সমস্ত ইণ্ডিয়ার ফ্রিডম্ এখন বিপন্ন। এই সময়ে সামান্য ছোটখাটো ঘরোয়া ঝগড়া নিয়ে মেতে আছে সবাই, এটা বড় লজ্জার কথা। নেফাতে যখন মানুষ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে তখন কার ঘরে আগুন লাগলো, কে কার পকেট কাটলো তা নিয়ে সদাব্রত কেন এত মাথা ঘামাচ্ছে! মনিলা বোসের যে-অ্যাক্সিডেণ্ট, ইণ্ডিয়ার অ্যাক্সিডেণ্টের কাছে সে যে তুচ্ছ!

সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু সুন্দরিয়া বাঈ যে-অ্যালিগেশন এনেছে তার পর আমার আর কিছু বলবার মুখ নেই যে—

শিবপ্রসাদ গুপ্ত বললেন—কিন্তু কে তোমায় মুখ খুলতে বলেছে ?

—আমি মুখ না খুললে আসামী যে খালাস পেয়ে যাবে ! কুন্তি গুহর‌ও তো শাস্তি হওয়া চাই !

শিবপ্রসাদ গুপ্ত বললেন—শাস্তি দেবার মালিক কি তুমি ?

—নিশ্চয় আমি। আমার এভিডেন্সের ওপরেই তো ওর ফাঁসি হওয়া-না-হওয়া নির্ভর করছে !

সদাব্রত জীবনে কখনও বাবার সামনে এমন জোরের সঙ্গে কথা বলে নি।

—ভুল কথা ! আজকে ইণ্ডিয়ার ওপর চায়না যে অ্যাটাক্ করেছে তার জন্যে কে দায়ী ?

সদাব্রত বললে—আমরা সবাই।

—তবে ? তবে কুন্তি গুহকে ফাঁসি দিলেই যদি সোসাইটির কল্যাণ হতো তা হলে কি আমি আপত্তি করতুম ? কুন্তি গুহকে তোমরা ফাঁসি দাও না, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। তাতেই যদি সোসাইটির মঙ্গল হয় তো হোক !

শিবপ্রসাদ গুপ্তর কথাগুলো সদাব্রত বুঝতে পারলে না।

রাত হয়ে এসেছিল তখন। কিন্তু তবু সদাব্রতর মনে হলো এর একটা নিষ্পত্তি না হলে যেন চলবে না।

শিবপ্রসাদবাবু বলতে লাগলেন—আমি দিল্লীতেই খবরটা পড়েছিলুম, আমি জানি আমার এগেনস্টে অনেক ষড়যন্ত্র চলছে। শুধু চলছে নয়, চিরকাল চলবে। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন চলবে। পলিটিক্স করতে যখন নেমেছি তখন এসব শুনে তো পেছিয়ে গেলে চলবে না।

—কিন্তু আপনার এগেনস্টে সব অ্যালিগেশন কি তা হলে মিথ্যে ?

শিবপ্রসাদবাবু হাসলেন।

বললেন—তুমি আমাকে এ-প্রশ্ন একদিন করবে তা আমি জানতুম। একটু আগে মিস্টার বোসও আমাকে এই কথাই জিজ্ঞেস করছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি—তুমি কি বিশ্বাস করেছিলে সব সত্যি ?

সদাব্রত কী বলবে বুঝতে পারলে না।

—মানুষের বিশ্বাসটাই বড় কথা ! তুমি যদি সেই বিশ্বাস হারিয়ে থাকো তো তার চেয়ে বড় ডাউনফল্ আর নেই। কালকেই তো তোমাকে কোর্টে গিয়ে এভিডেন্স দিতে হবে !

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ—

—তা হলে কোর্টে গিয়ে তুমি সেই কথাই বলো যে ওই মেয়েটাই মনিলা বোসকে খুন করেছে। ওই মেয়েটাই অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ছুঁড়েছে মনিলা বোসের দিকে—

সদাব্রত বললে—লোয়ার কোর্টে আমি সেই কথাই বলেছি—

—আর আসামী কী বলেছে ?

—আসামী বলেছে সে ইনোসেণ্ট ! কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি ঠিক ওই রকম চেহারা, ও মেয়েটাকে আমি আগে থেকেই চিনতুম। ও ক্লাবে ক্লাবে প্লে করে বেড়ায় তা-ই জানতুম। কিন্তু ও যে ও-রকম তা জানতুম না—

—তা হলে তুমি ওকে আগে থেকেই চিনতে ?

সদাব্রত বললে—হ্যাঁ—

—তা হলে তুমিও কালপ্রিট্ ! তুমি নিজে কালপ্রিট্ হয়ে আর একজন কালপ্রিটের বিরুদ্ধে এভিডেন্স দিতে যাচ্ছো ? তুমি নিজে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো তোমার কোনও দুর্বলতা নেই ? তোমার কোনও উইক্‌নেস্ নেই, তুমি নিষ্পাপ ?

সদাব্রত বাবার সামনে এ-প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেমন বিব্রত হয়ে পড়লো।

—তোমার নিজেকে দিয়ে সকলকে বিচার করে দেখো। যারা আজ ফরিয়াদী তারা কি সবাই দেবতা ? সবাই নিষ্পাপ ? যারা লাস্ট ওয়ারে নুরেমবুর্গ ট্রায়াল করেছে, যারা হিটলারের বিচার করেছে, মুসোলিনীর বিচার করেছে, গোয়েরিং গোয়েবল্‌স্-এর বিচার করেছে, তারা কি সবাই নির্দোষ ?

সদাব্রত কী বলবে কিছু বুঝতে পারলে না।

—যদি নির্দোষ হয় তা হলে কেন আজ আবার সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের হিড়িক পড়েছে ? যে-চায়না আজ ইণ্ডিয়া অ্যাটাক্ করেছে, কেন ব্রিটেন সেই চায়নাকে বোমা-বারুদ ফাইটার প্লেন বিক্রী করছে ? তার জবাব দাও তুমি ?

কী কথা বলতে গিয়ে কী কথা এসে পড়ল !

শিবপ্রসাদবাবু আবার বলতে লাগলেন—বিচার কে করবে ? কার বিচার করবে ? আজকে যা সুবিচার, কালকে তা অবিচার প্রমাণ হতে পারে। একই মানুষ একশো বছর আগে যে-বিধান দিয়েছে, একশো বছর পরে তার উল্টো বিধান দিচ্ছে। পরন্তু যা খারাপ ছিল, আজ তা ভাল বলে স্বীকার করছে। তা হলে ?

আরো অনেক কথা বলেছিলেন শিবপ্রসাদবাবু। মাথার মধ্যে সমস্ত রাত যেন কথাগুলো তোলপাড় করতে লাগলো।

—তা হলে আমি মিথ্যে কথা বলবো বলতে চান?

—কে তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে বলছে? তুমি যদি সমস্ত জিনিসটার মুখোশ খুলে দিতে চাও তা হলে যা বলা উচিত তাই-ই বলবে। তাতে মানুষের মর্যাদা বাড়বে কিনা তুমিই ভেবে দেখবে। তুমি বড় হয়েছ, তুমি নিজেও একদিন ফাদার হবে, তখন তোমার দায়িত্ব আরো বাড়বে, সুতরাং তুমি কী করবে না-করবে তুমিই ভালো জানো, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন?

হঠাৎ সদাব্রত জিজ্ঞেস করে বসলো—কিন্তু আমি? তা হলে আমি কোথায় যাবো? আসামীকে নির্দোষ বলে সাক্ষ্য দিলে আমি কোথায় থাকি?

—কেন? তুমি যেমন আছো তেমনিই থাকবে!

সদাব্রত বললে—কিন্তু তখন আর সে অধিকার কি আমার থাকবে? আমার পায়ের তলার মাটি কি তখন সরে যাবে না? আমার মাথার ওপরের ছাদ কি তখন ধসে পড়বে না?

শিবপ্রসাদবাবু ছেলের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন—বলছো কী তুমি?

—আমি কেমন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো? কেমন করে মানুষের দিকে মুখ তুলে চাইবো? পৃথিবীর মাটিতে কোন্ সাহসে ঘুরে বেড়াবো?

শিবপ্রসাদবাবু আরও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

—কেন? যেমন করে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি তেমনি করে ঘুরে বেড়াবে!

—কিন্তু নিজের কাছে আমি কী বলে জবাবদিহি করবো?

—যেমন করে সবাই নিজের কাছে জবাবদিহি করে। তুমি কি পৃথিবীতে নতুন হয়ে জন্মেছ? তোমার আগে আর কেউ জন্মায় নি? আর কেউ বেঁচে থাকে নি? আমি বেঁচে নেই? পণ্ডিত নেহরু বেঁচে নেই?

—তা হলে আপনি স্বীকার করছেন সুন্দরিয়া বাঈ যা বলেছে সব সত্যি?

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই শিবপ্রসাদবাবু রিসিভারটা তুলে নিলেন। তার পর শুরু হলো চায়না, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, ইউ-কে। শুরু হলো ডিফেন্স বণ্ড, গোল্ড-কন্ট্রোল অর্ডার। তার পর আর সদাব্রতর কথা বলবার ফুরসৎ হলো না।

মন্দা রাত্রের দিকে একবার ঘরে এসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল কেন সদাব্রত

খেলে না। তার কোন জবাবই দেয় নি সদাব্রত। সমস্ত রাত বাবার কথাগুলো মাথার মধ্যে ওলোট-পালোট করেছিল শুধু, তার পর ভোরের দিকে বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। আর তখনই এসেছিলেন কেদারবাবু।

কেদারবাবুকে দেখে সদাব্রত কী বলবে বুঝতে পারে নি। কেদারবাবুর সঙ্গে দেখা হোক এটাও যেন সে চায় নি। ঘুম ভাঙার পর এ-বাড়ি ছেড়েও চলে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কেদারবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি না-হয়ে আর উপায় ছিল না।

কেদারবাবু বললেন—শুনেছ তো সদাব্রত?

সদাব্রত প্রথমটায় বুঝতে পারে নি।

জিজ্ঞেস করলে—কী?

কেদারবাবু বললেন—চায়না আরো এগিয়ে এসেছে। একেবারে বমডিলার কাছাকাছি।

সদাব্রত কিছু উত্তর দেবার আগেই কেদারবাবু আবার বললেন—আমি তোমাকে বলেছিলুম একটা কিছু হবেই, এ-রকম চলতে পারে না—

সদাব্রত উত্তর দিলে না।

কেদারবাবু বলে যেতে লাগলেন—মানুষ এত খারাপ হলে তার একটা প্রায়শ্চিত্ত তো আছেই। কী বলো তুমি, নেই?

সদাব্রত কিছু কথা বললে না তবু।

কেদারবাবু বললেন—কী হলো তোমার? শরীর খারাপ?

সদাব্রত বললে—না মাস্টার মশাই, আজকে সকালেই আমাকে কোর্টে যেতে হবে—আমায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে—আজকে আমার শেষ দিন—

—কিন্তু সেদিন তো তুমি এলে না? তুমি শৈলকে কথা দিলে আসবে! শৈলও তোমার জন্যে বসে রইল, আমরাও বসে রইলুম অনেক রাত পর্যন্ত—

সদাব্রত হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো মাস্টার-মশাই?

—বলো না?

সদাব্রত জিজ্ঞেস করলে—যখন মানুষের বৈরাগ্য আসে, তখন কি লোকে তাকে পাগল বলে?

—কেন? ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

—বলুন না, কথাটা কদিন থেকেই ভাবছি। আর কাউকে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করতে পারছি না।

কেদারবাবুও কেমন যেন কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কেন বলো তো, তোমার বৈরাগ্য এসেছে নাকি?

সদাব্রত বললে—আমি আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না এখন মাস্টার মশাই, আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে—

—তা হলে তুমি আসছো তো কোর্টের পরে?

সদাব্রত বললে—না।

—না মানে?

—না মানে আমি আজ কোথায় থাকবো তারই কিছু ঠিক নেই। আমি যদি আপনাদের সঙ্গে আর দেখা না করতে পারি তো দয়া করে আপনি কিছু মনে করবেন না!

—তার মানে? কোথায় যাবে তুমি?

—কিছুই বলতে পারছি না।

—তা হলে মন্মথকে কী বলবো? শৈলকে কী বলবো?

—ওদের বলবেন ওদের দু'জনকেই আমি আশীর্বাদ করছি। দূর থেকেই ওদের আমি আশীর্বাদ দিলুম—

কেদারবাবু বললেন—আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না হে—তুমি বলছো কী? তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে? লোকে তো আমাকেই মাথা-খারাপ বলে—

কিন্তু সদাব্রত তখন আর সেখানে নেই। সোজা মাস্টার মশাইয়ের চোখের আড়ালে গিয়ে যেন সে বাঁচলো!

কোর্টসুদ্ধ লোক সেদিন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সদাব্রত এই সেদিন এজাহার দিয়েছিল যে সে নিজের চোখে আসামীকে অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ছুঁড়তে দেখেছিল, সে-ই আবার আজ অন্য কথা বলছে!

সদাব্রত সকালবেলাই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তার পর একবার পাঁচ মিনিটের জন্যে শুধু অফিসে গিয়েছিল। এতদিনের অফিস। মিস্টার বোস তার

হাতে ফ্যাক্টরির ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। হয়ত সে ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না তাঁর। দিনে দিনে এত বড় কারখানা গড়ে উঠেছিল মিস্টার বোসের চোখের সামনে। ফ্যাক্টরি নিয়েই তিনি মেতে ছিলেন জীবনের বেশির ভাগ সময়। ফ্যাক্টরিটা চোখের সামনে বড় হয়েছে, কিন্তু তার জন্যে তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। সংসারের দিকে ফিরে তাকাবার সময় পান নি। মনিলাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দার্জিলিং-এর বোর্ডিং-স্কুলে। সেখানে পাঠিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে ভেবেছিলেন তাঁর দায়িত্ব বুঝি সেখানেই শেষ হয়ে গেল। থাকবার মধ্যে বাড়িতে ছিল শুধু স্ত্রী। বেবি। আদরের ডাকনাম বেবি। বেবিকে তিনি দিয়েছেন অগাধ টাকা, গাড়ি, বাড়ি, আয়া আর অনন্ত অবসর। সেই অবসর বেবি কেমন করে কাটাচ্ছে তা দেখবারও অবকাশ ছিল না তাঁর। তিনি কেবল টাকা উপার্জন করছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা। কয়েক মিলিয়ান টাকা। সেই টাকা দিয়ে তিনি নিজের স্ত্রী আর মনিলার ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিলেন।

সদাব্রত চেয়ারে একবার মাত্র বসেছিল।

তার পর আর বেশিক্ষণ বসতে যেন কষ্ট হয়েছিল তার।

চাপরাসীকে একবার ডেকেছিল। কী একটা কাজের কথা বলেছিল। চাপরাসীটার আজও মনে আছে, গুপ্ত সাহেবের মুখখানা যেন আরো শুকিয়ে গিয়েছিল তখন।

চাপরাসীটা বলেছিল—তখন আমি বুঝতে পারি নি হুজুর যে সাহেব আর আপিসে আসবে না—

শুধু অফিসের চাপরাসীই বা কেন? কেউই বুঝতে পারে নি। শম্ভু প্রত্যেক দিন খবর রাখতো। বউবাজার ক্লাবের আড্ডায় প্রত্যেক দিনই প্রায় সদাব্রতর কথা উঠতো। সদাব্রতর মামলার কথা উঠতো। সদাব্রতর ভাগ্যের কথা উঠতো। শম্ভু-ও বলেছিল—আগের দিনও আমার সঙ্গে সদাব্রতর দেখা হলো মাইরি, তখনও কিছু জানতে পারি নি—

কালীপদ বললে—মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তোর বন্ধুর—নইলে কেউ অমন করে এত প্রপার্টি ছেড়ে চলে যায়?

সত্যিই তো, দু' হাজার টাকা মাইনের চাকরি তো সোজা কথা নয়!

আর শৈল?

খবরটা প্রথমে কেউ জানতো না। কেউ সন্দেহও করে নি। বেশ সুস্থ

মানুষ। থাক্-দায় গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়, তার আবার কষ্টটা কী ?

মানুষ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলেই বোধ হয় অনন্তের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে ভয় পায়। নইলে এতটুকু পার্থিব লোকসান কেন মানুষ এত বড় করে দেখে ? নইলে কিছুরই তো অভাব ছিল না তার। পৃথিবীর মানুষ যা চায় তার কি কিছু অভাব ছিল সদাব্রতর ?

মন্মথও তাই ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। সাধারণ মানুষের বুঝতে পারার কথাও নয় এটা।

শৈল কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শুধু।

তার পর নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে শৈল কোন্ দেবতাকে উদ্দেশ করে কী প্রার্থনা করেছিল তা কারো জানবার আগ্রহ হয় নি। কত মানুষের কত অসংখ্য দেনা-পাওনা হিসেব-নিকেশের কত রহস্য চিরকালের মত প্রচ্ছন্ন হয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে সে কি কেউ খবর রেখেছে ? না খবর রাখবার চেষ্টা করেছে ?

কেদারবাবু চিরকালের আশাবাদী মানুষ। চিরকাল হিস্ট্রির সঙ্গে মিলিয়ে মানুষকে যাচাই করে দেখেন। তিনিও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন শুনে। তাই নাকি ?

শেষ পর্যন্ত যেদিন আর কোথাও কোনও প্রতীক্ষা সফল হবার চিহ্নটুকুও দেখতে পেলেন না তখন শশীপদবাবুকে ডাকলেন। বললেন—তা হলে এখন কী করা যায় ?

শশীপদবাবুই বা কী বলবেন !

একটা মানুষ এ-সংসারে এসেছিল অত্যন্ত অবহেলার মধ্যে। জন্ম থেকে অবহেলা পেয়েই বড় হয়েছিল। শুধু দিনকতকের জন্যে কে একজন কোথা থেকে দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়ে হঠাৎ সচেতন করে দিলে তাকে। তার বেশি কিছু নয়। সেইটুকুতেই হৃদয়টা ভরে উঠেছিল তার। গর্বে বুকটা ফুলে-ফুলে উঠেছিল। কিন্তু তবু যাবার সময় একটা কথাও বলে গেল না। অন্ততঃ একটা বিদায়-সম্ভাষণ ! এ যেন অপমান ! এ অপমানের যেন তুলনা নেই !

অথচ কোর্টে দাঁড়িয়ে সেদিন সদাব্রত যে অমন করে অমন কথা বলবে তা কে কল্পনা করেছিল ?

—লোয়ার-কোর্টে আপনিই তো বলেছিলেন যে, আসামীর মত কাউকে আপনি দেখেছিলেন অ্যাসিড-বাল্‌ব্ ছুঁড়তে ?

—হ্যাঁ, বলেছিলুম।

—তা হলে এখন এ-কথা বলছেন কেন?

—আমি ভেবে দেখলাম আসামীর চেহারা ঠিক সে-চেহারা নয়।

—আপনি তা হলে কাকে দেখেছিলেন ঠিক মনে করতে পারছেন না?

—না।

—এখনও ভাল করে ভেবে দেখুন। আপনার সাক্ষ্যের ওপর কিন্তু আসামী কুন্তি গুহর জীবন-মরণ নির্ভর করছে। আপনিই এ-মামলার প্রধান সাক্ষী।

—আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি।

—কী ভেবে দেখেছেন?

—আমি যাকে অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ছুঁড়তে দেখেছিলুম, সে সম্পূর্ণ অন্য চেহারা! এ অন্য মহিলা!

—আপনি কি ঠিক বলছেন?

—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ঠিক।

সমস্ত মানুষের ভিড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জন-শব্দ উঠলো—যারা এতদিন ধরে এ-মামলার প্রতিটি পদে রোমাঞ্চ খুঁজে এসেছে। আজকের রোমাঞ্চ তাদের কাছে যেন আরো তীব্র বলে মনে হলো। সমস্ত আকাশ যেন দুলে উঠলো। সমস্ত ধরিত্রী যেন টলতে লাগলো।

হাইকোর্টের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল যেন একথা শোনবার জন্যে তৈরী ছিল না। প্রসিকিউশন উইটনেস আজ তাদেরও যেন বিপদে ফেললে বিনা নোটিসে।

নিজের কাজটা ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে চলে যাচ্ছিল সদাব্রত। কিন্তু না, যেন আরো কিছু শোনবার আরো কিছু বলবার প্রতীক্ষায় তার অন্তর হাহাকার করে উঠছে।

তুমি একবার বলো যে আমাকে তুমি ক্ষমা করেছ। শুধু আমাকে নয়, আমি শম্ভু, বিনয়, কালীপদ, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, মিস্টার বোস, মনিলা বোস, যারা যত অত্যাচার করেছি তোমার ওপর, তুমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করেছ!

যাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলা সে তখন পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বোধ হয় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। প্রতিদিন পুলিসের হাতকড়া লাগিয়ে এখানে তাকে এনে হাজির করা হয়েছে, আর প্রতিদিন সে পাথরের চোখ দিয়ে সব-কিছু দেখেছে, পাথরের কান দিয়ে সব কিছু শুনেছে। ফাঁসীর আসামীর এ ছাড়া বুঝি আর কিছু করবারও নেই। অক্‌ল্যাণ্ড-প্রেসের সেই বিভূতিবাবু থেকে শুরু করে পদ্মরাণীর

ফ্ল্যাটের সবাই যেন একসঙ্গে তার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হেসে উঠলো। কেমন হয়েছে? কেমন হয়েছে এবার? এত অহংকার তোমার ভাল নয়। তোমার সব অহংকারের মাশুল এবার আমরা আদায় করে তবে ছাড়বো। একদিন তুমিই না সমস্ত কলকাতাকে কিনতে চেয়েছিলে তোমার চব্বিশ বছরের যৌবন দিয়ে? তুমিই না শেঠ ঠগনলালের পঁচিশ হাজার টাকা অপমান করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে মাটির ওপর? তুমিই না নিজের বোনকে পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে আনতে রাজী হও নি? তুমিই না শিবপ্রসাদ গুপ্তর মেডেল নিতে আপত্তি করেছিলে নির্লজ্জ ভাষায়? এবার তোমাকে কে বাঁচাবে? এবার তুমি কার ওপর প্রতিশোধ নেবে, ভাবো!

হঠাৎ সকলে দেখলে চোখের পাতা দুটো একটু নড়ে উঠলো। মাথাটা যেন একটু দুললো। কপালের ভাঁজে ভাঁজে দু-একটা যেন ঘামের বিন্দু দেখা দিল। তা হলে পাথরেরও প্রাণ আছে নাকি?

কলকাতার সে-সব দিনের কথা অনেকেরই মনে নেই।

রেডিওর সামনে মানুষের ভিড়। এর পর আর কতদূর এগোল চাইনিজ আর্মি! তেজপুর পৌঁছতে আর কত দেরি! কোথায় ওয়ালং, কোথায় বমডিলা, কোথায় তেজপুর! কিন্তু সারা ইণ্ডিয়ার যেন টনক নড়ে গেছে। আমরা এতদিন যা-কিছু অন্যায় করেছি সকলের সব অন্যায়ের যেন প্রতিকারের দিন এসেছে আজ।

শশীপদবাবু অফিস থেকে আসেন আর কেদারবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকেন খবর শোনবার জন্যে। সকালবেলার খবরের কাগজটা পড়েও যেন পেট ভরে না। ছাত্র পড়াতে পড়াতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যান।

বলেন—এবার ঠিক হয়েছে, এবার বেশ হয়েছে—

সেদিন সদাব্রতর সঙ্গে দেখা করে এসেই ডাকলেন—শৈল—

শৈলর কোনও উত্তর পেলেন না।

ঘরের ভেতরে গেলেন। দেখলেন—শৈল চুপ করে বসে আছে।

—কী রে, সাড়া দিচ্ছিস না যে?

তবু উত্তর দিলে না শৈল।

কেদারবাবু বললেন—আমি সদাব্রতর বাড়িতে গিয়েছিলুম, জানিস, সেখান থেকেই আসছি এখন—

তবু কোনও উত্তর দিলে না শৈল।

—কী হলো তোর ?

কাছে গিয়ে শৈলর গায়ে হাত দিতেই হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেছে। খানিকটা তন্দ্রার মত এসেছিল। তন্দ্রার মধ্যেই যেন শৈলর ঘরে গিয়েছিলেন, শৈলর গায়ে হাত দিয়েছিলেন। এবার মনে পড়লো। শৈল আর মন্মথ গেছে বাড়ি খুঁজতে। সত্যিই তো, আর কতদিন এখানে থাকা যায়। তিনি না হয় সারাদিন বাইরে বাইরে ঘোরেন। কিন্তু শৈল ? শৈলরও তো একটা নিজের সুখ-সুবিধে বলে জিনিস আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার তিনি চেয়ারে হেলান দিলেন।

রাস্তায় তখন মন্মথ আর পারছে না।

বললে—কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে ?

শৈল সেদিনকার মত আর একলা বেরোয় নি। সঙ্গে মন্মথ আছে। বার-বার রাস্তা ভুল হবার কথা নয়। একবার এ-বাসে উঠে ওখানে গিয়ে নেমেছে, আর একবার সেখান থেকে বাসে উঠে অন্য এক জায়গায় গিয়ে নেমেছে। অথচ কোনও কিছু বলবার অধিকারও নেই মন্মথর।

—কিন্তু এভাবে কতক্ষণ ঘুরবে রাস্তায় ?

শৈল বললে—আমি যেখানে যেতে বলবো সেখানেই তোমাকে যেতে হবে—

মন্মথ বললে—তাই-ই তো যাচ্ছি—

—তা হলে আর কথা বলো না। আমি যেখানে যেতে বলবো সেখানেই চলো—

মন্মথর মনে হচ্ছিল শৈলর এ-পাগলামির যেন আর শেষ হবে না আজ।

কলকাতার রাস্তায় দুপুর-রোদ। এতদিন কলকাতার বন্ধ-ঘরের মধ্যে বছরের পর বছর আটকে থাকার সমস্ত প্রতিশোধ যেন মন্মথর ওপর দিয়ে তুলে নিচ্ছে শৈল। বহুদিন থেকেই মন্মথ মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে আসা-যাওয়া করে আসছে। চিরকালই হুকুম তামিল করে এসেছে তার। কতদিন সংসারের কত টুকিটাকি কিনে দিয়ে উপকার করেছে। প্রতিবাদও করে নি, প্রতিদানও চায় নি কখনও। আজ এখন এতদিন পরে প্রতিবাদ করলে আর কে-ই বা শুনবে!

মন্মথ জিজ্ঞেস করলে—মাস্টার মশাই যদি বাড়িতে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, তখন কী বলবে ?

—সে তোমায় ভাবতে হবে না।

—কিন্তু কোথায় যাবে তা বলবে তো ?

শৈল বললে—যেখানে সদাব্রতদার মামলা হচ্ছে সেই জায়গায় নিয়ে চলো আমাকে—

—সে তো হাইকোর্ট !

—তা হোক, সেখানেই আমাকে নিয়ে চলো—

—কিন্তু সদাব্রতদার কী এখন কথা বলবার সময় হবে ?

—কে কথা বলতে চায় তার সঙ্গে ? আমি শুধু সেখানে যাবো একবার।

বাস আসতেই তাতে উঠে পড়লো দু'জনে।

শুধু একটা কথা বলে আসবে সদাব্রতকে। আর কিছু নয়। মানুষের জীবনে বিপর্যয় তো আছেই। বিপদ বিপর্যয়ই তো জীবন। তার সঙ্গে দু'দণ্ড শান্তি যদি কেউ পায় তো সেই মানুষই তো ভাগ্যবান! তা হলে কেন সংসারে মিষ্টি কথার এত দাম ? হাসিমুখের এত কদর ? একটুখানি শান্তির জন্যে কেন মানুষ সমস্ত জীবনটা বাজি রাখতে তৈরী হয় ! শৈল শুধু সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করে আসবে। উত্তর যদি সদাব্রত দেয় তো ভাল, না দিলেও করবার কিছু নেই তার।

হাইকোর্ট তখন গমগম করছে।

বাদী বিবাদী সব পক্ষেরই হিয়ারিং হয়ে গেছে। এবার উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। আমরা সবাই-ই অপেক্ষা করে আছি। বহু যুগ ধরে আমরা কেবল আমাদের আমিত্বটুকু নিয়ে ছিলাম। আমাদের চোখের আড়ালে আর একটা জগতের কথা এবার শুনবো। সে-জগৎ এই কলকাতা শহরের মধ্যেই। আমরা যে কত ছোট, আমরা যে কত নীচ, নগণ্য, তুচ্ছ তা জানা হয়ে গেছে। আমাদের নীচতার জন্যেই আজ আমাদের ঘরে আগুন জ্বলছে। এবার দেখবো আমরা শান্তি পাই কি-না। এবার দেখবো আমাদের মুক্তি হয় কি-না।

সদাব্রতও একপাশে বসে ছিল।

সদাব্রতর সাক্ষ্যের ওপরই সব নির্ভর করছিল। এবার সে নাকচ করেছে নিজের জবানবন্দিকে। এবার সে বলেছে কুন্তি গুহ নির্দোষ। কুন্তি গুহকে সে অপরাধ করতে দেখে নি। এবার তাকে মুক্তি দাও। এবার তাকে মুক্তি দিয়ে আমাকেও অব্যাহতি দাও—

এবার প্রশ্ন হলো আসামীর ওপর।

হাইকোর্টের ধর্মাধিকরণ প্রশ্ন করলেন—কুন্তি গুহ, তোমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ সব তুমি শুনলে, এ-সম্বন্ধে তোমার আর কিছু বলবার আছে ?

১৯৬২ সাল নিস্তব্ধ।

—বলো তোমার কিছু বলবার আছে ?

—আমি দোষী !

—তুমি দোষী ? তুমি দোষ স্বীকার করছো ? আগে তুমি তো নিজেকে নির্দোষ বলেই জবানবন্দি দিয়েছিলে ?

১৯৬২ আবার কথা কয়ে উঠলো।

—না হুজুর। এখন আমি দোষ স্বীকার করছি। আমিই মনিলা বোসের গায়ে অ্যাসিড্-বাল্ব্ ছুঁড়ে মেরেছি। আমিই অপরাধী। ধর্মাবতার, আমাকে আপনি যা কিছু শাস্তি দেবেন আমি সমস্ত মাথা পেতে নেবো। আমাকে আপনি চরম শাস্তি দিন !

বমডিলার পতন হলো। ইণ্ডিয়ার আর্মি পাহাড় পর্বত পেরিয়ে ঢালু পথে পালাতে পালাতে নেমে এলো তেজপুরে। তেজপুর তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ওদিকে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ব্রেজিল, বলিভিয়া, কানাডা, চিলি, ডেনমার্ক, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান, জর্ডন, ইউ-এ-আর, নরওয়ে, সুইডেন, গ্রীস, ইউ-কে, ইউ-এস-এ, উগাণ্ডা, ওয়েস্ট-জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, মেক্সিকো, মরোক্কো পৃথিবীর যাটটা কাণ্ট্রি সবাই ইণ্ডিয়ার পক্ষে রায় দিয়েছে। সবাই বলেছে অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে। দোষীর সাজা হওয়া চাই !

কলকাতার রাত ক্রমে আরো গভীর হলো। রাস্তার ট্রাফিক ক্রমে আরো কমে এলো। আরো অন্ধকার। আরো ভয়। শিবপ্রসাদ গুপ্ত ঘুমিয়ে পড়লেন হিন্দুস্থান পার্কে। এলগিন রোডে মিস্টার বোসের চোখেও স্লীপিং-পিল কাজ করতে শুরু করলো। পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটেও আস্তে আস্তে ঘুম নেমে এলো। সন্ধ্যে থেকেই শুরু হয়েছিল—'চাঁদ বলে ও চকোরী বাঁকা চোখে চেয়ো না', তাও থেমে গেল এক সময়।

মন্দাকিনী ঘড়ির দিকে চাইলে। বঙ্কিনাথের নাক ডাকছে। লেকের দিক থেকে একটা রাত-জাগা পাখী কঁক্-কঁক্ করে পুব-দিকের আকাশে

মিলিয়ে গেল। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর মোড়ে একটা ভিখিরির মেয়ে পাশ ফিরে শুলো। রোঁদের পুলিসটার হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেছে। সেও বসে পড়লো পানের দোকানের বেঞ্চিটার ওপর। ঘেয়ো কুকুরটা মুখ তুলে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে একবার ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে আবার মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো।

তার পর একরাশ অন্ধকার। একঝাঁক ভয়। খাবারের এঁটো শালপাতার ঠোঙাটা হাওয়ায় উড়তে উড়তে নর্দমায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো। আর সব চুপ। সবাই চুপ করো এবার। এবার পৃথিবীও পাশ ফিরে শোবে। ইণ্ডিয়ারও নাক ডাকতে শুরু করবে।

সদাব্রত আর বাড়ি ফিরলো না।

পরিসমাপ্তি

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রাজা রোহিত তখনও চলেছেন, তখনও তাঁর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। এগিয়ে চলাই তো জীবন, এগিয়ে চলাই তো যৌবন। তখন সেই মুহূর্তে যে-প্রাণশক্তি লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি তরঙ্গ-বিক্ষোভ হয়ে এই ধরিত্রীকে অশ্রান্ত আঘাত করছে, রাজা রোহিতের কাছে সে সব-কিছুই যেন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল মান-সম্মান-অর্থ-যশ-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির নেশা। তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল রাজ্যলিপ্সা। তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল ভয়-ভাবনার বন্ধন। যে এ পারে সে রাজা রোহিতের মত এমনি করেই পারে। এমনি করেই ভয়-ভাবনার-আশা-কামনার বন্ধন অতিক্রম করে দিনের-পর-দিন রাতের-পর-রাত জীবন পরিক্রমা করতে পারে।

কবে বুঝি কুন্তি গুহ বলে একটা অখ্যাত-অবজ্ঞাত মেয়ে এই উপন্যাসের অযোগ্য নায়িকা হিসেবে জন্ম নিয়েছিল বাংলা দেশের কোন্ এক অখ্যাত-অবজ্ঞাত পল্লীর এক প্রান্তে। কবে কলকাতায় এসে সে কয়েকটা সংসারে বিপর্যয় বাধিয়ে তুলেছিল, কলকাতার নাগরিক জীবনকে কয়েক মাসের জন্যে বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিল নিজের কলঙ্কের পসরার পাবলিসিটি করে, তার পরেও অনেক দিন কেটে গেছে।

কিন্তু এত ঘটনার ঘন-ঘটার মধ্যে কে সে-কথা মনে রেখেছিল? যে-রোমাঞ্চ প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের জীবনে অপরিহার্য, সেই রোমাঞ্চের তৃষ্ণায় কুন্তি গুহর কলঙ্কও একদিন ম্লান হয়ে এল। অন্য আরো হাজার রোমাঞ্চের চাপে কুন্তি গুহর নামটাও একদিন চাপা পড়ে গেল কলকাতা শহরের মানুষের কাছে।

তখন নতুন করে আবার আর একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পর থেকে এগোতে এগোতে আমরাও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা যুদ্ধ দেখেছি, মন্বন্তর দেখেছি, পার্টিশান দেখেছি, রেফিউজী দেখেছি। আমাদের বাঙালীদের মত এমন করে সারা ইণ্ডিয়ার কেউই এত সব

দেখে নি। মানুষ মরে না বলেই আমরা মরি নি। নইলে কবেই আমরা মারা যেতাম। ১৯৬১ সালের মধ্যেই হঠাৎ আমরা পোর্টুগীজদের হারিয়ে গোয়া নিয়ে নিয়েছি। আর টাটকা টাটকা ইলেক্শন। আমরা দলে দলে গিয়ে ভোট দিয়েছি পোলিং বুথে।

শিবপ্রসাদ গুপ্তও খুব খেটেছিলেন তখন।

তিনি ভোটের মীটিং-এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন—ইণ্ডিয়ার মানুষ খেতে পরতে পায় না, এর চেয়ে মর্মান্তিক সত্য আর নেই। কিন্তু গোয়ার যুদ্ধের পর কংগ্রেস প্রমাণ করেছে যে ইণ্ডিয়া ভৌগোলিক অর্থে এখন স্বাধীন। এই ইলেক্শনের মধ্যে দিয়ে সেই কংগ্রেসকেই পাঁচ বছরের মধ্যে আবার প্রমাণ করতে হবে যে ইণ্ডিয়ার মানুষকেও তারা স্বাধীন করেছে। খাওয়া-পরার স্বাধীনতা, বেঁচে থাকার স্বাধীনতা, যত কিছু স্বাধীনতার জন্যে আমরা লড়াই করেছি এতদিন তা তারা দিতে পেরেছে—

সেদিন পার্কে-পার্কে শিবপ্রসাদ গুপ্তর বক্তৃতায় মানুষ নিজেদের সঠিক পরিচয় দেখতে পেয়েছিল। সবাই বলেছিল শিবপ্রসাদবাবু ঠিক কথা বলেছেন—শিবপ্রসাদ গুপ্ত লোকটি খাঁটি।

পাড়ার পেন্‌সন্‌-হোল্ডার অবিনাশবাবু বঙ্কুবাবু সবাই মীটিং থেকে ফিরে এসে আলোচনা করেছেন।

বলেছেন—কাউকে ভয় করবার লোক নন শিবপ্রসাদবাবু, নেহরুর মুখের সামনেই কী-রকম সত্যি কথা স্পষ্ট করে বললেন, দেখলেন তো মশাই—

তার পর যুদ্ধ। এ তোমার আমার, ইণ্ডিয়ার কোটি কোটি মানুষের যুদ্ধ। এ-যুদ্ধতেও শিবপ্রসাদবাবু অনেক টাকা তুলে দিলেন ডিফেন্স ফাণ্ডে। যেন তখন প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছিল কে কত চাঁদা তুলতে পারে। তোমার যা আছে সব কিছু দাও। সোনা দাও। সোনা না থাকে তো সোনার গয়না যদি কিছু থাকে তাই-ই দাও। ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সবাই লেগে গেল চাঁদা তুলতে। চাঁদার লিস্ট্ বেরোয় খবরের কাগজের পাতায়। পণ্ডিত নেহরু কত টাকা তুলেছেন, পদ্মজা নাইডু কত টাকা তুলেছেন, অতুল্য ঘোষ কত টাকা তুলেছেন, তার হিসেব বেরোয় প্রতিদিন।

সেই হিসেবের তালিকায় একদিন সবাই দেখলে সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস চাঁদা দিয়েছে এক লক্ষ টাকা।

দেশের জন্যে যেন সবাই-ই উঠে পড়ে লেগেছে।

এবার শত্রুরাও আবার উঠে পড়ে লেগেছে। যুদ্ধের জন্যে ডিফেন্স ফাণ্ডের চাঁদার নাম করে তাদের 'মরা মাটি' নাটক সত্যিই একদিন স্টেজে নামলো।

কিন্তু কুন্তি গুহ হিরোইন সাজলে যেমন হতো ঠিক তেমনটি হলো না।

কালীপদ বললে—কুন্তি গুহ হলে দেখতিস্ আমি আজকে বোর্ড ফাটিয়ে ছেড়ে দিতুম—

আর কুন্তি গুহ! আজকে কুন্তি গুহর খবরটাই যেন পুরোনো হয়ে গেছে। বাসি হয়ে গেছে। চীনেরা যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে সব জোলো করে দিয়েছে। নইলে কোর্টে মামলা হতে হতে কখন যে কুন্তি ছাড়া পেয়ে গেল তা যেন কেউ মনে করতেও পারে না এখন। লোকে বলে—বেনিফিট্ অব ডাউট—

সন্দেহের চোরাগলির ফাঁক দিয়ে কুন্তি ছাড়া পেয়ে গেল কোন্ ফাঁকিতে, তা যেন অনেক ভেবে ভেবে মনে করতে হয় আজ।

আসলে কিন্তু কুন্তি গুহ ছাড়া পেতে চায় নি। মুখ উঁচু করেই বলেছিল—আমি দোষী, আমাকেই ধর্মাবতার শাস্তি দিন—

গভর্মেণ্টের দেওয়া উকিল। বড় বুদ্ধিমান ভদ্রলোক। বুঝতে পেরেছিলেন কোথায় যেন প্রধান সাক্ষী সদাব্রত গুপ্তর সঙ্গে আসামীর একটা গোপন সম্পর্ক উহ্য রয়েছে, যা মামলার নথি-পত্রে কোথাও লেখা নেই, কোনও রেকর্ডও নেই কোথাও, থাকবেও না। তিনিই কুন্তি গুহকে পাগল বলে দরখাস্ত করে দিলেন এজলাসে।

কেউ কখনও নিজের ইচ্ছেয় ফাঁসির দড়ি গলায় তুলে নেয়? এমন বেকুব কেউ আছে দুনিয়ায় এক পাগল ছাড়া? যে লোক লোয়ার কোর্ট থেকে নিজেকে বরাবর নির্দোষ বলে জবানবন্দি দিয়ে এসেছে, সে হঠাৎ হাইকোর্টে এসে নিজেকে দোষী বলে স্বীকারোক্তি দিলে কেন? নিশ্চয় কোথাও গোলমাল আছে।

ভদ্রলোক সদাব্রত গুপ্তকে জেরা করেছিলেন।

বলেছিলেন—আপনি হঠাৎ আপনার মত বদলালেন কেন?

সদাব্রত বলেছিল—হঠাৎ নয়, আমি অনেক ভেবেই উত্তর দিয়েছি—

—আপনার পারিবারিক কলঙ্ক এড়াবার জন্যে?

—না, তাও না।

—তা হলে সত্যিই আপনি কুন্তি গুহকে অ্যাসিড্-বাল্‌ব্ ছুঁড়তে দেখেন নি?

এই একই প্রসঙ্গের উত্তর যে কতবার কতভাবে তাকে কত লোককে দিতে হয়েছে তার যেন হিসেব নেই।

সাধারণ মানুষ আমরা যারা আইনের কিছুই জানি না, তারা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কুন্তি গুহর ছাড়া পাওয়ার খবর পেয়ে। তার পর কখন কুন্তি গুহ কোন্ খবরের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল তা আর জানতে পারি নি। জানতে চেষ্টাও করি নি।

কিন্তু কিছুদিন পরেই যুদ্ধের আবহাওয়া যেন আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। শেয়ালদা স্টেশন থেকে গভীর রাত্রে ট্রেনগুলো ছাড়তো। মিলিটারি ট্রেন। কেউ জানতে পারতো না কোথায় যাবে সে ট্রেন। আর ছাড়তো প্লেন। ব্যারাকপুরের এয়ারপোর্ট থেকে ছাড়তো মিলিটারি প্লেন।

এ-ট্রেনগুলো সাধারণতঃ কোথাও থামে না। যেখানে ইঞ্জিন জল নেবে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়। মিনিট কুড়ি কিংবা মিনিট পঁচিশ। তার পর আবার হুইস্‌ল্ বাজে, আবার চাকা ঘোরে, আবার শেকলে-শেকলে টান পড়ে। যে-মানুষগুলো এই ট্রেনে যাচ্ছে তারা ফিরবে কি-না তাও কেউ জোর গলায় বলতে পারে না। তাই দূরের পাহাড়টাকে ঘিরে কয়েক জোড়া চোখ ট্রেনের বাইরে উধাও হয়ে হারিয়ে যেতে চায়। কখনও বা তারা মনে মনে ফাঁকা মাঠে গিয়ে খেলা করে বেড়ায়, আবার কখনও অন্ধকার রাত্রে যখন ইঞ্জিনটা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মুখ দিয়ে গল্‌গল্ করে ধোঁয়া ছাড়ে, তখন কান পেতে চুপ করে সেই শব্দটা শোনে।

নেফা এখানে নয়। দিনের পর দিন চলেছে তারা। ট্রেনটা ছেড়েছে শেয়ালদা স্টেশন থেকে। কিন্তু কবে সেখানে পৌঁছোবে তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না কেউ। পৌঁছোবে একদিন নিশ্চয়ই। আর যদি না-ই পৌঁছোয় তাতেই বা কার কিসের ক্ষতি? কে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছে? দেশের মানুষকে রক্ষে করবে তারা? দেশের মাটি থেকে তাড়িয়ে দেবে চীনেদের?

এ সব কথা কিন্তু কেউ এরা ভাবে নি। যারা এই গাড়িতে চলেছে তারা একদিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সোজা নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। নাম লিখিয়েছিল ব্ল্যাঙ্ক্-ফর্মে। নিজের নিজের কোয়ালিফিকেশনের কথা লিখতে হয়েছিল। নিজের নিজের বাবার নামও লিখতে হয়েছিল।

সবই তাড়াহুড়োর ব্যাপার। চীনেরা নেফার কামেঙ্-এর ভেতর দিয়ে

অনেকদূর এগিয়ে বমডিলায় এসে পড়েছে। আর একদিন বাদেই তেজপুরে এসে পৌঁছোবে। তার পর আসামের শিলং গৌহাটি। আর তার পর কলকাতা।

—কী নাম আপনার?

—কল্যাণী হাজরা।

—বাবার নাম?

—জগৎহরি হাজরা।

—কী কাজ করেছেন আগে?

—নার্সের ডিপ্লোমা আছে—

—আপনার নাম?

—কুন্তি গুহ।

—বাবার নাম?

—মনোমোহন গুহ—মারা গেছেন।

—কোথায় কাজ করেছেন আগে?

—নার্সিং-এর কাজ করেছি—নার্সিং-হোমে—

—ডিপ্লোমা আছে?

—না।

মন্মথ হঠাৎ বললে—ওই যে সদাব্রতদা বসে আছে—ডাকবো? যাবে ওর কাছে?

শৈল বললে—না থাক—

কোর্ট ভাঙতেই সবাই চলে যেতে শুরু করেছিল। সদাব্রতও বোধ হয় হারিয়ে যেত। আজকেই শেষ জেরা। রায় বেরোবে পরে। সলিসিটরের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তাড়াহুড়ো। গণ্ডগোল। পুলিস-পাহারা যথারীতি বন্দুক-বেয়নেট্ নিয়ে কুন্তি গুহকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

—সদাব্রতদা, এই যে আমরা এখানে!

সদাব্রত পেছন ফিরলো। এত ঝঞ্ঝাট। শুধু ঝঞ্ঝাট নয়, সদাব্রতর সারা জীবনের উপলব্ধির সঙ্গে আজ সংগ্রাম বেধেছে। এতদিনের অস্তিত্বের সঙ্গে আজকে তার বিরোধ বেধেছে। আজ যদি আসামীর শাস্তি হয়ে যায় তা হলে

তার সমস্ত অতীতটা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে। আর যদি কুন্তি গুহ মুক্তিও পায়, অব্যাহতিও পায়, তা হলেও সদাব্রতর দায়িত্ব যেন শেষ হবে না। পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারিতের কাছে গিয়ে তাকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইতে হবে।

যে যেখানে মানুষের কাছে অপমান লাঞ্ছনা সয়ে অপমৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুহূর্ত গুনছে তাদের সকলের কাছে গিয়ে বলতে হবে—আমাকে ক্ষমা করো। শুধু আমাকে নয়, আমার এই দেশ, এই মানুষ, এই সমাজ, এই সকলকে ক্ষমা না-করলে আমার মুক্তি নেই। ক্ষমা না করলে আমি অশুচি হয়ে থাকবো, আমার মুক্তি না হলে যে আমার জাতিরও অব্যাহতি নেই।

—সদাব্রতদা ?

সদাব্রত কাছে এলো।

মন্মথ বললে—ওই শৈল এসেছে—

—শৈল ? কিন্তু ওকে কেন এখানে নিয়ে এলে ? এটা কি কথা বলবার জায়গা ?

মন্মথ বললে—আমি শৈলকে নিয়ে আসি নি, শৈলই আমাকে নিয়ে এলো এখানে—

সদাব্রত বললে—কিন্তু আমি যে এখন খুব ব্যস্ত মন্মথ—

—তা জানি সদাব্রতদা, তোমার যে কী অবস্থা তা আমি বুঝতে পারছি।

সদাব্রত বাধা দিয়ে উঠলো। বললে—ভুল মন্মথ, এক আমি ছাড়া আর কেউ তা বুঝবে না—

—শুনলাম রাত্রেও তুমি বাড়ি যাও নি ! তুমি নাকি কোথাও চলে যাবে ঠিক করেছ ?

সদাব্রত বললে—আমার সম্বন্ধে সবাই তাই বলে বেড়াচ্ছে শুনছি। সবাই বলছে আমি নাকি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছি বাড়িতে—

—তুমি নাকি চাকরিও ছেড়ে দিয়েছ ?

—সারা কলকাতার লোক তো তাই-ই বলছে শুনছি !

—কিন্তু তুমি নিজে কী বলছো ?

—আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না মন্মথ। আমি সলিসিটরের কাছে যাচ্ছি এখন, তার পর যতদিন না কেসের জাজ্‌মেণ্ট বেরোচ্ছে ততদিন কিছুই বলতে পারছি না—

—তা হলে সলিসিটরের সঙ্গে দেখা করার পর শৈলর সঙ্গে একবারটির জন্যে একটু কথা বলে যেও, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—

সদাব্রত তবু দ্বিধা করতে লাগলো।

বললে—কিন্তু কী বলবো আমি তাকে? আর আমাকেই বা সে কী বলবে?

—সে তুমি জানো আর সে জানে।

—কিন্তু শৈল কি নিজে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে?

মন্মথ বললে—না, সে-কথা আমাকে বলে নি সে, কিন্তু সেদিন তুমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার পর থেকে কেমন যেন বড় অন্যমনস্ক হয়ে আছে সারাক্ষণ। আমার ইচ্ছে তোমাদের দু'জনের একবার দেখা হোক।

—কিন্তু তাতে কার কী লাভ হবে?

মন্মথ বললে—তা জানি না, তবে আমার ইচ্ছে—

—তা হলে তুমি দাঁড়াও একটু, আমি সলিসিটরের কাছ থেকে একটু ঘুরে আসি—

—বেশি দেরি করো না যেন। শৈল একলা ওখানে রয়েছে, আমি ওর কাছেই যাচ্ছি—

তার পর কী কথা যেন বলতে ভুলে গিয়েছে, এমনি ভাবে আবার সামনে এগিয়ে এলো মন্মথ।

বললে—একটা কথা, তুমি যেন ওকে বলো না যে আমিই তোমাকে ওর সঙ্গে জোর করে দেখা করিয়ে দিচ্ছি—

সদাব্রত বুঝতে পারলে না।

বললে—তার মানে?

মন্মথ বললে—তুমি নিজের থেকেই শৈলর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ এইটে জানলে ও আরো খুশী হবে—

—আচ্ছা তাই হবে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি—

বলে সদাব্রত চলে গেল।

মন্মথ আবার এসে দাঁড়াল শৈলর কাছে।

শৈল জিজ্ঞেস করলে—এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলে? আমি ভাবছি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

—সদাব্রতদা ডেকেছিল আমাকে।

—কেন ?

মন্মথ শৈলর মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে দেখলে। মুখ চোখ কান নাক সব যেন হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো তার।

—কেন ? তোমাকে ডেকেছিল কী করতে ?

মন্মথ বললে—তোমার সঙ্গে সদাব্রতদা একবার দেখা করতে চায়, দেখা করবে তুমি ?

—কেন ? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন ?

মন্মথ বললে—তা জানি না, কিন্তু সদাব্রতদা বিশেষ করে আমাকে অনুরোধ করলে যেন আমি তোমাকে রাজী করাই।

—কিন্তু কী কথা বলবে আমাকে ?

মন্মথ বললে—তা জানি না। তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলিতে দেখা করতে চায়।

—নিরিবিলিতে! কেন ?

—বোধ হয় তেমোর সঙ্গে এমন কিছু কথা বলবে যা আমার শোনা উচিত নয়—। সদাব্রতদা সলিসিটরের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, এখুনি আসছে, তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে—
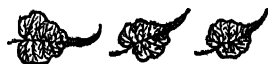
মিলিটারি ট্রেন জল নিয়ে কয়লা নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে আবার চলতে শুরু করলো। বাংলাদেশের নরম মাটি ছাড়িয়ে আরো কঠিন-কর্কশ যাত্রা। যেখানে নদী পার হতে হয় সেখানে ট্রেন থেকে নেমে সবাই আবার আকাশ-গাছ-মাটি-পাথর-ঘাস সব কিছুর সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নিয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। হয়ত এমন করে আর এই প্রকৃতিকে দেখতে পাবে না তারা। হয়ত আকাশ থেকে বোমা পড়বে, সামনের পাহাড়ের চুড়ো থেকে কামানের গোলা এসে হাসপাতালের মাথায় আঘাত করবে। তাই চোখ ভরে সবাই দেখে নেয় সব কিছু।

আবার এক সময় গার্ডের বাঁশি বেজে ওঠে। সবুজ ফ্ল্যাগ ওড়ে। আর বিকট হুইসলের শব্দ করে ট্রেনটা আবার চলতে আরম্ভ করে। এক-একটা প্ল্যাটফরমে যদি ট্রেনটা কখনও থামে তো প্ল্যাটফরমের উল্টো দিকে স্টেশন-

মাস্টারের কোয়ার্টারের দিকে চাইলে দেখা যায় দু-একটা মুখ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা দৌড়ে দৌড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে হাঁ করে চেয়ে দেখে—

বলে—ওই ছাখ, ওরা যুদ্ধে যাচ্ছে—

কেমন যেন হতাশা-মেশানো দৃষ্টি। এরা যেন বিচিত্র জীব। এরা যেন আর ফিরবে না। ছেলে-মেয়ে বউরা শেষবারের মত এদের দেখে নিচ্ছে যেন।

—গাড়ির গায়ে ক্রস আঁকা আছে কেন বল দিকিনি?

—ডাক্তারদের গাড়ি কিনা, তাই জন্যে। ওর ভেতরে ওষুধ-নার্স-ডাক্তার আছে, তাই রেড-ক্রস আঁকা রয়েছে। দূর থেকে ওই চিহ্ন দেখলে এ-গাড়ির ওপর কেউ বোমা ফেলবে না।—

আবার যখন রাত হয় তখন অন্য রকম চেহারা। কয়েকটা ঘুমন্ত লোক হঠাৎ জেগে উঠে অবাক হয়ে মুখগুলোর দিকে চেয়ে দেখে। কেউ এখানে কিছু কিনবে না। চা-বিড়ি-সিগারেট কারো দরকার নেই এদের। এদের সব সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে মিলিটারি থেকে।

কল্যাণী হাজরা হঠাৎ বললে—আপনার ডিপ্লোমা নেই, তবু নিলে?

কুন্তি গুহ বললে—হ্যাঁ—

—আপনার জানা-শোনা বুঝি কেউ ছিল?

কুন্তি বললে—না—

অনেকগুলো কথা জিজ্ঞেস করলে তবে একটার উত্তর দেয় মেয়েটা। এক গাড়িতে পাশাপাশি সেই শেয়ালদা থেকে আসছে, তবু যেন মেয়েটা এখনও ঘরোয়া হয়ে উঠলো না। কতবার উঠতে-বসতে নানা প্রসঙ্গ উঠেছে। যুদ্ধে যেতে ভয় করছে কি-না। বাড়িতে কে-কে আছে। কেন যুদ্ধে নাম লেখালো!

সব কথাতেই মেয়েটা গম্ভীর হয়ে থাকে।

—আপনার বুঝি খুব ভয় পাচ্ছে?

কুন্তি গুহ বললে—না।

—কারোর জন্যে মন-কেমন করছে?

—না।

—বাড়িতে আপনার কে-কে আছে?

—কেউ না।

—তা হলে আপনি এত গম্ভীর-গম্ভীর কেন ?

উত্তরে শুধু একবার ক্ষীণ একটু হেসেছিল কুন্তি গুহ। তাকে ঠিক হাসি বলা যায় না। আবার কান্নাও বলা যায় না। কল্যাণী হাজরা যত দেখেছে মেয়েটাকে, ততই অবাক হয়ে গেছে।

রাত তখন বেশ ঘন হয়ে এসেছে। হঠাৎ একটা স্টেশনে এসে গাড়ি থামতেই কল্যাণী হাজরা চীৎকার করে উঠেছে—ওই দেখুন ভাই, সেই ভদ্র-লোকটা—

কুন্তি গুহ শুয়ে ছিল। তেমনি শুয়েই রইল।

কল্যাণী হাজরা বললে—আচ্ছা, ও ভদ্রলোক কে বলুন তো ? কলকাতাতেও দেখেছি আপনার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল—

কলকাতায় রিক্রুটিং অফিসের সামনে যেদিন কল্যাণীরা নাম লেখাতে গিয়েছিল, সেদিনও লোকটা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। তখন যেন চেহারা অনেক ভালো ছিল। তার পর যত দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হয়ে যাচ্ছে চেহারাটা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে মুখে। কোট-প্যাণ্ট ময়লা চিল-চিল করছে।

—আপনি চেনেন নাকি ও ভদ্রলোককে ?

কুন্তি গুহ শুয়ে ছিল। সেই ভাবে শুয়ে শুয়েই বললে—না—

ট্রেনটা আবার ছেড়ে দিলে। আবার মিলিটারি স্পেশাল বন-জঙ্গল-নদী পেরিয়ে চলতে লাগলো সামনের দিকে।

তখন টেম্পল চেম্বার্স বন্ধ হয়ে আসবার সময় হয়ে এসেছে। মন্মথ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। সদাব্রত আর শৈল ঘরের ভেতর ঢুকেছে।

কোরিডোর দিয়ে বাইরের লোক সবাই নিচের দিকে নামছে। এখন ছুটি। হাইকোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে, আর কারো কোনও বিশেষ কাজ নেই। যারা কাজ-পাগলা মানুষ, যাদের বাড়িতে বউ নেই, তারাই রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত এখানে ফাইল ঘাঁটে।

কিন্তু সদাব্রতর সলিসিটর্স ফার্ম বড় বেশি রকমের কাজের লোক। তারা অনেক মক্কেল নিয়ে কারবার করে। এই মিস্টার বোসের কেস নিয়ে বহুদিন

ধরে তাদের আহার-নিদ্রা নেই। আজ হিয়ারিং শেষ হয়ে গেল। এবার জাজমেণ্ট বেরোবে।

মিস্টার গাঙ্গুলী ফাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

সদাব্রত বললে—আপনার ওই ও-পাশের পার্টিশানটা একটু খালি আছে মিস্টার গাঙ্গুলী ?

আজ এই যেদিন উপন্যাস শেষ করছি, এখন থেকে সে প্রায় এক বছর আগের কথা। তখনও এইরকম নভেম্বর মাস। বিকেলবেলাই সন্ধ্যে নেমে আসে। সারা কলকাতায় আতঙ্ক। তখন যে-কোনও দিন তেজপুরের মাথার ওপর বোমা পড়তে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লোকরা লক্ষ-লক্ষ টাকা ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে—পাছে চীনেদের হাতে পড়ে। কমিশনার সাহেব রাত্রিবেলাই জীপগাড়ি নিয়ে কোথায় পালিয়েছে তার ঠিকানা নেই। ইণ্ডিয়ান আর্মি নিজেদের পাহাড়ী-ঘাঁটি ছেড়ে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে। শহরে একটা হোটেল নেই, একটা আলো নেই, একটা মানুষ নেই। যারা আছে তারা বেপরোয়া। তাদের হাতে তেজপুরের ভার ছেড়ে দিয়ে নগরপালেরা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে-আতঙ্ক শুধু কলকাতা নয়, সমস্ত ইণ্ডিয়াতেও ছড়িয়ে গেছে। এমন করে দায়িত্বহীন নগরপালের হাতে মানুষের ভার ছেড়ে দিয়ে কেমন করে নিশ্চিন্ত ছিলাম আমরা এতদিন! এতদিন যে আমাদের কেউ আক্রমণ করে নি কেন এইটেই একটা আশ্চর্য ঘটনা।

মানুষের ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে যে মনের মধ্যেও একটা প্রাণ আছে। মন চলছে, মন বাড়ছে, মন ভাঙছে, মন গড়ছে। এই মন নিজের বাঁধা-সীমার মধ্যে থাকতে চায় না। চায় না বলেই মন নিয়ে এত টানাটানি। মন দেওয়া-নেওয়া নিয়ে এত কাব্য-গল্প-উপন্যাসের সৃষ্টি। এই মনের মধ্যে দিয়েই মানুষ মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মানুষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কও পাতায়। আমার মধ্যে বিশ্বমন আছে বলেই পৃথিবীর সকলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। আর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই আমার মন ভেঙে পড়ে। হাজার হাজার বছর আগে এই মনকে আকর্ষণ করবার জন্যেই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ এক ধর্মের বাঁধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে। শেষকালে ধর্মে-ধর্মে লড়াই শুরু হয়ে গেল। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে পৌত্তলিকদের, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের, বৌদ্ধদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মানুসারীদের। আজ ধর্ম নেই। ধর্মের বাঁধনটাকে আজ আর কেউ বড় বাঁধন বলে মানেই না। তার বদলে আজ

এসেছে রাজনীতি। সেকালের ধর্ম আজ আর এক নতুন মুখোশ পরে হাজির হয়েছে এই বিংশ-শতাব্দীর পৃথিবীতে। এই রাজনীতি বিশ্ব-রাজনীতি। বিশ্বের মানুষের মনকে আকর্ষণ করবার জন্যে এ অনেক ফন্দী-ফিকির আবিষ্কার করেছে। এ আবিষ্কার করেছে ইউ-এন-ও, এ আবিষ্কার করেছে মার্শাল-প্ল্যান, এ আবিষ্কার করেছে মিউচুয়্যাল-এড্। এ আবিষ্কার করেছে সেণ্টো, নাটো, সিয়াটো। কত রকম সব অদ্ভুত প্যাক্ট! অত করেও তবু মানুষের শান্তি নেই, মানুষের মনের ভেতর সর্বদাই ভয়। ভয়, এই বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলাম! এই বুঝি নিঃস্ব হয়ে গেলাম!

শৈল যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তার মুখখানা দেখে মন্মথ অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, সদাব্রতদার সঙ্গে কথা হলো?

শৈল বললে—চলো আর দেরি নয়, অনেক দূর যেতে হবে, একটা ট্যাক্সি ডাকো—

হঠাৎ ট্যাক্সি ডাকার কথা কেন মনে হলো শৈলর কে জানে!

মন্মথ জিজ্ঞেস করলে—সদাব্রতদা কোথায় গেল?

—আর আসবে না।

—আসবে না মানে?

শৈল আর কিছু প্রকাশ করে বললে না।

মন্মথ আবার জিজ্ঞেস করলে—সদাব্রতদার সঙ্গে কী কথা হলো তোমার? কী জন্যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল?

শৈল বললে—তা জানি না—

—তা জানো না তো এতক্ষণ কী করলে তোমরা?

শৈল রাগ করে উঠলো। বললে—তাও জানি না—

মন্মথ এর পরে অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল।

ট্যাক্সিতে উঠেও শৈল যেন নিজের মধ্যেই মশগুল হয়ে রইল। আজ যেন এতদিন পরে নিজের মধ্যেই নিজেকে পেয়ে আত্মহারা হয়ে গেছে সে। অনেক দুঃখের দিন কেটেছে তার কাকার বাড়িতে। বাগমারীতে একবার আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিল সে। কিন্তু আজ যেন সদাব্রত তাকে সঞ্জীবনীমন্ত্র দিয়ে পুনর্জীবন দিয়ে গেল। শৈলর জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কোন্ দিকে যাবে সে!

মন্মথও শৈলর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবে এখন ?

শৈল নিজের মনেই উত্তর দিলে—সদাব্রতদের বাড়িতে, হিন্দুস্থান পার্কে···

আশ্চর্য, হিন্দুস্থান পার্কের নাম শুনে মন্মথ প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল। এখন এই অবস্থায় সদাব্রতদের বাড়িতে কেন যাবে সে ? সেখানে কে আছে ?

ট্যাক্সিটা হিন্দুস্থান পার্কে শিবপ্রসাদ গুপ্তর বাড়ির সামনে পৌঁছতেই শৈল দরজা খুলে নেমে পড়লো।

দরজার সামনে কড়া নাড়তে লাগলো—

—মাসীমা, মাসীমা—

মন্মথ জিজ্ঞেস করলে—ট্যাক্সিটা রেখে দেবো, না ছেড়ে দেবো ?

—ছেড়ে দাও।

কল্যাণী হাজরা আবার দেখতে পেয়েছে। হাসপাতালের সঙ্গেই লাগোয়া নার্সদের কোয়ার্টার। কোথা থেকে সব রোগীরা আসে। দিন রাত ডিউটি করতে হয়।

সেদিনও কল্যাণী চীৎকার করে উঠেছে আবার—ওই যে ভাই, ওই যে সেই লোকটা—

চেহারাটা আরো খারাপ হয়ে গেছে। দাড়ি বেরিয়ে গেছে সারা মুখময়। মাথার চুলগুলো আর আঁচড়ায় না। কোথায় থাকে, কোথায় খায়, কোথায় ঘুমোয়, বোঝা যায় না।

ডিউটি সেরে কোয়ার্টারে যাবার পথে হঠাৎ এক-একদিন সামনে এসে দাঁড়ায় সে।

ডাকে—কুন্তি—

কুন্তি গুহ মুখটা ফিরিয়ে মাথা নিচু করে রাস্তা দিয়ে নিজের আস্তানার দিকে হনহন করে চলে যায়।

তার পর যখন আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়, রাতে ঠাণ্ডা পড়ে, হু-হু করে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বয়, তখন জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় অন্ধকারে ভূতের মত মানুষটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঝাপসা কালো মূর্তিটা। ঝাপসা কালো পাহাড় চারদিকে। তার পর যখন আরো অন্ধকার বাড়ে, যখন রাত আরো

গভীর হয়, তখন লোকটা বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ওঠে। একটা গাছে হেলান দেয়। তার পর মিলিটারি পুলিস দেখতে পেলে তাকে হটিয়ে দেয়, সরিয়ে দেয়। বলে—ভাগো—ভাগো হিয়াঁসে—

এক-একদিন আরো সাহস বেড়ে যায় লোকটার।

পেছন থেকে ডাকে—কুন্তি, আমাকে ক্ষমা করো—

প্রেতের মত ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর। কেউ বুঝতে পারে, কেউ বা বুঝতে পারে না। কিন্তু কেউ বুঝুক আর না-বুঝুক আমার ক্ষমা চাওয়া কাজ, আমি ক্ষমা চেয়ে যাবো। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। শুধু আমাকে নয়, আমার মাকে, আমার বাবাকে, আমার আত্মীয়-অনাত্মীয় যে-কেউ আছে সকলকে। আমার কলকাতাকে, আমার বাংলা দেশকে, আমার ইণ্ডিয়াকে। আমরা সবাই অপরাধ করেছি। মানুষকে আমরা মানুষের অধিকার দিই নি। মানুষকে নিয়ে আমরা ব্যবসা করেছি, স্লেভ-ট্রেড করেছি। স্বাধীনতার নাম করে আমরা মানুষকে দিয়ে পশুত্বের বেসাতি করিয়েছি। আমি জানতুম না তাই তোমাকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছি, তোমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি। তোমাকে অপরাধী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছি। কিন্তু আসলে আমরাই আসামী। আমরা আসামী, অথচ আমরাই ফরিয়াদী সেজে মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছি! তুমি আমাদের শাস্তি দাও। যা শাস্তি তুমি দেবে সব আমি মাথা পেতে নেবো—। আর যদি শাস্তি না দিতে পারো তো অন্তত ক্ষমা করো আমাদের—

সেদিন হঠাৎ কুন্তি গুহ স্টাফ-নার্সকে কম্প্লেন্ করলে। কে একজন লোক দিনের পর দিন আমার পেছন-পেছন ঘোরে—

স্টাফ-নার্স যথারীতি মিলিটারি কর্তাদের খবরটা দিলে।

—কী নাম তার? হু ইজ হি? হোয়াট ইজ হি?

—আমার স্টাফ সে-সব জানে না।

—অল্‌রাইট্! আমরা দেখছি—

কেউ বুঝলো না কোথায় হারিয়ে গেল সেই বিংশ শতাব্দীর মানুষের বিবেকটা। আত্মোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে-বিবেক যেন কলকাতা থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে।

কলকাতার মানুষ যখন মানুষের শবের ওপর বসে মৃত্যুর সাধনা করতে ব্যস্ত, পাপের পসরা নিয়ে নির্লজ্জ বেসাতি করতে উদ্‌গ্রীব, তখন সেই বিবেকটার কথা আর কারো মনে রইল না।

শুধু মনে রইল একজনের। সে শৈল।

তখনও তার মনে পড়তো সদাব্রতর সেদিনের শেষ কথাগুলো।

অ্যাটর্নী অফিসের নির্জন নিরিবিলি নিষ্প্রাণ ঘরটার মধ্যে হঠাৎ যেন সেই একবারই বিবেকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সদাব্রত বলেছিল—বিয়ে যদি কখনও করি তো তোমাকেই করবো শৈল, কিন্তু বিবেককে আমি কী বলে বোঝাবো—?

শৈল মাথা নিচু করে সেদিন কেঁদেছিল শুধু।

সদাব্রত আবার বলেছিল—আমি যদি তোমাদের মত সংসারের ছোট-ছোট আরাম নিয়ে মেতে থাকতে পারতুম তো আমি বেঁচে যেতুম শৈল। কিন্তু সে যে আমাকে সংসারে থাকতে দিচ্ছে না—

শৈল জিজ্ঞেস করেছিল—কে?

—আবার কে? আমার বিবেক!

তারপর একটু থেমে বলেছিল—তোমাদের কারো বিবেক নেই, তোমরা বেঁচে গেছ। তোমরা আরামের মধ্যে সুখ পাও, ছোটর মধ্যে স্বস্তি পাও। দরকার হলে তাস খেলে সিনেমা দেখে গান শুনে তোমরা শান্তি পাও। কিন্তু আমি কী করি বলো তো? আমার যে কালাশৌচ চলেছে—

শৈল হঠাৎ মাথা তুললো—কালাশৌচ? তার মানে?

সদাব্রত বললে—চারদিকের এই পাপ, চারদিকের এই অনাচার, চারদিকের এই ব্যভিচার, এই-ই তো জাতির মৃত্যু। একটা জাত যখন মরে তখন এইগুলোই তো তার লক্ষণ! এসব তো মৃত্যুরই পূর্বাভাস!

—কিন্তু তার জন্যে কি তুমি দায়ী?

—নিশ্চয়ই! এ যদি আমার দায় না হয় তো এর দায়িত্ব কে নেবে? ইণ্ডিয়ার প্রাইম-মিনিস্টারের ঘাড়ে এর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমরা চুপ করে বসে থাকবো?

—কিন্তু তুমি ছাড়া এ-দায়িত্ব নেবার কি আর কেউ নেই? সব দোষ তোমার?

সদব্রত বলেছিল—দোষ শুধু আমার একলার নয় শৈল, সকলেরই দোষ

তা জানি। কিন্তু পুণ্যের ভাগ নেবার অনেক ভাগীদার, পাপের ভাগ যে কেউ নিতে চায় না!

—তা হলে আমি কী করবো? আমিও তোমার সঙ্গে যাই—

সদাব্রত বললে—সকলের হয়ে আমাকেই কালাশৌচ পালন করতে দাও শৈল, যখন এ কাটবে তখন আমি আবার আসবো, ততদিন তুমি অপেক্ষা করতে পারবে না?

—কোথায় অপেক্ষা করবো?

—কেন, আমার মার কাছে, আমাদের বাড়িতে!

—কতদিন অপেক্ষা করবো?

—তা কি বলতে পারি! কালাশৌচ না কাটলে তো আমার বিবেক আমাকে মুক্তি দেবে না। আর তুমিই কি সেই মানুষটাকে নিয়ে খুশী হতে পারবে?

—কোথায় যাবে তুমি?

—সে-কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেস কোর না। আমি নিজেও জানি না আমি কোথায় থাকবো, কী করবো। আমি শুধু এইটুকু জানি যে আমার বিবেক ফিরে না এলে আমিও ফিরবো না।

—তুমি না ফিরলে আমি কী করবো?

—তুমি শুধু প্রার্থনা করবে যাতে আমি পরিত্রাণ পাই!

তারপর একটু থেমে সদাব্রত আবার বললে—নিজের জীবনে আমি শান্তি পেলাম না ঠিকই, কিন্তু সকলের শান্তি না হলে আমার শান্তি হবে না এও ঠিক। আমি সেই শান্তির জন্যেই যাচ্ছি শৈল, আমাকে তুমি বাধা দিও না, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, আমায় তুমি ক্ষমা করো—আমি চলি—আমি আসি—

বলে সদাব্রত আর দাঁড়ায় নি। সেই অবস্থাতে সেখান থেকেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। তারপর সেখান থেকেই শৈল সোজা চলে এসেছিল সদাব্রতদের বাড়িতে।

মন্দাকিনী সেদিন প্রথমে শৈলকে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

—আমাকে চিনতে পারছেন না মাসীমা, আমি শৈল!

মন্দাকিনী এতক্ষণে যেন চিনতে পারলে।

বললে—ও, তোমার কাকা তো এই সেদিন এসেছিলেন তোমার বিয়ের কথা বলতে—

শৈল বললে—আমি সেই জন্যেই তো আপনার কাছে এলুম মাসীমা, আমাকে সদাব্রতদা যে পাঠিয়ে দিলেন—

—কে? আমার খোকা?

—হ্যাঁ, তাঁর কাছ থেকেই তো আমি সোজা আসছি আপনার এখানে।

—কিন্তু খোকা? খোকা এলো না? সে কোথায়?

—তিনি আর আসবেন না মাসীমা।

—সে কি? তুমি বলছো কী মা?

মন্দাকিনী যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

শৈল বললে–হ্যাঁ মাসীমা, তিনি আর আসবেন না বলেই তো আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর বদলে আমি এলুম—আমিই আপনার কাছে থাকবো মাসীমা—

মন্দা যেন কিছুই বুঝতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—তুমি এসেছ বেশ করেছ মা, কিন্তু খোকা? খোকা কেন আসবে না?

শৈল বললে—তিনি বললেন তাঁর কালাশৌচ চলছে, যেদিন অশৌচ কাটবে, সেই দিন বাড়ি ফিরে আসবেন আবার—

—কালাশৌচ?

— হ্যাঁ মাসীমা, কালাশৌচ!

—কালাশৌচ! কালাশৌচ মানে কী মা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

তা শৈলই কি অত কথা বুঝিয়ে বলতে পারে? শৈলই কি সদাব্রতর সমস্ত ব্যথার মস্ত বেদনা সমস্ত মুখের ভাষার রূপ দিতে পারে? এও তো এক রকমের কালাশৌচ। এই হত্যা। এই অত্যাচার। আমরা জাতির পিতাকে হত্যা করি নি? ইণ্ডিয়ার কি পিতৃ-বিয়োগ হয় নি? কুন্তি গুহ তো সামান্য একজন প্রাণী নয়! আমাদের জাতি আজ পর্যন্ত যত অপরাধ করেছে, যত পাপ করেছে সব কিছু পাপের সব কিছু অপরাধের যে সে প্রতীক। সে যতক্ষণ ক্ষমা না করছে ততক্ষণ যে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে না। ততক্ষণ যে কারো মুক্তি নেই, কারো অব্যাহতি নেই—

শৈল হঠাৎ বললে—আমি কিন্তু এখানে থাকতে এসেছি মাসীমা—

—ওমা, নিশ্চয় থাকবে—তুমি কার সঙ্গে এলে?

—মন্মথ পৌঁছিয়ে দিয়েছে—সে আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে গেছে—

মন্দাকিনী বললে—কিন্তু খোকা? সত্যিই খোকা আসবে না?

শৈল বললে—তাঁর বদলে তো আমি এসেছি মাসীমা, আমিই আপনার খোকার অভাব পূরণ করবো—

মন্দাকিনীর যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। স্বামী থেকেও ছিলেন না কোনও দিন, কিন্তু যে এতদিন ছিল, সেও চলে গেল। কিন্তু কেন গেল? কার দোষে?

সেদিন মিলিটারি পুলিসরা ধরে ফেলেছে লোকটাকে। তখন অন্ধকার। ক'দিন থেকেই তারা ধরবার চেষ্টায় ছিল।

নার্সেস কোয়ার্টারের ভেতর যেন প্রতিধ্বনি আসতে লাগলো। চাবুকের আঘাতের প্রতিধ্বনি। পুলিস লোকটাকে ধরে চাবুক মেরেছে। তবু লোকটা পালায় না। চাবুকের তলায় মাথা পেতে দেয়। তোমরা আমাকে মারো। আমাকে নিঃশেষ করে দাও। কিংবা আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে ক্ষমা করো, আমার মাকে ক্ষমা করো, আমার বাবাকে ক্ষমা করো। আমার দেশ, আমার ইণ্ডিয়া, আমার পৃথিবীকে ক্ষমা করো। তুমিই আজ ফরিয়াদী আর আমিই আজ আসামী। তোমার ক্ষমা দিয়ে তুমি আমাকে পুনর্জীবন দাও। আমাকে আবার বলিষ্ঠ করে তোলো, আমাকে উন্নীত করো। আমি মাথা তুলে দাঁড়াব, আমি মহীয়ান হবো, আমি স্বাধীন হবো।

দিনের পর দিন রাতের পর রাত এই একটি প্রার্থনা ইণ্ডিয়ার আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। যে পরিচ্ছেদ একদিন শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে—এতদিনে তার পরিসমাপ্তি ঘটলো ১৯৬২তে। মৃত্যু দিয়ে নয়, অত্যাচার দিয়ে নয়, ক্ষমা দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, প্রেম দিয়ে আবার নতুন করে আমরা মহাজীবন আরম্ভ করবো।

আর ওদিকে রাজা রোহিত তখনও চলেছেন। তখনও তাঁর ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। তখনও বলে চলেছেন—আমাকে তুমি ক্ষমা করো কুন্তি, আমার বাবাকে ক্ষমা করো, আমার মাকে ক্ষমা করো, আমার দেশকে ক্ষমা করো, আমার

শুয়াকে ক্ষমা করো, আমার পৃথিবীকে ক্ষমা করো। সবাই বাইরের বিচরণকে সংকুচিত করে নিজের মধ্যে নিজেকে রুদ্ধ করে রেখেছে। সকলের অপমৃত্যু শুরু হয়েছে, এর থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দাও, এর থেকে তুমি আমাদের রক্ষে করো, এর থেকে তুমি আমাদের পরিত্রাণ করো।

যে-লোক চলতে চলতে শ্রান্ত তার মৃত্যু অনিবার্য। শ্রেষ্ঠ মানুষও যদি মানুষের মধ্যে বসে থাকে তবে তারও শ্রী বিনষ্ট হয়, যে এগিয়ে চলে ইন্দ্র তার বন্ধু, বরুণ তার সহায়। যে চলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ হয়ে ওঠে, তার আত্মা বিকশিত হয়ে ওঠে, তার হীনতা দীনতা দুর্বলতা খসে খসে পড়ে। যে বসে থাকে, তার ভাগ্যও বসে থাকে। যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্য সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে। শুয়ে থাকাই কলি, জেগে ওঠাই দ্বাপর, উঠে দাঁড়ানোই ত্রেতা, চলাই সত্যযুগ। সুতরাং এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো রাজা রোহিত, চরৈবেতি—চরৈবেতি—

চলতে চলতে রাজা রোহিত আরও এগিয়ে চললেন। মিশরের নীলনদ পেরিয়ে বাকু। বাকু পেরিয়ে কাশ্যপ সাগর। কাশ্যপ সাগর পেরিয়ে কৃষ্ণসাগর। কৃষ্ণসাগর পেরিয়ে যখন নীলনদ অতিক্রম করছেন চারিদিক থেকে তখন সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলো—থামো রাজা রোহিত, থামো—থামো—

কিন্তু কে কার কথা শোনে তখন! রাজা রোহিত তখনও বলে চলেছেন—আমাকে তুমি ক্ষমা করো কুন্তি, আমার বাবাকে ক্ষমা করো, আমার দেশকে ক্ষমা করো, আমার ইণ্ডিয়াকে ক্ষমা করো, আমার পৃথিবীকে ক্ষমা করো—

তখনও কলকাতা শহরের হিন্দুস্থান পার্কে পেন্‌সন্‌-হোল্ডারদের সামনে শিবপ্রসাদ গুপ্ত দেশসেবার গল্প করে যান। তখনও তাঁর ল্যাণ্ড্‌-ডেভেলপ্‌মেণ্ট্‌ কর্পোরেশন অফিসের বড়বাবু হিমাংশুবাবু আইনের প্যাঁচে জমির দর ওঠা-নামা নিয়ে স্পেকুলেশন্‌ করেন। তখনও সোনাগাছির পদ্মরাণীর ফ্ল্যাটে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বেলফুলের মালা ফিরি করতে আসে ফুলওয়ালা, পাঁঠার ঘুগ্‌নির প্লেট্‌ নিয়ে ঘরে ঘরে সাপ্লাই দিয়ে বেড়ায় সুফল। তখনও সন্ধ্যে হলেই উঠ্‌তি ছোকরারা এসে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢোকে, আর খিল্‌-দেওয়া দরজার ভেতরে হারমোনিয়াম-তবলা-ঘুঙুরের সঙ্গে গান শুরু হয়ে যায়—'চাঁদ বলে ও চকোরী

বাঁকা চোখে চেয়ো না।' ওদিকে 'সুভেনির ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্'-ফ্যাক্টরিতে তখনও ফরেন-পার্টস্-এর পারমিট্-এর জন্যে দিল্লীর সঙ্গে ট্রাঙ্ককল্-এ কথা চালাচালি হয়। মিস্টার বোস টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বলেন—হ্যাল্লো। তখনও মিসেস বোস বাথ্-টাবের ভেতরে শুয়ে হট্-ওয়াটার ছেড়ে দিয়ে মন দিয়ে টার্ফ-ক্লাবের হ্যাণ্ডিক্যাপ্ বই পড়ে। তখনও পি-জি-হস্‌পিট্যালের কেবিনের ভেতরে মনিলা বোসের গলা ফুটো করে রবারের টিউব্ ঢুকিয়ে তাকে গ্লুকোজ্ খাওয়ানো হয়। তখনও বন্দনা দাস, শ্যামলী চক্রবর্তীর দল মধু গুপ্ত লেনের ক্লাবে 'মরা মাটি'র রিহার্সাল দেয়। শম্ভু কালীপদর দল আবার আগেকার মত অফিস থেকে এসেই ক্লাবে ঢোকে। তখনও বিনয় ইন্‌স্টলমেণ্টে সুট তৈরি করায় অর্ডার দিয়ে আর বাসের ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে শরীরটা গরম করে নেয়। তখনও কেদারবাবু মানুষ তৈরির স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি বাড়ি ছাত্র পড়িয়ে বেড়ান। তখনও মন্মথ আর শৈল সদাব্রতর কালাশৌচের কাল উত্তীর্ণ হবার প্রতীক্ষায় দিন গোনে। সব ঠিক তেমনি করেই চলে, যেমন চলছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ঠিক তেমনি করেই পোস্টার-হোর্ডিং টাঙানো থাকে, যেমন থাকতো। বড় বড় অক্ষরে প্রাইম্-মিনিস্টারের বাস্ট-ছবির নিচে লেখা থাকে—জওয়ানদের জন্যে রক্ত দাও, অর্থ দাও, স্বর্ণ দাও—

কিন্তু নেফার দেবতা ইতিহাসের দেবতার মতই বড় নির্মম বড় নিষ্ঠুর—

রাজা রোহিত তাই তখনও চলেছেন। তখনও বলে চলেছেন—আমাকে তুমি ক্ষমা করো কুন্তি, আমার বাবাকে ক্ষমা করো, আমার মাকে ক্ষমা করো আমার দেশকে ক্ষমা করো, আমার ইণ্ডিয়াকে ক্ষমা করো, আমার পৃথিবীকে ক্ষমা করো—নিজের কৃত্রিম আচারের, নিজের কাল্পনিক বিশ্বাসের, নিজের অন্ধ সংস্কারের তমিস্র-আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন রেখো না—উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে আমাদের জাগ্রত করো। আমাদের পুনর্জীবন দাও !!!

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

স্টার থিয়েটারে 'একক-দশক-শতক' অভিনয় শুরু হবার পরই এই নাটক নিয়ে সারা ভারতবর্ষব্যাপী এক তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের পর আর কোনও নাটককে এত সরকারী বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করতে হয়নি। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙলা দেশের রাজ্য-বিধান সভাতেও এর আলোচনা তুমুল তর্ক-বিতর্কের ঝড় তোলে। এই সূত্রে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা থেকে আংশিকভাবে কিছু কিছু সংবাদ এখানে সংগৃহীত হলো।

যুগান্তর : ২৩. ৩. ৬৫

শিল্প ও সাহিত্যের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ হইতেছে বলিয়া আজ ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যরা অভিযোগ করিয়াছিলেন এবং তাহা লইয়া সভায় কিছুক্ষণ উত্তপ্ত বাদানুবাদও হইয়াছিল। সরকাব পক্ষ ঐ অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াছেন।

ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার অভিযোগ করেন, সরকারী হস্তক্ষেপে কলিকাতার নাট্যগৃহে অভিনীত একটি নাটকের একটি দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটানো হইয়াছে।

শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের কথায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নাকি ঐ পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ দৃঢ়তার সঙ্গে ঐ অভিযোগকে অস্বীকার করেন। তিনি ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়া বলেন, ঐ অভিনয়ের একটি দৃশ্যে একজন চোরাবাজারী, মুনাফাখোর, ভ্রষ্টাচারী, সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিকে খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি, গান্ধী-টুপি পরাইয়া দেখানো হইত, আর ঐ দৃশ্যে মহাত্মা গান্ধীর একটি ছবিও রাখা হইত। শ্রী ঘোষ বলেন, খদ্দরের পোশাক ও গান্ধী-টুপি আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতীক। আর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সকলের শ্রদ্ধাভাজন। একজন সমাজ-বিরোধী লোকের কলঙ্কিত দৃশ্যে খদ্দরের পোশাক ও গান্ধীজীর ছবি যুক্ত করা জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিমাত্রেরই আপত্তিকর মনে হইবে। অধিকন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে খদ্দরের পোশাক ও গান্ধী-টুপি পরিতেন তাহাও

তিনি সদস্যদের মনে রাখিতে বলেন। সেইজন্য ঐ দৃশ্যটি সম্পর্কে থিয়েটারের মালিকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছিল মাত্র বলিয়া তিনি জানান।

আনন্দবাজার : ২৬. ৩. ৬৫

.. শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ কলকাতার একটি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত একটা নাটকে হস্তক্ষেপ করেছেন। এই অভিযোগ নিয়েই সভাকক্ষে বেশ কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা চলে। তিনি বলেন, নাটকে একটা চোরাকারবারী খদ্দরের জামা ও 'গান্ধী টুপি' ব্যবহার করায় শ্রী ঘোষ অসন্তুষ্ট হন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে রঙ্গমঞ্চের মালিককে ডেকে চরিত্রটার পরিবর্তন করার নির্দেশ দেন এবং ভয় দেখান।

শিল্পমন্ত্রী শ্রী ঘোষ তাঁর উত্তরে বলেন, ভয় দেখানো হয়নি, অনুরোধ করা হয়েছিল।

এই সময় ফরোয়ার্ড ব্লকের বেঞ্চ থেকে শ্রীকমল গুহ, সুনীল দাসগুপ্ত, অপূর্ব মজুমদার একসঙ্গে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, সরকারের তরফ থেকে সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে।

শ্রী ঘোষ বলেন, নাটকে খদ্দর ও গান্ধী টুপি পরা লোকটার পেছনে গান্ধীজীর ছবি টাঙ্গানো ছিল। এতে দেশের নেতাদেরও সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হৈ-চৈ। স্পীকার বার বার হাতুড়ি পিটে গোলমাল থামাবার চেষ্টা করেন।

পরে শ্রীকমল গুহ (ফঃ বঃ) বলেন, ঐ নাটকে যুগের ও সমাজের ছবিই তুলে ধরা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর ছবি পানের দোকান থেকে চোরাকারবারীর ঘরেও টাঙ্গানো থাকে। তরুণবাবু সংস্কৃতির উপর আক্রমণ করেছেন।

বসুমতী : ২৬. ৩. ৬৫

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ সম্পর্কে বিরোধী সদস্য শ্রীঅপূর্ব মজুমদারের একটি অভিযোগ ও তাহার জবাব শ্রী ঘোষের বক্তব্য উপলক্ষ্য করিয়া বৃহস্পতিবার বিধান সভায় ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা এবং তাহার পর বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়।

শ্রী মজুমদারের অভিযোগ ছিল যে, শ্রী ঘোষ স্টার থিয়েটারে 'একক দশক শতক' নাটক দেখিতে গিয়া নাটকের দৃশ্যে জনৈক কালোবাজারীর ভূমিকাভিনেতার মাথায় 'কংগ্রেসী টুপি' দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া পড়েন এবং থিয়েটারের মালিককে

ভয় দেখাইয়া উহা বন্ধ করিয়া দেন। শ্রী মজুমদারের মতে ইহা সংস্কৃতির উপর অন্যায়, দলীয় স্বার্থ-প্রণোদিত হস্তক্ষেপ।

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিতে উঠিয়া শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বলেন যে, তিনি অভিনয় দেখিতে গিয়া একটি দৃশ্যে কালোবাজারীব বারবনিতার দালাল এবং জঘন্য ধরনের একজন চরিত্রাভিনেতার পরনে খদ্দর এবং মাথায় গান্ধী টুপি দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। পিছনে মহাত্মা গান্ধীর চিত্র ছিল। শ্রী ঘোষ বলেন, জাতীয় নেতারা যে পোশাক পরে তাহাকে এভাবে অপমানিত করা হয়, মহাত্মা গান্ধীকেও। তখন তিনি উক্ত থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে আহ্বান করিয়া উহা বদলাইতে বলিয়াছেন। ভয় দেখান নাই।

শ্রী ঘোষের এই জবাবে একসঙ্গে সর্বশ্রী কমল গুহ, সুনীল দাশগুপ্ত, অপূর্ব মজুমদার প্রমুখ সদস্যগণ তীব্র আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, এভাবে মন্ত্রীদের চাপ সৃষ্টি হইলে সাংস্কৃতিক জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে। তাঁহাদের উত্তেজিত ভাষণের সময়ে স্পীকার তাঁহাদের নাতি৷ফিক বক্তৃতার সময়ে বক্তব্য বলিতে বলেন।

পরে নির্দলীয় সদস্য শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ভাষণ দিতে উঠিয়া শ্রী ঘোষের আচরণের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, সরকার ইহা করিতে পারেন বলিয়া তরুণবাবু যে উক্তি করিযাছেন তাহা অসঙ্গত। পৃথিবীতে এ ধরনের বহু ব্যঙ্গাত্মক নাটক অভিনীত হয়। আপত্তি হইলে 'স্ট্যাটাযার' বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শ্রীকানাই পাল তাহার ভাষণে বলেন যে, এক সময়ের মিটিং-এর পোশাক আজকাল চিটিং-এর পোশাকে পরিণত হইয়াছে। নেতৃবৃন্দ দুর্নীতির স্রোতে গা ভাসাইয়াছেন বলিয়াই নাটক দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠেন।

শ্রীকমল গুহ বলেন, শ্রী ঘোষ যে জবাব দিলেন তাহা মারাত্মক। এই সরকার নাটক নিয়ন্ত্রণ বিল আনিতে চাহিয়াছিলেন। জনমতের চাপে তাহা বন্ধ করিয়াছেন। এই স্টার থিয়েটারে ইংরেজরা 'পথের দাবী' বন্ধ করিয়াছিলেন। আজ আবার কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নাটকে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। শ্রী গুহ বলেন, পল্লীসমাজে কোন চরিত্রে 'টিকি' থাকিলে যদি আপত্তি উঠে, তাহা হইলে সব নাটকই বন্ধ করা হইবে। আলোচ্য নাটকে দেশসেবার ভণ্ডামী যাহারা করে, তাহাদেরই শুধু ব্যঙ্গ করা হইয়াছে—প্রকৃত দেশপ্রেমিককে নয়।

Amrita Bazar Patrika : 26. 3. 65

There was a stir in the House when he (Sri Apurbalal Mazumdar, F. B.) resented a Minister's interference with a

particular scene of a play at a public stage which, he believed, was nothing short of the ruling party's intrusion in the field of art and culture.

At this stage, the Commerce and Industries Minister, Sri Tarun Kanti Ghosh, intervened to say that personally he found nothing wrong in drawing the proprietor's attention to the controversial scene as it might create misgivings about the khadi users in the public mind. The scene hurt his feelings since khadi was a thing that had been innately connected with the country's freedom movement. He asked the members to remember that patriots like Netaji Subhas Chandra Bose also used khadi. Moreover, the display of Gandhiji's portrait in that part of the play was unwarranted, he added.

Statesman : 26. 3. 65

Toward the close of the debate an exchange of hot words between Congress and Forward Block members followed Mr. Apurbalal Mazumdar's (FB) allegation that the Industries Minister, Mr. Tarun Kanti Ghosh, had put pressure on the management of a local theatre to make changes in the drama it was staging.

Mr. Ghosh explained that there was no question of his interfering with the staging of the drama, which, he said, showed a blackmarketer in khaddar and wearing a Ghndhi cap against the background of Mahatma Gandhi's portrait. The management was only reminded of the association of khaddar with great national leaders like Mahatma Gandhi and Subhas Chandra Bose, he said.

Several Forward Block members stood up to say that the Minister's statement was an admission of State interference in cultural matters.

Mr. Siddhartha Sankar Ray (Ind) said if, by his statement, the Minister meant to justify State interference, he would oppose it. Staging of dramas to satirize either the Crngress or Leftist forces "quarrelling among themselves on the eve of the Corporation elections" should be welcome in a democracy.

Hindusthan Standard : 26. 3. 65

The third allegation was that Mr. Tarun Kanti Ghosh had tried to interfere with a play, now being staged in Calcutta. Mr. Ghosh intervened to say that he had merely requested the management of the particular playhouse to drop an obnoxious character—a man clad in khadi, with a white cap on and a photo of Gandhiji on his wall—since this was indecently suggestive.

সাপ্তাহিক বসুমতী ঃ বৃহস্পতিবার, ১৮ই চৈত্র
১৩৭১ (ইং ১লা এপ্রিল ৬৫)

সরস্বতীর পবিত্র অঙ্গন কলুষিত হয়েছে। যেখানে মন্ত্রী স্বয়ং দর্শক ও শ্রোতা, সেখানে এই রকম হওয়াটা হয়তো আশ্চর্যজনক কিছু নয়। কেননা কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন না হলে, কর্তা সেখানে খড়্গহস্ত হবেনই। ব্যাপারটা ঘটেছে খাস পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতার স্টার থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিল 'একক, দশক, শতক' নাটকটি। সেই নাটকের অভিনয়কালে জনৈক দর্শক মন্ত্রী একেবারে খাপ্পা! কারণ নাটকের দৃশ্যে জনৈক কালোবাজারীর মাথায় গান্ধীটুপি, পরনে খদ্দর! এ হেন ব্যঙ্গ-অভিনয়ের অনুষ্ঠান মন্ত্রী মহাশয়ের চোখে অসহ্য। সুতরাং বাংলা নাট্যমঞ্চের গৌরবময় ইতিহাসকে এক নিমেষে তুড়ি মেরে তিনি কর্তৃপক্ষকে হুকুম করে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন!

স্টার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রথমেই এই ঘটনার প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হলেও বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরে খোলাখুলিভাবে ঘটনাটি প্রকাশ পেয়েছে। এবং পবিত্র নাট্য-মন্দির 'ব্যক্তিগত'র অন্তরালে মন্ত্রী-মহাশয়ের হস্তক্ষেপে কলুষিত হওয়া" আমরা বিচলিত।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের খুব স্পষ্টভাবে মনে পড়ছে যে, প্রায় এক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাটক নিয়ন্ত্রণ বিল পাশ করানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু জাগ্রত জনমতের চাপে সরকারের সে আশা মুকুলেই শুকিয়ে গেছে। তাই যুদ্ধপরাহত অতি উৎসাহী মন্ত্রীমহোদয় রঙ্গমঞ্চে গিয়ে, ঠিক যেন পশ্চাৎ দরজা দিয়ে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে লেগে পড়েছেন! এই অগণতান্ত্রিক ব্যাপারের পর আজ স্বাধীন দেশে বসে

ভাবতেও অবাক লাগে, তাহলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আমাদের সরকারের পার্থক্য কোথায়? সেই বৃটিশ রাজত্বের যুগে প্রিন্স অব ওয়েলসকে সম্বর্ধনায় যারা সহযোগিতা করেছিল, তাদের উপলক্ষ করে রচিত হয়েছিল 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক।

তদানীন্তন রাজকর্মচারীদের ব্যঙ্গ করার জন্যে রচিত 'দেশের ডাক', 'কারাগার' এমন কি 'পথের দাবী'র মতো নাটককে ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থে হামেশাই বাজেয়াপ্ত করত। সেই বৃটিশ নীতির পুনরভিনয় হতে চলেছে গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষেও! একান্ত রসশূন্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীন না হলে একটি নাটকের অঙ্গ কর্তন করার মতো দুর্বুদ্ধি কারো কাছে আশা করা যায় না। মাত্র একটি কারণে আশা করা যায়, সেটি হচ্ছে দলগত স্বার্থ।

নাটকে দুরাত্মার ছদ্মবেশ ধারণ ব্যাপারটি নতুন নয়। কারণ ব্যঙ্গাত্মক ক্রিয়ায় সেখানে দুরাত্মার ছদ্মবেশ উন্মোচন করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অভিযানে'ও মহাত্মাজীকে অপমান করা হয়নি। বরং আপামর যারা মহাত্মাজীর নাম নিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করে, সেখানে তাদের আসল স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের দৃশ্যে সৎ ব্যক্তিদের খাপ্পা হবার কারণ নেই। কিন্তু আমাদের মন্ত্রীমহোদয় সামাজিক গলদ দূরীকরণের পরিবর্তে নাটক দেখেই মগাখাপ্পা! কিন্তু প্রকৃত গুণী রসিক জানেন, ব্যঙ্গাত্মক দৃশ্যে নাটকের আসল বক্তব্য দর্শককে কিভাবে সত্যের সম্মুখীন করে দেয়। বিদ্যাসাগর রোগ সাহেবের অত্যাচার দৃশ্যে মুস্তাফিকে চটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন। আর সেই চটিকে অভিনয়-জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে মাথায় তুলে নিয়েছেন মুস্তাফি সেই মঞ্চে। কিন্তু একালের দর্শক হচ্ছেন মন্ত্রী। তাই রস বিসর্জন দিয়ে তিনি কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন শুনতেই ইচ্ছুক। হায়, সেই ইচ্ছায় ছাই পড়েছে শুরুতেই।

বসুমতী : ৭. ৪. ৬৫

মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলীর উভয় কক্ষে ব্যক্তিগতভাবে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী সদস্যগণ শিল্প ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ উত্থাপন করেন।

স্টার থিয়েটারে 'একক, দশক, শতক' নাটকের একটি দৃশ্যকে পরিবর্তন করিতে উক্ত থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করার অভিযোগ করিয়া বিরোধী

নেতৃবৃন্দ সরকারকে ফ্যাসিস্ট বলিয়া অভিহিত করেন। বিধান সভায় একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিরোধী নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এবং বিধান পরিষদে একটি দৃষ্টি-আকর্ষণী প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রীযতীন চক্রবর্তী প্রসঙ্গটির অবতারণা করিয়া তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, মন্ত্রীরা এইভাবে হস্তক্ষেপ করিলে মুক্ত সাংস্কৃতিক জীবন পশ্চিম বাংলা হইতে অবলুপ্ত হইবে।

বিধান সভায় বিরোধী নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, তরুণবাবু নাটকটি দেখিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বক্তব্য শুনিয়া চটিয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া ঐ নাটকের দৃশ্যটি বন্ধ করিয়া দিলেন। কংগ্রেস সরকার আইন করিয়া সৃষ্টিকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু জনমতের চাপে পিছু হটিয়াছিলেন। এখন সেই উদ্দেশ্যই আবার সাধন করিতে চাহিতেছেন।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বলেন, তিনি নাটকের ঐ দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন। একজন চোরাকারবারী দেশদ্রোহী (কমল গুহ বলেন, না, না, আপনাদের মত খদ্দরপরা দেশপ্রেমিক) পতিতা আবাসের রক্ষককে গান্ধীজী, নেতাজী যে পোশাক পরিতেন তাহাই পরানো হইয়াছিল। ইহা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নয়, জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বলিয়াই তিনি শ্রীজগন্নাথ কোলে ও শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের সঙ্গে আলাপ করার পর থিয়েটারের মালিককে দৃশ্য পরিবর্তনের অনুরোধ করিয়াছেন মাত্র।

শ্রী জ্যোতি বসু বলেন, বিমল মিত্রের বইটি তরুণবাবু বুঝিতে পারেন নাই। প্রাক্স্বাধীনতা যুগের সমালোচনা করা হয় নাই। এখন গান্ধী টুপি পরিয়া যাহারা চোরাকারবার চালায়, তাহাদের কথা বলা হইয়াছে। এতে চটিয়া যাওয়ার অর্থ ই হইল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছু সহ্য করা হইবে না।

বিধান পরিষদে শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলিয়া বলেন, জনসাধারণের মনে আজ এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বর্তমান যুগে খদ্দর পরিয়া চোরাকারবার ও দুর্নীতি চালানো হয়। বাস্তব জিনিসকে এইভাবে পরিবর্তন করানোর অর্থ হইতেছে, জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করা।

শ্রী সান্যাল এজন্য একটি তদন্ত কমিটী গঠনের দাবী জানান।

শ্রী জ্যোতি বসু ও শ্রী সান্যাল ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, মন্ত্রীদের এই ভীতি প্রদর্শনের ফলে উক্ত থিয়েটারের মালিক ইতোমধ্যেই দৃশ্যটির পরিবর্তন করিয়াছেন।

যুগান্তর : ৭. ৪. ৬৫

বিরোধী দলনেতা শ্রী জ্যোতি বসু একটি মুলতুবী প্রস্তাব তুলিয়া বলেন যে, মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ 'একক দশক শতক' নাটকের একটি চরিত্র বদলাইয়া দিবার জন্য সংশ্লিষ্ট থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়া শ্রী বসু প্রশ্ন করেন—এইভাবে চলিলে ফ্যাসিবাদ আর কতদূর ?

শ্রী ঘোষ এই সম্পর্কে নিজ বক্তব্য জানান। তিনি বলেন যে, নেতাজী যে পোশাক পরিতেন, হাজার হাজার লোক যে পোশাক পরিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতীক—সেই খদ্দর ও গান্ধী টুপি পরাইয়া এই নাটকে একটি দুষ্ট চরিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার খুবই খারাপ লাগে। সেইজন্যই তিনি ঐ থিয়েটারের মালিককে ইহা জানান। উহা অনুরোধ মাত্র, অন্য কিছুই নহে। স্পীকার আগেই মুলতুবী প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রী বসুও পরে আর চাপ দেন নাই।

বিধান পরিষদে শ্রীযতীন চক্রবর্তীও ঐ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শ্রী ঘোষ অনুরূপ উত্তর দেন।

আনন্দবাজার : ৭. ৪. ৬৫

ঐদিন বিরোধী দলনেতা শ্রীজ্যোতি বসু কলকাতার একটি থিয়েটারে একটি নাটক অভিনয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ঐ নাটকটি দেখতে গিয়েছিলেন। নাটকের কোন একটি অংশ তাঁর মনঃপূত হয়নি। তাঁর কথায় থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ঐ অংশটি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রী বসু এ ব্যবস্থার মধ্যে 'ফ্যাসিজমে'র সন্ধান পান। শ্রী বসু বলেন যে, থিয়েটার কর্তৃপক্ষ শ্রী ঘোষের আপত্তিকে সরকারী মনোভাব বলে ধরে নিয়েছেন। এরূপ প্রচেষ্টা সংস্কৃতির স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ বলে তিনি মনে করেন। (প্রসঙ্গটি পরিষদেও উত্থাপিত হয়।)

মন্ত্রী শ্রী ঘোষ বলেন যে, তিনি তাঁর প্রভাব এতটুকু খাটাননি। জাতির জনক এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নায়কদের মর্যাদাক্ষুন্নকর কোন অংশ নাটকে থাকা উচিত নয়। থাকলে বাদ দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে তিনি অনুরোধ জানালে তাঁরা তা

রক্ষা করেন। এটি ছিল সম্পূর্ণ অনুরোধের প্রশ্ন—প্রভাব বিস্তারের প্রশ্ন এখানে ছিল না।

শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে, তিনি শ্রী ঘোষের এ বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

Amrita Bazar Patrika : 7. 4. 65

Immediately after the question hour, Sri Jyoti Basu sought to move an adjournment motion challenging the Commerce and Industries Minister, Sri Tarun Kanti Ghosh's right to ask the management of a public theatre in Calcutta to change a certain scene that appeared to the latter as objectionable.

When the Speaker disallowed the motion, Sri Basu asked him to treat his contention according to some other sections of the Rules of Business of the House and demanded a reply from the Commerce and Industries Minister.

Sri Basu said that the management had effected the desired change in the impugned scene fearing persecution since they took the Minister's request as the Government's order. This he considered as an infringement on the concept of free culture.

Sri Tarun Kanti Ghosh immediately came out with a ready reply to allay Sri Basu's apprehension. Sri Ghosh said that he was pained to see in the play in question a character donned in khaddar and Gandhi cap, who, while professing himself as a follower of Gandhiji and displaying the Father of the Nation's portrait in his room, was actually indulging in black-marketing and running a brothel.

What aggrieved him more was the wanted association of khaddar with such a sinister character since khadi had become an emblem of the country's freedom struggle. Moreover, patriots like Netaji Subhas Chandra Basu were users of khadi.

Sri Ghosh said that he conveyed his feeling to the Chief Minister Sri P. C. Sen, Jail Minister Sri Jagannath Kolay and the Labour Minister Sri Bijoy Singh Nahar. The proprietor of the theater, came to them and agreed to make the change. He had made just a request and nothing more.

The matter was also raised by Sri Jatin Chakravarty (RSP) in the West Bengal Council and the Minister made an identical reply.

Statesman : 7. 4. 65

In the Assembly, moving an adjournment, which was disallowed by the speaker, the Opposition Leader, Mr. Jyoti Basu, said that the Commerce and Industries Minister Mr. Tarun Kanti Ghosh, had "intimidated" the proprietor of a theatre in North Calcutta which was producing a play by Mr. Bimal Mitra in which a person wearing a Congress cap was caricatured. Under his threat the theatre authorities had changed the cast of the play. This was a serious matter. Official interference in the cultural life of the people must be stopped.

Mr. Ghosh said that while watching the performance he was pained to see a black-marketer paraded as a Congressman who had hung up Gandhiji's picture in his room. He conveyed his feelings to Mr. Jagannath Kolay, the Minister for Parliamentary Affairs. The proprietor of the theatre was sent for by Mr. Kolay, who conveyed his sense of shock to him. "This is merely a personal request and nothing else."

Mr. Bose said that the explanation was not convincing. "A pre-Independence genuine Congressman was not being caricatured : Mr. Ghosh should have read the book."

A similar issue arose in the Council and an identical reply was given by the Minister.

Hindusthan Standard : 7. 4. 65.

Earlier, the Assembly had a close brush with an outburst when the Commerce and Industries Minister, Mr. T. K. Ghosh, was explaining his stand regarding the deletion of a portion of a drama now being staged in a Calcutta theatre. Mr. Jyoti Basu described the action as fascist. Undue ministerial influence, he alleged, was responsible for it. This should be immediately stopped or cultural freedom would be in danger, he added.

Mr. Ghosh, in his reply, denied any ministerial interference in the matter. The deleted portion contained aspersion on the freedom struggle. He explained that a request was made to the theatre-owner and he conceded.

A similar question was raised in the Upper House by Mr. Jatin Chakravarty and the Minister gave almost a similar reply.

What's on the Calcutta. 9th April 1965

Bimal Mitra's widely read novel "Ekak Dasak Satak" dramatised and directed by Debnarayan Gupta is being staged at Star Theatre. We find a vivid picture of the Socio-Econo-political trend of the whole of West Bengal of 1947, even of country as a whole vigorously depicted in this drama. The different characters represent different sections of the society and the story moves round the character of Sibaprosad who was once a political sufferer but now a very rich man. He takes pride in declaring himself as a disciple of Mahatma Gandhi but behind the curtain of Khaddar and Gandhi Cap, Sibaprosad engages himself in blackmarketing and other anti-social activities including maintaining a brothel house.

The drama speaks of the present-day situation of our country's social life although the story might have originated from the unfortunate partition of the country. We find the same state of affairs in our everyday life as has been boldly displayed in "Ekak Dasak Satak."

In the role of Kunti, Nilima Das represents the unfortunate refugee girl. She did not act but appeared in reality. Kanu Banerjee as the old teacher speaks of the oppressed humanity. He shows the way—the means of getting courage—to fight against the evil. Basabi Nandy, Jyotsna Biswas, Geeta Dey, Ketaki Dutta, Aparna Devi, Ajit Banerjee, Bhanu Banerjee, Nabakumar have done well in their respective roles.

Stage craft, light, music go a long way to give an exquisite effect to the central theme of the drama.

'The nation is known by its stage'—We wish, let "Ekak Dasak Satak" throw a new light to other stages of the country.

It is the glory of Bengali stage to have a performance like this. We congratulate the producer Salil Kumar Mitra and director Debnarayan Gupta for offering such a bold production like "Ekak Dasak Satak."

The Illustrated Weekly of India : 2. 5. 65, Page 23
Newsletters : A Stage Portrayal

To find myself in the position of having to defend the Congress is a novel experience ; not my worst enemy could garb me in the khadi of the party stalwart. But defence is called for and, for once, on legitimate grounds It concerns a little matter of a play called *Ekak Dashak Shatak* at Calcutta's time-honoured Star Theatre and of the pressure that had of necessity to be brought to bear upon the management to divest the villain of the piece—a brothel keeper—of his khadi and Gandhi cap. The management succumbed. The bad man lounges now in a bath robe and *Ekak Dashak Shatak*, basking in the fierce limelight of having been ' victimised", can hope to live for many years on the patronage of those who make the all-too-simple mistake of confusing license with liberalism.

At the time of writing, the play is a *cause celebre*. The novel by Bimal Mitra is far more hard-hitting than anything our basically hamstrung (hamstrung, not so much because of minor regulatory laws, but because of their own limited minds) stage dare present, was a bestseller. Deb Narain Gupta brings to the direction his many years of experienced talent ; the irrepressible Mr. Jyoti Basu seized the opportunity to brand the Government as "fascist" on the Assembly floor ; Mr. Jatin Chakravarty in the Upper House seemed equally outraged ; and certain sections of the Press see in the alteration in the production proof of the strangulation of liberty. Which all makes for a good box-office.

"What," asks a local magazine columnist rather naively, "is the law whereby I can be prevented from criticising or ridiculing the Congress party ?" The answer of course is that there is no such law ; nor is criticism or ridicule of the party, I repeat, of

the party as such, to be muzzled. That belongs to the world of political polemics and our system, for all its faults, allows a degree of free exchange of opinion—degenerating usually, it is true, to accusation as debating points—of which we can justly be proud. But slander is quite another thing. To make an obviously recognisable symbol of the party, of any group or party for that matter, an objectionable caricature is not to be justified on political grounds. It makes no specific accusation against the party's credo or operations, it advocates nothing, repudiates nothing, offers no tangible evidence against the party nor even definite criticism that can be answered. It merely perverts a popular medium of artistic expression in a smear campaign that is as safely general as it is deliberately malicious.

In answer to the question then, if there are no laws already to deal with such situations, there jolly well should be. And with that I have probably earned myself a place in the gallery of other "Fascists" who will not allow their liberalism to run away with their sense of right and wrong.

It is not that my prudery is offended at the portrayal of a brothel keeper on the stage. For many they are, no doubt, of the stuff of life, and though I have little patience with the adolescent craving to shock, I can envisage a perfectly valid artistic situation that might necessitate the presentation of such a purveyor of horseflesh. Nor would I dream of flinging my gauntlet at anyone daring to suggest that Congressmen dabble in such trades ; far be it from me to hold that members of the ruling party are impeccable. But can it reasonably be claimed that the proportion of brothel keepers is higher among Congressmen than among ordinary citizens ? For that was plainly the imputation of *Ekak Dashak Shatak* ; the management had the good sense to realise this and the theatre can only benefit from the curb that did not allow the producers to get away with it.

Having said as much, it must be conceded that the Government's handling of the case and its prevarication in debate have not been exemplary. A minister is reported to have seen the

play and, incensed at the characterisation, apparently consulted his colleagues and threatened both the Company and the proprietor of the Star Theatre, Mr. Salil Mitra, with the D.I.R. That was an imprudent thing to do. The D. I. R. is already being strained rather more than circumstances justify ; to use it when the integrity not of the State, but of a private organisation (as the Congress party must be held to be in this context) is challenged, cannot have any legal sanction. Prosecution for libel would have been the more correct procedure but the time and expense involved probably made it unthinkable. Clapping people into jail without trial is so much easier. That extreme was not necessary in this case of course, but such use of the D. I. R. can only bring the Government into disrepute.

The alternative is censorship. The West Bengal Government's proposed Dramatic Performances Bill was withdrawn in the face of a storm of protest and your chronicler was among those who believed that its stringent clauses, drawn up to suit the arbitrary requirements of the British Raj, had best not be imposed on a theatre that requires help and nurturing rather more than control. But it also requires guidance, and a clear way out of anomalous situations that can arise only in the absence of censorship.

Nor do I regard censorship in itself as a dirty word. The situation often calls for it. The standard and direction of political consciousness in the country demand it no less. Even in the placid liberalism of Britain—the source of the democratic inspiration of all except those vocal few who have found in Communism another answer—some kind of control is thought advisable in the interests of good taste if of nothing else. Thus the Lord Chamberlain's ban clamped down on John Osborne's *The Entertainer* starring no less a celebrity than Sir Laurence Olivier, after only a single night at London's Royal Court Theatre with a nude Britannia draped but slightly in the Union Jack and bearing aloft her shield and trident. The lady had perforce to dress more decorously after that. More recently, the B. B. C. television feature *Not So Much A Programme* had to be

withdrawn after a cruel and pointless *skit on the ailing Duke* of Windsor. The level of innuendo mistakenly called criticism in *Ekak Dashak Shatak* was no higher.

What is to be deplored, however, is the Government's all too common identifying of Congress with the nation. *Ekak Dashak Shatak* may have been an offence to a group of individuals, an offence to art, even an offence to any responsible audience ; it did not, however, endanger the defence of the country. But in his answer in the Assembly, the Minister for Commerce and Industries, Mr. Tarun Kanti Ghosh, retorted that the play cast aspersions on the freedom struggle. And skating on thin ice, he conjured up the vision of Netaji Subhas Chandra Bose, the still-living idol of Bengal whose return to the motherland, declared imminent every so often, the prophecies being swallowed whole by a gullible public, will put all things right. Nothing succeeds so much as an appeal to Bengali emotion : Netaji the missing, misguided, tragic hero of the forties, had once worn khadi, hence the cloth must be sacrosanct. There must have been many a wry smile in the Press Gallery when Mr. Ghosh added that there was no ministerial interference. Only a "request" had been made to the theatre owner who had promptly conceded to it.

Sunanda K. Datta-Ray

Link : May 23, 1965

Recently there was widespread criticism from writers and artists about what has been called Government interference in art and literature. Three instances were given in support of this charge.

The first case of interference concerned the dramatic performance of a story by the well-known writer, Bimal Mitra. The story, given the form of a play called "Ekak Dashak Shatak", by the noted playwright Deb Narayan Gupta, has a villain who masquerades as a patriot in Khadi clothes and Gandhi cap. He calls himself a disciple of Gandhiji and displays in his house a portrait of the Mahatma. But in practice he violates almost every moral principle.